প্রকাশকঃ— শ্রীদীপেন্দ্র নাথ মৌলিক, মৌলিক লাইব্রেরী ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৫৯

মুদ্রাকর—টি. ঘোষ, "লিপিমালী" ২জি, নিলমনি রো, কলিকাতা—৭০০ ০০২

সূচিপত্র

সহমরণ বিষয়
প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ

রামমোহন রায়

প্রথমে প্রবর্তকের প্রশ্ন।— আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ॥

নিবর্তকের উত্তর।— সর্বশাস্ত্রেতে এবং সর্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।

প্রবর্তক।— তোমরা এ বড় অযোগ্য কহিতেছ যে সহমরণ ও অনুমরণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় এ-বিষয়ে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদের বচন শুন। মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ তিস্রঃ কোট্যৰ্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে। তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তদ্বৎ ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥ মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে। পুনাতি ত্রিকুলং সাধ্বী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ তত্র সা ভর্তৃপরমা পরা পরমলালসা। ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ব্রহ্মঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি মানবঃ। তং বৈ পুনাতিসা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতং॥ সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে। নান্যোহি ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ॥ স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী ঐ পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে বাস করে॥ আর যেমন সর্পগ্রাহকেরা আপন বলের দ্বারা গর্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয় তাহার ন্যায় বলের দ্বারা ঐ স্ত্রী স্বামীকে লইয়া তাহার সহিত সুখ ভোগ করে। আর যে স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামীকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে। আর অন্য স্ত্রী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ইচ্ছাবতী আর স্বামীর প্রতি অত্যন্তশ্রদ্ধাযুক্ত যে ঐ স্ত্রী সে পতির সহিত তাবৎ পর্যন্ত স্বর্গ ভোগ করে যাবৎ চতুর্দশ ইন্দ্রপাত না হয়। আর পতি যদি ব্রহ্মহত্যা করেন কিংবা কৃতঘ্ন হয়েন কিংবা মিত্রহত্যা করেন তথাপি ঐ পতিকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করে ইহা অঙ্গিরামুনি কহিয়াছেন॥ স্বামী মরিলে সাধ্বী স্ত্রী সকলের অগ্নি

প্রবেশ ব্যতিরেকে আর অন্য ধর্ম নাই। কপোতিকার ইতিহাসচ্ছলে যাহা ব্যাস লিখিয়াছেন তাহাও শুন॥ পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং। তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্ত্তারং সাম্বপদ্যত॥ পতিব্রতা যে এক কপোতিকা সে পতি মরিলে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল পরে ঐ কপোতিকা স্বর্গে যাইয়া পতিকে পায়॥ এবং হারীতের বচন শুন। যাবদ্ধ্যগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী নাত্মানং প্রদাহয়েৎ। তাবন্ন মুচ্যতে সা হি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চনেতি॥ পতি মরিলে স্ত্রী যাবৎ পর্যন্ত অগ্নিতে আত্মাকে দাহ না করে তাবৎ স্ত্রীযোনি হইতে কোনোরূপে মুক্ত হয় না। এবং বিষ্ণু ঋষির বচন শুন॥ মৃতে ভর্ত্তারি ব্রহ্মচর্য্যং তদাম্বারোহণম্বেতি। পতি মরিলে পত্নী ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিবেন কিংবা পতির চিতাতে আরোহণ করিবেন। এখন অনুমরণ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণের বচন শুন॥ দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং॥ ঋগ্‌বেদবদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ।*। অন্যদেশস্থ পতির মৃত্যু হইলে পর স্বাধ্বী স্ত্রী স্নান আচমনপূর্বক পতির পাদুকাদ্বয়কে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক। এইরূপ অগ্নিপ্রবেশ করিলে ঐ স্ত্রী আত্মঘাতিনী হয় না যেহেতুক ঋক্‌বেদের বাক্য আছে কিন্তু তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয় সেই অশৌচ অতীত হইলে পুত্রেরা যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিবেন।*। মৃতানুমরণং নাস্তি ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মশাসনাৎ। ইতরেষু তু বর্ণেষু তপঃ পরমমুচ্যতে। জীবন্তী তদ্ধিতং কুর্য্যান্মরণাদাত্মঘাতিনী। যা স্ত্রী ব্রাহ্মণজাতীয়া মৃতং পতিমনুব্রজেৎ। সা স্বর্গমাত্মঘাতেন নাত্মানং ন পতিঃ নয়েৎ। মৃত পতির অনুমরণ ব্রাহ্মণী করিবেন না যেহেতু বেদের শাসন আছে আর ইতর বর্ণের যে স্ত্রী তাহাদের অনুমরণকে পরম তপস্যা করিয়া কহেন। ব্রাহ্মণী জীবদ্দশায় থাকিয়া পতির হিত কর্ম করিবেন। আর ব্রাহ্মণ জাতির যে স্ত্রী পতি মরিলে অনুমরণ করে সে আত্মঘাতজন্য পাপের দ্বারা আপনাকে ও পতিকে স্বর্গে লইতে পারে না॥ এইরূপ নানা স্মৃতিবচনের দ্বারা সিদ্ধ যে সহমরণ ও অনুমরণ তাহাকে কিরূপে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কহ এবং তাহার অন্যথা করিতে চাহ।

নিবর্তক।— এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক যদি সহমরণ ও অনুমরণ করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয় কিন্তু বিধবাধর্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর॥ কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং॥ পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না॥ আর আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠানপূর্বক থাকিবেন॥ ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে, পতি মরিলে ব্রহ্মচর্যে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন॥ যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং॥ যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য

জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্মৃতি॥ মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে। বিশেষত বেদে কহিতেছেন॥ তস্মাদ্ হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াদিতি॥ যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুসত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না। অতএব মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আপন আপন স্মৃতিতে বিধবার প্রতি ব্রহ্মচর্যধর্মই কেবল লিখিয়াছেন এই নিমিত্ত এই শ্রুতি ও মন্বাদি স্মৃতির দ্বারা তোমার পঠিত অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি সকল বাধিত হইয়াছেন যেহেতু স্পষ্ট বিধি দেখিতেছি যে, স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মোক্ষ সাধন করিবেন।

প্রবর্তক।— তুমি যে কহিতেছ সহমরণ ও অনুমরণ বিধায়ক অঙ্গিরা প্রভৃতির যে স্মৃতি তাহা মনুস্মৃতির বিপরীত হয় এ কথা আমরা অঙ্গীকার করি না যেহেতু মনু যে কর্ম করিতে বিধি দেন নাই তাহা অন্য স্মৃতিকারেরা বিধি দিলে মনুর বিপরীত হয় না যেমন মনু সন্ধ্যা করিতে বিধি দিয়াছেন হরিসংকীর্তন করিতে কহেন নাই কিন্তু ব্যাস হরিসংকীর্তন করিতে কহিয়াছেন সে ব্যাসবাক্য মনুর বিপরীত নহে এবং হরিসংকীর্তন করা নিষিদ্ধ না হয় সেইরূপ এখানেও জানিবে যে মনু বিধবাকে ব্রহ্মচর্যের বিধি দিয়াছেন এবং বিষ্ণু প্রভৃতি ঋষিরা ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ উভয়ের বিধি দিয়াছেন অতএব মনুস্মৃতি সহমরণের অভাব পক্ষে জানিবে।

নিবর্তক।— সন্ধ্যা ও হরিসংকীর্তনের উদাহরণ যাহা তুমি দিতেছ সে ব্রহ্মচর্য ও সহমরণের সহিত সাদৃশ্য রাখে না যেহেতু দিনমানের মধ্যে সন্ধ্যার বিহিত কালে সন্ধ্যা করিলে তদ্ভিন্ন কালে হরিসংকীর্তনের বাধা জন্মে না এবং সন্ধ্যার ইতরকালে হরিসংকীর্তন করিলে সন্ধ্যার বাধা হয় না অতএব এ স্থানে একের বিধি অন্যের বাধক কেন হইবেক কিন্তু ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ বিষয়ে একের অনুষ্ঠান করিলে অন্যের অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা থাকে না অর্থাৎ পতি মরিলে যাবৎজীবন থাকিয়া ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান যাহা মনু কহিয়াছেন, তাহা করিলে সহমরণের বাধ হয় এবং সহমরণ যাহা অঙ্গিরা প্রভৃতি কহিয়াছেন তাহা করিলে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মোক্ষ সাধনের বাধ হয় অতএব এ দুয়ের অবশ্যই বৈপরীত্য আছে। বিশেষত নান্যো হি ধর্ম্ম ইত্যাদি বচনে অঙ্গিরা ঋষি সহমরণের নিত্যতা কহেন এবং হারীত ঋষি আপন স্মৃতিতেও সহমরণ না করিলে স্ত্রীযোনি হইতে মুক্ত হয় না এইরূপ দোষ শ্রবণের দ্বারা নিত্যতা কহেন। অতএব ঐ সকল বচন সর্বথাই মনুস্মৃতির বিপরীত হয়।

প্রবর্তক।— অঙ্গিরার বচনে কহেন যে সাধ্বী স্ত্রীর সহমরণ বিনা অন্য ধর্ম নাই আর হারীতবচনে সহমরণ না করিলে যে দোষশ্রবণ আছে তাহাকে আমরা মনুস্মৃতির অনুরোধে সহমরণের প্রশংসা মাত্র বলিয়া সংকোচ করি কিন্তু সহমরণের নিত্যতাবোধক হয় এমত নহে এবং ঐ সকল বচনে সহমরণের ফলশ্রুতি আছে তাহার দ্বারাও সহমরণ কাম্য হয় এমৎ বুঝাইতেছে।

নিবর্তক।— যদি মনুস্মৃতির অনুরোধ করিয়া সহমরণের নিত্যতাবোধক যে বাক্য

অঙ্গিরা হারীতবচনে আছে তাহাকে স্তুতিবাদ কহিয়া সংকোচ করিলে তবে ঐ মনুস্মৃতি যাহাতে পতি মরিলে বিধবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য করিবেক এই বিধির দ্বারা ব্রহ্মচর্যের নিত্যতা দেখাইয়াছেন তাহার অনুরোধ করিয়া অঙ্গিরা ও হারীতাদির সমুদায় বচনের সংকোচ কেন না কর এবং স্বর্গাদির প্রলোভ দেখাইয়া স্ত্রীহত্যাদর্শনে ক্ষান্ত কেন না হও। অধিকন্তু পূর্বোক্ত শ্রুতিতে কামনাপূর্বক আত্মহননকে দৃঢ় কবিয়া নিষেধ করিয়াছেন।

প্রবর্তক।— যে সকল মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য ও শ্রুতি তুমি শাসন দিলে তাহা প্রমাণ বটে কিন্তু সহমরণ বিষয়ে যে এই ঋক্‌বেদেব শ্রুতি আছে তাহাকে তুমি কি রূপে অপ্রমাণ করিতে পার। যথা॥ ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্বিশন্তুনশ্রবা অনমীরাসুরত্না আরোহন্তু যাময়ো যোনিমগ্নেঃ॥

নিবর্তক।— এই শ্রুতি এবং ওই পূর্বোক্ত হারীত প্রভৃতির স্মৃতি যাহা তুমি প্রমাণ দিতেছ সে সকল সহমরণের ও অনুমরণেব প্রশংসা এবং স্বর্গফল প্রদর্শনের দ্বারা কাম্য বোধক হয় এবং ইহাকে কাম্য না কহিলে তোমারো উপায়ান্তর নাই এবং সহমরণের সংকল্পবাক্যে স্বর্গাদি কামনার প্রয়োগ স্পষ্ট করাইতেছে অতএব এ শ্রুতির ও হারীতাদি স্মৃতির বাধক আমাদের পূর্বোক্ত নিষ্কাম শ্রুতি সর্বথা হয় ইহার প্রমাণ। কঠোপনিষৎ॥ অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তের্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥ শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক্ হয় আর শ্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে কর্ম সেও পৃথক্ হয় ঐ জ্ঞান আর কর্ম ইহাঁরা পৃথক্ পৃথক ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার কল্যাণ হয় আব যে কামনাসাধন কর্মের অনুষ্ঠান করে সে পরমপুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়॥ মুণ্ডকোপনিষৎ॥ প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জংঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ অষ্টাদশাঙ্গ যে যজ্ঞরূপ কর্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মরণকে প্রাপ্ত হয়॥ আর যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞানরূপে কর্মকাণ্ডেতে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা জন্মজরামরণাদিদুঃখে পীড়িত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ কবে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধসকল গমন করিলে পথে নানাপ্রকার ক্লেশ পায়॥ এবং সকল স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসের সার যে ভগবদ্গীতা তাহাতে লিখিয়েছেন॥ যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যাগতিং প্রতি॥ ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ না বিধীয়তে॥ যে সকল মূঢ়েরা বেদের ফলশ্রবণবাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে ওই ফলশ্রুতি তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহে আর কহে যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিরা দেবতাস্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরমপুরুষার্থ করিয়া জানে আর জন্ম ও কর্ম ও তাহার ফল

প্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্যের প্রলোভ দেখায় এমৎরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমৎ বাক্যসকলকে পরমার্থসাধন কহে অতএব ভোগৈশ্বর্যেতে আসক্তচিত্ত এমৎরূপ ব্যক্তিসকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না॥ এবং মুণ্ডকশ্রুতি॥ যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ইত্যাদি॥ গীতা॥ অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং॥ অর্থাৎ তাবৎ বিদ্যা হইতে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ হয়েন। অতএব এই সকল শ্রুতির ও গীতার প্রমাণে ফলপ্রদর্শক শ্রুতি সর্বথা নিষ্কাম শ্রুতিদ্বারা বাধিত হয়েন। অধিকন্তু পূর্ব পূর্ব ঋষিরা এবং আচার্যেরা ও সংগ্রহকর্তারা এবং তোমরা ও আমরা সকলেরই এই সিদ্ধান্ত যে ভগবান্ মনু সর্বাপেক্ষা বেদার্থজ্ঞাতা হয়েন তেঁহ ঐ দুই শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সকাম শ্রুতির দুর্বলতা স্বীকারপূর্বক পূর্বলিখিত নিষ্কাম শ্রুতির অনুসারে পতি মরিলে স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন। এবং ভগবান মনু সকাম ও নিষ্কামের বিবরণ আপনি করিয়াছেন। ১২ অধ্যায়॥ ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥ প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সার্ষ্টিতাং। নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ কি ইহলোকে কি পরলোকে বাঞ্ছিত ফল পাইব এই কামনাতে যে কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের পর জন্মমরণরূপ সংসারে প্রবর্তক হয় আর কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসপূর্বক যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করে তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম কহি অর্থাৎ সংসার হইতে নিবর্ত করায় যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্ত কর্ম করে তাহারা দেবতাদের সমান হইয়া স্বর্গাদি ভোগ করে আর যে ব্যক্তি নিবৃত্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে সে শরীরের কারণ যে পঞ্চভূত তাহা হইতে অতীত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয়।

প্রবর্তক।— তুমি যাহা কহিলে তাহা বেদ ও মনু ভগবদগীতাসম্মত বটে কিন্তু ইহাতে এই আশঙ্কা হয় যে স্বর্গাদিসাধনে সহমরণ ও অন্য অন্য যজ্ঞাদি কর্ম বেদে এবং অন্য অন্য শাস্ত্রে যাহা কহিয়াছেন সে সকল বাক্য কি প্রতারণা মাত্র হয়।

নিবর্তক।— সে প্রতারণা নহে তাহার তাৎপর্য এই যে মনুষ্যতে প্রবৃত্তি নানা প্রকার যাহারা কাম ক্রোধ লোভেতে আচ্ছন্নচিত্ত হয় তাহারা নিষ্কাম পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্রবর্ত না হইয়া যদি সকাম শাস্ত্র না পায় তবে এককালেই শাস্ত্র হইতে নিবর্ত হইয়া নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় যথেষ্টাচার করিবেক অতএব সেই সকল লোককে যথেষ্টাচার হইতে নিবর্ত করিবার জন্যে নানাপ্রকার যজ্ঞাদি যেমন শত্রুবধার্থীর প্রতি শ্যেনযাগ এবং পুত্রার্থীর প্রতি পুত্রেষ্টি যাগ ও স্বর্গার্থীর প্রতি জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ইত্যাদির বিধান করিয়াছেন কিন্তু পরে পরে ঐ সকল সকামীর নিন্দা করিয়াছেন এবং ঐ সকল ফলের তুচ্ছতা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যদি এইরূপ বারংবার সকামীর নিন্দা ও ফলের তুচ্ছতা না করিতেন তবে ঐ সকল বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পারিত। ইহার প্রমাণ কঠোপনিষৎ॥ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥ জ্ঞান আর কর্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি ও দুয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্মের অনাদরপূর্বক জ্ঞানকে আশ্রয়

করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রিয়সাধন যে কর্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। ভগবদগীতা॥ ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। কর্মবিধায়ক বেদ সকল সকাম অধিকারিবিষয়ে হয়েন অতএব হে অর্জুন তুমি কামনারহিত হও। ও কর্মফলের নিন্দাবোধক শ্রুতি শুন॥ ইহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি॥ যেমন ইহলোকে কৃষ্যাদি কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত যে ফল তাহা পশ্চাৎ নষ্ট হয় সেইরূপ পরলোকে পুণ্য কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত যে স্বর্গাদি ফল তাহা নষ্ট হয়। গীতা। ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ যে সকল ব্যক্তি ত্রিবেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং ঐ সকল যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করিয়া স্বর্গ প্রার্থনা করে সে সকল ব্যক্তি যজ্ঞশেষ ভোজনের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ গমন করিয়া নানাপ্রকার দেবভোগ প্রাপ্ত হয়। পরে সেই সকল ব্যক্তি ঐরূপে স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আইসে অতএব কাম্য ফলার্থী ব্যক্তিসকল এইরূপ ত্রিবেদোক্ত কর্ম করিয়া কখন স্বর্গে কখন মর্ত্যলোকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।

প্রবর্তক।— তুমি সহমরণ ও অনুমরণের অন্যথা বিষয়ে যে সকল শ্রুতিস্মৃতিকে প্রমাণ দিলে যদ্যপিও তাহার খণ্ডন কোনো রূপে হইতে পারে না কিন্তু আমরা ঐ হারীতাদি স্মৃতির অনুসারে সহমরণ ও অনুমরণের ব্যবহার করিয়া পরম্পরায় আসিতেছি।

নিবর্তক।— তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যায্য ঐ সকল বাধিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত করানো সর্বথা অযোগ্য হয় দ্বিতীয়ত ঐ সকল বচনেতে এবং ঐ বচনানুসারে তোমাদের রচিত সংকল্পবাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্বক আরোহণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম কোন্ হারীতাদির বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা হয়।

প্রবর্তক।— যদিও এরূপ বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা হারীতাদি বচনের দ্বারা প্রাপ্ত নহে তথাপি সংকল্পের পর সহমরণ না করিলে পাপ হয় এবং লোকত নিন্দা আছে এনিমিত্ত আমরা করিয়া থাকি।

নিবর্তক।— পাপের ভয় যে কহিলে সে তোমাদের কথামাত্র যেহেতু ঐ স্মৃতিতেই কহিয়াছেন যে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে পাপের ক্ষয় হয়। যথা। চিতিভ্রষ্টা চ যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥ প্রাজাপত্য ব্রতে অসমর্থ হইলে এক ধেনুমূল্য তিন কাহন কড়ি উৎসর্গ করিলেই সিদ্ধ হয়। অতএব পাপের ভয় নাই তবে লোকনিন্দাভয় যাহা কহিতেছ তাহাও অন্যায় যেহেতু যে সকল লোক জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা না করিলে নিন্দা করে তাহাদের স্তুতি নিন্দাকে সাধু

ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন না আর ঈশ্বরের ভয় ও ধর্মভয় ও শাস্ত্রভয় এ সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল স্ত্রীবধেচ্ছু লোকের নিন্দাভয়ে স্ত্রীবধ করাতে কিরূপ পাতক হয় তাহা কি আপনি বিবেচনা না করিতেছেন।

প্রবর্তক।—যদ্যপি এরূপ বন্ধনাদি করা শাস্ত্রপ্রাপ্ত নহে তথাপি তাবৎ হিন্দুর দেশে এইরূপ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে এ প্রযুক্ত আমরা করি।

নিবর্তক।— তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্পদেশ যে এই বাংলা ইহাতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরাপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ ও চৌর্যাদি কর্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনস্থ এবং পর্বতীয় লোক যাহারা যাহারা পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে তাহাদিগ্যে নির্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এ সকল কুকর্ম হইতে তাহাদিগ্যে নিবর্ত করণে প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না বস্তুত ধর্মাধর্ম নিরূপণের উপায় শাস্ত্র এবং শাস্ত্রসম্মত যুক্তি হইয়াছেন সে শাস্ত্রের সর্বপ্রকারে অসম্মত এরূপ স্ত্রীবধ হয় এবং যুক্তিতেও অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।

প্রবর্তক।— এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিংবা যাহা হউক আমরা এ ব্যবহারকে নিবর্ত করিতে দিব না ইহার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহারো মনে স্ত্রীঘটিত কলঙ্কের কোনো চিন্তা হয় না ইতি।

নিবর্তক।— কেবল ভাবি আশঙ্কাকে দূর করিবার নিমিত্তে এরূপ স্ত্রীবধে পাপ জানিয়াও নির্দয় হইয়া জ্ঞানপূর্বক প্রবর্ত হইতেছ তবে ইহাতে আমরা কি করিতে পারি কিন্তু ব্যভিচারের আশঙ্কা পতি বর্তমান থাকিতেই বা কোন্ না আছে বিশষত পতি দূরদেশে বহুকাল থাকিলে ঐ আশঙ্কার সম্ভাবনা কেন না থাকে অতএব সে আশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় কি করিয়াছ।

প্রবর্তক।— স্বামী বর্তমানে ও অবর্তমানে অনেক প্রভেদ আছে যেহেতু স্বামী বর্তমান থাকিলে নিকটেই থাকুন কিংবা দূরদেশেই থাকুন স্ত্রী সর্বদা স্বামীর শাসনেই থাকে নিঃশঙ্ক হইতে পারে না স্বামীর মৃত্যু হইলে পর সেরূপ শাসন থাকে না সুতরাং নিঃশঙ্ক হয়।

নিবর্তক।— যে শাস্ত্রানুসারে পতি বর্তমানে পতির শাসনে স্ত্রীকে থাকিতে হয় সেই শাস্ত্রেই লিখেন পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক এ ধর্ম রক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়ন্তা করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামী বর্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্তমানে স্বামী প্রভৃতির শাসন ত্যাগ ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিবৃত্তি হইতে পারে না যেহেতু অনেক অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে স্বামী

বর্তমান থাকিতেও তাহার শাসনে স্ত্রী না থাকিয়া স্বতন্ত্রা হইতেছে। কায়মনবাক্যজন্য দুষ্কর্ম হইতে নিবর্ত করিবার কারণ শাসনমাত্র হইতে পারে না কিন্তু জ্ঞানের উপদেশ ঈশ্বরের ভয় দুষ্কর্ম হইতে কি স্ত্রীকে কি পুরুষকে নিবর্ত করায় ইহা শাস্ত্রে ও প্রত্যক্ষে দেখিতেছি।

প্রবর্তক।— তুমি আমাদিগ্যে পুনঃ পুনঃ কহিতেছে যে নির্দয়তা করিয়া আমরা স্ত্রীবধে প্রবর্ত হই এ অতি অযোগ্য যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিতে সর্বদা কহিতেছেন যে দয়া সকল ধর্মের মূল হয় এবং অতিথিসেবাদি পরম্পরা ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দয়াবত্তা সর্বত্র প্রকাশ আছে।

নিবর্তক।— অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালককাল অবধি আপন আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধে সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ-মহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।

প্রবর্তক।— তুমি যাহা যাহা কহিলে তাহা আমি বিশেষ মতে বিবেচনা করিব।

নিবর্তক।— এ অতি আহ্লাদের বিষয় যে এখন তুমি এ বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবর্ত হইলে পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিবেচনা করিলে যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হয় তাহার অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেক এবং এরূপ স্ত্রীবধজন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি।[১]

১. ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত

প্রাচীন কবি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

রাম বসু প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কৃত কবিতাসকল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা ধন, মন ও জীবন পর্যন্ত পণ করিয়াছি। এজন্য সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি, নিয়তই আহার নিদ্রার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি। স্থলপথে ও জলপথে গমনপূর্বক নানাস্থানি হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি। অমুক স্থানের অমুক মহাশয় অমুক গীতটি জানেন, ইহা শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ যে উপায়ে হউক তাহার আশ্রয় লইয়া সেই গীতটি আনয়ন করিতেছি। তাহা না পাইলে জগদীশ্বর স্মরণপূর্বক কেবল আক্ষেপ কবিতেছি। অধুনা এ বিষয়ে আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের কোনো সুখই সুখ বোধ হয় না-- কিছুতেই মন স্থির হয় না— অপর কোনো কর্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না। শুদ্ধ পুরাতন গান গান করিয়া মনে মনেই ভাবনা করিতেছি। গীতের মতো একটি গীত গাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তৎকালে বোধ হয় যেন ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

কিছুদিন পূর্বে যদি আমরা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতাম তবে এতদিনে বোধ হয় আশার অর্ধেক ফল লাভ হইত। এইক্ষণে উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগের সাক্ষাৎ হইতেছে, কারণ অনুষ্ঠান করণমাত্র গাত্র-পাত্র বিষম ব্যাধির আধার হইল; দুই মাস কাল নিয়ত শয্যা সার করত পরিশেষ দুই মাস কেবল জলে জলে বহুস্থলে ভ্রমণ করিয়াছি। এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতা সংগ্রহের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই, রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাচ, এ প্রত্যাশায় বিরত হই নাই। সুপ্তির যথার্থ তৃপ্তি ভোগ প্রায় রহিত হইয়াছে, স্বপ্নে স্বপ্নে এমত বোধ হইয়াছে, যেন আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য সাধন করিতেছি।

আমরা সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সুসম্পন্ন করিতে পারি এমত সম্ভাবনা নাই, কেননা একে ধনাভাব, তাহাতে আবার দৈহিক বলের হ্রাসতা হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকটস্থ হইতেছে। যদি মনের মতো ধন থাকিত তবে কখনোই এতাদৃশ খেদ করিতে হইত না, যেহেতু ধনের দ্বারা সুসিদ্ধ না হয় এমত কর্ম প্রায় দেখা যায় না, অর্থ পাইলে লোভাকুল হইয়া অনেকেই আমারদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করণে যত্নশীল হইতে পারেন। কী করিব? সে পক্ষে কোনোরূপ উপায় দেখিতে পাই না, আমরা এ পর্যন্ত

সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি, আর যত দূর সাধ্য ততদূর করিব। কেহ যদি অস্মদাদির যন্ত্রালয়াদি সর্বস্ব লইয়া পুরাতন সমুদয় কবিতা প্রদান করেন, আমরা তাহাতে সর্বতোভাবেই সম্মত আছি, পরাঙ্মুখ না হইয়া এই দণ্ডেই উন্মুখ হইব। ইহার নিমিত্ত যখন অমূল্য মহারত্ন পরমায়ু পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন সামান্য অর্থে কি অধিক মায়া জন্মিতে পারে?

এতৎ কার্যারম্ভের পূর্বে কোনো কোনো ধনী সম্ভবমতো সাহায্যকরণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইক্ষণে সেই সেই ধনীর সেই সেই ধ্বনি শরৎকালের মেঘ-ধ্বনিবৎ মিথ্যা হইল। ধনাঢ্য জনেরা যদিস্যাৎ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উৎসাহ প্রকাশ করেন, তবে এত আক্ষেপ প্রকাশ কেন করিতে হইবে? সকলেই ধনের কেনা, ধন পাইলে কে না যত্ন করিবেন? ফলে এখনও সময় বহির্ভূত হয় নাই, ইহার পর আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে সুফল সিদ্ধ করা এককালেই নিষ্ফল হইয়া উঠিবেক, কারণ প্রাচীন লোকের অভাব হইলে আর কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? তখন কুবেরের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ধন বিতরণ করিলেও ফলোদয় হইবে না। একে তো প্রাচীন অনুরাগী লোকসকল পূর্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইদানীং যে দুই একজন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারদেরও আর বড়ো অপেক্ষা নাই, তাঁহারা কেহ কেহ কিছু কিছু জ্ঞাত আছেন, ইহার পর ঐ মহাশয়দিগের অভাব হইলে সম্পূর্ণরূপেই তাহার অভাব হইয়া যাইবে। কেহই এসকল কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, কেবল মুখে অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং সে অভ্যাস বৃথা হইতেছে। অক্ষরবদ্ধ থাকিলে অন্বেষণ দ্বারা প্রাপণ পক্ষে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অভ্যাসকর্তা স্বয়ং যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহার অভ্যাসে ফল দর্শে, পরে সমুদয় বিফল হইয়া যায়।

যদিও অর্থ ব্যয় ও শারীরিক শ্রম দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সমুদয় সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তথাচ যে পর্যন্ত হয় তাহাই উত্তম, উত্তমের অল্পাংশই অধিক! ঘৃত ও ক্ষীরের বিন্দুমাত্র ভোজন করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মে। তিমিরময় কুটিরমধ্যে আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাকেই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যখন সর্বস্বই লোপ পাইবার লক্ষণ হইয়াছে তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয় তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবেক।— আমরা এই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া সাহসকে সহায় করত প্রবৃত্তিদেবীর চরণ শরণ লইয়াছি। এ বিষয়ে এরূপ চেষ্টা ও যত্ন না করিয়া যদি আর পাঁচ বৎসর কাল আলস্যের কৃতদাস হইয়া বৃথা যাপন করি, তবে এদেশে ঐ সমস্ত কবিরদিগের প্রণীত কবিতাগুলিন প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক তাঁহারদিগের নাম পর্যন্ত লোপ হইয়া আসিবে। নব্যজনেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। এক শত বৎসরের অধিককালের কথা প্রসঙ্গ করিতে চাহি না, ৪০।৫০ বর্ষের মধ্যে এই বঙ্গদেশে কবিগণের দ্বারা যে সকল আশ্চর্য কবিতা রচনা হইয়াছে তাহার যথার্থ গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রকৃত একখানি পুস্তক প্রকটন করিতে হয়। অদ্য বাসরীয় পত্রে যে কয়েকটি গীত উদিত হইল ইহার কোনো কোনো গীতে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন।

স্থানাভাব জন্য অদ্য আমরা কেবল **নিতাইদাস বৈরাগী** ও **রাম বসু**-র গান মাত্র প্রকাশ করিলাম, ক্রমে শ্রেণীবদ্ধরূপে অন্যান্য কবিদিগের কবিতা পত্রস্থ করিব, তখন তাবতেই পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন।

কোনো কোনো গান অসম্পূর্ণ প্রকাশ হওয়াতে দুঃখরূপ অনলে আমারদিগের অন্তঃকরণ অহরহ দগ্ধ হইতেছে। যথা রাম বসুর কবিতা।

'যদি অনলো, হোতো প্রবলো, জলে হইত নির্বাণ্।
নহে কাল ভুজঙ্গ, দংশিলে অঙ্গ, মন্ত্রেতে বাঁচিত প্রাণ॥

হে পাঠকগণ! আপনারা বিবেচনা করুন, ইহার পর ঐ কবি কিরূপ বিচিত্র বাক্-কৌশলে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অব্যক্ত থাকা সাধারণ শোকের ব্যাপার নহে! আহা! ঐ কথাগুলিন লুপ্ত হওয়াতে ভাবগ্রাহি পাঠকের মন কেবল চঞ্চল হইতেছে! মধুকর প্রফুল্লপঙ্কজ-মধুপানে— চাতক নব-নীল নীরদ-নির্গত নীর-পানে— চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধাপানে— ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে ভূপতি স্বীয় প্রিয় সিংহাসনে— সাধ্বী স্ত্রী পরিসুখ সম্ভোগে— রসিকজন রসালাপ আস্বাদনে— এবং কৃপণ আপন ধনে বঞ্চিত হইলে যাদৃশ দুঃখিত না হয়, আমরা উত্তম উত্তম কবিতার অপ্রাপ্য অসম্পূর্ণ পূর্ণকরণে বঞ্চিত হওয়াতে তদপেক্ষা সহস্রগুণে ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যদি পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া এই অভাব বিমোচন করিয়া দেন, তবেই স্বান্তকে শান্ত করিতে পারিব নচেৎ তাহার চাঞ্চল্য নিবারণ পক্ষে কোনোরূপ উপায় দেখিতে পাই না।

যৎকালে আমরা মনে মনে সংকল্প করিয়া এই মহাব্রতে ব্রতী হই, তৎকালে কৃতকার্য হওন পক্ষে কিছুমাত্রই ভরসা ছিল না, কিন্তু এই ক্ষণে বাঞ্ছাফলপ্রদ করুণাময় করুণ কটাক্ষ পূর্বক ক্রমে ক্রমে সেই আশায় সুসার করিতেছেন। অতিশয় অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনার যোটনা হইতেছে। যাঁহার সহিত কস্মিন্‌কালে সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি হঠাৎ আসিয়া আপনিই দয়া বিতরণ করিতেছেন।— যাঁহার দ্বারা এ বিষয়ের আশা পূর্ণ হওনের অসম্ভাবনা জ্ঞান করিয়াছিলাম তাঁহার দ্বারাই বাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে।— দেশ বিদেশীয় অনেকেই অনুকূলভাবে আমারদিগের সহিত সমান উৎসুক হইয়া শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা সমান অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে যত উৎসাহী লোকের সংখ্যার আধিক্য হইবে ততই আমরা চরিতার্থ হইতে থাকিব। এই কার্য কখনোই একজনের সাধ্যাধীন নহে। ইহাতে বহুজনে সমভাবে অনুরত হইলে অনায়াসে বিড়ম্বনার পক্ষে বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনাই হইতে পারে।— যাহাতে দশের মনোযোগ, তাহাতেই যশের সংযোগ, ইহাতে সংশয় কি? অতএব আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া বারংবার বিপুল বিনয়ে ব্যক্ত করিতেছি, সকলে এই মহোৎসাহে কুৎসা না করিয়া যত্ন রত্ন অবলম্বন করিলেই কৃতার্থ হইতে পারিব।

কেহ যেন এমত বিবেচনা না করেন, যে, এইরূপ উপকার দ্বারা কেবল আমারদিগ্যেই উপকৃত করিবেন। আমরা উপকারের কামনায় কদাচ এই শুভসূত্রের সঞ্চার করি নাই! ইহাতে আমরা যেরূপ উপকৃত হইব, তাঁহারা বরং ততোধিক উপকৃত হইয়া অধীনস্থ সমস্ত লোককে উপকার গুণে বদ্ধ করিবেন। এবং চন্দ্রাদিত্যের স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত দেশের

প্রধান হিতৈষী বন্ধুরূপে পরিগণ্য হইবেন। এই সকল কবিতা প্রকাশ পাইলে পূর্বতন মৃত কবি মহাশয়েরা কীর্তির সহিত পৃথ্বীতলে পুনর্বার সজীব হইবেন! দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাইয়া গৌরব পুষ্পের সৌরভ সর্বত্র বিস্তৃত হইবে। আধুনিক অহঙ্কারী অনিপুণ কবিদিগের গর্ব পর্বতচূড়া সহিত অধোভাগে নিপতিত হইবেক! যাঁহারা কবিতা প্ররচনা পথের পথিক হইয়াছেন তাঁহারা সহজেই কার্যসিদ্ধির উপায়-পথ প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

কতকগুলিন যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতাব চালনাপূর্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতার রসজ্ঞ কী রূপে হইতে পারেন? কারণ প্রথমাবধি তাহার অনুশীলন হয় নাই, কিছুই শোনেন নাই। হাটে বাজারে, সামান্য যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে দুই একটা ইতর কবিতা শুনিয়া শুনিয়া উপহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। ফলে ইহাতে আমরা ঐ নব্যগণকে অভব্য বলিয়া দোষার্পণ করিতে পারি না, কেননা তাঁহারা অপরিচিত ব্যাপারে কী প্রকারে অনুরাগী হইবেন।— সম্প্রতি আমরা প্রীতিচিত্তে বিশেষ অনুরোধ করি, উক্ত মহোদয়েরা স্ব-দেশীয় এই সমস্ত কবিতার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিবেন। স্থির ভাবে অবলোকন করিয়া মনের যত্নে মর্ম গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন। দেশস্থ প্রাচীন কবি কদম্ব কবিতা দ্বারা কত দূর পর্যন্ত ভাবুকতা, রসিকতা ও প্রেমিকতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন!— ইহারা কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন! শব্দের কি লালিত্য! কি তাৎপর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য! কোনো পক্ষেই অপ্রাচুর্য দেখিতে পাই না। ইঁহারা যখন যে রসের কবিতা রচিয়াছেন, তখন সেই রসকে মূর্তিমান করিয়াছেন, আমরা সময়ে সময়ে যৎকালে রস-বিশেষের পুরাতন কবিতা পাঠ করি, তৎকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয়, যে, সেই সকল রস-সমুদ্র প্লাবিত হইয়া লহরীলীলা দ্বারা তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তাব করিতেছে।

আমরা অদ্য কেবল দুইজন কবির কবিতা পত্রস্থ করিলাম, এই সমস্ত হইতে বাছনি পূর্বক নায়ক নায়িকার উক্তিভেদের দুই একটি গান করিয়া অথবা পাঠ করিয়া দেখুন, এখনই বোধ হইবে, যেন স্ত্রী পুরুষ কিংবা সহচরীগণ পরস্পর একত্র হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতেই নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌশলে নানা ভাবে নানা রসে কথোপকথন করিতেছেন! বিশেষত রামবসু যেমন সরল শব্দে অতি সহজে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তেমন কেহই পারেন নাই, কিন্তু অপরাপর মহাশয়দিগ্যে কোনো অংশেই ন্যূন বলিতে পারি না, তবে কোনো কোনো বিষয়ে কোনো কোনো পক্ষে কিঞ্চিৎ তারতম্য মাত্র!

আমরা গত কালের গত ব্যাপার যত অন্বেষণ করিতেছি ততই সুখী হইতেছি, কত কাণ্ড পুস্তক রচিলে গত কাণ্ড শেষ হইয়া উঠে তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না। অধুনা দুই শত বৎসরের পূর্বকার কথা উত্থাপন করণে বিরত হইলাম। ১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইলে 'গোঁজলা গুঁই' নামক এক ব্যক্তি 'পেশাদারি' দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন, ঐ ব্যক্তির সহিত কাহার প্রতিযোগিতা হইত তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই, তৎকালে 'টিকেরার' বাদ্যে সঙ্গত হইত। 'লালুনন্দলাল, রঘু, ও রামজী' এই তিনজন

কবিওয়ালা উক্ত 'গোঁজলা গুঁই' প্রভৃতির সংগীতশিষ্য ছিলেন। রঘুর নিবাস ফরাসডাঙ্গায়, তিনি তন্তুবায়কুলে জন্মগ্রহণ করেন, গান ও সুর করিতে ভালো পারিতেন। লালুনন্দনাল ও রামজীর বিবরণ অদ্যাপি জানিতে পারি নাই, এই তিন জন পুরাতন কবিওয়ালা, ইঁহারদিগের সময়ে 'কাড়ার' বাদ্যে সঙ্গত হইত। হরুঠাকুর প্রভৃতির সময়ে 'ষোড়খাই' তৎপরে 'ঢোলের' সঙ্গত আরম্ভ হইল।

হরুঠাকুর রঘুর শিষ্য, ভবানে বেনে রামজীর শিষ্য এবং নিতে বৈষ্ণব লালু নন্দলালের শিষ্য। ইঁহারা গাহনা সমাপন সময়ে আপনাপন 'ওস্তাদ' অর্থাৎ গুরুর নামে ভণিতা দিতেন। যে কালে লালু নন্দলাল প্রভৃতি দল করিয়াছিলেন, সে কালে 'কৃষ্ণ' নামক এক জন চর্মকার, যাহাকে সাধারণে 'কেষ্টা মুচী' বলিয়া উল্লেখ করিত, সেই ব্যক্তি কবিতা রচনা দ্বারা অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় সমাদরপূর্বক তাহার গান শ্রবণ করিতেন। বড়ো বড়ো 'ওস্তাদি' দলেরা তাহার নিকট গান লইয়া তদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। ঐ মুচি হরুঠাকুরকে অনেকবার পরাজয় করিয়াছে। আমরা ঐ কেষ্টার গীতের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, দেশটা ভ্রমণ করিয়া শেষ্টা কেবল একটা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। যথা।

মহড়া।

'হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে। ভাল প্রেম্ করিলে॥
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইযে শ্রীপতি, শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।

চিতেন।

শ্যাম্ সেজেছ হে বেশ্, ওহে হৃষীকেশ্, রাখালের বেশ্ এখন্ কোথা লুকালে॥
মাতুলো বধিলে, প্রভুলো করিলে, গোপো গোপীকুলে, গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিলে॥'

ইহার অপবাংশ প্রাপ্ত হই নাই। এ গানের বয়স ৭০ বর্ষ হইবে।

আহা!— যখন এত শুচি।— সংগীত সুধায় এত রুচি তখন ইহাকে 'মুচি' বলিয়া কে সম্বোধন করিবে? এই স্থলে দেখুন,— এতদ্ভিন্ন 'নিমে শুঁড়ি' একজন গণনীয় কবি ছিল। যে দেশের তাঁতি, শুঁড়ি, মুচি, হাড়ি, এতদ্রূপ সৎ কবি, সে দেশের ভদ্রলোকেরা আরও কত উত্তম হইবেন।

নিতাই দাসের 'ওস্তাদ' লালু নন্দলালের কৃত একটি গান সংগ্রহপূর্বক প্রকাশ করিলাম, সকলে দেখুন। যথা।

মহড়া।

'হোলো এই সুখো লাভো পীরিতে। চিরদিন্ গেল কাঁদিতে॥

চিতেন।

হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কুল্।
ডুবেছি না ডুব্ দিয়ে দেখি পাতলো কত দূর।
শেষে এই হোলো, কাণ্ডারি পালালো, তরণি লাগিলো ভাসিতে।

অন্তরা।

ধনো প্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে, শরণে লইলাম্ যার।
তবু তার্ মন্ পাওয়া সখি, আমারে হোলো ভার্॥
না পূরিলো সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদো, মিছে পরিবাদো জগতে।।'

এই গানের বয়স ৮০ আশি বৎসরের ন্যূন নহে। এ রচনাকে প্রশংসাই করিতে হইবে। ১৪০ এক শত চল্লিশ বৎসরের এদিক্ নহে বরং অধিক হইবে, 'গোঁজলা গুঁই' যে সমস্ত গান প্রস্তুত করেন, কোনো বিশেষ বন্ধুর করুণায় তাহার দুইটি গীতের কিয়দংশ লাভ করত সাধারণের গোচরার্থ প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রকটন করিলাম। যথা।

'এসো এসো চাঁদ্‌বদনি। এ রসে নিরসো কোরোনা ধনি॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ, তুমি আমার তায় রতনমণি। ১
তোমাতে আমাতে একই কায়া, আমি দেহ প্রাণ্
তুমিলো ছায়া, আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া, মনে মনে ভেবে দেখ আপনি'॥ ২

তথা। 'প্রাণ্ তোরে হেরিয়ে, দুখো দূরে গেলো মোর্।
বিরহ অনলো, হইলো শীতলো, জুড়ালো প্রাণো চকোর।'

ইহার প্রথম গানটি কী চমৎকার!— বেদান্ত সিদ্ধান্তবৎ সিদ্ধান্তসূচক শব্দ বিন্যাস দ্বারা মনের ধ্বান্ত মোচন করিয়াছে। হায়রে, গুঁই, তুই, কি মানুষ ছিলিরে! মহাশূন্যের ন্যায় যাহার বিস্তার, তাহার নাম 'গোঁজ্‌লা' আঁজ্‌লার দ্বারা কি এই গোঁজ্‌লার নিরূপণ হইতে পারে? তোমার সঙ্গীতে ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতের গুণে আমি যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধ রহিলাম।

এই সময়ে অগ্রে চিতেন ধরিয়া গাহনার প্রথা ছিল না। টপ্‌পার নিয়মানুসারে প্রথমে মহড়া ধরিয়া পরে পরে চিতেন ও অন্তরা গাহিত।

☐ *সংবাদ প্রভাকর*, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল। ইংরাজি ১৫ নভেম্বর ১৮৫৪

২.

এতদ্দেশীয় প্রাচীন কবিকদম্বের জীবনবৃত্তান্ত ও কবিতাকলাপ প্রকাশার্থ আমরা এ পর্যন্ত ক্রমশই উৎসাহ-রথে আরোহণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপথে ভ্রমণ করিতেছি, এবং ভবিষ্যতে আর কতদিন এইরূপ অবস্থায় অবস্থান করিব তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ফলে যে পর্যন্ত দেহের সহিত জীবনের সম্বন্ধ থাকিবে বোধ করি সেই পর্যন্তই এই ব্রত পালন করিতে হইবেক, ইহার মধ্যে উদ্‌যাপন হয় এমত সম্ভাবনা দেখিতে পাই না; তবে জীবনের উদ্‌যাপনেই উদ্‌যাপন বটে, কারণ ব্যাপার অত্যন্ত বৃহৎ, পরমায়ু অতি অল্প, কী প্রকারে এই অল্প সময়ের মধ্যে কল্প সমাধা হইতে পারে? তবে যে পর্যন্ত হয় তাহাই যথেষ্ট,

তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিব। আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকর পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরও প্রকাশ করিব। কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।

আমরা পূর্বে ৺রামপ্রসাদ সেন, ৺রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবু, ৺রাম বসু, ৺নিতাইদাস বৈরাগী ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ, ৺হরু ঠাকুর, ৺অজু গোঁসাই, গোঁজ্‌লা গুঁই, কৃষ্ণ মুচী ও লালুনন্দলাল প্রভৃতি কতিপয় মৃত কবিকে কীর্তির সহিত সজীব করিয়াছি। অদ্য আবার ৺রাসু নৃসিংহ ও ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে জীবিত করিলাম, অদ্যাবধি ইহাঁরা এই বিশ্ববিপিনে অমর হইয়া বিচরণ করিবেন। প্রভাকরের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই সকলে ইঁহারদিগ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। পরন্তু এতদ্রূপ যত্নযোগে প্রতিমাসেই দুই এক ব্যক্তির প্রাণদান করিব। কীর্তিকুশল জনেরা পৃথ্বী হইতে অবসৃত হয়েন না; যতদিন তাঁহারদের কীর্তি থাকে, ততদিন তাঁহারা সজীব থাকেন; ফলে বিবিধ প্রকাব বিড়ম্বনা ও দৈবঘটনা দ্বারা আর আর প্রকার কীর্তি সকল অনায়াসেই নাশের গ্রাসে পতিত হইতে পারে, কিন্তু কবিগণের কবিতা-কীর্তি কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে, যত দিন বিচিত্র গগন ক্ষেত্র মধ্যে নক্ষত্রগণ ও চন্দ্র সূর্য স্ব স্ব ভাবে স্বভাবের শোভা বিস্তার করিতে থাকিবেন, ততদিন কাব্য-কর্তারা মনুষ্যসমাজে বিরাজমান থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ কি।

যিনি (পিতামহ) তিনি চিরকালই পিতামহ নামে পরিচিত রহিয়াছেন। এই সংসারে কত পিতামহ, ও কত পৌত্র হইতেছে ও লয় পাইতেছে, কিন্তু আদি কবি পিতামহ (যিনি) তিনি তিনিই আছেন। মনুমণ্ডলে (মনু) মনুরূপেই বিহার করিতেছেন। মনুর মনু জনু নাশ হয় নাই, মনুর তনু লয় পায় নাই। মহর্ষি বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, গৌতম, অষ্টাবক্র,— বেদব্যাস, শুক, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবি মহাত্মারা কেহই ইহলোক পরিত্যাগ করেন নাই। তাবতেই জ্ঞান পূরিত গ্রন্থরূপ কলেবর ধারণ করিয়া উপদেশ দ্বারা আমাদিগ্যে কৃতার্থ করিতেছেন। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির ন্যায় তাঁহারদিগের সৃষ্টি সকল দৃষ্টিপথের তুষ্টিকর হইয়াছে। সুদ্ধ এই মহাশয়েরাই জীবিত আছেন এমত নহে। ইহাঁরা কত কত মৃত সম্রাট, কত কত মৃত রাজমন্ত্রী, কত কত মৃত মহাযোদ্ধা, কত কত মৃত সদ্‌গুণান্বিত ব্যক্তি, কত কত মৃত রাজধানী, কত কত মৃত দ্বীপ উপদ্বীপ,— কত কত মৃত নদী, নদ, কত কত পর্বত ও কত কত মৃত বন উপবনকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন তাহার নিরূপণ হয় না। অধুনা যাহারদের চিহ্নমাত্রও নাই তাহারা বিলক্ষণ মূর্তিমান হইয়া কবির বর্ণনাপথে অস্মদাদির নয়ন নিকটেই নৃত্য করিতেছে। তাহারদিগের তাবৎকেই যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। সেই সমস্ত রাজা, সেই সমস্ত রাজমন্ত্রী, সেই সমস্ত যোদ্ধা, সেই সমস্ত সুধীর, সেই সমস্ত গহন, উপবন, দ্বীপ উপদ্বীপ, ও নদী নদাদি সকলই আমারদিগের সম্পাদকীয় আসনের অগ্রেই যেন রহিয়াছে। তন্মধ্যে কেহই অদৃশ্য... নের অদৃশ্য নহে। অতএব এই স্থলে লেখনী পরিত্যাগ করণের পূর্বেই একবার পূর্বতন কবি মহাশয়দিগের চরণে প্রণিপাত করিলাম।

ইহাঁরদিগেব তুলনায় প্রাচীন বাঙ্গালী কবি মহোদয়েরা যদিও সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ ও

চন্দ্র সম্বন্ধে খদ্যোতবৎ, তথাচ সর্বতোভাবেই আমারদিগের পূজ্য বটেন। এই ব্যক্তিব্যূহের অসাধারণ ক্ষমতার অসাধারণ প্রশংসা অবশ্যই করিতে হইবে। যাহা হউক,— কবির প্রণীত কবিতা সকল গোপন থাকা কি দুঃখের বিষয়! এই বিষয় যত প্রকাশ হইবে, ততই দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, ততই অনুশীলনের আধিক্য হইবে। ততই সভ্যতা ও সুখের সঞ্চালন হইবেক,— রত্ন গোময় মধ্যে গুপ্ত থাকিলে কেহই জানিতে পারে না, সুতরাং সে রত্নের যত্নের সূত্র কি রূপে হইতে পারে। অতএব দেশস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে বিনয়পূর্বক অনুরোধ করি, সকলে আমারদিগের সহিত সমান অনুরাগী হইয়া এতদ্বিষয়ে বিহিত মনোযোগ করুন।

আমরা যে সকল গীত প্রকাশ করিতেছি, তাহার লেখার দোষ কেহ ধর্তব্য করিবেন না। কারণ গানের সুর যে রূপ তদনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। নচেৎ কোনো মতেই গাহনা করা যাইতে পারে না। পয়ার, ত্রিপদীর, যেরূপ নিয়ম, গীতের নিয়ম তদ্রূপ নহে। সুরানুযায়ী উচ্চারণ এবং উচ্চারণানুযায়ী লিখন। গীতের অগ্রে মহড়া, পরে চিতেন, সর্বশেষ অন্তরা লিখিত হয়। কিন্তু পড়িবার কি গাহিবার কালে প্রথমে চিতেন, পরে মহড়া, তৎপরেই অন্তরা ধরিতে হইবে। গত কার্তিক মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে আমরা বিস্তারিতরূপে তদ্বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি, সেই পত্র দৃষ্টি করিলেই ইহার সমুদায় নিয়ম ও প্রণালী জানিতে পারিবেন। এইক্ষণে পুনর্বার লেখা বাহুল্য মাত্র, পুরাতন গ্রাহক মহাশয়েরা সমস্তই জ্ঞাত আছেন, তাঁহারদিগের নিমিত্ত কিছুই লিখিতে হইবে না, কেবল নূতন গ্রাহকগণের নিমিত্ত সঙ্কেত মাত্র করিলাম।

□ *সংবাদ প্রভাকর,* শনিবার ১লা মাঘ ১২৬১ সাল। ইংরাজি ১৩ জানুয়াবি ১৮৫৫

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা

প্যারীচাঁদ মিত্র

আর্য রাজ্য

আর্যেরা উত্তর পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে আসিয়া বাস করিলেন। বিন্ধ্যাচল ও হিমালয় পর্বতের মধ্যবর্তী দেশ আর্যাবর্ত বলিয়া বিখ্যাত হইল। ক্রমশ দেশ, গ্রাম, ও নগরে বিভক্ত হইল ও রাজ্য রক্ষার্থে গ্রাম ও দেশ অধিকার নিযুক্ত হইল। রাজা কতিপয় মন্ত্রী লইয়া প্রত্যেক গ্রামের ও রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতে লাগিলেন। যেরূপ রাজ্য বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, সেইরূপ কৃষি ও বাণিজ্য সর্বস্থানে প্রকাশিত হইল। রাস্তাঘাট নির্মিত হইল ও শকট, নৌকা ও জাহাজের দ্বারা এক স্থানের বিক্রয় দ্রব্যাদি অন্য স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোক পার্থিব কার্যে কালযাপন করিত। যে সকল আর্য সরস্বতী-তীবে বাস করিতেন, তাঁহারাই জ্ঞান প্রকাশক হইলেন; তাঁহারা কেবল ঈশ্বর ও আত্মা চিন্তা করিতেন। সকলের গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। তাঁহারা পরিবার লইয়া প্রতিদিন তিন বার সংস্কৃত ভাষায় উপাসনা করিতেন। এই সকল উপাসনা একত্রিত হইয়া ঋগ্বেদ নামে বিখ্যাত হয়। অনন্তর যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ বিরচিত হয়। বেদ ছন্দস্ মন্ত্র অথবা সংহিতা ব্রাহ্মণ্যে ও সূত্রে বেদাঙ্গতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণের শেষাংশ আরণ্যক বলে, কারণ তাহা অরণ্যে পঠিত হইত। যাহা বেদের শেষাংশ তাহাকে উপনিষদ বলে, কারণ আচার্যের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে হইত। যদিও বেদে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সংস্থাপিত, কিন্তু উপনিষদে ঈশ্বর ও আত্মা যে অশেষ যত্নপূর্বক চিন্তিত ও নিদিধ্যাসিত হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের উপদেশ এই— একই ঈশ্বর, তাঁহাকে জান, তাঁহারি উপাসনা কর। আত্মার অমরত্ব লক্ষণ সংস্থাপিত; কিন্তু জীবের পুনর্জন্ম-জন্মান্তরে কিছুই উল্লেখ নাই। পূর্বে জাতি ছিল না— পুরোহিত ছিল না— প্রকাশ্য উপাসনার স্থান ছিল না— মন্দির ছিল না— প্রতিমা ছিল না। গৃহস্থ স্বয়ং পরিবারকে লইয়া উপাসনা করিতেন। যে সকল স্তোত্র উপাসনাকালে পঠিত হইত, তাহা হয়তো পূর্বে রচিত হইত অথবা তৎকালে বিনাচিন্তনে সঙ্গীত হইত। যদি কোনো বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের ও পরিবারদের সকলের মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের বৃদ্ধি হয়, সে বন্ধন একত্র ঈশ্বর উপাসনা করা, তখন সকলের আত্মা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে থাকে। অসভ্য দেশে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমতুল্য জ্ঞান করে না— হয় তো কিঙ্করী নয় তো গৃহ বস্তুর স্বরূপ

বোধ করে এবং আজ্ঞানুবর্তিনী না হইলে প্রহারিত অথবা দূরীকৃত হয়। আর্যেরা স্ত্রীকে সমতুল্য অর্ধশরীর ও অর্ধ জীবন জ্ঞান করিতেন। স্ত্রী ভিন্ন ঈশ্বর উপাসনা, ধর্ম কার্য ও পারলৌকিক ধনসঞ্চয় উত্তমরূপে হইত না। ঋগ্বেদের এক শ্লোকে লেখে, স্ত্রীই পুরুষের গৃহ— স্ত্রীই পুরুষের বাটী। মনুও বলেন স্ত্রী গৃহ উজ্জ্বল করেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ

পূর্বে স্ত্রীলোকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। উহাদিগের উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা পতি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা বেদ পড়িতেন ও পড়াইতেন, জ্ঞানানুশীলনার্থে তাঁহারা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতেন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে যে, মিনা ও বৈতরণী নামে দুই জন ব্রহ্মবাদিনী নারী ছিলেন। হরিবংশে লেখে যে বরুণার এক তপঃশালিনী কন্যা ছিল। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, মহাত্মা আসুরি আত্ম-জ্ঞানার্থে কপিলের শিষ্য হইয়া শাবরীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন। কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার সহধর্মিণী ছিলেন। প্রিয় শিষ্য পঞ্চশিখ ঐ কপিলার নিকট ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মিথিলাধিপতি জনক ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনার্থে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করেন। গার্গী নাম্নী এক তত্ত্বজ্ঞা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অনেক তর্ক-বিতর্ক করেন। মহাভারতে লেখে যে সলভা নামে একটি স্ত্রীলোক দর্শনশাস্ত্র ভালো জানিতেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মবাদিনীরা জ্ঞানানুশীলন ত্যাগ করিয়া ধ্যানাবৃত হইতেন। ধ্যান কাণ্ড জ্ঞান কাণ্ডের চরমাবস্থা। রঘুবংশে এক ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে। 'এই সুতীক্ষ্ণনামা শান্তচরিত্র আব এক তপস্বী ইন্ধন প্রজ্বলিত হুতাশন চতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী ও সূর্যাভিমুখী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন।' আরণ্যকাণ্ডে লেখে 'চীরধারিণী জটিলা তাপসী শবরী' রাম দর্শনে অগ্নিতে প্রবেশ করত 'আপন বিদ্যুতের* ন্যায় দেহ প্রভায় চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে স্থানে সেই সুকৃতাত্মা মুনিগণ বাস করিতেছিলেন, তিনি সেই পুণ্য স্থানে গমন করিলেন।'

যদিও ব্রহ্মবাদিনীরা ঈশ্বর ও আত্মজ্ঞানানুশীলনে মগ্ন থাকিতেন, তথাচ সদ্যোবধূরা পতিগ্রহণ করিয়াও উক্ত জ্ঞানে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অত্রিবংশীয় দুই নারী ঋগ্বেদের কতিপয় স্তোত্র রচনা করেন। উত্তর রামচরিতেও লেখে যে অত্রিমুনির বনিতা আত্রেয়ী পথে আসিতেছিলেন, একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? মুনিপত্নী বলিলেন, আমি বাল্মীকির নিকট অধ্যয়ন কবিয়া অগস্ত্যের আশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা বাস করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী অতি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীর নিকট তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ পান।

---

* বিদ্যুতের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীর যাহা উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদে প্রকাশিত আছে।

সদ্যোবধূরা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয়, পারলৌকিক উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রকার শিক্ষিত কতিপয় আধ্যাত্মিক সদ্যোবধূর সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

উচ্চ সদ্যোবধূ

দেবহূতি

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দম মুনির স্ত্রী দেবহূতি স্বামীর বনে গমন সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, 'আপনি প্রব্রজ্যার্থে গমন করিতেছেন। আমি কাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিব? আমার জ্ঞানোপদেশ নিমিত্তে কাহাকেও রাখিতে আজ্ঞা হউক।

পরে দেবহূতির গর্ভে কপিলের জন্ম হয়। কপিল তপোবল দ্বারা 'নিরহংকার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিশূন্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা' ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন। দেবহূতি পুত্রের নিকট আসিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করেন। কপিল বলেন, 'আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগ পুরুষের নিঃশ্রেয়সের কারণ, কেননা তাহাতেই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উপরতি হয়। চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন ও পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলে তাহার মুক্তি হয়। কপিলের উপদেশ জ্ঞানপ্রদ। তৃতীয় স্কন্ধে এই উপদেশ বাহুল্য রূপে লিখিত আছে।

শান্তা

শান্তার বিবাহ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত হয়। অন্তরউচ্চতা ও সৌন্দর্যে তিনি অতুল্য ছিলেন।

কেশনী

কেশনী সাগরকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও সত্যানুরাগে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

সতী

সতী শৈশবকালাবধি যোগাভ্যাস ও তপস্যা করিতেন। পতিনিন্দা শুনিয়া যোগবলে আপন দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অনসূয়া

অত্রিমুনির বনিতা অনসূয়া অনেক শাস্ত্র জানিতেন ও অন্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সীতার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তাহা আরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত আছে।

কৌশল্যা

কৌশল্যা দশরথের দ্বারা রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত। 'সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার

সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্মাচরণে ভার্যার ন্যায়, সৎপরামর্শ দানে ভগিনীর ন্যায়, ভোজনকালে জননীর ন্যায়, ব্যবহার করিয়া থাকেন।'

সীতা

সীতা কেবল শরীর ধারণ করিতেন— তিনি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তা পিতৃ আলয়ে হইয়াছিল। তিনি কহেন, 'সংযতচিত্ত মুনিগণ যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাও আমি কৌমার কালে পিতৃভবনে এক সাধুশীল ভিক্ষুকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা কহেন পতিই নারীদিগের দেবতা, যে নারী ছায়ার ন্যায় সর্বদা ভর্তার অনুসরণ করে, সে ইহ ও পরলোকে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া সুখে সময় যাপন করে। আমি বিবাহ কালে স্বামীর করে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার হিতের নিমিত্তে অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।' বনবাসকালে রামচন্দ্র সীতাকে গৃহে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতা বলিলেন, তোমা ছাড়া হইলে আমি স্বর্গ ছাড়া হইব। দণ্ডকারণ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে কে না চমৎকৃত হইবে? যে সকল জীব সমাহিত ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা তাড়িত ও অপমানিত হইলেও অন্তর শীতলতা হইতে চ্যুত হন না। ব্রহ্মবাদিনীদিগের ব্রহ্মই লক্ষ্য ব্রহ্মলাভের জন্য তপোবলের দ্বারা তমস জীবনকে নির্বাণ করাই সাধনা ছিল। সদ্যোবধূগণ পতি গ্রহণ পূর্বক আপন শুদ্ধপ্রেম পতিকে অপর্ণ করিয়া পরলোকে উন্নতি সাধন করিতেন।

সীতা অসতী হইয়াছেন, এই জনরব যখন ঘোষণা হইতে লাগিল, তখন রামচন্দ্র আপন রাজ্যের কুশলার্থে সীতার সহিত আর সহবাস না করিতে পারিয়া তাঁহাকে বনবাস দিলেন। এই মর্মবেদনা পাইয়াও সীতার ভাব রামচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ছিল তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

সাবিত্রী

সাবিত্রীর আধ্যাত্মিক ভাব অল্প ছিল না। সত্যবানকে বনে দেখিয়া মনেতে বরণ করিলেন, তিনি এক বৎসরের মধ্যে মরিবেন এই সংবাদ নারদ মুখে শুনিয়া ও পিতা মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। যখন শ্বশুরগৃহে গমন করিলেন, তখন তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আপন অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্বক, শ্বশুর ও শাশুড়ির ন্যায় বল্কল ধারণ করিলেন। এই সকল কার্যেতে দেদীপ্যমান হয় যে, যাঁহারা আত্মজ্ঞ হয়েন, তাঁহারা নশ্বর বস্তু ও ভাব হইতে অতীত— তাঁহারা মনন্মোয়ী অবস্থায় উপরতিতে পূর্ণ হয়েন।

দময়ন্তী

দময়ন্তীও পতিপরায়ণা ছিলেন। সকল কামনা পতিতে পর্যবসান করত পতিতে মগ্ন হইয়া আত্ম লাভ সাধন করিতেন।

পতি সত্ত্বেই হউক আর পতি বিয়োগেই হউক, সাকার কিংবা নিরাকার পতি

অবলম্বনে পূর্বকালীন অঙ্গনারী আত্মার উদ্দীপন করিতেন। দময়ন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছিলেন,— অরণ্যে পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা— অর্ধবস্ত্র পরিধানা, তথাচ নিমেষমাত্র পতিকে বিস্মরণ না করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে পর্যটন পূর্বক পুনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।

শকুন্তলা

শকুন্তলার উচ্চ শিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার পালক পিতা কহেন— 'কন্যা ঋণ স্বরূপ— উৎকৃষ্ট দুর্মূল্য রত্ন— পিতারই গচ্ছিদ্ধন।' রাজা দুষ্মন্ত কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর শকুন্তলার এক পুত্র জন্মে। তিনি ঐ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া বলেন— রাজন্! আমি তোমার ভার্যা ও এই বালকটি তোমার পুত্র। রাজা তাঁহার কথা অবিশ্বাস কবিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, রাজন্! ভার্যাকে অবহেলা করিও না— ভার্যা ধর্ম কার্যে পিতার স্বরূপ— আর্ত ব্যক্তির জননী স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম স্থান স্বরূপ— আর সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম। অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না।

গান্ধারী

গান্ধারী আপনার স্বামীর অন্ধতা জন্য আপন চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে আপনার স্বামীর নিকট পুত্রদিগের অধর্ম আচরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ধর্মের জয়— অধর্মের কখনই জয় হয় না।'

কুন্তী

কুন্তীর মনের ভাব কীরূপ ছিল, তাহা তাঁহার উপদেশেতে প্রতীয়মান। দ্রৌপদী যখন বনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলেন— 'দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না। তুমি স্ত্রীধর্মাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাধ্বী ও সদাচারবতী তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে; অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তোমাকে উপদেশ দিবার আবশ্যক নাই! হে অনঘে! কৌরবেরা পরম ভাগ্যবান, যেহেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। বৎসে! আমি সর্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর।'

উদ্যোগ পর্বে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'লোকে সৎস্বভাব দ্বারা যেরূপ মান্য হইতে পারে, ধন বা বিদ্যার দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না।'

বীরের কন্যাই বীর-ভাব প্রকাশ করেন। কুন্তী বলিলেন— 'হে কেশব! তুমি বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, ক্ষত্রিয় কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তোমরা এই সময়ে বিপরীতাচরণ কর, তাহা হইলে অতি ঘৃণাকর কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য করিলে আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব; সময়ক্রমে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়।' তাঁহার

আধ্যাত্মিক ভাব এই উপদেশে প্রকাশ হইতেছে— 'আমি পুত্রগণের নির্বাসন, প্রব্রজ্যা, অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্যোধন আমাকে ও আমার পুত্রগণকে এই চতুর্দশ বৎসর অপমান করিতেছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, পরে পুণ্য ফল সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি; পশ্চাৎ সুখ সম্ভোগ করিব; তাহার সন্দেহ নাই।'

দ্রৌপদী

দ্রৌপদী শৈশবাবস্থায় পিতার ক্রোড় হইতে আচার্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ বর্ণন— 'অনন্তর দ্রুপদ রাজা আলেখ্য রচনা ও শিল্পকার্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্ন পূর্বক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্রোণ সন্নিধানে অস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে দ্রুপদ মহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয় কার্য সমাধান করিবার নিমিত্তে দ্রুপদ রাজাকে অনুরোধ করিলেন।' পাণ্ডবদিগকে বিবাহ করিয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া অনেক কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন—অভ্যাগত অতিথি এবং দাস দাসীদিগের ভোজন ও পরিচ্ছদ বিষয়ে তত্ত্ব করিতেন। গোশালা ও মেষশালা আপনি দেখিতেন। কোষ তাঁহার অধীনে ছিল, ও আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য তিনি নির্বাহ করিতেন। যে সকল কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অতি বিনীত ও শান্তভাবে করিতেন। তিনি কহিতেন যে, জীব নিষ্কাম না হইলে মুক্তি পায় না। যখন তিনি বনে ছিলেন তখন তাঁহার সত্যভামার সহিত পতি বশকরণ বিষয়ক কথোপকথন হয়। তিনি কহেন, 'আমি কাম ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্যা করিয়া থাকি! অভিমান পরিহারপূর্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্তন করি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জন, পাক, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্য শূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে সতত বাস করিয়া অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগ পূর্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্তৃগণের সেবা করিয়া এক মুহূর্ত অসুখী থাকি না। স্বামী কোনো আত্মীয়ের নিমিত্তে প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগপূর্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।'

সুভদ্রা

সুভদ্রা অর্জুনকে বিবাহ করেন। অভিমন্যু সমরে প্রাণত্যাগ করিলে তিনি যে বিলাপ করেন, তাহাতে তাঁহার পারলৌকিক উচ্চ ভাব প্রকাশ হয়। 'সংশিতব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নী পরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। ভূপালগণ সদাচার চারিবর্ণের মনুষ্যগণ পুণ্য ও পুণ্যবানেরা পুণ্যের সুরক্ষণ দ্বারা যে

সনাতন গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও। যাঁহারা দীনগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সত্য সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সতত যজ্ঞানুষ্ঠান, ধর্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদিগের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট বিপন্ন ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য রক্ষা করেন, যাঁহারা সর্বদা মাতা পিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং আপনার পত্নীতে নিরত হন, যাঁহারা গত-মৎসর হইয়া সর্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন, সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, তোমার সেই গতি হউক।'

রুক্মিণী

ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। 'হে নরশ্রেষ্ঠ! কুল শীল রূপ বিদ্যা বয়ঃ ধন সম্পত্তি ও প্রভাব দ্বারা উপমা রহিত এবং নরলোকের যে মনোভিরাম যে তুমি, তোমাকে কেন কুলবতী গুণদ্বারা বুদ্ধিমতী কন্যা বিবাহবাসরে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ না করে? অতএব আমাতে দোষের শঙ্কা কি? হে বিভো! সেই হেতু আমি তোমাকে নিশ্চয় পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং আমায় তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি, অতএব তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নী স্বীকার কর। হে অম্বুজাক্ষ! তুমি বীর, আমি তোমার বস্তু ; চেদিরাজ যেন আমাকে স্পর্শ না করে, শীঘ্র আসিয়া তাহা কর। আমি যদি পূর্বজন্মে পূতকর্ম বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বা পর্বণাদি দান বা তীর্থ পর্যটনাদি বা নিয়ম ব্রতাদি কিংবা দেব বিপ্র গুরু অর্চনাদি দ্বারা নিয়ত ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, তবে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন, দমঘোষ পুত্র প্রভৃতি অন্য ব্যক্তি না করুক। হে অজিত! কল্য বিবাহের দিন, অতএব তুমি গোপনে বিদর্ভে আগমন পূর্বক সেনাগণে পরিবৃত হইয়া চেদিরাজ ও মগধ রাজের বল সমুদয় নির্মন্থন কর ; হঠাৎ বীর্যস্বরূপ শুল্ক দ্বারা ব্রাহ্ম বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ কর। যদি বল তুমি অন্তঃপুরমধ্যচারিণী, অতএব তোমার বন্ধুগণকে নিহত না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব? তাহার উত্তর বলি। বিবাহ পূর্বদিনে মহতী কুলদেব যাত্রা হইয়া থাকে, যে যাত্রায় নববধূকে পুরীর বাহিরে অম্বিকার মন্দিরে গমন করিতে হয়, অতএব অম্বিকার মন্দির হইতে আমাকে হরণ করা অতি সুকর।'

পতিব্রতা ধর্ম

অরুন্ধতী লোপামুদ্রা চিন্তা প্রভৃতি বিখ্যাত পতিব্রতা। পতিব্রতা ধর্ম স্ত্রীলোকদিগের এত আদরণীয় যে নীচ জাতীয় নারীরা এ ধর্ম অভ্যাস করে। ফুল্লরা খুল্লনা প্রভৃতি নারীরা পতিপরায়ণা ছিলেন, ঈশ্বরেতেই আত্মা অর্পণ করিলে জীবন নানা শুদ্ধভাবে পূর্ণ হয়। কেহ নিরাকার ব্রহ্ম কেহ সাকার ব্রহ্ম অবলম্বন করে। কিন্তু নিরাকার হউক অথবা সাকার হউক, অন্তরে অভ্যাসের বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে থাকে। যে সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদিগের অনেক কার্য স্বভাব বশত বা সংস্কারাধীন হইতে পারে, অথবা এমন হইতে পারে যে সাকার উপাসনা নিরাকার ভাবের সোপান।

অহল্যাবাই

অহল্যাবাই মহারাষ্ট্র দেশে মালহর রায়ের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের বিয়োগ হইল, ও কন্যার স্বামীর কাল হওয়াতে তিনি সহমরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অহল্যাবাই কন্যাকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার কথা শুনিলেন না। মাতা তখন শান্ত হইয়া কন্যার সহমরণ বসিয়া দেখিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে অহল্যাবাই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া রাজকার্য করিতেন। প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করণানন্তর গ্রন্থাদি পাঠ শুনিতেন, পরে ব্রত নিয়মাদি সাঙ্গ করিয়া দান করিতেন। মৎস্য মাংস খাইতেন না। আহারের পরে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া কেবল গলায় এক ছড়া হীরকের চিক দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন। বেলা ২টা অবধি ৬টা পর্যন্ত রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রজাদিগের প্রাণ ও বিষয় রক্ষা করা ও তাহাদিগের নিকট হইতে অল্প কর লওয়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী ছিলেন ; এজন্য তাহাদিগের সকলের কথা আপন কর্ণে শুনিয়া হুকুম দিতেন। ৬টার পর তিনি আত্মোন্নতিতে নিযুক্ত থাকিতেন। পুরাণ শ্রবণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বলিতেন ঈশ্বরের নিকট আমার সর্ব কার্যের জবাব দিতে হইবে, এজন্য তাঁহার অভিপ্রায়ের কিছু যেন অন্যথা করা না হয়।

তিনি সত্যকে আদর করিতেন ও তোষামোদকে ঘৃণা করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া এক পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি ঐ পুস্তক নর্মদা নদীতে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন ঈশ্বর পরায়ণা নারী ছিলেন, তেমনি তাঁহার বিষয়কার্যে পরিষ্কার বুদ্ধি ছিল। তিনি উত্তম উত্তম কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজকার্য ৩০ বৎসর নিরুদ্বেগে নির্বাহিত হইয়াছিল— কাহার সহিত বিবাদ কলহ ও যুদ্ধ হয় নাই। অহল্যাবাই অনেক মন্দির ধর্মশালা দুর্গ কূপ ও রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার দয়া কেবল মানব জাতিতে ছিল না। পশু পক্ষীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা ছিল। পশু পক্ষী ও মৎস্যের আরাম জন্য তিনি অনেক যত্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সংযুক্তা

সংযুক্তা রাজপুত্রবংশীয় জয়চাঁদ রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি পৃথুরাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথু হাস্তিনার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন ও অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন মুসলমানেরা দিল্লি আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, পৃথুপত্নী স্বামীকে বলিলেন— 'উত্তমরূপে মরিলে চির জীবন লাভ হয়। আপনার বিষয় চিন্তা করিও না— অমরত্ব চিন্তা কর। তুমি শত্রুর মস্তক ছেদন কর। পরকালে আমি অর্ধ অঙ্গ হইব।' পৃথু যুদ্ধে গমন করিলেন। যুদ্ধের ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার নারী বলিলেন, পতিকে আর আমি এখানে দেখিতে পাইব না— তাঁহাকে স্বর্গে দেখিব। এই বলিয়া আপনি অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন।

ক্ষত্রিয় নারীদিগের বীরভাব

ক্ষত্রিয় নারীরা বীরভাবে অনুরাগিণী ছিলেন। স্পার্টা দেশে মাতা পুত্রকে যুদ্ধে গমনকালীন বলিতেন। দেখিও পুত্র! রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিও না। হয় তো জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিও, নতুবা তোমার মস্তক যেন চর্মোপরি আনীত হয়। রাজপুত্র যদুবংশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বংশীয় অঙ্গনারা বীরভাব প্রকাশ করিতেন। উদয়পুরের রানার কন্যা স্বামীকে যুদ্ধে পলায়ন করিয়া আসিতে দেখিয়া দ্বার রক্ষককে বলিলেন, দ্বার বন্ধ কর ও স্বামীকে বলিলেন আপনার কর্তব্য এই ছিল, হয় যুদ্ধে জয়ী হওয়া নয় যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করা— পলায়ন করা কাপুরুষের কার্য ; বুন্দি রানি যুদ্ধে আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে শুনিযা আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

দ্রোণপর্বে ভীম অর্জুনকে এই বলিয়াছিলেন. 'হে ভ্রাতঃ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় কামিনীরা যে কার্য সাধনের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করেন, এক্ষণে সেই কার্য সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের অন্যপ্রকার শিক্ষা

কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্বশী নাটকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকেরা ভূর্জপত্রে লিখিতেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা নানা বিষয়ে হইত। ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতী, পাটীগণিত ও লীলাবতী গ্রন্থ লেখেন। মণ্ডন-মিশ্রের স্ত্রী তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, কারণ যখন মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্যের বিতণ্ডা হয়, তখন তিনি মধ্যস্থ হয়েন। বিদ্যতমা কালিদাসের স্ত্রী ছিলেন, তিনিও বিদ্যাবতী ছিলেন। মিহিরের স্ত্রী খনা জ্যোতিষ বিদ্যা ও তাঁহার বচনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। মীরাবাই চিতোরের রানি বড়ো কবি ছিলেন। তিনি জয়দেবের ন্যায় মিষ্ট কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজার স্ত্রী পদ্মাবতী, চৌষট্টি শিল্প ও চতুর্দশ বিদ্যা জানিতেন।

মালাবারে চারি জন সহোদরা স্ত্রীলোক বিখ্যাত হন। তাঁহাদিগের মধ্যে আভির সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি নীতি কাব্য ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক লেখেন। ঐ সকল পুস্তক পাঠশালাতে পাঠ্য পুস্তক হইয়াছিল। তিনি ভূগোল, চিকিৎসা, কিমিয়া ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য ভগিনীরা নীতি ও অন্যান্য বিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কাশীতে হট্টি বিদ্যালঙ্কার নামে একজন বিখ্যাত স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি স্মৃতি ও ন্যায়জ্ঞ ছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূদিগের যেরূপ শিক্ষা হইত, তাহা উল্লিখিত হইল। ঈশ্বর তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য ;—ব্রহ্মানন্দের জন্য তাঁহাদিগের ধ্যান, জপ ও সর্বপ্রকার অন্তর অভ্যাস হইত। আয়, ব্যয়, শান্তিরক্ষা, পাক করা, আতিথ্য-করণ ইত্যাদি গৃহকার্য যাহা দ্রৌপদী সত্যভামাকে বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করিয়াছিলেন, সদ্যোবধূরা সেই সমস্ত গৃহকার্য বিশেষরূপে জানিতেন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকেরাও নানাপ্রকার বিদ্যা শিখিতেন। দশকুমারে লেখে যে স্ত্রীলোকেরা বিদেশীয় ভাষা, চিত্রকরা, নৃত্য-বিদ্যা, সঙ্গীত, নাট্যশালায় অভিনয়করণ, আয় ব্যয় বিষয়ক, তর্কবিদ্যা, গণনা বাক্য-বিন্যাস, পুষ্পবিদ্যা,

সৌগন্ধ ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণ, জীবিকা নির্বাহক— অর্থকরী বিদ্যা ইত্যাদি শিখিতেন। কাব্য গ্রন্থতে চিত্রশালা, নৃত্যশালা ও সঙ্গীতশালার উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্জুন বিরাটের কন্যাদিগকে নৃত্য ও সঙ্গীত শিখাইয়া ছিলেন। নৃত্য, গান ও সমাজে গমন জন্য স্ত্রীলোকেরা মিষ্টরূপে আলাপ করিতে পারিতেন। বিষ্ণু পুরাণে লেখে যে, অঙ্গনাগণের কথা সুমধুর ও সঙ্গীত স্বরূপ।

কালেতে স্ত্রীলোকদিগের উপনয়ন ও বেদ অধ্যয়ন বিলুপ্ত হইল। পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তক হইল। কালেতে স্ত্রীলোকদিগের নিরাকার ব্রহ্ম লোপ হইলেও ব্রহ্মধ্যান, অনন্ত ও বিস্তীর্ণরূপে না হইয়া পরিমিত ও সাকার ব্রহ্মেতে চিত্ত অর্পিত হইল। তথাচ স্ত্রীলোকদিগের আত্মার অমরত্ব ও পরলোকে ব্রহ্মানন্দ ভোগ, এ বিশ্বাস দৃঢ় রূপে হৃদয়ে বদ্ধ থাকিল। এই কারণ বশত তাঁহাদিগের অন্তরে যে নির্মল স্রোত বহিতে ছিল, তাহা বহিতে লাগিল। উপনিষদের জ্ঞান-সুধা, পুরাণের ভক্তি-সুধার সহিত মিলিত হইয়া ভক্তির প্রবলতায় আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃতি হইতে অতীত হয় নাই, সুতরাং ভক্তির প্রাবল্য ও আত্মার অনন্ত জ্ঞানের খর্বতা হইয়াছিল।

স্ত্রীলোকদিগের সম্মান

এদেশে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে একভাবে ছিল। বেদেতে, মনুতে ও পুরাণে স্ত্রীলোকদিগের সম্মানের প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মনু বলেন স্ত্রীলোক যথার্থ পবিত্র। স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী, সমান। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমানা। স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই শুদ্ধ। যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান, সেখানে দেবতারা তুষ্ট। যে স্থানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত, সেখানে সকল ধর্মের ভ্রষ্টতা।

বিবাহিতা স্ত্রীলোক পিতা কর্তৃক, ভ্রাতা কর্তৃক, স্বামী কর্তৃক, ও দেবর, ভাসুর কর্তৃক, সম্মানিত ও পূজিত হওয়া কর্তব্য। স্ত্রীলোক 'ভবতি ও প্রিয় ভগ্নি বা মাতা' বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্রে পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অগ্রে যাইতে দিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির আপন কিঙ্করীকে 'ভদ্রে' বলিয়া ডাকিতেন। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক নিষেধিত না হইলে, কথোপকথন করিতে পারিত। কিন্তু স্বামী বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী অন্যের বাটীতে উৎসব ও যেখানে বহুলোকের সমাগম, সেই সকল স্থানে না যাইয়া আপন গৃহে থাকিয়া ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজারা স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ভরত, রামচন্দ্রের নিকট বনে গমন করিলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান পূর্বক ব্যবহার করিয়া থাক তো?' যখন যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন— 'রাজ্যেতে দুঃখিনী অঙ্গনারা তো উত্তমরূপে রক্ষিত হয় ও রাজবাটীতে স্ত্রীলোকেরা তো সম্মানপূর্বক গৃহীত হয়?' স্ত্রীলোক, রক্ষক-বিহীনা হইলে রাজা দ্বারা রক্ষিত হইতেন। মনু কহেন 'কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী।' ভীষ্ম কহেন— মাতা ইহ ও পরলোকের মঙ্গলকারিণী। পীড়িত ও দুঃখিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই।

স্ত্রী পরম ঔষধি ; আধ্যাত্মিকতা অর্জনে স্ত্রী অপেক্ষা সহযোগিনী নাই। মনু ও রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক আপন শুদ্ধ মতিতেই রক্ষিত হয়, বদ্ধ থাকিলে রক্ষিত হয় না, কথাসরিৎসাগরে এক গল্পে লেখে যে, যখন এক বর কন্যা বিবাহ করিয়া আসিলেন, কন্যা কহিলেন— দ্বার উদঘাটন কর, বন্ধুবান্ধবের সমাগম হউক। স্ত্রীলোক অন্তর বলেতেই রক্ষিত হয়। বন্ধনের আবশ্যক নাই। ডাক্তার উইলসন আমাদিগের ভাষা ও শাস্ত্র উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, হিন্দুজাতীয় মহিলাগণ যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, এরূপ আর কোনো প্রাচীন জাতিতে হয় নাই। স্ত্রীলোক সকল নাটকে কবিতাতে উৎকৃষ্ট ও উচ্চরূপে বর্ণিত। তাহারা পুরুষদিগের নিয়ামক ও পুরুষেরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিত।

পুনর্বিবাহ, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য

ঋগ্বেদের সময় সহমরণ ছিল না। যিনি বিধবা হইতেন, তিনি স্বামীর মৃতদেহের সহিত কিয়ৎকালের জন্য স্থাপিত হইয়া উঠিয়া আসিতেন। পরে তিনি অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। ঋষিরা বিধবা বিবাহ করিতেন। অনন্তর বিধবার পুনর্বিবাহ, পতিপরায়ণা নারীদিগের বিষতুল্য জ্ঞান হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন বৈবাহিক বন্ধন কেবল ঐহিক বন্ধন নহে— ইহা ঐহিক ও পারলৌকিক বন্ধন। পতি সাকার হউক বা নিরাকার হউক, সেই পতির সহিত মিলিত হইয়া, লোকান্তরে দুই জনে উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অতএব এই বিশুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া পশুবৎ ভাব গ্রহণ পূর্বক, পশুবৎ হইয়া অধোগতি প্রাপ্তির কি আবশ্যক? বৈবাহিক বন্ধনে স্ত্রী ও স্বামী, পরস্পরের অর্ধেক শরীর, অর্ধেক জীবন, অর্ধেক হৃদয়। এইরূপ চিন্তা সতীর হৃদয়ে মুদ্রিত হইলে, সহমরণের প্রথা প্রচলিত হইল। বিধবার এই বাসনা যে, স্বর্গে স্বামীর সহিত বাস করাই শ্রেষ্ঠ কল্প ও তাঁহার সহযোগে, তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুল পবিত্র করা, উচ্চ কার্য। বিধবারা শারীরিক ও মানসিক ভাব পরিত্যাগপূর্বক, আত্মবলে বলীয়ান হইয়া, আত্মার চক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের মাহাত্ম্য দৃষ্টি করত— চিতারূঢ় হইয়া, দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পট্টবস্ত্রপরিধানা— কপালে সিন্দূর, হস্তে বটশাখা, রসনা ধ্বনি করিতেছে— 'হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্— এ জগৎ মিথ্যা— আমার পতিই আমার সর্বস্ব— যে রাজ্যে তিনি আছেন, আমি সেই রাজ্যে যাই। সত্যং সত্যং সত্যং।' এই ধ্যান ও এই গভীর ভাব প্রকাশে, সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন হইত ও দগ্ধ হইবার অগ্রে নারীর আপন আত্মা ইচ্ছাবলে, শরীর ও মন হইতে বিভিন্ন হইত।

কিয়ৎকাল পরে মনু এই বিধি দিলেন যে, বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য উত্তম কল্প, কারণ ব্রহ্মচর্য দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, সহিষ্ণুতা অভ্যাসিত হইতে হইতে আত্মার উন্নতি সাধন হয়। যদবধি পতি ছিল, তদবধি পতির সহিত এক মন, এক প্রাণ, এক শরীর হইয়া থাকাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে পতির প্রীতার্থে, ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করিলে নিরাকার পতিকে হৃদয়ে আনয়ন করা হয় ও অভ্যাস নিষ্কাম ভাবে পরিচালিত হইলে আত্মার বল ও শক্তির বৃদ্ধি অনিবার্য।

বিবাহ

পূর্বে স্ত্রীলোকেরা পতিমর্যাদা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইলে বিবাহ করিতেন না। শাস্ত্রে লেখে 'কন্যা যত দিন পতিমর্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম শাসনে অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।' সে সকল সদ্যোবধূর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা যৌবনাবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। যুবক ও যুবতী পরস্পর সন্দর্শন করিয়া ও পরস্পরের স্বভাব, চরিত্র গুণ ইত্যাদি জানিয়া, পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে বিবাহ করিতেন। রামচন্দ্রের বনবাসকালীন অযোধ্যা সর্বপ্রকারে নিরানন্দে মগ্ন ছিল। বাল্মীকি লেখেন, যে সকল উদ্যানে যুবক ও যুবতী আমোদার্থে ও পরস্পর সন্দর্শনার্থে গমন করিতেন, তাহা এক্ষণে শূন্য রহিল।

ক্ষত্রিয়েরা বীরত্ব সম্মানার্থে কন্যাকে স্বয়ম্বরা করিয়া বিশেষ বিশেষ পণ করিতেন। রাম, ধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন। অর্জুন, লক্ষ্য ভেদ করত দ্রৌপদী লাভ করেন। স্বয়ম্বর সভায় কন্যা, ধাত্রির নিকট সকলের পরিচয় পাইয়া ও রূপ দেখিয়া, যাঁহার প্রতি মনন করিতেন, তাঁহার গলায় বরমাল্য দান করিতেন।

রঘুবংশে ৬ষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর, ও নৈষধের ২১ সর্গে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বিবরণ লিখিত আছে।

পূর্বে কন্যা, স্বয়ম্বরা না হইয়াও ইচ্ছামতো পাত্রে পাণি প্রদান করিতেন, যথা— সাবিত্রী, দেবযানি, রুক্মিণী, শুভদ্রা ইত্যাদি। দশকুমারে লেখে যে, কন্যা সুশিক্ষিত হইয়া আপন স্বেচ্ছাক্রমে বর গ্রহণ করিতেন।

বিবাহ অষ্ট প্রকার ছিল।

১। ব্রাহ্ম— সুপাত্রে কন্যা দান।

২। দৈব— পুরোহিতকে কন্যা দান।

৩। ঋষি— দুইটা গোরু পাইয়া কন্যা দান।

৪। প্রজাপত্য— সম্মান পূর্বক কন্যা দান। পিতা এই আশীর্বাদ করিতেন— বর কন্যা তোমরা দুই জনে মিলিত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম করিবে।

৫। আসুর— ধন পাইয়া কন্যা দান।

৬। গান্ধর্ব— বর ও কন্যার স্বেচ্ছামতে বিবাহ।

৭। রাক্ষস— কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ।

৮। পৈশাচ— কন্যা নিদ্রিত, উন্মত্ত অথবা ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে, তাহার সহিত বিবাহ।

প্রথম ছয় ব্রাহ্মণদিগের, শেষ চারি ক্ষত্রিয়দিগের, ও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রকার বিবাহ অন্যান্য শ্রেণীর জন্য বিহিত হইয়াছিল।

উচ্চ জাতিস্থ লোকেরা নিম্ন জাতিকে বিবাহ করিতে পারিত। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিত।

ব্রাহ্মণের কন্যা, নীচ জাতিকে বিবাহ করিলে তাহাকে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারিত

না। তিনি স্বামীর সহিত সকল বৈদিক কার্য নির্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী ভার্যা হইলে, তিনি সকল বৈদিক কার্যে গৃহীত হইতেন না। ব্রাহ্মণের নানা বর্ণীয় স্ত্রী থাকিলে, উপাসনা প্রভৃতি তাহাদিগের বর্ণানুসারে হইত। যদি কোনো স্ত্রী, উচ্চ জাতীয় ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইত আর নীচ জাতীয় লোকের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বাটীতে রুদ্ধ থাকিতে হইত। এই নিয়ম কতদূর প্রবল ছিল, তাহা বলা কঠিন, কারণ অসবর্ণ বিবাহ পূর্বে প্রচলিত ছিল।

উত্তম স্ত্রীর লক্ষণ, মনু বলেন— জ্ঞান, ধর্ম, পবিত্রতা, মৃদুবাক্য, ও নানা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা। এবম্প্রকার অঙ্গনা, রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল হয়েন। মনু ও ভীষ্ম বলেন যে, নীচ জাতিতে উত্তম স্ত্রীলোক থাকিলে, তিনিও উচ্চ জাতি দ্বারা গ্রহণীয়। বিবাহে কন্যার সম্মতির আবশ্যক হইত। বিবাহকালীন, বর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাকে কে দিতেছেন— প্রেম অথবা আপন ইচ্ছা? উত্তর প্রেম দাতা, প্রেম গৃহীতা। তাহার পর, বর বলিতেন-- তোমার চিত্ত আমার চিত্ত হউক। বিবাহের এক নিয়ম এই যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি শুদ্ধাচার অনুষ্ঠান পূর্বক বৈবাহিক শপথ রক্ষা করিবেক। রণে, যদ্যপি রাজা শত্রুর কন্যাকে জয় লাভ করিয়া আনিতেন, তথাপি তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। পূর্বে কোনো কোনো বিদুষী এই পণ করিতেন, যাহারা তাহাদিগকে পাণ্ডিত্যে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাদিগের গলায় তাহারা বরমাল্য অর্পণ করিবেন। এ কাবণ স্ত্রী-লাভ করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হইত। ক্রমে বিদ্যার অনুশীলন এতদূর হইয়াছিল যে, কোনো কোনো রানি পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিতেন। কর্ণাটের রানি এইরূপ বিদ্যার চর্চা করিতেন ও কাশ্মীরের রানি সামদেবকে কথাসরিৎসাগর লিখিতে আদেশ করেন। এক বিবাহ শ্রেয়ঃকল্প ও বহুবিবাহ করা শ্রেয়ঃকল্প নহে। রামায়ণ ও মহাভারতে লেখে, এক পত্নী গ্রহণই উৎকৃষ্ট প্রথা ও উচ্চগতি প্রদ— স্ত্রীর নামই ধর্মপত্নী, কারণ স্ত্রীর সহিত ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনে পুরুষ নিযুক্ত থাকিবে। এক পত্নী হইলে, পুরুষ তাহাকে আপন হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া তাহার সহিত বন্ধন ক্রমশ দৃঢ়ীভূত করিবেক। অবশেষে, স্মৃতিকারকেরা এই ধার্য করিলেন যে, স্ত্রী সুরাপায়ী, অধার্মিক, মন্দকারিণী, অপ্রিয়া, বন্ধ্যা, চিররোগী অথবা অপব্যয়ী হইলে, অন্য স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু যদি প্রথম স্ত্রী, ধার্মিকা ও পীড়িতা হয়েন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় বিবাহ হইত।

স্ত্রীলোকের বাহিরে গমন

ঋগ্বেদে প্রকাশ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা সালঙ্কৃতা হইয়া উৎসব ও বিদ্যানুরঞ্জন সভাতে গমন করিতেন। মহাবীর চরিতে লিখিত আছে যে, ঋষি কন্যা ও পত্নী সকল, পিতা ও স্বামীর সহিত ভোজে ও যজ্ঞে গমন করিতেন। মনুসংহিতা পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে স্ত্রীলোকেরা নাট্যশালায় ও উৎসবে গমন করিতেন। প্রকাশ্য স্থানে মঞ্চোপরি স্ত্রীলোক বসিয়া মল্লযুদ্ধ ও বাণ শিক্ষা ইত্যাদি দেখিতেন। কি মৃগয়ায়, কি যুদ্ধস্থানে, কি শব-সৎকারে, কি যজ্ঞস্থানে, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা পাণ্ডবদিগের শিবিরে ছিলেন। দ্রৌপদীর বিবাহ বিবেচনার্থে, দ্রুপদের সভায়

কুন্তি উপস্থিত থাকিয়া আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজসূয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞে ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময়ে নারীরা উপস্থিত ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ছিল ও যুবতীরা সভার মধ্যে ইতস্তত বেড়াইয়া ছিলেন।

রানিদিগের রাজ্য গ্রহণ

প্রকাশ্য সভাতে, রানি রাজার বামদিকে সিংহাসনে বসিতেন। রাজপুত্র না থাকিলে রাজকন্যা সিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন। প্রেমদেবী নামে একজন রাজবংশীয় নারী দিল্লির সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নেপালে, তিন জন অঙ্গনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজকার্য করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাজেন্দ্রলক্ষ্মী অতি উচ্চ ছিলেন। সিংহলেও কয়েকজন রানি রাজকার্য করিয়াছিলেন, এবং মহারাষ্ট্রে অহল্যাবাই রাজকার্য করেন। তাঁহার সংক্ষেপ বিবরণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে।

পুরাণে, স্ত্রীরাজ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। হিখখোফ নামে একজন চীন ভ্রমণকারী এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি কহেন— যেখান হইতে গঙ্গা ও যমুনা নামিতেছে, তাহার নিকট স্ত্রীরাজ্য, ঐ রাজ্য স্ত্রীলোক দ্বারা শাসিত হইত। মালদ্বীপ, একজন রানির দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল।

পরিচ্ছদ ও গমনাগমন

এখানকার রাজস্থানের নারীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ বৈদিক সময়ে অঙ্গনাদিগের ছিল। ঘাগরা, কাঞ্চুলি ও চাদর। চাদরে মস্তক অবধি ঢাকা থাকিত। সীতা যখন রাবণ কর্তৃক হৃত হন, তখন তাঁহার মস্তকের আবরণ, চিহ্ন রাখিবার জন্য ভূমিতে ফেলিয়া দেন। যখন জয়দ্রথ, দ্রৌপদীকে হরণ করেন, তখন তিনি তাঁহার ঘাগরা ধরিয়া ছিলেন। মনু বলেন— স্ত্রীলোক বাহিরে গমন করিতে গেলে, শরীরের উপরের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া যাইবেক না। ঋগ্বেদে এক সূত্রেতে প্রকাশ হইতেছে যে, অঙ্গনাগণের মস্তকের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত। মহারাষ্ট্র, কাশী প্রভৃতি দেশে অঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ পূর্ববৎ আছে। পূর্বে কেবল এক শাড়ি পরা প্রথা ছিল না।

পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা রথে, অশ্বে ও গজে আরোহণ করিতেন। অশ্বে আরোহণ করা, বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে।

মাঘ কাব্যে লেখে যে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজারা আপন আপন অশ্বারূঢ়া মহিষী সঙ্গে লইয়া আসিয়া ছিলেন।

কল্কিপুরাণে লেখে, স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধ করিতেন।

বৌদ্ধমত

বেদের অনুশীলনকালীন পুরোহিতের সৃষ্টি হইল। ক্রমে পুরোহিতরা আপন আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত গুরুর স্বরূপ ; কিন্তু—

'গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভা গুরবো দেবী শিষ্যসন্তাপহারকাঃ॥

অনেক গুরু আছেন যাঁহারা শিষ্যের চিত্ত অপহরণ করেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণ করিবার জন্য গুরু দুর্লভ।

সকল ধর্মশিক্ষক নিষ্কাম রূপে শিক্ষা দেন না অথবা সকল ধর্মশিক্ষকও শিষ্যের সন্তাপ হরণ করিতে পারেন না ;কিন্তু অনেকেই আপন ক্ষমতাতে উন্মত্ত হয়েন। সেইরূপ বৈদিক পুরোহিত প্রতাপান্বিত হওয়ায় সাধারণ সমাজের ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন। বিশ্বামিত্র ও জনক বেদের দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি, তিনি বেদের লেখকদিগকে ভাঁড়, বঞ্চক ও ভূত বলিলেন ও ব্রাহ্মণেরাও অন্ত্যজ রূপে বর্ণিত হইলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ মতের সৃষ্টি হইল। বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগকে মাংসাশী, মদ্যপায়ী ও জাতি অনুরাগী দেখিয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত অহিংসা পরম ধর্ম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক— যাহা আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, তাহা তাহাদিগের হৃদয়ে শীঘ্র সংলগ্ন হইল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকেরা বলিল যে, জীবনের উদ্দেশ্য নির্বাণ— যোগ ও ধ্যান ইহার পথ। এই উপদেশ শুনিয়া বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইল। ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইল। বৌদ্ধ ধর্ম, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন হইতে গৃহীত। সাংখ্যদিগের ন্যায় বৌদ্ধেরা প্রথমে নিরীশ্বর ছিলেন, পরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিলেন। ক্রমশ তাঁহারা আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের উদ্দেশ্য একই। যাহাকে হিন্দুরা জীবন্মুক্তি বলেন তাহাকেই বৌদ্ধেরা নির্বাণ কহেন। এই অবস্থাতেই ভবনদী পার— এই অবস্থাতেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও অন্তর জ্ঞান পূর্ণ— এই অবস্থাতেই স্থূল শরীর বিগত ও সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন। পূর্বে ভারতভূমি ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূর দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়াছিল ;এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা দেখিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণ হিংসা ও দ্বেষ শূন্য, এবং অনেকেই ঐ ধর্ম মতাবলম্বী হইলেন। মহা প্রজাপতি অশোক রাজার কন্যা, ও অনেক স্ত্রীলোক এই ধর্মের অনুগামিনী হইলেন। তাঁহারা প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় পুরুষের সহিত বিচার করিতেন। যখন চন্দ্রগুপ্ত রাজা ছিলেন, তখন স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত বাহিরে যাইতেন।

মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যদেব এই কথা লেখে— 'নগরীয় লোকেরা আপন আপন বনিতা সঙ্গে লইয়া. আমোদার্থে বাহিরে আইসে না কেন?' বৌদ্ধ নীতি গ্রন্থে লিখিত আছে— উত্তম স্ত্রী, মাতা, ভগিনী ও সখী স্বরূপ। লঙ্কা দ্বীপ হইতে, বৌদ্ধ নারীরা বিবাহার্থে ভারতবর্ষে জাহাজে আসিতেন।

রানিদিগের গৃহ

যে প্রকার গৃহে রানিরা থাকিতেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়।

'কোনো স্থানে শুক ও ময়ূরগণ ক্রীড়া করিতেছে, কোনো স্থানে বক ও হংসগণ শব্দ করিতেছে, কোনো স্থান নানাপ্রকার লতা দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে, কোনো স্থান চম্পক ও অশোক প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, কোনো স্থান বা নানা বর্ণরঞ্জিত চিত্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। কোনো স্থান বা উৎকৃষ্ট গজদন্ত রজত ও সুবর্ণময় বেদি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে, কোনো স্থানে বা সতত বিরাজমান পুষ্পফল পরিশোভিত বৃক্ষ সকল

ও মনোহর সরোবর সকল শোভা পাইতেছে, কোনো স্থান বা পরমোৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত রজত ও স্বর্ণময় আসনে এবং উত্তম উত্তম উপাদেয় অন্ন পানীয়ে সুশোভিত হইয়াছে।'

দায়াদি

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে দায়াদি নিয়মাবলি হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, তাহাদিগের সম্পত্তি বিভাগের অংশ বড়ো অল্প হয় নাই। অবিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। তুল্যানুতুল্য মাতৃধনের বিভাগ হইবে। বিবাহিতা কন্যা ভ্রাতার অংশের চতুর্থ অংশ পাইবে। মাতা, স্বামীর বিষয় তাঁহার পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। এইরূপ কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী, মাতা, পিতামহী দিগের মধ্যে দায়াদি সম্পত্তি বিভক্ত হইত।

স্ত্রীলোকের বিশেষ সম্পত্তি স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইত। স্ত্রীলোকের ধন কেহ হরণ করিলে, ঘৃণাস্পদ হইত। যিনি স্ত্রীলোকের দ্রব্য অপহরণ অথবা তাহার প্রাণ নাশ করিতেন, তাহার প্রাণদণ্ড হইত। অবিবাহিতা স্ত্রী অথবা বিবাহিতা স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি কেহ দোষারোপ করিলে দণ্ডনীয় হইত। স্ত্রীলোকের রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় হইত।

চৈতন্য

চৈতন্যের অনেক স্ত্রীশিষ্য ছিল। স্ত্রীপুরুষেরা এক বাটীতে থাকিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। চৈতন্যের শিক্ষা— ভক্তিভাবক, স্ত্রীলোকেরা ঐ শিক্ষা পাওয়াতে অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের মাতা উচ্চ স্ত্রীলোক ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার এইরূপ বর্ণন আছে।

> 'জগন্নাথের ব্রাহ্মণী তেঁহ, মহা পতিব্রতা।
> বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ, যেন জগন্মাতা॥
> রন্ধনে নিপুণা তা সম নাহি ত্রিভুবনে।
> পুত্র সম স্নেহ করে সন্ন্যাসী ভোজনে॥'

উপসংহার

আর্য জাতীয় মহিলাগণের পূর্ব বৃত্তান্ত পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাহাদিগের শিক্ষা, আচার ও ব্যবহার আধ্যাত্মিক— যাহা কিছু শিখিতেন ও করিতেন তাহা ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতেন— ইহা পৌত্তলিক অথবা অপৌত্তলিক ভাবে হইতে পারে কিন্তু অন্তর অভ্যাসের ফললাভ অবশ্যই হইত। এইরূপ অভ্যাস বহুকালাবধি হওয়াতে স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ে নিষ্কাম ধর্মানুষ্ঠান করা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই জন্য সহমরণ, ব্রহ্মচর্য, ব্রত, নিয়মাদি ও পতিপরায়ণত্ব অনুষ্ঠিত হইত। নিষ্কামভাবই আত্মার প্রকৃত বল।

'ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যদ্দ্বারা অবিনাশী পরমব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।' গার্গীর এই উপদেশ 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং'— যাহার দ্বারা

অমৃত তত্ত্ব না পাইব, তাহা লইয়া কী করিব? উক্ত বেদ প্রেরণা ও উপদেশ হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে যেন মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, বাহ্য আড়ম্বরীয় বা অনুকরণীয় শিক্ষা তাহাদিগের চিত্তে বিতৃষ্ণারূপ প্রবেশ করে ও অনাদর পূর্বক গৃহীত হয়। যে উপদেশ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলজনক না হয়, যে উপদেশে ও অভ্যাসে আত্মার শান্তপ্রকৃতি উদ্দীপন করে না— সে উপদেশ ও অভ্যাস হিন্দু মহিলাগণের হৃদয়ে স্থায়ী হয় না। যেরূপ স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ও অন্তর যেরূপ আধ্যাত্মিক সলিলে ধৌত হইতেছে, সেইরূপ উপদেশ না পাইলে কখনই গৃহীত হইবেক না।

বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বর পরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য। ঈশ্বর পরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্য এদেশের মহিলাগণ পূর্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে? ও সর্বত্যাগী হইয়া, ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্য জাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বর পরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় সম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর, ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও। বিষয়ানন্দ, বাসনানন্দ ত্যাগ পূর্বক ধ্যানানন্দে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ কর। ধ্যানাৎ পরতরং নহি— ধ্যানের অপেক্ষা কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। ধ্যানই অন্তর যোগ। ধ্যানেতে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, ও মালিন্যের বিনাশ, আত্মার উদ্দীপন ও ঈশ্বরের সহিত সংযোগ।

ভব-ভাবনা ভেবনা, ভৌতিক ভাবনা,
ভাব ভাব ভাবাতীত, যিনি নাশেন ভাবনা।

☐ ২ জানুয়ারি ১৮৭৯

ব্রাহ্মধর্মের নবম ব্যাখ্যান

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

ব্রহ্ম-পরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সংসারাশ্রম হইতে অবসৃত হইবার সময় যখন স্বীয় ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ীকে আপনার ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন, তখন মৈত্রেয়ী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে স্বামিন্! যদি এই সমুদয় পৃথিবী বিত্তেতে পূর্ণ হয়; তবে ইহার দ্বারা আমার অমৃত লাভ হয় কিনা?" নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য : যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "তাহা হয় না— যথৈবোপ-করণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ— কতকগুলিন উপকরণ লইয়া সংসারী ব্যক্তির জীবন যে প্রকারে গত হয় তোমারও জীবন সেই প্রকার হইবে। অমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন। বিত্তেতে অমৃতত্বের আশা নাই। এই সকল অস্থায়ী অধ্রুব বস্তুর দ্বারা সেই নিত্য সত্য বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।" ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হই, মুক্ত না হই, ঈশ্বরকে না পাই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?"

সকলেরই এক এক সময়ে এই প্রকার অভাব বোধ হয়। যখন জীবনের মহান্ লক্ষ্য মনেতে প্রতিভাত হয় তখন সংসার আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না; সংসারের সমুদয় সম্পত্তি সেই গভীর আন্তরিক অভাব মোচন করিতে পারে না। তখন তৃষ্ণার্ত মৃগের ন্যায় ঈশ্বরকে সর্বত্র অন্বেষণ করি, সকলকেই জিজ্ঞাসা করি; যেখানে তাঁর কোনো চিহ্ন পাই সেইখানেই যাই। যেখানে সাধুমণ্ডলী একত্র হয়, যেখানেই তাঁর গুণ-কীর্তন হয়, সেইখানে গমন করি। প্রথমে হৃদয়ে অভাব বোধ হয়, পরে ব্যাকুলতা আইসে, জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, সর্বত্র অন্বেষণ করি। আপনাকে পবিত্র রাখিবার ইচ্ছা হয়; কেননা, জানিতে পারি যাঁহাকে চাহিতেছি তিনি শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্! পরে ঈশ্বরের নিকটে সমুদয় হৃদয়ে প্রার্থনা করি; তাঁহাকেই সর্বস্ব সমর্পণ করি এবং তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হই। হয়তো আপনাকে পবিত্র করিতে পারি নাই; হয়তো কোনো গূঢ় পাপ অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; তখন মনে করি, কেন ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। কিন্তু যখনই সেই পাপ-প্রবৃত্তিকে বলিদান দিয়া অকৃত্রিমভাবে হৃদয়ের দ্বার উদঘাটন করি, তখনই তার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সঙ্গে

এই প্রকার যোগ। যখন অন্তরের বিষাদ-অন্ধকারের মধ্য হইতে সেই স্বপ্রকাশ সূর্যের উদয় দেখিতে পাই, তখন কি সম্পদ-না লাভ করি! তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়; নেত্র-যুগল প্রেমাশ্রু বিসর্জন করে; হৃদয় বিমলানন্দে পূর্ণ হয়। কিন্তু এ আনন্দ আমরা ধারণ করিতে পারি না। ঈশ্বর-রত্নকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারি না। তিনি একবার আসেন, আবার থাকেন না। সময়ে সময়ে দেখা দেন, আমরাও কৃতার্থ হই। কিন্তু যেমন ইচ্ছা সে প্রকার তাঁহাকে পাই না। তাঁর সেই আনন্দ-ভাব মঙ্গল-ভাব একবার পাইয়া আমারদের তৃষ্ণা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। কোথায় সজ্জন ভগবজ্জনের সাক্ষাৎ পাই, কোন্ স্থানে গেলে এই আন্তরিক স্পৃহা তৃপ্ত হয়, কি প্রকার কর্ম করিলে-- কি প্রকার মনের ভাব হইলে, ঈশ্বরকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারি, তখন তাহাই দেখি। তখন ইচ্ছা ও প্রার্থনা শতগুণ বল ধারণ করে। তখন ঈশ্বরকে বলি, "যখন হৃদয়ে দর্শন দিয়াছ তখন কেন না সেখানে চিরস্থায়ী হও। একবার যখন কৃতার্থ করিয়াছ, তখন বার বার আমারদের জীবনকে কৃতার্থ কর। এই শরীর-কুটিরে আসিয়া চিরদিন বাস কর, কৃপা বিতরণ কর।" যেমন ঈশ্বর-লাভের জন্য তন্মনা একাগ্রমনা হই তেমনি হৃদয়কে পবিত্র রাখার জন্যও সাবধান হই; তখন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে হৃদয়ে রাখিয়া পূজা করিবার জন্য পাপ হইতে বিরত থাকিতে প্রাণ-পণে যত্ন করি। আর কিছুতে তেমন ভয় হয় না। যেমন ভয় হয়, পাছে ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ আর দেখিতে না পাই। এই ইচ্ছা প্রবল হইলে সংসারের বিঘ্নরাশি অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। সংসারের সম্পদ বিপদের বল থাকে না। কর্তব্যের কঠোরতা থাকে না। ধর্ম-পথের কণ্টক-সকল শরীরে বিদ্ধ হয় না। তখন আশা ভয়, সুখ দুঃখ ঈশ্বরেতেই সমর্পিত থাকে। তাঁহাকে পাইলে সকল সম্পত্তি লাভ হয়, তাঁহাকে হারাইলে সকলই শূন্য, সকলই নিরাশ ও অন্ধকার। যতক্ষণ দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় তাঁর দিকেই আত্মার লক্ষ্য স্থির থাকে ততক্ষণ আর কিছুতেই ভয় নাই। চতুর্দিকে ঝঞ্ঝা তরঙ্গ, চতুর্দিকে বিপত্তি বিষাদ, তথাপি তাঁর মুখ দেখিতে দেখিতেই আমরা সকল বিঘ্ন, সকল শোক, সকল তাপ অতিক্রম করি।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমারদের এই লক্ষ্য যেন স্থির থাকে। তোমারদের ইচ্ছা যেন দুই ভাগ না হয়। তোমারদিগের সেই ঈশ্বরকে লাভ করিবার একই ইচ্ছা থাকিবে, আর আর ইচ্ছা তাহার অনুগত হইবে। ব্রহ্মই তোমারদের লক্ষ্য, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই তোমারদের লক্ষ্য। তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছাই প্রধান। সেই ইচ্ছাই তোমারদের রাজা, মন্ত্রী, যন্ত্রী; আর আর বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা তাহার দাসের ন্যায়। আমরা ব্রাহ্ম; ব্রহ্মের সঙ্গে আমারদের সম্বন্ধ, নিত্য সম্বন্ধ। আমরা কি সামান্য বিষয়ী লোকের ন্যায় সংসারের ক্ষতি লাভ লইয়াই থাকিব? যেমন উপকরণবতাং জীবিতং— যেমন কতকগুলিন উপকরণ লইয়া সংসারিদিগের জীবন গত হয়, আমারদেরও কি সেই প্রকার জীবন হইবে? আমরা কি ঈশ্বরেতে প্রীতিশূন্য হইয়া, পাষাণ-সমান হৃদয় লইয়া, কেবল বিষয়-ব্যাপার, ক্রিয়া-কলাপ, কার্যকর্মেতেই লিপ্ত থাকিব? ঈশ্বরের কার্য পশুপক্ষী, চন্দ্রসূর্য, সকলেই করিতেছে। সূর্যের ন্যায় অবিশ্রান্ত রূপে কে তাঁহার কার্য করিতে পারে? মেঘের ন্যায় এত বারি-ধারা বর্ষণ করিয়া কে এ পৃথিবীর উপকার করিতে পারে? আমরা কি অচেতন মেঘ সূর্যের

ন্যায় অচেতন হইয়া ঈশ্বরের কার্য করিব? আমারদের ব্রাহ্মধর্মের তো উপদেশ এই যে, আমরা ইচ্ছার সহিত প্রীতির সহিত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য সাধন করিব। ঈশ্বরও চাই, সংসারও চাই, আমারদের ইচ্ছা এমন দ্বিধা নহে। ঈশ্বরকে পাইয়া যদি সংসার থাকে, তবে থাকুক; নতুবা সংসার চাহি না। আমারদের আত্মার উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য যে-সকল সাংসারিক বিষয়-সুখের প্রয়োজন, সে সকল সুখ তো ঈশ্বর নিয়তই বিধান করিতেছেন এবং করিবেনই। তিনি যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।— যে-সকল কঠোর পর্বত কেবল হিমের আলয়, সেখানেও অগ্রে জীবিকা রাখিয়া জীব-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে কি তিনি আমারদিগকে বিস্মৃত থাকিবেন? যখন আমরা মাতৃ-গর্ভ-অন্ধকারে থাকিয়া কিছুই জানিতাম না, তখনও তিনি আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন কি দেখিবেন না? তিনি যদি এখনই আমারদের সম্মুখে তেজোরাশি-রূপে আবির্ভূত হইয়া বলেন "বর প্রার্থনা কর", আমরা কি প্রার্থনা করিব? আমরা কি প্রার্থনা করিব, প্রতিদিন যেন অন্ন পাই, বস্ত্র পাই? না বলিব, যেমন এখন কৃপা করিয়া দেখা দিলে, এই প্রকার চিরকাল আমার নয়নের সম্মুখে থাক; আমার হৃদয়ে থাক; অনন্ত কালের উপজীবিকা হইয়া থাক। আমরা যেমন এই পৃথিবীতে বিষয়-সুখের জন্য প্রার্থনা করি না সেইরূপ পরলোকের সুখেব জন্যও আকাঙ্ক্ষী নহি। আমারদের প্রার্থনা ইহা নহে যে, ইন্দ্রলোকে গিয়া রাজত্ব করিব, স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করিব, সুরা অপ্সরা লইয়া নানা প্রকার ইন্দ্রিয়সুখে পরিবৃত থাকিব। এ-সকল কল্পনা ও ক্ষুদ্রতা আমারদের নহে। যে-সকল সুখ এই পৃথিবীরই যোগ্য নহে, তাহা আমরা স্বর্গলোকে গিয়া আবার ভোগ করিতে চাহি না। ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ এ প্রকার নয় যে, চন্দ্রলোকে বিভূতিমননুভূয় পুনরাবর্ততে— পুণ্য-বলে চন্দ্রলোকে গিয়া তথাকার ঐশ্বর্য-ভোগের শেষ হইলে পুনর্বার পৃথিবীতে জন্মিতে হইবে। আমরা চন্দ্রলোকেরও ঐশ্বর্য চাহি না, পৃথিবীরও দুর্গতি চাহি না, আমারদের আকর্ষণ ঈশ্বরের দিকে। সর্বসুখদাতা আমারদের জন্য স্বর্গলোক-সকল যে কি প্রকার সজ্জাতে সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু আমরা সেখানে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই আমারদের সকল কামনা সিদ্ধ হইল, সকল সম্পত্তি লাভ হইল। আমরা স্বর্গ-নরকের প্রতি দেখিতেছি না; আমরা ঈশ্বরকেই দেখিতেছি, তাঁহাকেই চাহিতেছি। আমাদের এই ইচ্ছা যে, যত কাল থাকি তাঁর সঙ্গেই থাকিতে পাই; লোক হইতে লোকান্তবে দিন দিন উন্নত হইয়া তাঁহার সহবাস-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অধিকাধিক উপভোগ করিতে পারি।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমারদের হৃদয়ে এই উন্নত আশা প্রেরণ করিতেছ, তুমি অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিবে। এখানে যেমন তোমার সঙ্গে যোগ হইয়াছে, নিত্যকাল তোমারই সঙ্গে থাকিব এবং তোমার পথে অগ্রসর হইব, এই আমারদের আশা— এই আশা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

□ ২৯ কার্তিক, ১৭৮৩ শক, (১৮৬২), *ব্রাহ্মধর্মের নবম ব্যাখ্যান*

সামাজিক 'লোফার'

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সকলেই লোফারদিগকে জানেন। ইহারা ক্ষমতা থাকিতে পরিশ্রম করে না। ভিক্ষা অথবা অপহরণ দ্বারা পরের দ্রব্য লইয়া কাল যাপন করা ইহাদিগের অভ্যাস। কিন্তু ইহারা ভিক্ষুকের ন্যায় নম্র নয়। দস্যুগণ বলে 'টাকা দাও, নতুবা তোমার প্রাণ গেল।' লোফারদিগের ভিক্ষাও সেই প্রকার। লাম্পট্য, চুরি, সুরাপান, মিথ্যা কথা, দাঙ্গা প্রভৃতি বিস্তর পাপ ইহাদিগের একচেটিয়া। লোফার নাম শুনিলেই একজন ছিন্নবস্ত্র পরিধায়ী বিকটমুখ বলবান অর্ধ-দস্যুর আকৃতি মনোমধ্যে উদয় হয়। ইহারা নগরের লোফার। এভিন্ন সমাজে এক প্রকার লোফার আছে। ইহারা আকৃতিতে নাবিক লোফারের ন্যায় না হউক, আর সকল বিষয়ে নিষ্কর্মা নাবিক অপেক্ষা প্রধান। শেষোক্ত ব্যক্তি কেবল আহার ও সুরাপান করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু সামাজিক লোফার ইহাতে সন্তুষ্ট নহে। এই মহাপুরুষদিগের কিঞ্চিৎমাত্র লেখাপড়া জ্ঞান আছে, কিন্তু বাহিরে এরূপ ভাব প্রকাশ করা হয় যে, এমন প্রগাঢ় পণ্ডিত আর নাই। কোনো পণ্ডিতের কথা হইতেছে, সামাজিক লোফার অমনি বলিয়া উঠেন 'সে কি জানে? আমি অমুক সময়ে তাহার সহিত কথা কহিয়া ছিলাম, সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও সে বলিতে পারে না।' কিন্তু সামাজিক লোফারের বাটি অনুসন্ধান করিলে একখানি পুস্তক পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক পাঠ করা হইয়াছে, বহুকাল সেগুলি হকারের নিকটে সের দরে বিক্রয় করা হইয়াছে। নূতন পুস্তক অথবা সংবাদপত্র একখানিও নাই। তথাপি আমাদিগের লোফার মিলের শেষ গ্রন্থের দোষ গুণ ও প্রিন্স বিসমার্কের শেষ কার্যে নিগূঢ় তাৎপর্যের বিষয়ে কথোপকথন করিতে পারেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন যে বিষয়ের কথা পাড়িবে লোফার সে সকলই জানেন। '১৮৫৯ অব্দের ৮ আইনে ফৌজদারী বিচারপতিদিগকে ভূমি জরিপ করিতে বলা হইয়াছে' লোফারের একথা কাহার সাধ্য খণ্ডন করেন। তুমি বল ইহা নিতান্ত ভ্রম; লোফার অমনি বলিবেন 'এখানে জুয়াচুরি করিলে খাটিবে না।' ভদ্রলোককে এরূপ অসমসাহসী মূর্খতা দর্শন করিয়া স্তব্ধ হইতে হয়। লোফার ভাবেন, আমার প্রশংসা বৃদ্ধি হইল। তবে এই সকল লোক এক বিষয়ে সতর্ক হয়। তাহারা কখনও উপযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে কোনো কথা বলে না। মূর্খের দলে একা বাল্মীকিকে পাইলেও বলে, তিনি চারি ছত্র কবিতা লিখিতে পারেন না; কিন্তু উপযুক্ত মধ্যস্থ থাকিলেই লোফারের মুখ বন্ধ হয়। নিকৃষ্ট দলে বাহাদুরি করা এই সকল লোকের অভ্যাস! মূর্খগণ ভাবে এত বড় লোক যখন

আমার বন্ধু তখন আমার ভাবনা নাই। লোফারের বিদ্যা ইহাদিগের নিকটে সমুদ্রবৎ বোধ হয়। সামাজিক লোফার পরিশ্রম করে না। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র কাহারই নিমিত্ত ইহারা চিন্তা করে না। আপনার তৃপ্তি হইলেই হইল। ইহাদিগের এমন চমৎকার ক্ষমতা এই, তোমার টাকা লইবে, কিন্তু দেখাইবে যেন তোমার টাকা লইয়া তোমারই মহা উপকার করিল। বলিতে থাকে, তোমাকে ভালোবাসি বলিয়াই সাহায্য লইতেছি। 'অমুক আমার পিতৃব্য, আমি চাহিলে তিনি পাঁচ সহস্র টাকা দিতে পারেন; কিন্তু তাহা আমি লই না, কেন তাঁহার নিকটে লঘুতা স্বীকার করিব।' লোফার এরূপ ভাব দেখায় যেন দেশে এমন বড় লোক নাই যাঁহার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব না আছে। অল্প বুদ্ধি ও আত্মাভিমানী লোক ইহাতে মোহিত হইয়া ভাবে 'দ্বারে হস্তি বাঁধিয়াছি।' নাবিক লোফারের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও আহারের দিকে ৩ত দৃষ্টি নাই। কিন্তু সামাজিক লোফার, উত্তম বস্ত্র না হইলে পরিধান করিতে পারে না। সাদা ভাত ইহাদিগের মতে শূকরের আহার। অম্বুরি তামাক যে না খায় সে ছোট লোক। যাঁহারা লোফারের কুহকে পড়েন, তাঁহারা পাছে লোফার মহাশয় ইতর ভাবেন বলিয়া নিজে উত্তম বস্ত্র পরিধান ও উত্তম আহার করেন, সেই সঙ্গে প্রিয় সহচরকেও সেই প্রকার, কখনও কখনও তদপেক্ষা উৎকৃষ্টও দিতে হয়। লোফার এক-একজনকে পাইয়া বসিলে তাহার ভিটায় ঘুঘু না চরাইয়া ছাড়ে না। যে-সে প্রকারে তাহার টাকা লওয়া হয়, এবং সুবিধামতো উপকারকের স্ত্রী ভগিনী কন্যা প্রভৃতিকে কুপথগামিনী করিতে পারিলেও ছাড়ে না এইরূপে নিজের ব্যয় চলে। কিন্তু পরিবারের যারপর নাই কষ্ট হয়। লোকে যতই অল্পবুদ্ধি হউক না কেন, তথাপি যখন দেখে যে, এক ব্যক্তি কেবল আপনার আমোদ লইয়াই আছে, তখন অবশ্যই মনে মনে ভাবে 'এ ব্যক্তি আপনার পরিবারকে খাইতে দেয় না, বাটি যায় না, যেখানে পায় সেইখানে আহার ও শয়ন করে। এমন ব্যক্তি কি যথার্থ ভদ্রলোক হইতে পারে?' লোফার এই আশঙ্কার পথ পূর্ব হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে। মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মের কথা হয়। বলিয়া থাকে পুত্র কন্যা সম্বন্ধ কেবল ঐহিক মাত্র; পরিবারকে অন্নদান না করিলে পাপ নাই। পাপ পুণ্য সকলই ঐহিক। যাহাতে মনের কষ্ট হয় তাহাই পাপ, যাহাতে সুখ হয় তাহাই পুণ্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেবল ক্ষীণমতি লোকেরা স্বীকার করে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা আনুমানিক। সুখদুঃখও আনুমানিক, পীড়া স্বাস্থ্যও আনুমানিক। নিজেব কষ্টেব নায় পরের কষ্টও আনুমানিক। ধর্মনীতি সম্বন্ধেও এই তর্ক। ব্যভিচার, চুরি, প্রতারণা, বৈরনির্যাতন স্পৃহা প্রভৃতিতে যদি মনের আনন্দ হয়, তবে অবশ্য তাহা করিবে। যাহারা নিজে হীনমতি তাহাদিগের পক্ষে এই সকল তর্ক বিশেষ সুখকর। পরকালের ভয় না থাকিলে অনেক ভয় যায়। সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগের সামাজিক লোফার বেদ স্বরূপ হইয়া ওঠে।

সামাজিক লোফারের অবস্থা এই, কিন্তু পাছে যে ব্যক্তির স্কন্ধে চাপিয়াছে তাহার অর্থ যাইবার ভয় হয়, সেই নিমিত্ত সর্বদা বলা হয়, 'আমি চেষ্টা পাইতেছি, শীঘ্র আমার অবস্থা ভালো হইবে, তখন তুমি বিশেষ সাহায্য পাইবে।' যাহার স্কন্ধে চাপে তাহার পয়সা যায়, কিন্তু আশা থাকে, কোনোকালে তাহার প্রত্যুপকার হইবে। এইজন্য হীনমতি লোকের তাহাকে কিছু বলিতে সাহস হয় না। সে এই সুযোগে যত ইচ্ছা স্বার্থ সাধন করে।

লোফারের সর্বদাই ভবিষ্যৎ আশা আছে। লোফার দুই বৎসর পরে রাজা হইয়া অমুকের সর্বনাশ করিবে, লোফারের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না; পৃথিবী বিস্মিত হইয়া স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া বলিবেন, 'এত বড় লোক লুকাইয়াছিল তাহা আমার জানিতাম না।' কিন্তু বর্তমানে তাহার কিছু হইবার যো নাই। সে নিজে কোনো আশা করে না, সে যে মন্দ লোক তাহার জ্ঞান আছে এবং তাহার কখনও ভালো হইবে না তাহারও সন্দেহ করে না। কিন্তু যাহাদিগকে দোহন করিতে হইবে তাহাদিগকে দেখায় যে তাহার দুর্ভাগ্যের সুখ-তারা শীঘ্র উদিত হইবে।

এই সকল লোক সমাজের ভয়ানক কণ্টক। ইহারা না মাতার, না পিতার, না স্ত্রীর, না সন্তানের, না আত্মীয়ের। স্বার্থ ইহাদিগের সকলই। তবে কিছু দিন ইহারা লোককে এই বলিয়া বিমোহিত করে, যেন পৃথিবীর ঐশ্বর্যকে গ্রাহ্য করে না এবং যদি সমুদায় ভারতবর্ষের এক বর্ষের রাজস্ব এক দিনে পায়, সমুদায় দান করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতভাব শীঘ্র প্রকাশিত হয়। সুখ দুঃখ আনুমানিক, মুখে লোফার এই কথা বলেন; কিন্তু একটা ব্যঞ্জন বিস্বাদ হইলে বৃষের ন্যায় গর্জন করিতে থাকেন। যে ৫০০ কোটি টাকা দান করিতে পারে সে এক টাকা বাজার করিতে পাইলে চারি আনা চুরি করিতে ছাড়ে না। সূক্ষ্মদর্শী লোক শীঘ্র বুঝিতে পারেন, লোফারের উপকার করা আর তাহার শত্রু হওয়া সমান। এই নিমিত্ত সামাজিক লোফাবেরা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে। তাহারা সুযোগ পাইলেই উপকারকের সহিত বিবাদ করিয়া লোককে জানায় যে, তৎপ্রদত্ত উপকার সে তুচ্ছজ্ঞান করে। একে এ সকল লোকের কৃতজ্ঞতা নাই, তাহাতে আত্মাভিমান বিলক্ষণ আছে, ইহাদিগের সহিত সমাজে একত্র হওয়া অতিশয় কষ্টের হয়। ঋণের তমাদিকাল তিনবৎসর, লোফারের উপকারের তমাদি এক দিনেই হইয়া যায়। ইহাদিগের উপকার করা বৃথা। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ইহারা অপমানের বিষয় জ্ঞান করে, তাহা করিলে ইহাদিগের ব্যবসায়ের হানি হয়, আর কাহাকে ঠকাইতে পারে না। যখন বড় কৃতজ্ঞতা দেখানো হইল, তখন ঊর্ধ্বসংখ্যা বলা হয়, উপকার করা মানুষের কর্তব্য কর্ম, যে ব্যক্তি এ নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা চায়, সে মূঢ়!! যাঁহারা সমস্ত জীবন ধর্মকার্যে বিনিয়োজিত করেন, তাঁহারাও প্রত্যুপকার স্বরূপ পরকালের নিস্তার আশা করেন। ঈশ্বর এত উপকার করিয়াছেন, তথাপি তিনিও আশা করেন যে জীব সকল ইহা ভোগ করিয়া তাঁহার গুণগান করিবে কিন্তু সামাজিক লোফারের কোষ্ঠীতে ইহা লিখে না।

সামাজিক লোফারদিগের আর এক ভয়ংকর গুণ আছে। ইহাদিগের সমবয়স্ক মাত্রেই ইহাদিগের শত্রু। নিজেদের বুদ্ধি বিদ্যা নাই, সমাজ সম্মান নাই, তথাপি সমবয়স্ক কেহ প্রধান হইলে রাগের সীমা থাকে না। লোফারের উক্ত ব্যক্তির ন্যায় নিজের বড় হইবার বাসনা নাই, কিন্তু তাঁহার পতন হইবে ও আপনি বড় হইব একান্ত এই বাসনা। ফলত মানুষের যত দোষ জন্মিতে পারে, লোফারের তাহা আছে। ইহারা অধার্মিক, নাস্তিক, অকৃতজ্ঞ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, জুয়াচোর, বিশ্বনিন্দুক, উপকারকের শত্রু ও আত্মীয়ের কণ্টক। যতক্ষণ সাহায্য পাইবে ততক্ষণ বন্ধুতা, তাহার শেষ হইলেই প্রকাশ্য শত্রুতা। ইহাদিগের যদি কখনও সৌভাগ্য হয়, তাহা কেবল লোকের কষ্ট ও অপমানের হেতু হইয়া থাকে।

অদ্য একজন বাটিতে অন্নদাস হইয়া আছে, কল্য যদি সৌভাগ্য হইল (লোফারের ভাগ্যে ইহা প্রায় হয় না) তবে আর সে বাটিতে সাধিলেও আহার হইবে না। তখন কলাইর ডাউল ঘোড়ার খোরাক বোধ হয়। দীর্ঘকাল লোফারের এই প্রতারণা চলে না। যে সকল ব্যক্তি অতি নির্বোধ তাহারাও বুঝিতে পারে কেবল ঠকানোই লোফারের ব্রত। লোফারের যথার্থ সৌভাগ্য সূর্যের কখনও উদয় হয় না। কিছু দিন ইহারা ঠকাইয়া খায়, কিন্তু ইহারা পরিণামে আত্মীয়হীন সমাজচ্যুত ও দরিদ্র হইয়া পড়ে। পৃথিবী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও স্ত্রী পুত্রের নিকটে স্নেহ পাওয়া যায়। কিন্তু লোফারের ভাগ্যে তাহাও ঘটে না। জীবনের শেষাংশ প্রায় জেলে অতিবাহিত হয়। চিন্তা, আত্মভর্ৎসনা, পৃথিবীর উপরে বিরক্তি এইগুলি লোফারের জীবনের পরিণাম। বুদ্ধিমান লোকে ইহাদিগকে চিনিবামাত্র পরিত্যাগ করিয়া রক্ষা পান; যে সকল লোক ইহা না করে, তাহাদিগের পরিণাম প্রায় লোফারের ন্যায় হইয়া ওঠে।

☐ *সোমপ্রকাশ*, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯। *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, চতুর্থ খণ্ড

কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা

অক্ষয়কুমার দত্ত

বালুময় উত্তপ্ত মরুভূমি ভ্রমণ পূর্বক ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া সম্মুখে কোনো নিবিড় কানন দৃষ্টি করিলে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ কবিয়া যদি কেবল কতকগুলিন নিষ্ফল বৃক্ষ এবং শুষ্ক অথবা পঙ্ক পূরিত সবোবর দেখা যায, তবে কি প্রকাব নিরাশ হইতে হয়! তদ্রূপ কোনো গ্রামবাসী স্বদেশেব হিতৈষী বিজ্ঞ ও সুচরিত্র ব্যক্তি সমুদয় পল্লীগ্রামের বিষম দুরবস্থা জন্য বিষণ্ণ হইয়া, কলিকাতার বাহ্য শোভা এবং তত্রস্থ লোকের নানা হিতজনক বিষয়ে মৌখিক আন্দোলন অবগতি পূবক অতিশয় আনন্দিত হয়েন, কিন্তু তাহাবদিগের আচার, ব্যবহার, চবিত্র বিষযে যত নিগূঢ় রূপে অনুসন্ধান করেন, ক্রমশ ততই ক্ষুব্ধ হইতে থাকেন। বৃদ্ধ যুবা বালক, ধনী মধ্যবর্তী দবিদ্র, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন না।

এইক্ষণকার প্রাচীন লোক এবং প্রাচীনদিগের সম্পূর্ণ মতানুগামী যাঁহারা,—বিষয়োপযোগী হস্তলিপি এবং কিঞ্চিৎ অংকপাত মাত্র যাঁহারদিগের বিদ্যার সীমা, এবং যাঁহারদিগের এই প্রত্যয় যে কেবল অর্থ উপার্জনই সমুদয় বিদ্যায় তাৎপর্য ও তাবৎ জীবের সুখ—স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহাবা চিন্তাই করেন না— 'দেশের উপকার' এ বাক্যের অর্থও তাঁহাদিগের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহারা কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন—এই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক পাদও অগ্রসর হয়েন না— সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধন সঞ্চয় করিযা তাহা পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্তে রক্ষা করিতে পাবিলেই আপনারদিগকে কৃতকার্য বোধ করেন। ইহার জন্যেই দিবা-রাত্রি ব্যতিব্যস্ত. এ কর্মেব সমাধা পরে যে কিঞ্চিৎকাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় অলীক আমোদেই ক্ষেপণ করেন। ইঁহারদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনারদিগকে ধার্মিক বলিয়া অভিমান কবেন, তাঁহাবা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় ধর্মের অনুষ্ঠান করেন। বিষয় সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ সম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহারদিগের ধর্ম প্রবৃত্তির প্রধান সূত্র; নতুবা প্রতিমা অর্চনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা প্রভৃতির জন্যেই বিশেষ মনোযোগী হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় অনেকে কেন করেন? বিশেষত তাঁহারদিগের উপাসনায় সাত্ত্বিকতার কি অপূর্ব চিহ্ন দেখা যায়, যাঁহারা আড়ম্বরের সহিত বিবিধ পূজার সামগ্রী সকল সম্মুখে রাখিয়া বিষয় ব্যাপার তাবৎ নিপুণ রূপে তৎকালে সমাধা করেন। এই সমুদয় মনুষ্যের ক্রোড়ে বাশিকৃত ধন স্থাপিত হইলেও তদ্দ্বারা স্বদেশের বিন্দুমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্প্রদায়

ভুক্ত দাতাও অনেকে আছেন, স্বীয় মণ্ডলী মধ্যে যশ উপার্জন করা তাঁহারদিগের প্রধান তাৎপর্য; অতএব বিবাহ ও দলাদলি প্রভৃতি কর্মে কেহ কেহ এককালে সহস্র সহস্র মুদ্রা অক্লেশে দান করেন। যিনি পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা একদিনে ব্যয় করিয়া থাকেন, তিনি সেই পুত্রের অধ্যয়ন হেতু মাসিক পাঁচ টাকাও প্রদান করিতে ক্লেশ বোধ করেন। ব্রাহ্মণদিগের অজ্ঞান প্রবাহ রক্ষার প্রধান হেতু ইহাঁরাই হইয়াছেন। দান বিষয়ে ইহাঁরা পাত্রাপাত্র বিচার করেন না; সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও যে কোনো ব্রাহ্মণ বিবিধ ধর্ম চিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকে ধার্মিক রূপে প্রকাশ করে, অথবা তাঁহারদিগের যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয় মন্ত্র সকল কেবল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই যথেষ্ট সমাদর পূর্বক ধন প্রদান করিয়া থাকেন, সে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাপন্ন কি না ইহা ভ্রান্তিতেও বিবেচনা করেন না। এই প্রকার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ দশাকর্মোপযোগী কতকগুলিন মন্ত্র অভ্যাস করিয়াই আপনারদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন;—কঠোর জ্ঞানাভ্যাসে আর কেন পরিশ্রম করিবেন? তথাপি ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের পূর্বাভিমানেই মগ্ন রহিয়াছেন—বিবেচনা করেন না যে ব্রাহ্মণ নামের উপযুক্ত তাঁহারদিগের আর কি পদার্থ আছে? অন্যকে ধর্মের উপদেশ দিবেন কি? আপনারা তাহার সম্যক বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন, এবং অজ্ঞান ও কুপ্রবৃত্তি প্রযুক্ত বিজ্ঞ সমাজে ক্রমাগত হতাদর হইতেছেন। ইহা কি ব্রাহ্মণদিগের সামান্য লজ্জার বিষয় যে, যে শূদ্রেরা পূর্বে তাঁহারদিগের আজ্ঞাকারী দাস ছিল, এইক্ষণে তাঁহারা সেই শূদ্রদিগের আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছেন—ধন সেবা জন্য তাঁহারদিগের সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া দম্ভ করেন, অনাহূত অনাদৃত, তিরস্কৃত হইলেও ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহারদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে, এবং ধনীদিগের উপাসনা আন্তরিক ধর্মানুষ্ঠান হইয়াছে। কি জানি তাঁহারা অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখেন, এনিমিত্তে কপালে দীর্ঘ রেখা, হস্তেতে কোষাপাত্র, এবং তদুপরি গঙ্গাস্নানের প্রত্যক্ষ চিহ্নস্বরূপ সিক্ত বস্ত্রখণ্ড পরিপাটি রূপে সংস্থাপন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্বাদ করত উপস্থিত হয়েন। অনেক মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কিঞ্চিৎ ধনপ্রাপ্ত হইলে দাতার মনোরম্য যে কোনো অভিপ্রায়, তাহাকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া প্রায়বক্ত্য করেন, এবং কত অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা স্বহস্তেও লিখিয়া প্রদান করেন। এবম্প্রকার অযোগ্য আচরণ প্রযুক্ত ক্রমে তাঁহারা সংসারে অধোগামী হইতেছেন, তদ্বিপরীতে অনেক শূদ্র জ্ঞান ও যোগ্যতা দ্বারা উচ্চপদে আরোহণ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহারদিগের অধিক অপমানের বিষয় আর কি আছে যে ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো কোনো সভা হইলে শূদ্রেরা তাহার অধিপতি হয়েন? কিন্তু কি আশ্চর্য যে তাঁহারা সেই সেই শূদ্র সভাপতির দলাক্রান্ত বলিয়া আপনারদিগকে সম্ভ্রান্ত জ্ঞান করেন, ও লোকের নিকটে মান্য হয়েন। আপনারদিগের বৃত্তি যে ধর্মপালন তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং ধর্ম কি জ্ঞান প্রচারে এককালে বিরত রহিয়াছেন। কিন্তু যদি কোনো পরোপকারী ব্যক্তি জ্ঞান প্রচার, ধর্ম সংস্থাপন প্রভৃতি হিত কার্যে অনুরক্ত হয়েন, তবে তদ্দ্বারা আপনারদিগের মান ও প্রভুত্বের হানি সম্ভাবনায় যাহাতে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয়, এমত দুষ্ট চেষ্টা প্রতিজ্ঞা পূর্বক করিতে থাকেন, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান

ও অন্য অন্য সাংসারিক দুঃখ প্রদান করিতে সযত্ন হয়েন। ইতর বিশেষ সাধারণের নিকটে প্রভুত্ব রক্ষা ও দম্ভ প্রকাশ জন্য যাঁহারা এতদ্রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারদিগের পাদপদ্মধ্যায়ী শিষ্যদিগের নিকটে ঈশ্বরতুল্য মর্যাদা পালনের নিমিত্তে তাঁহারা কি না করিয়া থাকেন? শিষ্য সমীপে নানা প্রকার ছদ্ম ব্যবহার দ্বারা আপনারদিগকে পরম পবিত্র ঋষি তুল্য দেখান। যাঁহার আমিষ ভোজন ব্যতীত এক সন্ধ্যা যাপন হয় না, এবং কুলটা সংসর্গ বিনাও এক রজনী ক্ষেপণ হয় না, শিষ্য গৃহে তিনি হবিষ্যাশী হইয়া অতি শুদ্ধ সত্ব রূপে অবস্থান করেন, এবং সংযম উপবাসাদি কঠিন কঠিন নিয়ম পালন-পূর্বক পরম তপস্বীর ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করেন। শিষ্যের বিত্তগ্রহণ জন্য গুরুদিগের এই প্রকার বিবিধ কৌশল, কিন্তু তাহার পরিত্রাণের উপায় বিষয়ে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কহেন যে প্রতিমাদি স্থূল ধ্যান দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের সোপান লাভ হইবেক। হা! একদিবস একবার মাত্র তাহার কর্ণকুহরে মন্ত্রধ্বনি প্রবিষ্ট করিয়া উপযুক্ত উপদেশ করিতে চিরকাল ক্ষান্ত থাকিলে সোপান সে কোথায় পাইবে যে তদ্দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিবেক? পরিত্রাণ দূরে থাকুক, অনেক শিষ্যের অধোগতির কারণ হয়েন। গোস্বামীরা কৃষ্ণমন্ত্রে বা রাধামন্ত্রে বা যুগলমন্ত্রে শিষ্যদিগকে দীক্ষিত করিয়া গোপাঙ্গনাদিগের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতিকে অহরহ আলোচনা করিতে অনুমতি করেন। ভণ্ড কথকদিগের সহায়তা দ্বারা শিষ্যেরাও সেই অনুমতি পালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না,— বরঞ্চ কোনো নিপুণ শিষ্য সেই রাস লীলাদির অনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শক্তিমন্ত্রের উপদেশক বামাচারীরাও অল্প অনর্থের কারণ নহেন। তাঁহারা প্রচুর মদ্য-মাংস ভোজনাদিকে উপাসনার অঙ্গরূপে উপদেশ করেন, চণ্ডালী প্রভৃতি স্ত্রী-সঙ্গকেও অতি গুহ্য পরমার্থ সাধনরূপে ব্যাখ্যা করেন, এবং কদাপি স্বয়ং চক্রমধ্যে ভৈরবী সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইয়া চক্রেশ্বর রূপে কারণ বলে ও মন্ত্র বলে চক্রীদিগকে অভিভূত করেন, যেখানে গলিত নরমাংস পর্যন্ত তাঁহারদিগের লোভ হইতে পরিত্রাণ পায় না।

এই সমুদয় প্রাচীন ব্যক্তিদিগের সন্তানেরা, যাহারা ইংলন্ডীয় ভাষায় বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহারদিগের বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হয়। প্রাচীনদিগের সহিত তাহারদিগের ধর্মাধর্ম বিষয়ে কিছু মাত্র ঐক্য হয় না। পিতা অতি যত্নপূর্বক স্বীয় গৃহে প্রতিমা অর্চনার আয়োজন করেন, পুত্র তাহাকে কাল্পনিক জানিয়া অবহেলা করেন। পিতা অন্যের সহিত অসংশ্রবে আহারাদি সমাধা করেন, পুত্র কোনো জাতি বিচার করেন না— ম্লেচ্ছেরও সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া পিতার মানসিক ক্লেশের কারণ হয়েন। এই প্রকার পরিবারের মনে ক্লেশ প্রদান মাত্র অনেকের বিদ্যা শিক্ষার ফল হইয়াছে। জ্ঞানানুসারে হিতকার্য করিতে কয় ব্যক্তি প্রবৃত্ত আছেন? যদিও তাঁহারা পুস্তক আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করিয়াছেন যে স্বদেশের উপকার করা মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য-কর্ম, কিন্তু উৎসাহের দৃঢ়তা অভাবে তাঁহারদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইতেছে না। তাঁহারা যত দিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তত দিন গাঢ় রূপে জ্ঞানের চর্চা করেন, দেশময় বিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা করেন, ধর্মাধর্ম নানা প্রস্তাব বিচার করেন, এবং উৎসাহের সহিত স্বদেশের উপকার-জনক অনেক বিষয় কল্পনা করিয়া থাকেন। হা! যে দিন তাঁহারা বিদ্যালয় হইতে

অবসর হয়েন, সেই দিবসাবধি তাঁহারদিগের বুদ্ধি, বিদ্যা, চরিত্র সমুদয় নতুন পথে ধাবিত হয়— পূর্বের উজ্জ্বল উৎসাহ ম্লান হয়, এবং স্বদেশের সুখ বাসনা অবসন্ন হয়। কতজন বিষয় কর্মে লিপ্ত হইয়া বিত্ত মোহে আচ্ছন্ন হয়েন এবং ধনোপার্জনেই সমুদয় যত্নকে সমর্পণ করেন; জ্ঞান ধর্ম কি স্বদেশের হিত-বাসনা আর তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ ইংলন্ডীয় সমাজে গণ্য হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের আচার, ব্যবহার, বেশ বিন্যাস, অঙ্গ ভঙ্গী পর্যন্ত শিক্ষা করেন, এবং তাহারদিগের অবিকল প্রতিমূর্তি হইতে চেষ্টা করেন। পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষকে কোনো অধোলোকের ন্যায় জ্ঞান করেন, তন্নিবাসি মনুষ্যদিগকে কোনো নীচ জাতি রূপে দৃষ্টি করেন, এবং তাহারদিগের রীতি, নীতি, ভাষা পর্যন্ত সমুদয়ের প্রতি পদে পদে হেয় বাক্য প্রয়োগ করেন। জ্ঞান ধর্মের উন্নতি তাঁহারদিগের দ্বারা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, যখন ইংলন্ডীয় লোকের প্রথা, পরিচ্ছদ, ব্যবহার প্রভৃতি প্রচলিত করা তাঁহারদিগের নিকটে দেশের সমুদয় মঙ্গল হইয়াছে? কতকব্যক্তি সাধারণ লোকের অনুগামী হইয়া পুনর্বার পৌত্তলিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন— সে ধর্মে বিশ্বাস না থাকিলেও কেবল আমোদ জন্য তাহাতে মুগ্ধ থাকেন। অনেকে মৌখিক যদিও জগৎ-কারণ এক পরমেশ্বরকে স্বীকার করেন, কিন্তু দিন মধ্যে একবার শ্রদ্ধা পূর্বক তাঁহার উপাসনা করেন না,— কেহ পরলোক অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিয়ম পালনেও যত্নবান্ হয়েন না। কতক ব্যক্তি কেবল মৌখিক বাগাড়ম্বর করিয়াই কাল হরণ করেন। তাঁহারা মনঃকল্পনাতে স্ত্রীদিগের নিমিত্তে কদাপি প্রকাশ্য পাঠশালা স্থাপন করিতেছেন, কদাপি বিধবার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছেন, কদাপি সমুদয় দেশ হইতে পৌত্তলিকতাকে এক দিবসে উচ্ছেদ করিতেছেন। তাঁহারা দেশের স্বরূপ অবস্থাকে আলোচনা করেন না— নিবিড় অন্ধকার-ময় পল্লীগ্রামকে স্মরণ করেন না— জ্ঞান ধর্মের যৎকিঞ্চিৎ আন্দোলন এই কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে দৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বিস্তীর্ণ ভারতভূমিকে একই দিবসে উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা মৌখিক যে প্রকার আন্দোলন করেন, তদনুসারে কি কার্য করিয়া থাকেন? সাধারণকে যে সকল কর্মে অনুরোধ করেন, আপনারদিগকে বিজ্ঞ জানিয়া তাহার ঈষদ্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনা করিতে কি অগ্রসর হয়েন? তাঁহারা প্রস্তাব রচনা মাত্র করিতে বিদ্যালয়ে যে অভ্যাস করিয়াছেন, তথা হইতে অবসর হইলেও সে বাল্য অভ্যাস তাঁহারদিগকে সম্যক পরিত্যাগ করে না। এ উদ্বোধন তাঁহারদিগের হয় না যে আলোচনা স্থল বিদ্যালয় হইতে এইক্ষণে কর্ম ভূমি সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যেখানে কর্ম-ব্যতীত অনর্থক বাগাড়ম্বরে কোনো ফল দর্শে না। শুভসূচক কর্মের মৌখিক আন্দোলন মাত্র যে ইহাঁরা করেন সেও মঙ্গলের চিহ্ন; ইহাঁরদিগের দ্বারা কালে দেশের উপকার যে হইতে পারে এমত আশাও আছে। কিন্তু তাঁহারদিগের কথা কি বলিব, যাঁহারা কেবল স্বয়ং নিরুৎসাহ থাকিয়াও তৃপ্ত হয়েন না, অন্য ব্যক্তিতে স্বদেশের হিতকার্যে চেষ্টিত দেখিলে তাঁহার প্রতি উপহাস করেন, এবং কত অযোগ্য বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করেন। ইহারদিগের এতদ্রূপ ব্যবহার নিতান্ত ক্লেশকর, কিন্তু যাহারা হতজ্ঞান হইয়া খ্রিস্টধর্মকে অবলম্বন করিয়াছে তাহারদিগের অত্যাচার অসহ্য; তাহারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশের শত্রু হইয়াছে— মাতৃগর্ভকে

বিদারণ করিতেছে। ইহারদিগের দ্বারাই ভারতভূমির দুর্ভাগ্যের সীমা হইল? অসাধারণ বিদ্যাভিমানী কতক যুবা ব্যক্তি বিকৃত বুদ্ধি হইয়া নাস্তিক হইতেছে; পুত্র হইয়া পিতাকে--- পিতার সত্তাকে অমান্য করিতেছে। তাহারা জগদীশ্বরকে গ্রাহ্য করে না, পরলোক তাহারদিগের বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না; ঐহিক সুখ সম্ভোগে বিমুগ্ধ রহিয়াছে।

এইরূপে এইক্ষণকার বিদ্বান্ নামে খ্যাত যাঁহারা, তাঁহারদিগের দ্বারা উপকার না হউক, অপকার নানা প্রকারে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশের আচার-ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডীয় লোকের দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করিতেই শিক্ষা করেন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারদিগের উত্তম ব্যবহার সকলকে গ্রহণ না করিয়া যদ্দ্বারা অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা এমত আচরণ সকলের অনুবর্তী হইতেই অভ্যাস করেন। সম্প্রতি মদিরাপানের দৃষ্টান্ত তাঁহারদিগের বিনাশের হেতু হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমত অল্প পরিমাণে এই ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, পরে লোভ সংবরণে অসমর্থ প্রযুক্ত ক্রমাগত উপভোগ দ্বারা তাহাতে প্রগাঢ় আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হতজ্ঞান হয়েন। মদিরাপানে যাহার আসক্তি, তাহার দ্বারা কোন দুষ্কর্মের অসম্ভাবনা হয়? শুভকর্মের প্রবৃত্তিই বা তাহার কি প্রকারে হইতে পারে? ব্যক্ত করিতে অশ্রুপাত হয় যে কলিকাতার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের কত সুশিক্ষিত ছাত্র এই মোহকারী দুষ্কর্মে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে ব্যভিচার প্রভৃতি কুব্যবহার দ্বারা মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ বিদ্বান্‌দিগের যখন এই প্রকার ব্যবহার, তখন তাহারদিগের দৃষ্টান্তে জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের চরিত্র কি পর্যন্ত ঘৃণিত না হইতে পারে? এই কলিকাতা মধ্যে স্থানে এমত সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্মে অজস্র লিপ্ত থাকে। তাহারদিগের ধর্মের নিয়ম নাই, কোনো কর্মেরও নিয়ম নাই; কখনও পৌত্তলিকের ন্যায়, কখনও ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায়, কদাপি নাস্তিকের ন্যায়ও ব্যবহার করিয়া থাকে। কদাপি দেব বিশেষের প্রতিমা সমীপে দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইতেছে, পুনর্বার পরিহাসচ্ছলে সেই দেবতার প্রতি অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কদাপি ইতরজাতিকে স্পর্শ করিয়া আপনারদিগকে অশুচি জ্ঞানে গঙ্গানীরে অবগাহন করিতেছে, তৎপরক্ষণেই সকল বর্ণের সহিত একত্র হইয়া একাকার রূপে পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে। মাদকদ্রব্য সেবন এবং লাম্পট্য ব্যবহার এই দলভুক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের সার কর্ম হইয়াছে।

বেশ্যাগমন পাপ এইক্ষণে কলিকাতা মধ্যে যে কি প্রকার বিস্তারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধনী, মধ্যবর্তী, অতি দীন পর্যন্ত এই দুষ্কর্মে এমত সাধারণ রূপে মগ্ন হইয়াছে যে অন্য অন্য কর্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পর কাহারও নিকটে কেহ বিশেষ গোপন করে না— আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জা বোধ করে না। এই নগর মধ্যে এমত পল্লী নাই যেখানে শত শত বেশ্যা একত্র বাস না করে, এবং তন্মধ্যে প্রায় এমত বেশ্যা নাই যাহার আলয়ে বহু লম্পট ব্যক্তিকে অহর্নিশি একত্র দেখা না যায়? সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত; কোনো স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কুত্রাপি কোনো বাবুর কদাচারের সাক্ষী-স্বরূপ অশ্বযান তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যাদ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে; কোনো কোনো বেশ্যার আলয় হইতে

মাদকোন্মত্ত সমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে, কুত্রাপি গণিকার অধিকার জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ, কলহ, সংগ্রামে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেছে। কুকর্ম দ্বারা চিত্তের বিকৃতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সম্ভব হয় যে আপনার রক্ষিতা গণিকালয়ে স্বীয় বালক পুত্রাদি তাঁহার সাক্ষাতে, বরঞ্চ তাঁহার অনুমতিক্রমে স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করে, এবং তথায় পরিপাটি রূপে লাম্পট্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া চিরজীবন পাপের বর্ত্মে ভ্রমণ করে। তাহারা জন্ম কালে দুশ্চরিত্র পিতার অসৎ স্বভাব সকলকে অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং জীবনকালে তাঁহার কুদৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া সংসারে মহা উপদ্রবের হেতু হয়। এবং পরম্পরানুসারে এই জঘন্য দুষ্কর্ম গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় বহমান হইতেছে, এবং ক্রমশ বিস্তারিত হইয়া পল্লীগ্রাম পর্যন্ত প্লাবিত করিতেছে।

এই দলভুক্ত ধনী সকল এই দুষ্কর্মের প্রসঙ্গ, আয়োজন, এবং উপভোগে সর্বদা মগ্ন থাকেন, এবং ইহার আনুষঙ্গিক অশ্বযানের শোভা, পরিচ্ছদের পারিপাট্য, ও বিহঙ্গ ক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয়সুখের নিমিত্তে অপরিমিত রূপে রাশি রাশি ধন ক্ষেপণ করেন— কেহ কেহ সকল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া নানা প্রকারে অপমানের আস্পদ হয়েন। ইহাঁরা কেবল স্বীয় অমঙ্গলের কারণ আপনারা হয়েন না, ইহাঁরদিগের পার্শ্ববর্তী আশ্রিত যুবকগণের বিষম দুরদৃষ্টের হেতু হয়েন। তাহারা বাবুর তুষ্টির নিমিত্তে তাঁহার সকল প্রিয় কুকর্মে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উল্লাসের সহিত যত্নবান্ হয়। এইরূপে অনেক নির্দোষী ব্যক্তি ধনী বাবুদিগের সংসর্গ দ্বারা দুষ্কর্মের আমোদে সুশিক্ষিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহারদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য একেবারে বিনষ্ট হয়।

যাহারদিগের কুকর্ম সম্পাদনের উপযোগী ধন নাই, অথচ বুদ্ধিবিদ্যার হীনতা প্রযুক্ত ন্যায় পূর্বক উপার্জন করিতে যাহারা ক্ষমতাবান্ নহে, তাহারা সামান্য কোনো বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া চৌর্য প্রবঞ্চনাকে ধনলাভের প্রধান উপায় রূপে স্থির করে। বেশ্যাগমন তুল্য কর্মস্থলে চৌর্য ব্যবহার এইক্ষণকার সাধারণ পাপ হইয়াছে, এবং অভ্যাস দ্বারা অনেকের চিত্ত এমত কঠিন হইয়াছে, যে এই কদাচারকে তাহারা কুকর্ম বলিয়া জ্ঞান করে না, এবং প্রভুর সকল সম্পত্তি হরণ করিতে পারিলেও তজ্জন্য আপনারদিগের দোষী বোধ করে না।

পুরুষদিগের এই প্রকার অত্যাচারে এবং দেশের নানা প্রকার কুপ্রথাতে এদেশীয় অবোধ স্ত্রী লোকেরা যেরূপ ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা স্মরণ করিলে রোদন করিতে হয়। তাহারা বিদ্যার উপদেশ অভাবে মনুষ্যের প্রধান সৌভাগ্য যে জ্ঞান সুখ, তাহার আস্বাদন হইতে সম্যক্ বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং কারারুদ্ধ প্রায় চিরজীবন নানা যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। যাহারা কাল্পনিক ধর্ম পৌত্তলিক উপাসনা হইতে বিরত হইয়া তাহার উচ্ছেদ জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা স্বীয়গৃহে ভার্যাদিগকে যখন তাহাতেই বিশেষরূপে মগ্ন দেখেন, এবং ভার্যারা যখন স্বীয় পতিদিগকে জ্ঞানধর্ম ও পানভোজনাদি সমুদয় বিষয়ে তাহারদিগের বিপরীত ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখে, তখন স্বামী-স্ত্রীতে সম্প্রীতির সম্ভাবনা কি? অনেক পুরুষ এপ্রকার দুরাচার যে ভার্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহারদিগের প্রবৃত্তিই হয় না মাসান্তেও একবার তাহারা অন্তঃপুরের সংবাদ গ্রহণ করে না। অনেকে উপপত্নীর বশীভূত

প্রযুক্ত কোপ-দৃষ্টি ব্যতীত একদিনের নিমিত্তে প্রণয় দৃষ্টিতে ভার্যার প্রতি অবলোকন করে না, এবং প্রায় অপ্রিয় ব্যতীত প্রিয় শব্দে তাহাকে সম্ভাষণ করে না। ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে কোনো কোনো পতির নিতান্ত নিদারুণ কুব্যবহার জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া কত স্ত্রী আত্মঘাতিনী পর্যন্ত হইয়াছে।

দুঃখের বর্ণনা আর শেষ হয় না। দেশস্থ লোক আপনারাই এই রূপে স্বীয় দুর্ভাগ্যের হেতু হইয়াছেন, তাহাতেও রাজা তাহার প্রতিকার জন্য সম্যক্ চেষ্টাবান্ না হইয়া রাজ্য মধ্যে কোনো কোনো কুকর্ম বৃদ্ধির প্রতি বরঞ্চ মুখ্য কারণ হইয়াছেন; মাদক দ্রব্য সেবন ও বেশ্যা গমন দুষ্কর্ম রাজার সম্যক্ আশ্রয় দ্বারা অত্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে। জগতের সমুদয় পদার্থ অপেক্ষা ধনের প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অধিক প্রীতি, এ নিমিত্তে দ্রব্যের কর, বাটির কর, ভূমির রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্তে তাঁহারা যে প্রকার সত্বর, প্রজার হিতজনক কোনো ব্যাপারে তদ্রূপ যত্নবান্ নহেন। আয় বৃদ্ধির সুকৌশল নিয়ম স্থাপন জন্য তাঁহারদিগকে কাহারও অনুরোধ করিতে হয় না, বরঞ্চ তাঁহারদিগের এই অতিরিক্ত ধনাকাঙ্ক্ষা জন্য যে প্রজাপীড়ন হইতেছে, ইহা সংবাদপত্র সম্পাদকেরা চিৎকার পূর্বক জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। পূর্বে এই স্বাধীন ভারতবর্ষস্থ ধর্মশীল রাজাদিগের শাসনানুসারে মদ্য ব্যবসায় বা মদ্য ব্যবহার এদেশে প্রায় ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকের অধিকার হওয়া অবধি তাঁহারদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় যে মদিরা তাহারা ব্যবসায় দেশময় প্রচলিত হইয়াছে, এবং তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তে এদেশস্থ লোক সকল অপরিমিত মদ্য পানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মাদক দ্রব্যের কর সংগ্রহ জন্য নিযুক্ত কর্মচারীরা অধিক ধনাগম করিতে পারিলেই রাজ পুরুষদিগের নিকটে প্রতিপন্ন হয়েন, এপ্রযুক্ত স্বীয় অধিকারে মদ্যাদির অধিক বিপণি স্থাপন দ্বারা অধিক কর সংগ্রহ জন্য তাঁহারদিগের একান্তত যত্ন হয়। ইহাতে মাদক দ্রব্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত এতন্নগরস্থ লোকেরা ধনে-প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে। অধুনা এই নগরে রাজশাসন অভাবে যেমন মদ্য পানের বাহুল্য হইতেছে, তদ্রূপ দিন দিন বেশ্যা শ্রেণীও বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্বকালে রাজ শাসনে নগর বা গ্রামের প্রান্ত ব্যতীত কদাপি তাহারা তন্মধ্যে বসতি করিতে সমর্থ হইত না; ইহার কতক দৃষ্টান্ত পল্লীগ্রামে অদ্যাপি রহিয়াছে। কিন্তু ইদানীং এই রাজধানীতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। লোক যখন স্বীয় বাটির চতুর্দিকে বেশ্যাদিগের হাব, ভাব, কটাক্ষ সর্বদা দেখিতে পায়, তখন সহজেই তাহারদিগের মন তাহাতে আসক্ত হয়। কেবল পুরুষেরা কুপথগামী হয় না, অনেক অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী কুদৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম হইতে প্রচ্যুতা হয়। আপনারা কারারুদ্ধ থাকিয়া বেশ্যাদিগকে যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনা দেখে, অনেকে যখন স্বীয় পতিকে তাহারদিগের প্রমোদে আসক্ত দেখিতে পায়, তখন সুখ ভ্রমে কুকর্মের লালসা তাহারদিগের চিত্তে প্রজ্বলিত হওয়া কি অসম্ভব? অবগতি হইয়াছে যে এইরূপে অনেক অবলা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গণিকাদিগের অনুগামিনী হইয়াছে। অতএব যতকাল রাজ পুরুষেরা মাদক সেবনের শাসন এবং বেশ্যাদিগের বসতির নিয়ম পরিবর্তন না করিবেন, ততকাল এদেশ সম্যক্রূপে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেক না।

যখন প্রাচীন লোক সকল দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষই করেন না; যখন

যুবকদিগের মধ্যে কেহ নাস্তিক, কেহ খ্রিস্টিয়ান, কেহ যথেচ্ছাচারী হইতেছে, কেহ বা নানা অলীক আমোদে ও অসৎকর্মে কালক্ষেপ করিতেছে; যখন ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধি বিদ্যা বিহীন হইয়া ক্রমশ অপদস্থ হইতেছেন; যখন দেশের অর্ধলোক স্ত্রী জাতি বিদ্যার আলোক বিরহে অন্ধ প্রায় মুগ্ধ রহিয়াছে, ও পতির কদাচারে অহোরাত্র বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; যখন এই নগরে রাজা সুরাপানাদি কুকর্মের উপযুক্ত শাসন না করিতেছেন; তখন এদেশের সুখ সৌভাগ্যের দিন যে কত দূরে রহিয়াছে, তাহার সীমা করা যায় না। অসংখ্য ব্যক্তির বিচিত্র রোগ কদাপি দুই এক দেশহিতৈষী মনুষ্যের দ্বারা শান্তি হইতে পারে না। তাঁহারা পরস্পর সাক্ষাৎ করিলে কেবল আক্ষেপের আলাপ করেন, অবশেষে ক্ষুব্ধ চিত্তে সজল নেত্রে পৃথক হয়েন।

ফলত হে স্বদেশের হিতৈষী প্রিয় বান্ধবগণ! নিরাশ হওয়া উচিত হয় না— ঐক্য পূর্বক উৎসাহের সহিত যত্ন কর, যত্ন করিলেই কালে মানস সিদ্ধ হইবেক। যদিও গ্রীষ্মের উত্তাপ এইক্ষণে অস্থির করিয়াছে, তথাপি বর্ষার আগমন অবশ্য হইবেক। যিনি তোমাদিগকে এই সাধু ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন— এই গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই এ ভার মোচন করিবেন।

হে পরমাত্মন্! আমারদিগের দেশীয় লোককে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ কর, এবং অধর্ম পঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়া সৎকর্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল কর, যাহাতে তাঁহারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরম ধর্ম তোমার উপাসনাতে অধিকারী হইয়া পরম সুখী হইতে পারেন।

☐ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, ১লা শ্রাবণ, ১৭৬৮ শক (১৮৪৬) ৩৬ সংখ্যা। *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড

বাল্যবিবাহের দোষ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা দান করিলে পিতা-মাতার গৌরীদানজন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়; দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম-বিবেচনা-পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

ইহাতে এ পর্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সংঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভব-গোচর আছে? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধিকৌশলে এমত কঠিনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোনো কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্ত পুরুষ পর্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।

ইহাতে যদিও কোনো সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপ লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশত আমরা চিরকাল বাল্যবিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখনও আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহকরণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাকচাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়-পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুত প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য তাহাও বাল্যপরিণয়প্রযুক্ত ক্ষয় পায়। ফলত অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমারদিগকে এ দুরবস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভদিনই বা কতকালের পর উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধ হয়, কখনও না কখনও এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবী শুভদিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদ্যপি সর্বদাই লিখন পঠন ও পর্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিরাকরণের কোনো সদুপায় স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত মৃত্তিকা খনন করিলে কতদিন বারি বিনির্গত না হইয়া রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সংঘর্ষণ করিলে কতক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পারে? এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কতদিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

আমরা অন্তঃকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বাল্যবিবাহের বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্বজীবেই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বিশ্বরূপের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনোরূপ অপ্রতিবন্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেতর রক্ষণাবেক্ষণপূর্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তিনিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষত মনুষ্য জাতীয়েরা এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।

জগৎসৃষ্টির কত কাল পরে মনুষ্যজাতির এই বিবাহসম্বন্ধের নিয়ম চলিত হইয়াছে, যদ্যপি তদ্বিশেষ নির্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, বর্তমান বিবাহনিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতা-মাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্তবিবাহকাল এবং

অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালে কন্যার ভাবী সুখদুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোনো সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র-পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, এক বার অন্যোন্য নয়নসংঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যা-পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখদুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।

অপ্রমত্ত শারীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগ্বর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীতশৈশব জায়া-পতিসম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক-জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অংক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবত শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যপ্রযুক্ত সংসারযাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সংঘটন হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতামাতা সবল ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানেরা কখনও সবল হইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না। যেমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য বীজ রোপন করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকালবপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসঙ্গতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবন্ত বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোনো কোনো বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদিকার্যে প্রবল

পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রোথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্বকালে প্রায় সর্বজাতিমধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, এই বিবাহচতুষ্টয় অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল, এবং এই সমুদায়প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জ্ঞাত আছি, তদ্দেশে অদ্যাপি প্রায় সর্বজাতিমধ্যে বরকন্যার অধিক বয়সে বিবাহকর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোনো অসঙ্গতি না থাকাতে তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ, পশ্চিমদেশীয়েরা যখন অন্যবিধ জীবিকার উপায় না পায়, তখনি রাজকীয় সৈন্যশ্রেণীতে ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকের দৌবারিকতাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্নাভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোনো সাহসের ও পরাক্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখনও বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমারদিগের অপেক্ষাও ভীরু এবং দুর্বলস্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। জানা গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও এতদ্দেশের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। এতএব পাশ্চাত্য লোকের সহিত আমারদিগের ও উৎকলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতাদৃশ গুরুতর ইতরবিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বাল্যপরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যের কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তদ্দেশীয়েরাই দুর্বল ও সাহসবিহীন হয়, এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে তদ্দেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অস্মদ্দেশীয় বালক-বালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশব কালে যেরূপ স্ব স্ব প্রসূতির অনুগত থাকে, পিতা বা অন্য গুরুজনের নিকটে তাদৃশ অনুগত হয় না। শিশুগণের নিকটে সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ অনুকূলরূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রীসমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষসমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃ-মুখ-চন্দ্রমণ্ডল হইতে সরস উপদেশসুধা স্বাদ করিতে পায়, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর

অনুরাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের হৃদয়ে জননীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকতাশক্তি থাকাতেই ইওরোপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভ্যলক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অস্মদ্দেশ হইতে বাল্যবিবাহের নিয়ম দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটিবে না। আমরা অবগত আছি, কোনো কোনো ভদ্র সন্তানেরা স্ব স্ব কন্যাসন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহাব পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অস্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেষণ ও অন্যান্য পরিচর্যার পরিপাটি শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী, কটাহ, দর্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একবারেই লোপ পাইয়া যায়। ফলত সেই কন্যাদিগের পিতা মাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহনিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতা-মাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা স্ত্রীজাতিব শিক্ষাদান বিষয়ে যেরূপ উদ্যোগ করিবেন, তদ্রূপ বাল্যবিবাহপ্রথার উচ্ছেদকরণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমত বিবাহঘটিত আমোদপ্রমোদে ও কেলিকৌতুকে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য কাল যে বাল্যকাল, তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দশ ভুবন শূন্যময় প্রতীত হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসৎ কর্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়, তাহাতেও নিতান্ত পরান্মুখতা না হইয়া, বরং বার বার প্রবৃত্তি জন্মিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বাস্তবিক সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও কতকগুলি অপোগণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা দুষ্ক্রিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আর ঐরূপ দুরবস্থাকালে পরম প্রীতির পাত্র পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয়। তখন কাজে কাজেই পিতৃসত্ত্বে তাঁহার অধীন, কখনও বা সহোদরদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখনও বা আত্মীয়বর্গের ভারস্বরূপ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে পদে অপমানিত হইয়া অতি কষ্টে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় করিতে হয়। অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগেব এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?

যদ্যপি কোনো ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্মদ্দেশে বাল্যপরিণয়প্রথা না থাকিলে বালক-বালিকাদিগের দুষ্কর্মাসক্ত হইবার সম্ভাবনা। এ কথায় আমরা একান্ত ঔদাস্য করিতে পারি না; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যার

সাহিত্য বিবেক

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অভিপ্রায় ভিন্ন কেহই বাক্য উচ্চারণ করেন না, এবং সেই বাক্য দুই প্রকার হইয়া থাকে; প্রথমত 'ব্যক্ত্যনুদ্দেশ্য-বাকা' অর্থাৎ মনোগত ভাব প্রকাশ করণার্থে আপনার প্রতি প্রোক্ত বাক্য; দ্বিতীয়, 'উদ্দেশ্য-বাক্য' অর্থাৎ কোনো এক বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের উদ্দেশে প্রোক্ত বাক্য; এবং যে শাস্ত্রে ঐ বাক্য-সকলের সুশৃঙ্খলায় প্রয়োগ বিষয়ক বিধি নিরূপণ করে তাহার নাম 'সাহিত্য', অর্থাৎ বাক্য বিষয়ক হিতকারী শাস্ত্র। রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য, পরস্পর অন্বিত সেই কাব্যকে সাহিত্য শব্দে বিধান করা যায়, পরন্তু, বোধহয়, সে কেবল তৎকাব্যের উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থে ঘটিয়া থাকিবেক।

ব্যক্ত্যনুদ্দেশ্য-বাক্য সম্বন্ধে কোনো নিয়মের আবশ্যক নাই, কারণ বক্তা নানাবিধ বিশৃঙ্খলায় বাক্য উচ্চারণ করিলেও আপনার বাক্য আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, এবং তাহা হইলেই বাক্য-তাৎপর্য সফল হইল; অন্যের তাহা বুঝিবার প্রয়োজন না থাকায় তদ্বিষয়ের নিময়করণে ফলাভাব।

উদ্দেশ্য-বাক্যে এক ব্যক্তি স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় অপরকে ব্যক্ত করে। তদ্বাক্যের পরস্পর ঐক্য ও মাধুর্যাদিগুণ থাকিলে যে অভিপ্রায়ে বাক্য প্রয়োগ করা যায় তৎসিদ্ধির সুলভতা হয়. সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়মের প্রয়োজন, এবং ঐ নিয়ম সাহিত্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। বাক্যের পরস্পর অর্থ ব্যুৎপাদন ব্যাকরণ শাস্ত্রে নিষ্পন্ন হয়; এবং আশু বিবেচনা করিতে হইলে বোধহয় বাক্যের প্রয়োজ্যতা ও অপ্রয়োজ্যতা বিষয়ে বক্তা আপনিই বিহিত বিবেচনা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নিয়মান্তরের আবশ্যক করে না। যথা ক্রোধ-প্রকাশ-করণ-সময়ে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি হইতে ক্রোধ-জ্ঞাপক-বাক্যই নির্গত হয়, কারুণ্য বাক্যের স্ফূর্তি কদাচ হয় না, তথা অন্যান্য-ভাব প্রকাশ-করণ-সময়েও তত্তদ্ভাবনা রূপ বাক্যেরই সম্ভাবনা। পরন্তু এই স্বাভাবিক রীতি কেবল মনোগত ভাব প্রকাশ সম্বন্ধেই ফলবতী হয়; রসোদ্দীপন-বিষয়ে পরম্পরা পরীক্ষায় যে সকল নিয়ম উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে তাহারই অনুশীলন করা আবশ্যক; বিশেষত কাব্যাদি রচনা সময়ে, যখন অন্তঃকরণে যে সকল রস স্তব্ধীভূত থাকে তাহারই বর্ণনা করিতে হয়, তখন তদ্রসোদ্বোধ-বিষয়ক নিয়ম জানিবার অত্যন্ত প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে, আর এতদজন্য কেবল যে নিয়মেরই আবশ্যক এমত নহে; কিন্তু নিয়ম করিবার হেতু এবং ঐ রসের প্রকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান করাও কর্তব্য; নচেৎ উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা হইতে পারে না।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অভিপ্রায় ভিন্ন কেহ বাক্য উচ্চারণ করেন না। সেই অভিপ্রায় ভেদে উদ্দেশ্য বাক্য তিনপ্রকার হইয়া থাকে; যথা; ১, বুদ্ধ্যুদ্দীপক, অর্থাৎ যে বাক্যে তর্ক করা যায় বা অজ্ঞানি-ব্যক্তির মনে জ্ঞানালোক প্রদান করা যায়; ২, রসোদ্দীপক, অর্থাৎ যদ্দ্বারা শ্রোতার মনে করুণাদি-রসের উদ্দীপন হয় এবং ৩, মনোব্যবর্তক, অর্থাৎ যে বাক্য দ্বারা শ্রোতার মনকে এক পথ হইতে অন্য পথে আনয়ন করা যায়, যথা ক্রোধকে স্নিগ্ধ বাক্যে শান্ত করা ইত্যাদি। ঐ অভিপ্রায়-ভেদে বাক্য-রচনার পদ্ধতি বিভিন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহার অন্যথা করিলে ফলের হানি হয়। যে পদ্ধতিতে রসোদ্দীপক বাক্য রচনা করা যায়, তদনুসারে বুদ্ধ্যুদ্দীপক প্রস্তাব লিখিলে কদাপি তুল্য ফল সম্ভবে না। রসোদ্দীপক রচনায় যমক, অনুপ্রাস, রূপকাদি নানাবিধ অলংকারের ব্যবহার প্রয়োজনীয়। বুদ্ধ্যুদ্দীপক বাক্যে তাহার প্রয়োগ আপাতত ভ্রমের সম্ভাবনা, প্রকৃত প্রস্তাবের কোনো উপকারই হয় না; বিশেষত অংক শাস্ত্রের উপদেশ সময়ে অলংকার নিতান্ত নিষিদ্ধ। ২, ৩, ৫, ৭ ও ৯-য়ে ২৬ সংখ্যা হয়, ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে, দুই এবং তিনে পাঁচ, পাঁচ এবং পাঁচে দশ এবং দশ ও সাতে সতেরো এবং সতেরো ও নয়ে ২৬, এই প্রকার বলিলেই বক্তার অভিপ্রায় সর্বতোভাবে সুব্যক্ত হয়; তদন্যথায় যমক অনুপ্রাস বা রূপকে কদাপি সুলভে ইষ্ট-সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধ্যুদ্দীপক রচনায় অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র ও অংকশাস্ত্র এবং উপদেশ-বিষয়ক রচনায় অলংকার পরিহরণ-পূর্বক যাহাতে অভিপ্রায়ের স্পষ্টতা বোধগম্য হয় তাহাই কর্তব্য। পরন্তু এ কথা বলায় আমাদিগের এমত অভিপ্রায় নহে যে, অন্যত্র অভিপ্রায় স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই। প্রত্যুত সর্বত্রই স্পষ্টতার আবশ্যক। রচনা সম্বন্ধে ইহা এক অত্যুৎকৃষ্ট গুণ রূপে গণ্য। এই গুণ-বিরহে কোনো রচনাই সমাদরণীয়া হইতে পারে না, এবং এই গুণ-প্রাপ্তির নিমিত্তে লেখক মাত্রেরই নিয়ত চেষ্টা করাই বিধেয়। আমাদিগের পূর্বোক্ত বাক্যের এই মাত্র তাৎপর্য যে, অংকশাস্ত্রে অলংকার নিরপেক্ষ শুদ্ধ স্পষ্ট বাক্যেরই অত্যন্তাবশ্যক। এতদ্রূপ স্পষ্টতা বিচারালয় সম্পর্কীয় কাগজপত্রেও বিশেষ প্রয়োজনীয়। তথায়ও অলংকার সার্থক হয় না; প্রত্যুত তাহাতে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। এতদ্বিষয়ে মিতাক্ষরাকার লেখেন '[আবেদন পত্র] বিরূপ, ব্যর্থ, বিরুদ্ধার্থক অধিক শব্দান্বিত না হইয়া স্বল্পাক্ষর স্বল্প অথচ কোমল শব্দে বহু-মর্মাবধারক হইবেক'; এবং ইদানীন্তন বিচারালয়ের কর্মচারীরা এতদ্রূপ আবেদন-পত্র রচনায় সম্যকরূপে অপটু হওয়াতেই অধুনা আবেদন পত্রৈক-পার্শ্বে সংক্ষেপে তন্মর্মলিখনের প্রথা হইয়াছে। অপর অংকশাস্ত্র ও বিধিনিরূপকবাক্য ব্যতীত অন্যপ্রকার বুদ্ধ্যুদ্দীপক রচনায় সাবধানে বিবেচনাপূর্বক উপমাদি সামান্যালংকার ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই, পরন্তু রূপকাদি প্রদীপ্ত অলংকার কদাপি প্রয়োগযোগ্য হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার রচনার নাম রসোদ্দীপক। ইহার অভিপ্রায় শ্রোতার মনোমধ্যে করুণাদিরসের উদ্দীপন করত আনন্দ প্রদান করা। এবং তদর্থে কোনো রসাত্মক বাক্যকে উপযুক্ত অলংকারে ভূষিত করিয়া মনের সহিত সন্দর্শন করাইতে হয়। এতদ্রূপ রচনার প্রধান দৃষ্টান্তস্থান কবিতা। তাহাতে অলংকার মাত্রেরই প্রচুর রূপে ব্যবহার আছে; ফলত কবিতা ও রসাত্মক গল্পই অলংকারের উপযুক্তাধার; অপিতু মনোব্যবর্তক বাক্যেও

অলংকার নিষিদ্ধ নহে।

যে বাক্যে কোনো ব্যক্তির মনকে এক পন্থা হইতে ফিরাইয়া অন্যপথে আনয়ন করা যায় তাহার নাম 'মনোব্যবর্তক বাক্য'; এবং জনসমাজে বক্তৃতাই ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল। ইহা পূর্বোক্ত রচনাদ্বয় অপেক্ষা কঠিন। পূর্বোক্ত রচনাদ্বয়ে এক এক মাত্র অভিপ্রায়। বুদ্ধ্যুদ্দীপক বাক্যে ন্যায় ও স্পষ্টতা রক্ষা করিলেই ইষ্টাপত্তি হয়; এবং রসোদ্দীপক বাক্যে মনের সন্তোষই উদ্দেশ্য, ও তাহা জন্মানোই মুখ্য কল্প। মনোব্যবর্তক বাক্যের অভিপ্রায় দুই; প্রথমত কোনো পদার্থকে সপ্রমাণ করা, এবং দ্বিতীয়ত তদ্বিষয়ে শ্রোতার মনকে রত করানো; সুতরাং ইহাতে ন্যায় ও স্পষ্টতা ও রসোদ্দীপন— এতৎ সকলের ঐক্য ভিন্ন কদাপি ইষ্ট-সিদ্ধি সম্ভবে না; এবং যে সকল বক্তৃতায় এই সকলগুণের উত্তম সম্মিলন হয় তাহাই অত্যন্ত সমাদরণীয়া ও ফলবতী হইয়া থাকে।

যে প্রকার অভিপ্রায় ভেদে রচনার ত্রৈবিধ্য নিরূপিত হইল, অলংকারের প্রাচুর্যাদি ভেদেও রচনা ত্রিবিধ হইয়া থাকে; তদ্যথা; সাধারণী, বৃত্তগন্ধিনী ও উৎকলিকা। পরন্তু এতদ্বিষয়ে এই ক্ষণে আমাদিগের মনোনিবেশ করিতে প্রবৃত্তি নাই। আদৌ রচনার অঙ্গ সম্বন্ধীয় দোষ-গুণ বিচার্য; পরে অলংকারের লক্ষণ করা কর্তব্য, এবং এই উভয়ের বিশেষ বোধ হইলে, রচনা প্রণালীর বিচার অনায়াসেই সাধ্য হইবেক।

পদ, পদাংশ, বাক্য, অর্থ এবং রস—এই পঞ্চ রচনার অঙ্গ; অলংকার অলংকার মাত্র; এবং ইহাদিগের প্রত্যেকেতে দোষের সম্ভাবনা আছে। সাহিত্যশাস্ত্রকেরা পদগত দোষকে চতুর্দশ প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন; তদ্যথা ১. দুঃশ্রাব্য, অর্থাৎ শ্রবণে কটু; ২. অশ্লীলতা, অর্থাৎ লজ্জাদিজনক ভাষা বিশিষ্ট; ৩. চ্যুত-সংস্কৃতিত্ব, অর্থাৎ ব্যাকরণ অশুদ্ধ পদের প্রয়োগ; ৪. অপ্রযুক্ততা, অর্থাৎ যে পদ শুদ্ধ হইলেও সল্লেখকেরা ব্যবহার করেন না তাহার প্রয়োগ; ৫. গ্রাম্যত্ব, অর্থাৎ গ্রাম্য বাক্যের প্রয়োগ; ৬. অপ্রতীতত্ব, অর্থাৎ যে পদের কোনো একমাত্র শাস্ত্রে ব্যবহার আছে তাহার প্রয়োগ; ৭. সন্দিগ্ধতা, অর্থাৎ যে পদের প্রয়োগে দুই অর্থের সন্দেহ জন্মে; ৮. নিহিতার্থতা অর্থাৎ লক্ষণদ্বারা যে বাক্যের প্রয়োজন নাই, কেবল পাদপূরণের নিমিত্তে অপ্রসিদ্ধ অর্থে নিষ্পাদ্য পদ; ৯. নিরর্থকতা, অর্থাৎ যে বাক্যের প্রয়োজন নাই কেবল পাদপূরণের নিমিত্ত তাহার প্রয়োগ; ১০. নেয়ার্থতা, অর্থাৎ যে পদের যে অর্থ তদ্ভিন্ন অন্য অর্থে বা গৌণার্থে তাহার প্রয়োগ; ১১. অবাচকতা, অর্থাৎ যে অর্থের নিমিত্ত পদ প্রয়োগ করা যায় তদ্দ্বারা তদর্থের বোধ হয় না এমত পদের প্রয়োগ; ১২. ক্লিষ্টতা অর্থাৎ অত্যন্ত বুদ্ধিশ্রম-দ্বারা যে শব্দার্থের বোধ তাহার প্রয়োগ। ১৩. বিরুদ্ধমতিকারিতা, অর্থাৎ একার্থে প্রযুক্ত শব্দের বিরুদ্ধরূপ অর্থের বোধক বাক্যের প্রয়োগ; ১৪. অসমর্থতা অর্থাৎ যে-পদে লেখকের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত করে না তাহার প্রয়োগ।

□ *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, ভাদ্র ১৭৭৪ শকাব্দ, (১৮৫২), ১ম খণ্ড, ১১ সংখ্যা

কর্তব্যনির্ণয় — নেতৃ প্রতীক্ষা

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

উদ্ভাবন অপেক্ষা অনুকরণ সহজ। কিন্তু অনুকরণ কার্যত সহজ হইলেও উহাতে ভ্রম এবং হানি অধিক হইতে পারে। উদ্ভাবন সহজে হয় না; কিন্তু যদি হয় তবে একেবারে দেশকালপাত্রের উপযোগী হইয়াই হয়। অনুকরণে ঐরূপ উপযোগিতার রক্ষা বিশেষ চেষ্টাসাধ্য। যে অনুকরণে সম্যক্ উপযোগিতার রক্ষা হয়, তাদৃশ অনুকরণ উদ্ভাবন হইতে বড় নিকৃষ্ট বস্তু নহে। প্রত্যুত অনেকানেক উদ্ভাবনের উদাহরণই ঐরূপ অনুকরণের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু তাহা হইলেও অনুকরণে এবং উদ্ভাবনে মূলতই ভেদ আছে। অনুকরণ বাহ্য, উদ্ভাবন আভ্যন্তরিক। অনুকরণে ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য উদ্ভাবনে একত্ব এবং তদাত্মা। এইজন্য যিনি অনুকরণ করিতে পারেন, তিনি প্রায়ই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়েন না। এইজন্যই বোধ হয়, ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির ন্যূনতা। আমাদের বর্তমান নেতা ইংরেজও আমাদিগকে তাঁহার নিজের অনুকরণের শিক্ষা ভিন্ন আর কোনো শিক্ষাই দিতে পারেন না। ইংরেজের অবস্থা, স্বভাব এবং চিত্তবৃত্তি এরূপ নয় যে, তিনি আমাদিগের জন্য এবং আমাদিগের হইয়া আমাদিগের প্রকৃত গন্তব্য পথ আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত করিতে শক্ত হইতে পারেন। ভারতবর্ষে এ-পর্যন্ত এমন একটি আইন, কার্যবিধি অথবা ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই, যাহা ইংলন্ডের অনুকরণসঞ্জাত নহে।

ইংরেজের স্থানে অনুকরণ করিবার অনেকানেক বিষয় ভারতবাসী আপনার সম্মুখেই পাইতেছেন। এখন ইংরেজ নানা প্রকারেই তাঁহার আদর্শস্থানীয়। অর্থসাধন করিবার নিমিত্ত যে যে গুণের প্রয়োজন, ইংরেজের শরীরে সে সমস্ত গুণ মূর্তিমান হইয়া আছে। ইংরেজের উচ্চাভিলাষ আছে, স্বাবলম্বন আছে, অধ্যবসায় আছে, ইন্দ্রিয়দমন আছে, গাম্ভীর্য আছে, এবং সম্মিলনশক্তি আছে। সম্মিলনশক্তিটিতে অনেকানেক উচ্চতম সদ্‌গুণেরই সত্তা বুঝায়। ইহাতে মনের সংযম বুঝায়, স্থিরতর সহানুভূতি বুঝায়, বশ্যতা বুঝায়, সত্যনিষ্ঠা বুঝায়। ভারতবাসীর সম্মিলনশক্তি ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ঐ শক্তিটিকে অধিকার করিবার জন্য বিশেষ তপস্যার প্রয়োজন। যদি সম্মিলনপ্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয় ভাবের পরিবর্ধন অতি অল্পায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। বস্তুত জাতীয় ভাব সম্মিলন-প্রবণতারই নামান্তর অথবা পরিপাক।

আমরা সম্মিলন-প্রবণতা ইংরেজের উপদেশ হইতে যদিও না পাই, তাঁহার প্রকৃত

অনুকরণে কতকটা শিখিলেও শিখিতে পারি। ভারতবাসীর যত প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিই সম্মিলনপ্রবণতার ন্যূনতা হইতে সম্ভূত। ভারতবাসী রত্নপ্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়াও দরিদ্র। ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়াও উদরান্নে বঞ্চিত। ভারতবাসী বুদ্ধিমান হইয়াও অন্যের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় স্বল্প হইলেও তিনি ভীরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল, সম্মিলনে অক্ষমতা।

এই অক্ষমতার দূরীকরণ আমাদের বর্তমান নেতা ইংরেজের সাক্ষাৎ চেষ্টায় কদাপি পূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ হইবার নহে। কোনো স্বদেশীয় মহাপুরুষ কর্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ দূর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার কোনো পথ আছে কি না ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়োজন। তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় যে, তৎসম্বন্ধে আমাদের অবশ্যকরণীয় দুইটি। একটি এই যে, যখন কোনো শুভকার্য সাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই তাদৃশ কার্য সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। ৺জগন্নাথ দেবের রথ-রজ্জুতে অনেকের সহিত এক মন হইয়া হাত দিতে হয়, নচেৎ রথ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই— আপনার প্রতিবাসী হউন বা পরিচিত হউন বা শ্রুতনামা যে কোনো স্বজাতীয় ব্যক্তি হউন, যাঁহাকে সম্মানার্হ দেখিতে পাও, তাঁহাকেই সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। আমরা জাতিতে হিন্দু, আমরা স্বহস্তে মাটি তুলিয়া বাছিয়া ছানিয়া প্রতিমা নির্মাণ করিয়া সেই প্রতিমার পূজা করিতে এবং তাঁহার স্থানে বর প্রার্থনা করিতে জানি। অতএব প্রকৃতিস্থ থাকিলে আমরা ছোটকেও বড় করিয়া লইতে পারি। বড় দেখিবার এবং বড় করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড়লোক জন্মিয়া যাইতে পারেন। যে দেশে অসূয়ার আধিক্য সে দেশে প্রকৃত বড়লোক জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অসূয়া-দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবাসী স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও বড়লোক বলিয়া জানিতে চাহেন না; তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে ছ-কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন-কড়ে ছ-কড়ে দেখিতে চাই, অতএব ন কড়ে ছ কড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের সম্যক্ পরিহার না হইলে দেশে বড়লোকের আবির্ভাব হইবে না। ফলত অনুবর্তী লোক থাকে বলিয়াই বড়লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, স্বজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্তন না করা ইহাই আমাদিগের মর্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত। যখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে তখনই আমরা স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের গুণগরিমা দেখিতে পাইব এবং তখন আর অর্থপিশাচ, লঘুচিত্ত, অনুদারপ্রকৃতিক বৈদেশিকদিগকেই সর্বগুণাধার বলিয়া মনে করিব না। তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য দেশীয় পূর্বাচার্যগণের অপমান, দেশীয় রীতিনীতির প্রতি ঘৃণা এবং স্বজাতীয় লোকের কুৎসাপ্রচার করিব না।

ভারতভূমি সত্যসত্যই রত্নপ্রসবা। এখানে প্রকৃত বড়লোকের অঙ্কুর নিয়তই উদগত হয়। তাহা না হইলে এত শত শত নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে কেন? যাঁহারা ছোটখাট যেরূপ হউক এক একটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কিছু না কিছু মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে।

তবে কি যে-কেহ সংস্কারক নামধারী হইবে তাহারই অনুবর্তনে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়? তাহাও নহে। কিন্তু বরং তাহাও ভালো, তথাপি কেহ কোনো উদ্ভাবনী শক্তির লেশমাত্র প্রদর্শন করিলেই তাঁহার প্রতি অসূয়াবান্ হওয়া ভালো নয়। পরন্তু যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটি লক্ষণ যেন পূর্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়।

১. তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি-প্রয়াসী হইবেন। ২. তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী-ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। ৩. তিনি পূর্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্বাচার্যদিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। ৪. তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। ৫. তিনি সূর্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্বোদিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মিজালে বিলীন কবিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরই সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্নমাত্র পাইলেই ভগবদ্‌বাক্যের স্মরণ করিবে—

"যদ্‌যদ্-বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবং॥"

[যাহাতে প্রভা, শ্রী ও তেজঃ দেখিবে তাহাই আমার তেজেব অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।]

অতএব পূর্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাসমাত্র যাঁহাতে পাইবে তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোকে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলেই দেশ মধ্যে যদি প্রকৃত বড়লোক কেহ জন্মগ্রহণ কবিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও আবির্ভাবের সময় নিকটতর হইয়া আসিবে।

আমার বোধ হয় যে, ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে এখন এমন একটি আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ, অবস্থার উৎকর্ষসাধন, মনের সংশয়চ্ছেদন, এবং হৃদয়ের ক্ষোভশান্তন করিবার জন্য স্বজাতি মধ্যে একজন' নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যই হইবে। সেই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়া আবশ্যক। কারণ ভগবদ্‌বাক্য আছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

[হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের উদয় হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি।]

ঐ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে ভারতবাসীর কার্যকলাপ, ব্যবহারপ্রণালী, এবং মনের ভাব তদুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করিবে।

নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু কোথায় হইবে, কখন হইবে, তাহার কোনো অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব সেই ঘটনা তাঁহার নিজের ঘরেই হইতে পারে, প্রতি ব্যক্তিকেই এরূপ মনে করিতে হয় এবং তাহা মনে করিয়া আপনার গৃহকে সর্বতোভাবে সেই আবির্ভাবোন্মুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে হয়। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মাৎসর্য প্রভৃতি কুৎসিত এবং নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিজ নিজ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। আপনাপন সন্তানাদি সম্বন্ধে সকলকে ইহাও মনে করিতে হয় যে, আমাদের এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটিই সেই মহাপুরুষ হইতে পারেন। ইহা হইতেই আমাদের জন্মভূমি যশের মালা ধারণ করিতে পারেন, ইহা হইতেই পৃথিবীতে ধর্মধনের সংবর্ধন হইয়া মানুষ বিমুক্ত-পাপাচার এবং অভূতপূর্ব পুণ্যধনে ধনী হইয়া উঠিতে পারে। কোনো একটি মনুষ্যশিশুর ভাবী অবস্থা এবং ক্ষমতা কি হইতে পারে, বা কি হইতে পারে না, তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিতে সমর্থ? মনোমধ্যে নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশা এইরূপ স্থিরতর এবং ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রাখিয়া আপনারা পবিত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টাবান হইলে এবং শিশু ও যুবাদিগের সুশিক্ষার প্রতি নির্দিষ্টরূপে নিরন্তর যত্ন করিলে সকল লোকেরই মন উন্নত হইয়া উঠিবে। অনেকানেক সুবোধ লোকের হৃদয় তাদৃশ উন্নত, পবিত্র এবং একাগ্র হওয়াতেও নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্যতর হেতু উপস্থিত হইবে। একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোনো দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয় সেইরূপ হৃদয়বান্ ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকা দেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্ন দ্রোণিদেশ হইতে উঠে নাই। অতএব দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্তমানের কর্তব্য। শিক্ষাকার্য ও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপি-কুশলতা, উদারতা এবং ওজস্বিতা বর্ধনচেষ্টার সহিত স্বজাতিবাৎসল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রে একটি দশম অবতারের কথা আছে। উহার নাম কল্কি। তিনি সম্ভলগ্রামে, বিষ্ণুযশার ঔরসে, সুমতির গর্ভে জন্ম লইয়া শাণিত কৃপাণ হস্তে অশ্বারূঢ় পুরুষাকারে দৃষ্ট হইবেন। কোনো শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এই শাস্ত্রোক্তির যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে পূর্বোল্লিখিত সমস্ত কথাই সমর্থিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। তিনি বলেন—

'সম্ভলগ্রামের'[১] অর্থ 'নিশ্চয়াত্মক-চিত্তসমূহ', 'বিষ্ণুযশা'র[২] অর্থ 'ব্যাপক-আজ্ঞা', 'সুমতি'র[৩] অর্থ 'সাধুবুদ্ধি' এবং 'কল্কি'র[৪] অর্থ 'কলহ-নাশক'। অর্থাৎ লোকের হৃদয় নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠিলে (কিসে ভালো তাহা ঠিক করিয়া বুঝিলে) এবং লোকসমষ্টির সেই শুভ সাধনের নিমিত্ত আদেশ বা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইলে, সুবুদ্ধি হইতে কলহনিবারণ-দেবের আবির্ভাব হইবে। অতএব সকল ভারতবাসীর হৃদয়ই সম্ভলগ্রাম, সমস্ত ভারতসমাজই বিষ্ণুযশা, সকল ব্যক্তিই সুমতি স্থানীয়, এবং ভারতবাসীর পরস্পর বিবাদ বা গৃহ-বিচ্ছেদ নিবারণ করাই দশম অবতারের কার্য। কল্কিদেব যে অসিধারণ করিবেন সেটি জ্ঞানবিজ্ঞানময় অসি—অজ্ঞাননাশক এবং সম্মিলনসাধক। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিবেন তাহা জগৎ বা ভারতবর্ষ স্বরূপ মহা অশ্ব।

যদি দশম অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য এইরূপ হয় তাহা হইলে কোনো সময়ে ইহুদি জাতীয়দিগের অবতার (মেসাইয়া) লইয়া ঐ জাতীয় লোকের যে প্রকার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আমাদেরও ভাবী অবতার কল্কি সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকদিগের মধ্যে সেই প্রকার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে, বলা যাইতে পারে। ইহুদিরা তাহাদিগের ভাবী অবতারকে যুদ্ধবীররূপেই ভাবিত, এখানেও কল্কিকে সেইরূপ যুদ্ধবীর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু কল্কিদেব আয়সকৃপাণ-হস্ত সামান্য অশ্বারোহী পুরুষ না হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অসিধারী, অন্তর্বিচ্ছেদ-বিনাশকারী, সম্মিলনসাধক, ভারতাধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম হওয়াই সম্ভবপর।

১. সম্ভলগ্রাম শব্দের বুৎপত্তি— 'ভল' ধাতু নিরূপণার্থ, অচ্ প্রত্যয দ্বারা সিদ্ধ, সম্ভল অর্থে সম্যক্ প্রকাবে নিরূপিত বা নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চযাত্মক চিত্ত; গ্রাম অর্থে সমূহ, অতএব সম্ভলগ্রাম— নিশ্চযাত্মক চিত্ত সমূহ।

২ বিষ্ণুযশা— বিষ্ণু অর্থে ব্যাপক, যশস্ শব্দেব অর্থে আজ্ঞা বা সভা, অতএব বিষ্ণুযশা— ব্যাপক-আজ্ঞা।

৩ সুমতি— সুন্দর বুদ্ধি।

৪. কল্কি— কলি অর্থে কলহ বা পাপ (কলহাৎ কলিরুৎপন্নো যেন ধর্ম্মং বিনশ্যতি), কলি হইতে কণ্ প্রত্যয দ্বারা সিদ্ধ কল্ক শব্দ, কল্কের অর্থাৎ পাপের বা কলহেব নাশ কবেন এই অর্থে ই-প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ কল্কি-- কলহ বা পাপনাশক। কল্কিপুবাণেই কথিত আছে "কল্কিং কল্ক-বিনাশার্থম্ আবির্ভূতং বিদুর্বুধাঃ।"

□ *সামাজিক প্রবন্ধ*, ১৮৯২

বসন্তকূজন

রাজনারায়ণ বসু

অদ্য আমরা এই সুরম্য কালে, এই সুরম্য স্থানে, ঈশ্বরোপাসনার্থে সমাগত হইয়া কি অনুপম আনন্দ লাভ করিতেছি! কি মনোহর কাল উপস্থিত হইয়াছে! এই ক্ষুদ্র গিরিস্থিত বৃক্ষ সকল নব পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চতুর্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, বিহঙ্গগণ বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া সংগীতসুধা বর্ষণ করিতেছে, বসন্ত সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া হৃদয় মধ্যে অনেক কাল অননুভূত আশ্চর্য আহ্লাদরসের সঞ্চার করিতেছে। বসন্ত ঋতু-কুলের অধিপতি; এই ঋতু-কুলের অধিপতির আধিপত্য কালে মনের অধিপতিকে মনোমন্দিরে প্রীতিরূপ পবিত্র পুষ্প দ্বারা উপাসনা করিতেছি, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? বসন্ত সকল ঋতুর প্রধান, বসন্ত অতি সুখের সময়, অতএব আপনারা সকলে একবার মনের সহিত বসন্তের প্রেরয়িতাকে ধন্যবাদ করুন। আমরা এই সামান্য সুরম্য স্থানে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া এই রূপ আনন্দ লাভ করিতেছি, কিন্তু যাঁহারা সমুদ্রে অথবা মহোচ্চ পর্বত-শিখরে, ইহা অপেক্ষা সুরম্য স্থানে ঈশ্বরারাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি ভাগ্যবান্! কিন্তু আমি কি বলিতেছি! ঈশ্বর কি কেবল সুরম্য স্থানেই বর্তমান আছেন,— অন্য স্থানে কি তিনি বর্তমান নাই? কেবল বসন্ত ঋতুই কি তাঁহার মঙ্গলময় ভাব প্রচার করিতেছে, অন্য ঋতু কি সে ভাব সমান পরিমাণে প্রচার করে না? যে মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়ে সকল স্থানে সকল কালে এই সুরম্য স্থানের সন্নিহিত স্রোতস্বতীর সুনির্মল সুস্নিগ্ধ প্রবাহের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়, তিনিই ধন্য। অনেকে এই স্থানে আসিয়া অলীক আমোদে দিবস যাপন করেন, কিন্তু অদ্য এই স্থানের যথার্থ ব্যবহার হইতেছে। মনোহর পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান হইয়া যদ্যপি তাঁহাকে স্মরণ না হইল, সুধাময় চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া যদ্যপি তাঁহাকে মনে না পড়িল, বসন্ত সময়ে যদ্যপি তাঁহার সৌরভ অনুভূত না হইল, তবে ঐ সকল বস্তু আমাদিগের পক্ষে বৃথা হইল। যাহারা ঐ সকল বস্তুকে কেবল ইন্দ্রিয়সুখদায়ক বলিয়া জানে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য! তাহারা তাহাদের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। পুষ্পভোজী কীট পুষ্পের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য কি অনুভব করিবে? মনুষ্যই তাহার প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য অনুভব করিতে পারে। বসন্তকালে পৃথিবী রসপূর্ণা হইয়াছে, কিন্তু কবে আমাদিগের হৃদয় সেই রস-স্বরূপের প্রীতিরসে পূর্ণ হইবে? বৃক্ষগণ মুকলিত হইয়া চতুর্দিকে সুসৌরভ বিস্তার করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকার্য কবে স্বীয় মঙ্গলময় ভাব চতুর্দিকে

বিস্তার করিবে? বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বৃক্ষ-মুকুল হইতে প্রচ্যুত হইয়া আমাদিগের মস্তকোপরি পতিত হইতেছে, কিন্তু কবে তাঁহার পবিত্র সাক্ষাৎকারের অনুপম মকরন্দ আমাদিগের মনের উপর পতিত হইবে। কত কালে পুষ্পোদ্যানে পুষ্প-বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন কবিবে বালয়া আমরা পূর্ব হইতে কত যত্ন পাই, কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতির অঙ্কুর, যাহা ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষের রূপ ধারণ করিলে নিত্যকাল আমাদিগকে তৃপ্ত রাখিবে, তাহার উন্নতি সাধনে কি তত যত্ন করিয়া থাকি? ব্রহ্মপ্রীতির বর্তমান ক্ষুদ্র আকার দেখিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা কদাচ নিরাশ হয়েন না। নদীর প্রস্রবণ এমনি সংকীর্ণ যে শিশু তাহা উত্তরণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সেই প্রস্রবণই ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া তীরস্থ প্রদেশ সকলকে ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ করিয়া মহাকল্লোলসমন্বিত বেগে সমুদ্র সমাগম লাভ করে। সেই রূপ ব্রহ্মপ্রীতি প্রথমত সংকীর্ণ হইলেও ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মর্ত্য লোকের উপকার সাধন করত সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবের সহিত সম্মিলিত হয়। কিন্তু ইহা যত্নসাপেক্ষ। যত্ন না করিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। এই কঙ্করময় ভূমিতে এই অযত্নসম্ভূত বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হয়, আর প্রযত্ন সহকারে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক নানা সুকোমল ভাবের বীজ বিশিষ্ট মনুষ্যের মনোরূপ উর্বরা ভূমি হইতে ঈশ্বরপ্রীতিরূপ পুষ্পলতিকার উৎপত্তি ও উন্নতি সাধনে কেন নিরাশ হইব? অতএব আমারদিগের সকলের উচিত যে ঐহিক সুখলাভের ও অস্থায়ী সংসার পার সেই অভয়পদ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ ঈশ্বরের প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধনে সম্যক্ যত্নবান্ হই এবং যত্নবান্ হইতে অন্যাকে সর্বদা উপদেশ প্রদান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮১ শক

□□

অদ্যকার উৎসব দিবসে মনোমন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রফুল্লতার হিল্লোলকে একবার স্বাধীন-রূপে সঞ্চরণ করিতে দেও। সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে গেলে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না— একবার সাংসারিক ভাবনা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। দিবস তোমাদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, ঋতু তোমাদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, স্থান তোমাদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে, প্রকৃতি চতুর্দিকে মনোহর বেশ ধারণ করিয়া প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে। যদি প্রফুল্ল না হও, তবে দিবসের প্রতি, ঋতুর প্রতি, স্থানের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি অশিষ্টাচার হইবে। প্রফুল্ল হইতে তোমাদিগকে এতই বা অনুরোধ করিতেছি কেন? বসন্তসমীরণের এমনি গুণ, নবপল্লবিত ও মুকুলিত বন ও উপবনের এমনি শক্তি, বিহঙ্গ -কূজিত সুশব্দের এমনি ক্ষমতা, ঈশ্বর স্মরণের এমনি চমৎকার প্রভাব, যে তোমরা প্রফুল্ল না হইয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে কত সহজেই আনন্দিত করেন। একটু স্থানের পরিবর্তনে, একটু কালের পরিবর্তনে, তিনি আমাদিগকে কত আনন্দই প্রদান করেন। নিকটস্থিত নগর হইতে আমরা এখানে আসিয়া কত আনন্দই উপভোগ করিতেছি।

প্রতি বৎসর শীত না যাইতে যাইতে বসন্তসমীরণ হঠাৎ প্রবাহিত হইয়া জীব-শরীর এতদ্রূপ প্রফুল্ল করে যে পুত্রশোকে অভিভূত ব্যক্তিও পুলকিত না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। যিনি আমাদিগকে এতদ্রূপ অনায়াসে সুখী করিতে পারেন, তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর কর। মৃত্যুর পরে যে কত সহজে কত প্রকার আনন্দ তিনি প্রদান করিবেন, তাহা এক্ষণে কে বলিতে পারে? 'কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।' যে সুখ-ভাণ্ডার ঈশ্বর আপনার ভক্তের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণও শ্রবণ করে নাই, মনুষ্যের মন কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই। সে সুখ-ভাণ্ডার উপভোগ করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন আবশ্যক হয়। এমন সহজ ও সুন্দর উপায় থাকিতে আমরা যদি সে সুখভাণ্ডার অধিকার করিবার উপযুক্ত না হই, তবে আমরা কি হতভাগ্য! অহোরাত্র ধর্মের সৌন্দর্য অবলোকন কর, অহোরাত্র সেই মঙ্গলময়ের 'আনন্দ-জনন সুন্দর আনন' দর্শন কর, অহোরাত্র তাঁহার অমৃত সহবাসের মাধুর্য আস্বাদন কর, অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্যসাধন কর; তাহা হইলে এক দিন কি? প্রতি দিনই বসন্তের উৎসব তোমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিবে। ধর্মবীর্যে সর্বদা বীর্যবান থাক, ধর্মোৎসাহে সর্বদা উৎসাহান্বিত থাক, 'দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও,' সাংসারিক শোচনায় অভিভূত হইয়া আপনাকে দীনভাবাপন্ন ও মলিন করিও না। নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ থাকিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আনন্দ বিতরণ উদ্দেশেই জীবনের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সদানন্দ-চিত্ত থাকেন, তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পাদন করেন ও স্বয়ং কৃতার্থ হয়েন। যে ব্যক্তি সর্বদা সেই মঙ্গলস্বরূপ পুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তাঁহার নিত্য শান্তি হয়। 'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।' তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮২ শক

□□

আমরা প্রতিবৎসর বসন্তকালে এই সুরম্য স্থানে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কি পর্যন্ত না প্রীত হই! বসন্ত অতি মনোহর কাল। বসন্ত কালে ঈশ্বরের প্রেমময় ভাব চতুর্দিকে সঞ্চরণ করে; বসন্ত কালে ঈশ্বরের প্রেমমুখ আমরা বাহ্য জগতে আরো স্পষ্ট দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি বসন্ত কালে কোকিলরব শ্রবণ করিয়াছে সে কখনই এমত বিশ্বাস করিতে পারে না যে আমারদিগের ঈশ্বর কোনো নিষ্ঠুর দৈত্য। চতুর্দিক্‌স্থ বস্তু হৃদয়ে অপূর্ব রমণীয়ভাব সকলের উদ্রেক করিতেছে। নবজীবন প্রাপ্ত পৃথিবী নবজীবন প্রাপ্ত আত্মার কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে, নব পল্লব ও কুসুম সদ্যোজাগ্রৎ আত্মাতে নবোদিত ধর্মভাবসকলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, বসন্তসমীরণ আত্মার নবজীবনোৎপন্ন আনন্দ-পবনের ন্যায় প্রবাহিত

হইতেছে। আমরা এমন সুন্দর ঋতুতে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া সেই পরম পিতার উপাসনা করিতেছি ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? তিনিই আমাদিগের মনে সেই ভ্রাতৃভাব প্রেরণ করিতেছেন। তিনিই বন্ধুতার স্রষ্টা, প্রীতিরসের জনয়িতা ও আনন্দের প্রস্রবণ। তিনি আমাদিগের পরম সুহৃৎ, তিনি আমাদিগের চিরজীবন সখা। সে অমূল্য-নিধি যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সংসারের অন্য কোনো বস্তু প্রার্থনা করেন না; তিনি তাঁহার প্রীতিসুধা পানে সর্বদা নিমগ্ন থাকেন। পূর্বকালীন ঋষিরা নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর সুধার্ণবে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এস আমরা সকলে সেই সুধার্ণবে গাত্র ঢালিয়া দিই— অদ্যকার উৎসব দিবস সার্থক করি। এই ধর্মোৎসব যেন নিরন্তর আমাদিগের মনে বিরাজ করে; ঈশ্বরানুগ্রহে ব্রাহ্মধর্মরূপ যে পরম পবিত্র মহৎ ধর্ম এই ভাগ্যবান্ বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার প্রসাদাৎ সকল দিবসই আমাদিগের উৎসবের দিবস। আমাদিগের উৎসবের এখন কি হইয়াছে? আমরা যত উৎকৃষ্ট লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে উত্থিত হইব, ততই আমাদিগের উৎসব বর্ধিত হইবে। সে উৎসবের গম্ভীরতা ও মাধুর্যের সহিত তুলনা করিলে সাগরের গম্ভীরতা ও সংগীতের মাধুর্য কোথায়? সেই সুখচ্ছবি যদি আমাদিগের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এখনই প্রতিভাত হয়, তবে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ নদী হইতে নতুন সমুদ্রে সমাগত নাবিকের ন্যায় আমাদিগের আশ্চর্য ভাব সমুদ্ভূত হইবে। যাহাতে আমরা সেই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার উপায় আমাদিগের অবলম্বন করা উচিত। যেমন অদ্য আমরা এই গোপগিরির নিকটস্থিত সুনির্মল স্রোতঃস্বতীতে অবগাহন করিয়া আমাদিগের গাত্র শুদ্ধ করিয়াছি, তেমনি মনের শুদ্ধতা সম্পাদনার্থে আমরা যেন যত্নবান্ হই, তাহা হইলেই আমরা সেই অমৃতধামের উপযুক্ত হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৩ শক

□□

বৎসরের পরিবর্তন পুনর্বার বসন্তের উৎসবের সময় আনয়ন করিয়াছে। পুনর্বার গোপগিরি মনোহর বসন্তবেশ ধারণ করিয়াছে, পুনর্বার আমাদিগের পুরাতন সখা এই বৃক্ষ সকল নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চিত্ত হরণ করিতেছে, পুনর্বার বসন্ত সমীরণ এই স্থলে প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে অপূর্ব আহ্লাদরসের সঞ্চার করিতেছে। বাহ্য জগৎ শীতের সময় হীন দশা প্রাপ্ত হইয়া মৃতবৎ হয়; বসন্ত সমাগমে নব জীবন লাভ করে, নূতন রসে পূর্ণ হইয়া তেজস্বী হয়। বন ও উপবন সকলের ন্যায় মনুষ্যও হীন দশা প্রাপ্ত হয় কিন্তু বন ও উপবন সম্বন্ধে যেমন বসন্তের উদয় হয় তেমনি মনুষ্যের আত্মা সম্বন্ধে কি বসন্তের উদয় হইবে না? আমাদিগের অশেষ উন্নতির আশা কি চরিতার্থ হইবে না? এই সকল মহৎ মনোবৃত্তি অনন্ত দেশে ও অনন্ত কালে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইতেছে, সে সকল মনোবৃত্তি কি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? যে নিত্য পূর্ণ সুখের ইচ্ছা আমাদিগের স্রষ্টা

হৃদয়ে গাঢ় রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহা কি কখনই সম্পূর্ণ হইবে না? এমত আমরা কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না। বসন্ত কালে বাহ্য জগৎ যেমন নব জীবন প্রাপ্ত হয় মনুষ্যও সেইরূপ মৃত্যুর পরে নব জীবন প্রাপ্ত হইবে। বসন্তকালে যেমন প্রকৃতি নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ করে মনুষ্যও সেই রূপ নবতর কল্যাণতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সে অবস্থা ইন্দ্রধনু অপেক্ষা সুশোভন ও বসন্তপুষ্পমধু অপেক্ষা সুমধুর। ধার্মিক ব্যক্তির জন্য উৎসবের পর উৎসব, আনন্দের পর আনন্দ, অশেষ উন্নতি সঞ্চিত রহিয়াছে। এই অশেষ উন্নতির আশা আমাদিগের হৃদয়ে কে সঞ্চার করিয়াছেন? অন্য কোনো ধর্ম তো আত্মার অনন্ত উন্নতির কথা বলে না। আমাদিগের প্রিয় ব্রাহ্মধর্মই এই অশেষ উন্নতির দ্বার উদঘাটন করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম আমাদিগের দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বসন্ত সমাগমে যেমন বাহ্য জগৎ নব জীবন লাভ করিতেছে তেমনি ধর্ম আমাদিগের দেশে নব জীবন প্রাপ্ত হইতেছে। বসন্ত সমাগমে যেমন বন ও উপবন সকল নূতন শ্রীতে বিভূষিত হইতেছে, তেমনি ব্রাহ্মধর্মের প্রসাদাৎ আমাদিগের দেশের রীতি নীতি নূতন শ্রীধারণ করিতেছে। যিনি বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন, তাঁহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ কর। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যদি পুলকে পূর্ণ না হইব তবে কাহাকে স্মরণ করিয়া পুলকে পূর্ণ হইব? যদি তাঁহার উদ্দেশে উৎসব না করিব তবে কাহার উদ্দেশে উৎসব করিব? সংগীত দ্বারা যদি তাঁহার গুণ কীর্তন না করিব তবে কাহার গুণকীর্তন করিব? অতএব মনের সহিত অদ্য বসন্তের উৎসবকার্য সমাধা কর, তাঁহার পবিত্র নাম লইয়া জীবন সফল কর, তাঁহার গুণ গান দ্বারা বন উপবন সকলকে প্রতিধ্বনিত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৪ শক

□□

আমরা যে বসন্তের উৎসবের দিবস অনেক দিন অবধি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম অদ্য সেই দিবস উপস্থিত। অদ্য সেই সর্ব-স্রষ্টাকে স্মরণ কর যাঁহার মধুর মঙ্গল মূর্তি অবলোকন করিলে কোনো ভয়, কোনো উদ্বেগ থাকে না। অপূর্ব মলয়সমীরণ তাঁহারই মঙ্গল বার্তা সর্বত্র বহন করিতেছে; তাঁহারই করুণা মূর্তিমতী হইয়া নব পল্লব ও মুকুলের রূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি যেমন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন তেমনি আত্মা সম্বন্ধেও বসন্ত প্রেরণ করেন। তিনি যেমন বসন্ত কালে বাহ্য জগৎকে নব জীবন প্রদান করেন তেমনি মৃত আত্মাতে ধর্ম প্রবেশ করাইয়া তাহাকে নব জীবন প্রদান করেন। পাপই মৃত্যুর প্রতিকৃতি; ধর্মই মানুষের জীবন। যে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্মের আশ্রয় লাভ করে সে নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বসন্তপুষ্পের ন্যায় ঈশ্বরের প্রীতিরূপ পুষ্প তাঁহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করে; বসন্তসমীরণের হিল্লোলের ন্যায় ব্রহ্মানন্দের হিল্লোল তাঁহার আত্মাতে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করে। যেমন শীতপ্রধান দেশে

তুষারঘনীভূত স্রোতঃস্বতী সকল বসন্ত সমাগমে দ্রবীভূত হইয়া মনুষ্যের মঙ্গল জন্য প্রবাহিত হয় তেমনি স্বার্থপরতারূপ তুষারে জড়ীভূত মনোবৃত্তি সকল ধর্মের আবির্ভাবে ঔদার্য ভাব অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের হিত সাধনে ব্যস্ত হয়। বসন্ত কালে কেবল জীবিত থাকাই যেমন সুখের প্রতি কারণ হয়, বসন্ত কালে যেমন প্রতি নিঃশ্বাসে আমরা অভূতপূর্ব আনন্দ অনায়াসে প্রাপ্ত হই, তেমনি ধর্মরূপ জীবন-প্রাপ্ত মনুষ্য অযত্নসম্ভূত সহজ আনন্দ নিরন্তর উপভোগ করেন। তিনি এখানে যে জীবন ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, সেই জীবন ও আনন্দই পরকালে প্রাপ্ত হয়েন; কেবল তাহা তথায় উন্নত ভাব অবলম্বন করে, এইমাত্র প্রভেদ। কেবল তাঁহার শরীর ভাঙিয়া যায়; তাঁহার জীবন ও আনন্দ উন্নত নতুন অবস্থায় স্ফুরিত হয়। যিনি বাহ্য জগৎসম্বন্ধে আত্মাসম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন, অদ্য সেই মধুময় পুরুষকে সর্বান্তঃকরণের সহিত উপাসনা করিয়া জন্ম সার্থক কর। অদ্য সাংসারিক শোক দুঃখ বিস্মরণ পূর্বক সেই সকল সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তাকে সম্মুখস্থ করিয়া উৎসবের আনন্দে নিমগ্ন হও। যেমন মর্ত্য লোকের পিতা কখনও এমত ইচ্ছা করেন না যে বালক সাংসারিক চিন্তায় অভিভূত হইয়া সর্বদা বিষণ্নবদন হইয়া থাকে, তেমনি আমাদিগের পরম পিতার কখনও ইচ্ছা নয় যে, কেবল সাংসারিক উদ্বেগে উদ্বিগ্ন থাকিয়া আমরা কাল যাপন করি। বালক যেমন সম্পূর্ণ রূপে পিতার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তেমনি আইস আমাদিগের ভাবী সুখ দুঃখ সেই পরম পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই। যে ব্যক্তি বালকের ন্যায় নির্ভর-ভাবাপন্ন, সরল, নির্দোষ ও সদানন্দ না হইতে পারেন, তিনি ঈশ্বর হইতে অনেক দূর। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মনুষ্য, যিনি প্রৌঢ়াবস্থায় অভিজ্ঞতার সহিত বালকের ঔদার্য ও সারল্য সংযোগ করেন। বসন্তকাল বাল্যকালের প্রতিরূপ; এক্ষণে বিষণ্ন থাকা কখনই উচিত হয় না। অদ্য সকলে সাংসারিক চিন্তা দূর করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হও। অদ্য ব্রহ্ম-প্রীতিরূপ সুগন্ধ মাল্য ও আনন্দ রূপ বসন্তীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক বসন্তের উৎসবের কার্য মনের সহিত সমাধা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৫ শক

□□

অদ্য আমাদিগের বসন্তীয় উৎসবের দিবস উপস্থিত। অদ্য আমাদিগকে তিন প্রকার সৌন্দর্য এই স্থানে আকর্ষণ করিয়াছে; বসন্তের সৌন্দর্য, সখ্যভাবের সৌন্দর্য এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্য। বসন্ত কালে জগতে নবজীবন ও নবরসের আবির্ভাব হয়; বন ও উপবন সকল নব পল্লব ও মুকুলকুলে পরিশোভিত হইয়া চিত্ত হরণ করে; পক্ষিগণ নূতন স্ফূর্তি প্রাপ্তি পূর্বক অবরুদ্ধ কণ্ঠ সকল পরিমুক্ত করিয়া সংগীতসুধা বর্ষণ করে; অপূর্ব মলয়সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে আশ্চর্য সুখের সঞ্চার করে। কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্য অপেক্ষা সখ্য ভাবের সৌন্দর্য কি শ্রেষ্ঠ! যখন হৃদয় হৃদয়কে আকর্ষণ করে, যখন এক সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মন অন্য সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মনের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া

প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়, সে ভাবের সৌন্দর্যের নিকট বসন্তের সৌন্দর্য কোথায়? কিন্তু যিনি বসন্তের সৌন্দর্যের সৃষ্টি-কর্তা ও সখ্যভাবের সৌন্দর্যের জনয়িতা, তাঁহার সৌন্দর্যের কি সীমা আছে? তিনি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ; তাঁহা হইতে সকল জ্যোতি, সকল শোভা ও সকল সৌন্দর্য বিনিঃসৃত হইতেছে। তিনি গুণের আকর, তিনি সৌন্দর্যের সাগর। ঈশ্বরের অনুপম গুণই তাঁহার সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্যের সহিত চর্মের সম্পর্ক নাই, সে সৌন্দর্যের সহিত মলার সম্বন্ধ নাই। সে সৌন্দর্য যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহার আর চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য হইতেছে না। ব্যাকুলতা-শান্তিকর ভিষক্ আছেন, কিন্তু আমাদিগের ব্যাকুলতা কোথায়? প্রেমী কে হইল যে প্রেমাস্পদ তাহার প্রতি প্রীতি-দৃষ্টি না করিলেন? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয় ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি তাহার সমীপে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে স্বীয় সৌন্দর্যের প্রকৃত উপাসক দেখেন, তিনি তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আপনার সৌন্দর্য ক্রমশ অধিকতর প্রকাশিত করিতে থাকেন। এ অবস্থাতে সাধকগণ 'উৎসবাৎ উৎসবং যান্তি সর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম' উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, সুখ হইতে সুখে উপনীত হয়েন; এই রূপে তাঁহার পবিত্র যৌবন বিগত হইয়া যখন তাঁহার বার্ধক্য উপস্থিত হয়, তখন কি তাঁহার আনন্দের হ্রাস হয়? কখনই নয়। বরং তাহা অস্তকালীন সূর্যের জ্যোতির ন্যায় আরো গাঢ় ও পরিপক্ক হয়। বাহ্যে বার্ধক্যের চিহ্ন, অন্তরে চির-যৌবন ও চির-বসন্ত, এই বাহ্য বসন্ত সেই আধ্যাত্মিক বসন্তকে উদ্দীপন করিয়া দিতেছে। যিনি বসন্তের সৌন্দর্যে, সখ্যভাবের সৌন্দর্যে ও স্বীয় সৌন্দর্যে বিরাজ করিতেছেন, এস অদ্য আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার গুণ গান করত আমাদের জীবনকে সুন্দর করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৬ শক

□□

বসন্ত ঋতু উপস্থিত. প্রাতঃসূর্য সমুদিত, গোপগিরি প্রফুল্লিত। আমরা এই শুভক্ষণে এককালে নূতন ঋতু, নূতন দিবস, নূতন শরীর ও মনের নূতন বীর্য, লাভ করিয়াছি। সকলই অভিনব; এখন আমাদের ভক্তি-পুষ্প অভিনব রূপ ধারণ পূর্বক সেই মঙ্গলময়ের চরণে কি অর্পিত হইবে না? বন, উপবন, গিরি, কানন, স্রোতস্বতী, তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতেছে; পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইয়া তাঁহার গুণ গান করিতেছে; মলয়সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার যশ প্রচার করিতেছে; স্বয়ং বসন্ত গন্ধ-পুষ্প হস্তে লইয়া তাঁহার পূজার জন্য অগ্রসর হইয়াছে; আমরাই কি কেবল তাঁহার উপাসনা হইতে বিরত থাকিব? তিনিই এই নব ঋতু, নব পত্র, নব নব কলিকা প্রেরণ করিতেছেন। যিনি ব্যাধিকে আরোগ্যে, বিপদ্‌কে সম্পদে, পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেন; তিনিই বসন্তের প্রকাশ করেন। যিনি শীতকে বসন্তে, ব্যাধি আরোগ্যে, বিপদ সম্পদে, পরাজয় জয়ে পরিণত করেন; তিনি কি মৃত্যুকে অমৃতেতে পরিণত করিতে পারেন না? সেই পারলৌকিক জীবন

বসন্তের ন্যায় আমাদিগের সম্বন্ধে স্ফুরিত হইবে; বাহ্য সূর্য আমাদিগের সম্মুখে যেরূপ দীপ্তি পাইতেছে, তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে প্রেম-সূর্য পরলোকে আমাদের সম্মুখে দীপ্তি পাইবেক। যে মঙ্গলময় পিতা আমাদিগকে ইহকালে ধর্মাচরণের সুখের পর আবার পরলোকে এরূপ আনন্দ প্রদান করিবেন, তাঁহার উপাসনাতে সর্বদা নিযুক্ত থাক। তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন কর; তাহা হইলে বসন্তের কুসুম অপেক্ষা তোমাদের হৃদয় মধুময় হইবে, বসন্তের সৌন্দর্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য তোমাদের মুখশ্রীতে প্রকাশিত হইবে, মলয়সমীরণ অপেক্ষা প্রফুল্লকর আত্ম-প্রসাদের হিল্লোল তোমাদের অন্তরে নিত্য সঞ্চরণ করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ফাল্গুন ১৭৮৭ শক

□ *রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা*, দ্বিতীয় ভাগ, ১৭৯২ শক (১৮৭০)

স্বাধীনতা

কেশবচন্দ্র সেন

আমার ইষ্টদেবতা যখন আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাধীনতা-মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল। বৎস। কখনও কাহারও অধীন হইও না— এই প্রধান সৎপরামর্শ। প্রথম অবধি কায়মনোবাক্যে সাধ্যানুসারে এই মন্ত্র পালন করিয়া আসিতেছি। অধীনতা এই পৃথিবীতে বিষ; অধীনতা রাশি রাশি নরক-যন্ত্রণার হেতু। অধীনতার প্রতি প্রথম হইতেই কেন এত বিরক্ত হইয়াছিলাম, জানি না। মানুষ কাম ক্রোধ তাড়াইবার জন্য, রিপু দমন করিবার জন্য চেষ্টা করে, উৎসাহের সহিত প্রভাবিত হয়; কিন্তু অধীন হইব না, অধীন হইব না— এ কথা বলিয়া কেহ পাগল হয় না। অবশ্য বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল, এইজন্য জীবনের মূলে এই মন্ত্র নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অধীনতার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। অধীনতাকে পাপ মনে করিতাম; কী ফল ফলিবে, ভাবিতাম না। অধীনতা পাপ, অধীনতা অনিষ্টের হেতু, অধীনতা ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা। ফল না দেখিয়াই এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম; কেননা, মন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রথম হইতেই স্বীকার করিতে হয়। এইজন্যই আজ পর্যন্ত কাহারও নিকট মস্তক হেঁট করিতে পারিলাম না। ইহার জন্য কষ্টও পাইতে হইয়াছে, তথাপি মন্ত্র ছাড়ি নাই। পাহাড়ের ন্যায় অটল স্বাধীনতাকে আমি জড়াইয়া ধরিয়া আছি। দেখিয়াছি— এ মন্ত্র সহজ মন্ত্র নয়।

'অধীন হইও না' এই যে মন্ত্র, ইহার ভিতরে পরম অর্থ আছে। নববিধান পরে আসিবে, সকল প্রকার ভ্রম কুসংস্কার দূর করিতে হইবে, স্বাধীনভাবে সত্যের মহিমা মহীয়ান্ করিতে হইবে— এইসকলের জন্যই স্বাধীনতার ভাব আদি হইতে বর্তমান ছিল। স্বাধীনতাই হইল আদি শব্দ। অধীন হইব না, এই সংকল্প ব্যতীত, এ ভাব হইতে আর কী ফল ফলিতে পারে? এই স্বাধীনতা হইতেই অনেক গুরুতর কার্য প্রসূত হইয়াছে। অধীনতার শৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না; দাসত্ব স্বীকার করা হইবে না; কাহারও পদতলে পড়া হইবে না; গুরুজনের নিকটে আত্মবিক্রয় করা হইবে না; পুস্তক বিশেষেরও কিংকর হইয়া বন্দনা করা হইবে না; কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্র তাহারই যশ ঘোষণা করা হইবে না। এ দিকে যেমন এই-সকল প্রতিজ্ঞা, অপর দিকের প্রতিজ্ঞা তেমনিই— স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া হইবে না; অহংকারের অধীন হওয়া হইবে না; ঈশ্বরের নিকট যে ব্রত লওয়া উচিত, তাহাও পরিত্যাগ করা হইবে না। যতই স্বাধীনতার ভাব বৃদ্ধি হইল, দেখিলাম পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রভৃতি প্রভুত্ব

করিতেছে; দেখিবামাত্রই তৎসমুদয়ের শৃঙ্খল ছেদন করিবার জন্য যত্ন হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশকে পৌত্তলিকতাদির দাস করিয়া রাখিয়াছিল, তৎসমুদয়কে কাটিবার জন্য খড়্গহস্ত হইলাম। যাই দেখিলাম, ভ্রম, কুসংস্কার পিতা পিতামহকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পাড়াতে উপদ্রব করিতেছে, অমনিই অস্ত্র বাহির করিলাম।

আমি দাসত্ব সহ্য করিতে পরিতাম না; এখনও পারি না। কাহাকেও বাসনার বশবর্তী, কি রিপুর বশবর্তী দেখিলে অন্যায় বোধ করিতাম, কোনোক্রমেই সহিষ্ণু হইতে পারিতাম না। আমার অস্ত্র অধীনতা কাটিবার জন্য সততই চক্‌মক্ করিত। কত অনিষ্ট ফল অধীনতা দ্বারা ফলিয়াছে, ভাবিয়া ঠিক করি নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া যে অস্ত্র-হস্তে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা নয়, অবশেষে এই মহামন্ত্র, গুরুমন্ত্রের আশ্চর্য প্রভাব দর্শন করিলাম। এই পৃথিবীতে কত ভাই-ভগিনীকে দাস দাসী করিয়া রাখিয়াছে; তৎসমুদয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইবে বলিয়া ইষ্টদেবতা এমন শিক্ষা দিলেন যে, অধীনতা দেখিলেই আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। রাগের দাস হইতে কাহাকেও দেখিলে, রাগের উপরেই রাগ হইত। পিতার দাস, কি সন্তানের দাস হওয়াও সহ্য হইত না; ধনের দাস, মানের দাস অথবা কোনো সম্প্রদায়ের দাস হইতে যখনই কাহাকেও দেখিতাম, রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীনতা দিলেন আর সেই মানুষ পৃথিবীর বাজারে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, পৃথিবীর পাপের নিকট পরাস্ত হইয়া চিৎকার করিতেছে। রকম রকম লোক রকম রকম লোকের কাছে পদানত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে। ক্রীতদাস হইবার এত ইচ্ছা! পাঁচ দশ বৎসর দাসত্বই করিতেছে। এক এক বিশেষ-বিশেষ নারীর দাসত্ব করাকে কী বলে? ব্যভিচার বলে। মানুষের দাসত্ব করাকে কী বলে? দাসদলের মধ্যে গণ্য করে। ধনের দাস হইলে লোভী বলে। এ সমস্তই পাপ; দাস হওয়াই পাপ।

আসক্তি সংসারের রাজা হইলে মজিতে হয়। যে গ্রামে যাই, যে বাড়িতে যাই, রাগ বলে— দেখো, আমার কত দাস-দাসী; লোভ বলে— দেখো, কত আমার চাকর, আমি কত বড় রাজাকে পর্যন্ত মারিতেছি। দাসত্ব-বিধি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একেবারে পোড়াইয়া মারিতেছে। হা বিধাতঃ! স্বাধীনতা যে মুক্তি, অধীনতা যে নরক। স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে। কোনোপ্রকারে সাম্প্রদায়িকতায় পড়া হইবে না। কেহ বলেন, গুরুকে মানিয়ো; মন বলে, ভয় করে। পিতামাতাকে মানিয়ো; আশঙ্কা হয়। বন্ধু-বান্ধব যাঁহারা, ধর্মেতে যাঁহাদের সহিত মিলন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে মানিয়ো; আত্মা বলে, বড় ভয় করে। খুব যাঁহারা বিশেষ অনুগত, ধর্মে সৎকর্মে অনুকূল, আদরের সহিত তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়ো; মন বলিল— অধীন হইতে আমি ভীত হই। কোনো বন্ধুর বিশেষ মায়াতে আমি বদ্ধ হইব না। খুব বড় বন্ধু দেখিলাম যে, আমি ভালোবাসি বটে কিন্তু মায়াতে বদ্ধ হইলাম না। এইজন্য আমার বন্ধুরা বলিলেন— খুব যে আমাদের ভালোবাসে তা নয়, ভিতরে এ-ব্যক্তি আবার নিজের বুদ্ধিকে দাঁড় করায়; আমরা যা বলি, তা করে না। বন্ধুরা বলেন, এইটি করো; আমি তাহা করি না। অন্যের ভালো কথায় ভালো কাজ করিব না, ঈশ্বরের কথায় করিব। অন্যের কথায় যাহা করিলাম না, ঈশ্বরের কথায় তাহা আগ্রহের সহিত করিব। যতক্ষণ না ঈশ্বরের

কথা শুনিব, ততক্ষণ আমি কাজ আরম্ভ করিব না। এ-প্রকার প্রতিজ্ঞায় অন্যের বিপদ হইতে পারে, কিন্তু আমি সৌভাগ্যশালী, আমার ইহাতে বিপদ না হইয়া লাভই হইয়াছে।

বন্ধুদিগকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীর অধীন হই নাই; সন্তানাদির মায়াতে, কি দেশের মায়াতেও আবদ্ধ হই নাই, হইবও না। কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, জীবিত কি মৃত কোনো লোক আছেন, যাঁহার নিকট আমি অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি, অথবা যাঁহার মায়াতে আবদ্ধ আছি। স্বাধীনতাই আমার চিরকালের আদরণীয়, কিন্তু ভক্তিবিহীন স্বাধীনতা আদরণীয় ছিল না। পৃথিবীর বাজারে অহংকারমূলক স্বেচ্ছাচার আমি টাকা দিয়া ক্রয় করি নাই। বড় হইবার জন্য, উচ্চপদ লাভের জন্য স্বাধীনতা কিনি নাই, সে-প্রকার স্বাধীনতা নরকের স্বেচ্ছাচার; আমি তাহাকে স্বাধীনতা বলি না। আমি ভালোবাসিলাম, কিন্তু মায়াবদ্ধ হইলাম না— ইহাই যথার্থ ভালোবাসা। তোমাদের ভালোবাসিলাম, কিন্তু অধীন হইলাম না। অধীন হইয়া যদি লোক ডাকিতাম, আজ আমার দলে শত-সহস্র লোক থাকিত। মায়া দ্বারা যদি সকলকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতাম, দাসদলভুক্ত করিবার যদি আশা থাকিত, আমার দল লোকে পূর্ণ হইত। স্বাধীনতাকে দলপতি করিলাম। এইজন্য আমার সঙ্গে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আমাকে তাঁহাদের গুরু বলি না। স্বাধীনতারই জয় হইবে। এইজন্যই বলি— সত্যের জয়, সত্যের জয়, সত্যের জয়। স্বাধীনতা মানুষকে ডাকিবে। ইহাতে লোক আসে আসুক; গুরুগিরি কখনও করিব না। অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমাতে যাহা ঘৃণা করি, অন্যেতে তাহা ঘৃণা করি না? দলের সামান্য কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না। কেহ যে অন্যের অধীন হইবে তাহা দেখিতে পারি না; আমার অধীন যদি কেহ হয়, তাহাও আমার অত্যন্ত অসহ্য। অন্য একজন মনুষ্য আমার অধীন হইবে? পিতার নিকট আমি কী উত্তর দিব? আমার মত আর-একজনের ঘাড়ে আমি চাপাইব? আমার শাসনে অপরকে শাসিত করিব? মায়ার মোহিনী মূর্তি দেখাইয়া দলে আনিবার চেষ্টা করিব? অপরকে আমি আমার অধীন করিয়া রাখিব? ইহাতে নরক আমাকে হাঁ করিয়া গিলিবে; স্বর্গও লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে। আমার যদি দল না হয়, একজনও যদি কাছে না থাকে, নিজে যখন দাস নই, তখন অপরকেও দাস করিব না।

আমি কখনও দাসত্ব করিয়াছি, তোমরা কি কেহ ইহা জান? আমি যখন কাহারও দাসত্ব করি নাই, তোমরা কেন দাসত্ব করিবে? যে আপনাকে কখনও কাহারও দাস করে নাই, সে যদি অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করে, অথবা দাস দেখিয়া হাস্য করে, তার মতো পাপী কপট আর কে আছে? গুরু আমি নই; অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করি নাই। চিরকাল শিখিয়াছি, অর্থাৎ আমি শিক্ষার্থী; চিরদিনই শিক্ষা করিতে প্রস্তুত। আমার দলে যদি পঞ্চাশ জন লোক থাকেন, তবে পঞ্চাশ প্রকার; সত্য সাক্ষী, চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী, অধীনতা এখানে নাই। একশত জন লোক যদি এখানে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা স্ব-স্ব প্রধান। প্রত্যেককেই আমার সমক্ষে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; আমি চলিয়া গেলেও এ কথা প্রত্যেকে স্বীকার করিবেন। দলের কেহই অধীনতায় জীবিত নহেন, কিন্তু স্বাধীনতায়। আমি কাহাকেও জাঁতায় পেষণ করিতে মানস করি না— প্রত্যেককে স্বাধীন

দেখিতে চাই। কাহাকেও গুরু অথবা শাসনকর্তা বলি না; ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্তা বলিয়া জানি। অধীনতাপ্রিয় কেহ যদি ঠক হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকেন, সে ঠককে বাহির করিয়া দিব— দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়। যার উপর দলের ভার আছে, সে নিজেই যখন অধীন নয়, সে নিজেই যখন অধীনতাকে ঘৃণা করে, তখন এ দলের কেহই অধীন হইবেন না।

প্রত্যেকেরই এক-একটি গুরুতর ভার আছে, ব্রত আছে। একটি ভালো মতেরও অন্ধ হইয়া অনুসরণ করিতে চাই না। আমি অন্ধ হইয়া অন্ধ চালিত করিব না। স্বাধীনতা মহামন্ত্র। এতদূর যদি স্বাধীনতা হয়, এ যে স্বেচ্ছাচারের কাছে গেল। স্বাধীনতা পূর্ণ হইবে, স্বেচ্ছাচার হইবে না; কেননা, এক পিতামাতাকে মানি বলিয়াই পিতামাতার অধীন হইলাম না। সেইজন্য এত দূর করিলাম যে, ধর্মেতেও স্বাধীনতার ব্রত লইলাম। সংসারের মায়া কাটাইয়া আবার অনেকে ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবর্গের দাসত্ব করিল। পৃথিবীর কীট হইল না; কিন্তু হয়তো ধর্মসমাজে আসিয়া এই বইখানিকে অভ্রান্ত ভাবিয়া তাহারই সম্পূণ দাস হইল। আমি আপনাকে এ-সকলের মায়া হইতে দূরে রাখিয়াছি। কোনো এক পুস্তককে কেন অভ্রান্ত ভাবিব? কেন একটি মানুষকে অবলম্বন করিব? মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউন, শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি; কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না। অহংকারী বলিতে চাও, বলো। দুরাচার বলিবে, তাহাও বলো। কিন্তু কোনো মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনো মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না। যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন। কোনো পুস্তক নাই, যাহাতে পূর্ণ জ্ঞান পাইতে পারি, এইজন্য বইকে আদর্শ করিয়া লই নাই। ঈশ্বরের পুত্র সকলকে আমি যেমন ভালোবাসি, কে এমন ভালোবাসিয়া থাকে? অথচ আমিই বলি, তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ ভাবিয়া পিতার অপমান করিব না। আমি বাইবেল, পুরাণকে ভালোবাসিতে গিয়া পিতার অপমান করিব না। ঈশ্বরের কাছেই আমি থাকিব। স্বর্গে কি পৃথিবীতে, কাহারও দাস হইব না।

ব্যাঘ্রচর্ম আমার প্রিয়, একতারা আমার প্রিয়। এই দুইয়ের প্রতি যদি আমি আসক্ত হই, ইহারাই আমার নিকট দেবতার স্থান প্রাপ্ত হইবে। আজিকার জন্যেই ইহাদিগকে আজ লই, আবার কাল ছাড়ি। আজ উপাসনার সময় ব্যাঘ্রচর্মকে আদর করিলাম, দুই ঘণ্টা পরে তাহাকে ছাড়িলাম, আর যত্ন করিলাম না। বাহ্যিক ব্রত সাধনাদিরও দাস হইবে না। কেহ কি বলিতে পারেন না, কত লোক টাকার মায়া ছাড়িয়া ব্যাঘ্রচর্মের মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছে? এইজন্য আত্মা সতত সাবধান; অধীন আসক্ত কখনও কোনো বস্তুর হইবে না, ফুলে আসক্ত হইবে না, গৈরিক বস্ত্রে আসক্ত হইবে না, ব্যাঘ্রচর্মে আসক্ত হইবে না। আমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমি তদ্দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইব; তার পর বলিব— বিদায় দাও মৃদঙ্গ, বিদায় দাও গৈরিক বস্ত্র, বিদায় দাও ব্যাঘ্রচর্ম। আমার কার্য হইয়া গেল, আর তাহা লইয়া থাকিব কেন? সে কিছুতে আমাকে দাস করিবার জন্য আসে নাই। আমার দরকার, তার নয়। অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইব; সিদ্ধ হইলে আর তাহা থাকিবে না। যদি কিছুরও প্রতি আসক্তি থাকে, ব্রতাদির প্রতি যদি একটুকুও আসক্তি

থাকে, তবে যে পরিমাণে আসক্তি, সেই পরিমাণে নরকের অগ্নি জ্বলিতেছে।

নববিধানে প্রত্যেকের স্বাধীনতা। কে গুরু? কে ব্রাহ্মসমাজ? কে আমার ব্রাহ্মদল? কোনো বিষয়ের উপরেই আসক্তি নাই। বস্তু যাহা তাহা রাখিব। নাম পর্যন্তও আবশ্যক হইলে পরিত্যাগ করিতে পারি, বস্তু কোনো মতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না; আর সকলই পারি। এজন্য কাহারও সঙ্গে মিল হইল না। দুঃখ পাইলাম, সুখও অনেক পাইলাম। গুরুগিরি যদি করি, লোক-সংখ্যা বাড়াইতে পারি; কিন্তু তাহা করিতে পারি না। পরমেশ্বর আশীর্বাদ করুন, আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্বাধীনতাকে যেন সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারি। ইহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যাহা হইবার ইহাতেই হইবে। স্বর্গ হইতে স্বাধীন জীবগণের উপরে পুষ্পবর্ষণ হইতে থাকিবে, পিতার কাছে সকলে থাকিবে, স্বেচ্ছাচারী হইবে না। একদিকে যত পাপকে, ভ্রম কুসংস্কারকে দাঁড় করাও; অপর দিকে যত প্রকার ভয়ানক স্বেচ্ছাচার, দম্ভ অহংকার আছে, তৎসমুদয়কে দাঁড় করাও। অবশেষে এই দুইয়ের বিরুদ্ধেই স্বাধীনতার অস্ত্র নিক্ষেপ করো। আমরা ঈশ্বরের অধীন, এই জন্যই সম্পূর্ণ স্বাধীন।

হে দয়াময়, হে স্বাধীন পুরুষ! মহামন্ত্র স্বাধীনতা কী আশ্চর্য মন্ত্র! দয়া করিয়া যদি আমাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তবে আমার ও ভাই-ভগিনীর মঙ্গলের জন্য, আমাদিগের সকলের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব বৃদ্ধি করিয়া দাও। গেলাম যে পাপের জ্বালায়; তার উপর দেশাচার, কুরুচি, ভ্রম তোমার সন্তানকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তার উপর আবার নানা-প্রকার আসক্তি ঘাড়ে চাপিয়াছে। হে ঈশ্বর, ঐ ওরা আমাকে কিনিয়া লইবে, ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে— এই বলিয়া কাঁদিতেছি। মা, কোথায় তোমার দাসত্ব করিব— না, কার কাছে রহিয়াছি, সংসারের প্রভুর সেবা করিয়া মরিতেছি। স্কন্ধের উপর, মনের উপর, অসহ্য দাসত্ব-ভার রহিয়াছে। অধীনতা মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছে। স্বাধীনতা-প্রদাতা, কোথায় রহিলে আজ? মানুষ কেন এত কষ্ট পাইতেছে? অধীনতার ভাবের সঙ্গে একবার যুদ্ধ আরম্ভ হউক। মা শক্তিস্বরূপা, হুংকারে শত্রুদল তাড়াও। আর পরের দাসত্ব করিব না। মা আনন্দময়ি, আর পাপের দিকে যাইব না; রিপুপরতন্ত্র আর হইব না। যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব; যেখানে যাইতে বলিবে, সেইখানে যাইব; যাহা খাইতে বলিবে, তাহাই খাইব; যাহা নিষেধ করিবে, তাহা কখনোই করিব না। কোনো প্রকার কু-অভ্যাসের দাসত্ব করিব না। বড় কষ্ট হয় সে অবস্থায়, বিবেক যখন মনকে বলে, এমন যিনি ভালোবাসেন, সেই মার আদেশ পালন করলি না? তাঁর কথা অগ্রাহ্য করলি? তাঁকে অপমান করিতেছিস? বুঝিতেছি, মা— অধীনতা, দাসত্ব ভয়ানক নরক। তোমার পাতকী সন্তানকে উদ্ধার করো। লোহার শিকল ছিঁড়ে দাও, ভাই-বন্ধুদের লইয়া স্বাধীন পাখি হইয়া উড়িয়া বেড়াই, স্বর্গের বাগানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করি; স্বর্গের ফল ভক্ষণ করি। আর যেন অধীনতা-পিঞ্জরে না থাকি। আকাশ-বিহারী স্বাধীন পক্ষী আকাশে উড়ুক। দয়াময়, দয়া করো, আশীর্বাদ করো, তোমার দেওয়া স্বাধীনতার সদ্‌ব্যবহার করিয়া যেন সুখী হই। পিতা, তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা।

□ রবিবার, ৫ ভাদ্র, ১৮০৪ শক, ২০ অগস্ট, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত

বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যাঁহারা বাংলা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাংলা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাংলা ভাষার লেখকমাত্রেই হয়তো বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয়তো ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়তো অপাঠ্য, নয়তো কোনো ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাংলায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কী? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাংলা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের 'ভাষায়' যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা 'বিষয়ী লোক', তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোনো ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাংলা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌর-কন্যা, এবং কোনো কোনো নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাংলা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কাজই বাংলায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং, লেক্‌চর্‌, এড্রেস্‌, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখনো ষোলো আনা, কখনো বারো আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনোই বাংলায় হয় না। আমার কখনো দেখি নাই যে যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাংলায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জনের একমাত্র সোপান;

এবং বাঙালিরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভালো। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে, তাহা কেবল বাঙালির জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গি, পঞ্জাবি, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।[১] অতএব যতদূর ইংরাজি আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙালি কখনো ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙালি হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনোই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভালো। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙালি স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখনো খাঁটি বাঙালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালির বাংলা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙালির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নাই।

একথা কৃতবিদ্য বাঙালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন বাঙালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙলায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙালির উন্নতি না হইলে দেশের কোনো মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং

বাংলায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙালি কখনো বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোনো কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোনো উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন্ 'ফিল্টর ডৌন্' করিবে।[২] এ কথার তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক্ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্ হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিম্ন স্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্ন স্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে! জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেন না, তাঁহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোনো জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কী প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোনো দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোনো সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতিব পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ-ফল জন্মিবে কী প্রকারে? যে পৃথক্, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখনো কোনো দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই—যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম্, এথেন্স, ইংলন্ড, এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স,

মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স্ এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী। এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্স্ হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স্ তাহার প্রসূতি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজপীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্তপদাদিচ্ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ, এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোনো দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোনো দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙালিদিগের অভিপ্রায়সকল সাধারণত বাংলা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙালি তাঁহাদিগের মর্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর, পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙালি তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙালির উক্তি বাংলা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। কিন্তু রচনা-কালে সুশিক্ষিত বাঙালির বাংলা ভাষা ব্যবহার করার একটি বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাংলা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

'আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।'

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী। লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশ সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসৎ বিচারসক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এদিকে কোনো সুশিক্ষিত বাঙালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'মহাশয়, আপনি বাঙালি—বাংলা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনার এত হতাদর কেন?' তিনি উত্তর করেন, 'কোন্ বাংলা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।' আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাংলা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাংলা রচনা পাওয়া যায় না।

এইরূপ বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির অনাদরেই বাংলার অনাদর বাড়িতেছে।

সুশিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙালি বাংলা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙালি বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোনো বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোনো বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোনো সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য মনে করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমর স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। কিন্তু যত গর্জে, তত বর্ষে না। গর্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাংলা সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণস্বরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদিগের পূর্বতনেরা এইরূপ এক এক বার অকালগর্জন করিয়া, কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের ফলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন,

মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনোই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।

১. এখানে যাহা কথিত হইযাছে, কংগ্রেস্ এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।
২. উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবাব কথাটা এই সময়ে উঠিযাছিল। তদুপলক্ষে এই কথাটা উঠিযাছিল। উচ্চ শিক্ষাপক্ষীয লোক এই কথা বলিতেন।

❑ *বঙ্গদর্শন,* বৈশাখ ১২৭৯ (১৮৭২)

সাম্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট— ইহাই সাম্যনীতি। কৃষক ও ভূম্যধিকারীতে যে বৈষম্য, সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ করিব।*

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্, স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেই আপাতত যথেষ্ট হইবে। প্রথমত, স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙালিতেও সেইরূপ। ইংরেজ, বলবান্, বাঙালি দুর্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙালি ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ বাঙালি মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চিৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন স্টুয়ার্ট মিল্‌কৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।[১]

* বর্তমান প্রবন্ধ, 'সাম্য', পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১. Subjection of Women

স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশ স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সর্বপ্রকারে আজ্ঞানুবর্তী হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয়।

এই প্রথা সর্বদেশে এবং সর্বকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও ইংলন্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ত্ববিদ্ ইহার বিরোধী। তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্বপ্রকার সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন করিবে না? পুরুষে রাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে না? নারী পুরুষের পত্নী মাত্র, দাসী কেন হইবে?

আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার শতাংশও নহে। আমাদিগের দেশ অধীনতার দেশ, সর্বপ্রকার অধীনতা হইতে বীজমাত্রে অংকুরিত হইয়া, উর্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্মযাজকের তাদৃশ বশবর্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্তিনী, অন্যত্র তত নহে।

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ; দেবতাস্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এত দূর যে, পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্যা করিয়া থাকেন।

এই আর্য পাতিব্রত্য ধর্ম অতি সুন্দর; ইহার জন্য আর্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়। কিন্তু পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।

অস্মদ্দেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্বভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামীগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ করিতে পারেন।

১। প্রথম তত্ত্ব সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করানো ভালো। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম-এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মাত্রও মনে স্থান দেন না। যদি কেহ তাঁহাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে অনেকেই প্রশ্নকর্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, মেয়ে অত লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে না কি? যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, কেনই বা চাকরি করিবে না? তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা হরিবোল দিয়া উঠিবেন। কোনো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই জোটাইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকরি কোথায় পাইব? যাঁহারা বুঝেন যে বিদ্যোপার্জন কেবল চাকরির জন্য নহে, তাঁহারা বলিতে পারেন, "কন্যাদিগকে পুত্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্ত্রীবিদ্যালয় কই?"

বাস্তবিক বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মতো লেখাপড়া শিখাইবার উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্যতত্ত্বান্তর্গত এই নীতিটি যে অদ্যাপি পরিস্ফুট হয় নাই— লোকে যে স্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সমাজে কোনো অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়— সমাজ কিছু চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়— দ্বিতীয়, পুরুষবিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

দ্বিতীয়টির নামমাত্রে, বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলো তো অধঃপাতে যাইবেই; বেশির ভাগ ছেলেগুলোও যথেচ্ছাচারী হইবে।

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপত্তির অভাব নাই। মেয়েরা মেয়েকলেজে পড়িতে গেলে পর, শিশু পালন করিবে কে? বালককে স্তন্যপান করাইবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুর্দশ বৎসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে, তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও সাধ্য নহে— কেন না ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধূ বা কুলকন্যা, গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কলেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে?

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখিতে চাই যে, যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ববিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। সাম্যতত্ত্বান্তর্গত সমাজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে গ্রন্থিত, যদি স্ত্রী পুরুষ সর্বত্র

সমানাধিকারবিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে, কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করানো স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা স্ত্রীরই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধর্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহকর্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকর্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নির্বিঘ্ন হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে। অপরঞ্চ পুরুষগণ নির্বিঘ্নে যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহা কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে। বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে।

কথাটি আর এক প্রকারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয়, সকলেই বলিবেন, 'বিধেয় বটে।'

তারপর জিজ্ঞাস্য, কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে, চাকরির জন্য।[২] বোধ হয় এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জন এবং বুদ্ধি মার্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখানো উচিত।

তারপর জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘকর্ণ দেশীয় গর্দভশ্রেণী বলিবেন, চাকরির জন্য, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। অন্যে বলিবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জন, এবং বুদ্ধি মার্জনের জন্যই পুরুষের লেখাপড়া শিক্ষা প্রয়োজন। অন্য যদি কোনো প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নহে। গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষে সমান।

অতএব বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার করিতে হইল। এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকর্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সর্বত্র সাম্য স্বীকার করিতে হয়।

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয়। বিধবাবিবাহ ভালো কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভালো কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালোও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভালো নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামতো বিবাহে অধিকার থাকা ভালো। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালো বাসিয়াছিল সে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও

২. সাম্যবাদী বলেন, চাকরির জন্যও বটে।

পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোনো বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, 'যদি' পুরুষ পুনর্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। তিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের কর্তা পুরুষজাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে; কাহারও অনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।

আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধন, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখা কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?

তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।

৩য়। কিন্তু পুরুষের যত প্রকার দৌরাত্ম্য আছে, স্ত্রীপুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য অধর্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভালো আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে! কেন? হুকুম পুরুষের।

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ, অমর্যাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি!

জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছুই নহে?

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়ার করিয়াছ যে, তাহারা এখন আর এই শাস্তিকে দুঃখ বলিয়া বোধ করে না। বিচিত্র কিছুই নহে। যাহাকে অর্ধভোজনে অভ্যস্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অর্ধভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্নাভাবকে দুঃখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জনীয় হইল না। তাহারা সম্মত হউক, অসম্মতই হউক, তুমি তাহাদিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইবে।

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাঁহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে। তাঁহারা বলেন যে, স্ত্রীগণ সমাজমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিলে দুষ্টস্বভাব হইয়া উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধর্মভ্রষ্ট করিবে। যদি তাঁহাদিগকে বলা যায় যে, দেখ, ইউরোপাদি সভ্যসমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছা সমাজে বিচরণ করিতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষতি হইতেছে? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন যে, সে সকল সমাজের স্ত্রীগণ, হিন্দুমহিলাগণ অপেক্ষা ধর্মভ্রষ্ট এবং কলুষিতস্বভাব বটে।

ধর্মরক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরনিবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দুমহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাহাদিগের ধর্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহারা কুলধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু পিছু জুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে। যে ধর্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ, সে ধর্ম থাকা না থাকা সমান—তাহা রাখিবার জন্য এত যত্নের প্রয়োজন কি? তাহার বন্ধনভিত্তি উন্মূলিত করিয়া নূতন ভিত্তির পত্তন কর।

৪র্থ। আমরা চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুষগণের বহুবিবাহে

অধিকার, তৎসম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন যে, এই অধিকার নীতিবিরুদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে, এ স্থলে স্ত্রীগণের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজসংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; পুরুষগণের অধিকার কর্তন করাই উদ্দেশ্য; কারণ, মনুষ্যজাতিমধ্যে কাহারই বহুবিবাহে অধিকার নীতিসঙ্গত হইতে পারে না।[৩] কেহই বলিবে না যে, স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় বহুবিবাহে অধিকারিণী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব যেখানে অধিকারটি নীতিসঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে কার্যাধিকারটি অনৈতিক, সেখানে উহাকে কর্তিত এবং সংকীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্বানুবর্তিতা, এই দুই তত্ত্বমধ্যে সমুদায় নীতিশাস্ত্র নিহিত আছে।

এই চারিটি বৈষম্যের উপর আপাতত বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি গর্হিত, তাহারই যখন কোনো প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে কোনো উপকার হইবে, এমত ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একটি কথার উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্বসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা, উভয়েরই এক ঔরসে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার এক প্রকার যত্ন, এক প্রকার কর্তব্য কর্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দক পাইতে পারে না। এই নীতির কারণ হিন্দুশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার যৌক্তিকতা নির্বাচন করা নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য কোনো মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী; এবং তিনি স্বামীগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বর্যে কর্ত্রী, অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মূলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র বা এবম্বিধ কোনো পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না— পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে— নচেৎ হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট

৩ কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপুত্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্যা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত। বোধ হয় বলিতেছি, কেন না, ইহা স্বীকার করিলে পুরুষের বিপক্ষেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তুত বহুবিবাহ পক্ষে বলিবার দুই একটা কথা আছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বহুবিবাহ এমন কদর্য প্রথা যে, সকল কথার উল্লেখ মাত্রেও অনিষ্ট আছে।

হউক, কুভাষী, কদাচারী হউক, সকল সহ্য কর— অবাধ্য, দুর্মুখ, কৃতঘ্ন, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক— নচেৎ ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোনো সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্র তাড়াইয়া দিল তো সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার উপায় নাই— সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্বাধিকারী— স্ত্রীর ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোনো বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং নীতিবিরুদ্ধ।

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাপ্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্তিনী থাকে বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর— পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়; পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবত দুশ্চরিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা— পতি অপুত্রক মরিলে। এইটুকু হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আর্যব্যবস্থাশাস্ত্রকে কোনো কোনো অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভালো মাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী বটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহে। এ অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণপোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবনকালমধ্যে আর কাহাকেও কিছু দিবেন না, এই পর্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারানি স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্মনিষ্ঠা স্ত্রী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার উত্তরেরও অভাব নাই— স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমতি, বিষয়রক্ষণে অশক্ত। হঠাৎ সর্বস্ব হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এ জন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্থৈর্য, চতুরতায় পুরুষাপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহে। বিষয়রক্ষার জন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া বিষয়কর্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ। সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বিষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে মুড়ি রাখিয়া পরে পাঁটা কাটা যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা— কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়!

স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। কয় বৎসর পূর্বে হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য বিষয় এই— অসতী স্ত্রী,

বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। যা! এতকালে হিন্দুস্ত্রীর সতীত্বধর্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীত্বধর্ম রক্ষা করিবে না! বাঙালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না— রাজাজ্ঞা নহিলে চাঁদায় সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মর্মস্থানে বাজিয়াছিল যে, হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি করিয়া, প্রিভিকৌন্সিলে আপীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সংবাদপত্র 'হা সতীত্ব! কোথায় গেলি' বলিয়া ইংরেজি বাংলা সুরে রোদন করিয়া 'ওরে চাঁদা দে!' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না; কেন না, দেশী সংবাদপত্র পাঠসুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হউক, যাঁহারা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভালো হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগের সতী করিতে চাও— সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্মভ্রষ্ট স্ত্রী বিষয় পাইবে না; ধর্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্মভ্রষ্ট পুরুষ,— যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলেই বিষয় পাইবে; কেন না, সে পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্মশাস্ত্র, তবে অধর্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমনতর?

স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম সর্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার, ততই ভালো, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোনো কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রীগমন করুক, পরদারনিরত হউক, তাহার কোনো শাসন নাই কেন? শাস্ত্রে ভূরি ভূরি নিষেধ আছে; সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম, লোকেও একটু একটু নিন্দা করিবে— কিন্তু এই পর্যন্ত। স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোনো সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোনো দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়তো আত্মীয় স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য করিয়া রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোনো প্রকার ব্যবহারে সংকুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোনো প্রকার দাবি-দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য।

আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্বনিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় স্ত্রীগণ উপার্জন করিতে পারে না। সত্য বটে, উপার্জনকারী পুরুষেরা আপন আপন পরিবারস্থা

স্ত্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এ দেশে আছে যে তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, এমন কেহই নাই। বাংলার বিধবা স্ত্রীগণকে বিশেষত লক্ষ্য করিয়াই আমরা লিখিতেছি। অনাথা বঙ্গবিধবাদিগের অন্নকষ্ট লোকবিখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তাহারা উপার্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। সত্য বটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোনো বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী কন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়— তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প। অন্য কোনোপ্রকারে ইহারা যে উপার্জন করিতে পারে না, তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমত তাহারা দেশী সমাজের রীত্যনুসারে গৃহের বাহির হইতে পারে না। গৃহের বাহির না হইলে উপার্জন করার অল্প সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্ত্রীগণ লেখাপড়া বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিতা নহে; কোনোপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপার্জন করিতে পারে না। তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার এবং বিদেশী শিল্পীরা প্রতিযোগী; এ দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা বাণিজ্যে অন্ন করিয়া সংকুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি করিবে?

এই তিনটি বিঘ্ন নিরাকরণের একই উপায়— শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষত স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক্, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন— তাঁহাদিগের যশ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয় জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক অ্যাসোসিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে— কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্মনীতি, কাহার উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙলার অর্ধেক অধিবাসী, স্ত্রীজাতি— তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয় দিনের ভিতব অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

যায় না; কেন না, তাহাতে রঙ্ তামাশা কিছু নাই। কিছু করা যায় না; কেন না, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, স্টার অব্ ইন্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?

কলিকাতায় চড়ক পার্বণ

কালীপ্রসন্ন সিংহ

'কহই টুনোয়া—
সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি'— *টুনোয়ার টপ্পা।*

হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে,
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান"
এ কুৎসিতে! কোন লাজে সপত্নী-সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে— দুষিবে জগৎ— হাঁসিবে
সতিনী পোড়া ; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
কুমার— সে সময় মনে যান থাকে ; চির অনুগত লেখনীরে।

১২০২ সাল। কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকের বাদ্দি শুনা যাচ্চে, চড়কীর পিঠ সড় সড় কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে,— সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ের নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার আর সেপাইপেড়ে ঢাকাই শাড়ি মালকোচা করে পরা, ছোপানে তারকেশ্বরে গাম্ছা হাতে, বিল্বপত্র-বাঁধা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারির আনন্দের সীমা নাই— 'আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজন!'

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন। সেকালে নিম্কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল ; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান— সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড়মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদি বড়মানুষ কব্লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে— বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারি ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত— বাড়িতে ক্রিয়ে-কর্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে ; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আর্কবরী মোহরপোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।

এদিকে দুলে, বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে, উত্তরী সুতা গলায় দিয়ে নিজ

নিজ বীর-ব্রতের ও মহত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে, ও লোকের উঠানে ঢাকের ও ঢোলের সঙ্গতে নেচে বেড়াচ্চে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে ; গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েচে— ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ি করে তুলেচে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রোদে রোদে রপ্টে রপ্টে বেড়াচ্চে ; কখন 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব' চিৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে। কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে ; কখন ঢাকের পেছনটা দুম্ দুম্ করে বাজাচ্চে— বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা-ঝাপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূলসন্ন্যাসী কাণে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুটো বিল্বপত্র নিয়ে ধুঁক্তে ধুঁক্তে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো ; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবুকে তারে নমস্কার কত্তে হলো ; মূলসন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাসের উপর দিয়ে গিয়ে বাবুর মাথায় আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,— বাবু তটস্থ!

বৈঠকখানায় মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজ্‌লো, সূর্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগলো। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ ড্রাইভিং বগী ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেন্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন ; কেউ বাগানে চল্লেন। দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরই পেছনে মালভরা মোদাগাড়ি চল্লো ; পাছে লোকে জান্তে পারে, এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সহিস-কৌচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন। কেউ কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন, খাতির নদারৎ— কুঠিওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো ; সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তিযোগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে— শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্চে। প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না ; কি হবে! বাড়ির ভিতরে খবর গেল ; গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ণবদনে 'কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে' বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন— উপস্থিত দর্শকেরা 'বোধ হয় মূলসন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাক্‌বে, সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়' এই বলে নানাবিধ তর্কবিতর্ক আরম্ভ কল্লে ; অবশেষে গুরু-পুরুত ও গিন্নির ঐকামতে বাড়ির কর্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে— 'মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে, ফুল তো পড়ে না, সন্ধ্যা হয়।'— বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোযাক পরা, রেশমি-রুমালে বোকো মেকে বেরুচ্ছিলেন— শুনেই অজ্ঞান! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়ে-কাণ্ড বন্দ করা হয় না ; অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌কান পরে সেই সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন— বাবুকে আসতে দেখে দেউড়ির দারোয়ানেরা আগে আগে সার গেঁথে চল্লো ; মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ মনে করে বিষণ্ণবদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগ্‌লো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে 'ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব' বলে চিৎকার কত্তে লাগলো ; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।— বড় বড় হাতপাখা দুপাশে চলতে লাগ্‌লো। বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে আজ বাবু বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দু-হাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে বেশমি-রুমাল গলায় দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন ; পুরোহিত শিবের কাছে 'বাবা ফুল দাও, বাবা ফুল দাও' বারংবার বলতে লাগলো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাথায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাথা ঘুরুতে লাগলো, আধঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাথা থেকে এক বোঝা বিল্বপত্র সরে পড়্‌লো। সকলের আনন্দের সীমা নাই, 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো' বলে চিৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠলো 'না হবে কেন— কেমন বংশ!'

ঢাকের তাল ফিরে গেল। সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজনতলায় বিশ আঁটী বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপব রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো : কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুইজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে— সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো। উঃ। 'শিবের কি মাহাত্ম্য!' কাঁটা ফুট্‌লে বলবার যো নাই! এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু একজন কুটেল চোরা-গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মতো অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন, বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্‌তে পাল্লে না। কিন্তু আমরা সব দেখতে পাই। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো ; একজন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উলটো ঝাঁপ খেলে ; সজোরে ঢাক বেজে উঠলো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগলেন-- গিন্নীরা বলে দিয়েছেন— 'ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।'

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ থাম্‌লো। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েচে। 'বেলফুল', 'বরফ', 'মালাই', চীৎকার শুনা যাচ্ছে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে, অথচ খদ্দের ফিচ্চে না। ক্রমে অন্ধকার গা-ঢাকা হয়ে এলো ; এ সময় ইংরাজি জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে— রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইযারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজি কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢুঁ মেরে মেরে বেড়ে বেড়াচ্চেন ,এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা-পেষা দেখে বাড়ি ফির্‌বেন। মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণাগাজির গলি ও আহিরীটোলার চৌমাথা লোকারণ্য— কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন, কেউ তাঁরে চিন্‌তে পারবে না। আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে কেসে হেঁচে লোঁককে জানান দিচ্চেন যে, 'তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।'

সৌখীন কুঠিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন।

পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চিৎকার করে— বিদ্দেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়্ছে। পীল-ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্তে শিখ্‌চে। স্যাকরারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই এক খানা কাপড়, কাঠ-কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে ; রোকোড়ের দোকানদার ও পোদ্দার ও সোণার বেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাট্‌চে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোণা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের— 'ও গাম্‌চাকাঁদে, ভাল মাচ নিবি?' 'ও খেংরা-গুঁপো মিন্সে, চার আনা দিবি' বলে আদর কচ্চে— মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা লাঠি হাতে করে কাণা সেজে 'অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ' বলে ভিক্ষা করে বৌভাতের সম্বল কচ্চে। এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো।' চিৎকার হতে লাগ্‌লো ; গোল উঠ্‌লো, এবারে ঝুলসন্ন্যাস। বাড়ির সাম্‌নের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে ; বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হুজুরেরা দারোয়ান চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজনতলায় ঘুর-ঘুর কচ্চেন।

ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বেলে ভারার নীচে ধল্লে ; একজনকে তার উপরপানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুঁড়ো ধুনো ফেলতে লাগ্‌লো; ক্রমে একে একে অনেকে ঐ রকম করে দুল্লে, ঝুলসন্ন্যাস সমাপন হলো ; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্বের মতো সেতার বাজতে লাগ্‌লো, বেলফুল, বরফ ও মালাই যথামতো বিক্রি করবার অবসর পেলে ; শুক্রবারের রাত্রি এই রকমে কেটে গেল।

আজ নীলের রাত্তির, তাতে আবার শনিবার। শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুল্‌জার থাকে। পানের খিলির দোকানে বেললণ্ঠন আর দেয়ালগিরী জ্বল্‌চে। ফুর্‌ফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলচে। রাস্তার ধারেই দুই একটা বাড়িতে খেম্‌টা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুঙুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন ; কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা একজন চোর ধরে বেঁধে নে যাচ্চে— তার চারিদিকে চার পাঁচ জন হাস্‌চে আর মজা দেখ্‌চে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে ; তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়বে, তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজনতলায় চিৎপুরের হর ; ওদের মাটে সিঙ্গির বাগানের প্যালা ; ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি। আজ সহরের গাজনতলায় ভারী ধুম— চৌমাথার চৌকিদারদের পোহাবারো! মদের দোকান খোলা না থাক্‌লেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে— 'ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটীটি পাচ্চে না,' 'পালেদের একখানা পেতলের বাসন গেচে' ও 'গন্ধবেণেদের সর্বনাশ হয়েচে।' আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়— থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হর্‌রা ও 'বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব' চিৎকার।

এ দিকে গির্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো— বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েচে। উড়ে বামুনেরা ময়দার দোকানে ময়দা পিস্তে আরম্ভ

করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুর্‌ফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেচে ; দু একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন,— 'রামের মা চল্‌তে পারে না,' 'ওদের ন-বউটা কি বজ্জাত মা' 'মাগি যেন জক্কী' প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে রত দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েছেন! চিৎপুরের কসাইরা মটনচাপের তার নিয়ে চলেছে। পুলিসের সার্জন, দারোগা জমাদার প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্‌ মস্‌ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন। সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট, পরিপূর্ণ— হুজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মতো হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্‌ গস্‌ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন— সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেন্ড নিয়তই কাছে থাকে 'হারমোনিয়াম' ও 'পিয়ানো' বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান। সুতরাং ইনস্পেকটর মহলে একাদশ বৃহস্পতি!!!

গুপুস্‌ করে তোপ পড়ে গ্যাল! কাকগুলো কা কা করে বাসা ছেড়ে ওড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানিরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে, দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে, হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্‌সা হয়ে এলো— মাচের ভারিরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে— মেচুনিরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েচে। বদ্দিবাটির আলু, হাসমানের বেগুন বাজরা বাজরা আস্‌চে, দিশি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ি পাল্কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন। জ্বরবিকার, ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন ;কলিকাতা সহরেও দু-চার গো-দাগাকে প্রাক্‌টিস্‌ কত্তে দেখা যায়, এদের অষুধ চমৎকার ; কেউ বলদের মতন রোগীর নাক ফুঁড়ে আরাম করেন; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন। সহুরে কবিরাজেরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ ; সকল রকম রোগেই 'সদ্য মৃত্যুশ্বর' ব্যবস্থা করে থাকেন— অনেকে চাণক্য-শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেচেন।

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে ;আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্নিং-ওয়াকে বেরুচ্চেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েচে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েচে। হরিণমাংসের মতো কোনো কোনো বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকেরা পান না— ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেক্‌ফাস্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য উদয় হলেন।

সেক্সন্‌-লেখা কেরানির মতো কলুর ঘানির বলদ বদ্‌লি হলে ; পাগড়িবাঁধা দলের

প্রথম ইনস্টলমেন্টে— শিপ-সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম বেরুলেন। আজ গবর্নমেন্টের অফিস বন্ধ ; সুতরাং আমরা ক্লার্ক কেরানি, বুক্‌কিপার ও হেড রাইটারদিগকে দেখ্‌তে পেলাম না। আজকাল ইংরাজি লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে অফিসে যান— পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যাল— দুই এক জন সেকেলে কেরানিই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেচেন ; তাঁরা পেন্সন নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগ্‌ড়ি দেখতে পাব না ; পাগ্‌ড়ি মাথায় দিলে, আলবার্ট-ফেশনের বাঁকা সিঁতেটি ঢাকা পড়ে, এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম ও পরামাণিকদের পাগ্‌ড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েচে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে। হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হোক্ না, চোটাখোর বেণের ঘরে ও টাকাওয়ালা বাবুদের বাড়িতে একবার যেতেই হবে। 'কার বাড়ি বিক্রি হবে,' 'কার বাগানের দরকার', 'কে টাকা ধার কর্‌বে', তারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার-বেণে সহরে বাবুরা দালাল চাকর রেখে থাকেন ; দালালেরা শীকার ধরে আনে— বাবুরা আড়ে গেলেন!

দালালি কাজটা ভাল, 'নেপো মারে দইয়ের মতন' এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায় ; অনেক 'রেস্তহীন মুচ্ছুদি' চার বার 'ইন্সলভেন্ট' নিয়ে এখন দালালি ধরেছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালির দৌলতে 'কলাগেছে থাম' ফেঁদে ফেল্লেন। এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন, হেন কর্মই নাই। পেসাদার চোটাখোর বেণে— ও ব্যাভার-বেণে বড়মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতিজাল পাতা থাকে ; দালাল বিশ্বাসের কলসি ধ'রে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন; সুতরাং মনের মতো কোটাল হলে চুনোপুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারিদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সূতোশোণ, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুঁড়ে, একেবারে মরিয়া হয়ে নাচতে নাচতে কালীঘাট থেকে আসচে। বেশ্যালয়ের বারান্ডা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ; সকের দলের পাঁচালি ও হাপ-আখড়াইয়ের দোহার, গুলগার্ডেনের মেম্বরই অধিক— এঁরা গাজন দ্যাখবার জন্য ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড়মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন; কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও— 'সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড' বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা। কি করেন, বড় দাদা সেজো পিসে বর্তমান— আবার ঠাকুরমার এখনও কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরওয়াল ফোঁড়া, দেখতে ভালোবাসেন। প্রতিমা-বিসর্জনের দিন পৌত্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্সে হয়েও হীরেবসান টুপি, বুকে জরির কারচোপের কর্মকরা কাবা ও গলায় মুক্তোর মালা, হীরের কণ্ঠী, দু'হাতে দশটা আংটি পরে 'খোকা' সেজে

বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়তো তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর— ভাগ্নের চুল পেকে গ্যাছে।

অনেক পাড়াগাঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদাপর্ণ করে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারি ও মোৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হলে, ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগাঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোণা লাগত, এখন লোণা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিস লেগে থাকে— অনেকে তার দরুণ একেবারে আঁত্‌কে পড়েন; ঘাগি গোচের পাল্লায় প'ড়ে শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই এক জন জমিদার প্রায় বারো মাস এইখানেই কাটান; দুপুরবেলা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ-বারো মোসাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মতো পোষাক, গলায় মুক্তোর মালা; দেখ্‌লেই চেনা যায়, ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ— বিদ্যায় মূর্তিমান মা! বিসর্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা-নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত— মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গ্রেপ্তারি ও মহাজনের ডিক্রির দরুণ গা-ঢাকা দেন। রবিবার, পাল-পার্বণ, বিসর্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে-গুজে গাড়ি চড়ে বেরোন।

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোনো কথা নাই। কারণ, দু-একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছিতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্‌ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোঁড়স্যা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে চব্বিশ ঘণ্টা সোণাগাছিতে কাটান। লোকের বাড়ি চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জ্যেঠা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতি কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয়— পেড়াপেড়ী হলে দেশে সরে পড়েন— সেথায় রামরাজ্য!

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নাম্‌লেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে, সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল-পেস হন। দালাল বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ির যোগাড় করা, খ্যামটা-নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটীকেল এজেন্টের কাজ করেন। বাবুকে সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়ম— বালির ব্রিজ,— বাগবাজারের খালের কলের দরজা— রকমওয়ারি বাবুর সাজানো বৈঠকখানা— ও দু-এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ি দেখিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টি কর্মে মক্‌রর হয়।

আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দু'টি দল হয়েছেন; প্রথম দল উঁচু-কেতা সাহেবের গোবরের বস্‌ট', দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গির জঘন্য প্রতিরূপ'; প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল-চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে

ব্রান্ডি ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া; হরকরা ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে; পলিটিক্স ও 'বেস্ট নিউস অব দি ডে' নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন! এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, কেবল সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস— উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নির্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওল্ড ক্লাস।

দ্বিতীয়ের মধ্যে— বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বল্‌তে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে পেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ স্বার্থসাধনার্থ স্বদেশের ভালো চেষ্টা করেন। 'ক্যামন করে আপনি বড়লোক হব', 'ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাক্‌বে,' এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা— পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁফে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসি, এঁদের কাছে দাতব্য দূর পরিহার— চার আনার বেশি দান নাই।

সকালবেলা সহরের বড়মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকিলের বাড়ির হেড কেরানি তীর্থের কাকের মতো বসে আচেন। তিন-চারিটি 'ইটুকী', দুটি 'কমন্ লা' আদালতে ঝুল্‌চে। কোথাও পাওনাদার বিল-সরকার উট্‌নোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন-চার মাস হাঁট্‌চে, দেওয়ানজি কেবল আজ না কাল কচ্চেন। 'শমন', 'ওয়ারিন' 'উকিলের চিঠি' ও 'সফিনে' বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা মনে করে অন্তর্দাহ কর্চে। 'য়্যায়সা দিন নেহি রহেগা' অঙ্কিত আঙ্গটী আঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তিলাভ কত্তে পাচ্চেন না। কোথাও একজন বড়মানুষের ছেলে অল্পবয়সে বিষয় পেয়ে, কান্নেখেকো ঘুঁড়ির মতো ঘুরচেন। পরশুদিন 'বউ বউ', 'লুকোচুরি', 'ঘোড়াঘোড়া' খেলেচেন, আজ তাঁকে দেওয়ানজির কূটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকিলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে স'রে বস্‌তে হবে, নইলে ওঠ্‌সার কিস্তিতেই মাত! ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার;— কেউ 'স্বর্গীয় কর্তার পরম বন্ধু', কেউ স্বর্গীয় কর্তার 'মেজোপিসের মামার খুড়োর পিসতুতো ভেয়ের মামাতো ভাই' পরিচয় দিয়ে পেস হচ্চেন। 'উমেদার', 'কন্যাদায়' (হয়তো 'কন্যাদায়ের' বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুট্‌চেন, আসল মতলব দ্বৈপায়নহ্রদে ডোবান রয়েচে, সময়ে আমলে আস্‌বে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েচে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পুরে গ্যাছে। নানা রকম বেশ— কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগ্‌লেস আঁটা শাইনিং লেদর; কারো ইন্ডিয়া রবর আর চায়না কোট; হাতে ইস্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ডচেন গলায়; আলবার্ট ফেশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু-পাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয়রা দাঁড়িয়েচেন, ছোট আদালতের উকিল সেক্সন রাইটার, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী,

ঢাকাই কামার আর ফলারে যজ্‌মেনে বামুনই অধিক— কারু কোলে দুটি মেয়ে— কারু তিন্‌টে ছেলে।

কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন— কাছে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া— সুবর্বন চৌকিদারের মতো পোষাক— পেনটুলন, ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপি। আদালতি সুরে হাত-মুখ নেড়ে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন— হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা একমনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বল্‌চেন, কিছুই বুঝতে পাচ্চে না। পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রিস্টান হতো; কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে আর দিশি খ্রিস্টানদের দুর্দশা দেখে খ্রিস্টান হতেও ভয় হয়!

চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে কাদা হয়— ধুলোয় ধুলো; তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁদে কাঁদে করেছে— কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেছে— তার পেচোনে এলোমেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সঙ্গতে 'ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা, ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা,' ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থানমত তক্‌মাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা সেপাই। মধ্যে সর্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি-মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায়, শিব ও পার্বতী-সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুঁড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেচে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়িমাছ বাঁধা। সেট্‌কে সেট্‌ ঢাকে ড্যানাক্‌ ড্যানাক্‌ করে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগ্নে, ছোট ভাই বা পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ি চড়ে চলেচেন— তাঁরা রাত্রি তিনটার সময় উঠেচেন, চোক্‌ লাল টক্‌টক্‌ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে ও কালীঘাটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেপ্‌চে— হুড়মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পোড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে— তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুমমতো সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট-ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে, অমনি মার্শাল ল জারি হলো,— 'ঢাক বাজালে থানায় ধরে নিয়ে যাবে।' ক্রমে দুই-একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রেই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন— দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সহরটা কিছুকালের মতো জুড়ুলো। বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুক্‌লো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে গিয়ে হাতপাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেল্লে। গাজনতলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো— এ বছরের মতো বাণফোঁড়ার আমোদও ফুরুলো। এই রকমে রবিবারটা দেখতে দেখতে গ্যাল।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্বকালের এক বৎসর গ্যাল দেখে যুবক-যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদির নির্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গেল। দেখে আহ্লাদের পরিসীমা রইল না। আজ বুড়োটি বিদেয় নিলেন, কাল যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা যেসব কষ্ট ভোগ করেচি, যেসব ক্ষতি স্বীকার করেচি— আগামীর মুখ চেয়ে, আশার মন্ত্রণায়, আমরা সেসব মন থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জন দিলেম। ভূতকাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন— বর্তমান বৎসর স্কুল-মাস্টারের মতো গম্ভীর ভাবে এসে পড়লেন— আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরাণ হাকিম বদ্‌লি হলে নীল-প্রজাদের মন যেমন ধুকপুক্ করে, স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠ্‌লে নতুন মাস্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে— মড়ুঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আদর করেন। আগামীকে দাঁড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ করে ন্যান— নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালিরা বছরটি ভাল রকমেই যাক্ আর খারাবেই শেষ হোক্, সজনেখাঁড়া চিবিয়ে, ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধূলো দিয়ে, পুরাণকে বিদায় দ্যান। কেবল কলসি, উচ্ছুগ্‌গু কর্তারা আর নতুন খাতাওলারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন— আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বেন। এবারে উক্ত সমাজের কোনো উপাচার্য বড় ধূম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসব হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদ্‌তেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাক্‌লে তিনি বুজতে পারবেন না— আড্ডা থেকে না ডাক্‌লে শুন্‌তে পাবেন না? ক্রমে কৃশ্চানি ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ্ পুকুর থেকে তুলে, মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি-কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটিং ও স্টেট ক্যারেজে নানারকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন; কেউ কাঁসারীদের সঙের মতো পাল্কীগাড়ির ছাতের উপর বসে চলেচেন! ছোটলোক, বড়মানুষ ও হঠাৎ-বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই--- বামুন-কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরে নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন; ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো— সন্ধ্যার পর দু-খানি চাপাটি ও একটু ন্যাব্‌ড়ানোর বদলে— ফাউলকারী ও রোল রুটি ইন্ট্রডিউস্ হলো। শ্বশুরবাড়ি আহার করা, মেয়েদের

বাঁ-নাক বেঁধান চলিত হলো দেখে বোতলের দোকান, কড়ি গণা, মাকু ঠেলা ও ভালুকের লোমব্যাচা কোলকেতায় থাক্‌তে লজ্জিত হতে লাগলো। থরকামান চৈতন্যফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্তি হলেন। চাবির থলো কাঁদে করে টেনা ধুতি পরে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না; সুতরাং অবস্থাগত জুড়ি, বগী ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু-একজন ভদ্রলোক, মোসাহেব, তক্‌মা-আরদালী ও হরকরা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে-কৌশলে, বেণেতী বেসাতে টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোটলোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুনওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেছেন-- প্রায় অনেকেরই এক-একটি পোষা পাশবালিশ আছে— 'যে আজ্ঞে' ও 'হজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক' বলবার জন্য দুই-এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ-কর্মে দানের দফায় নবডঙ্কা! কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিস্টের খরচে— চার-পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউন্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শিগ্‌গির ফুরায় না, বারোইয়ারি পূজোর প্রতিমা-পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসি, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে— সেসব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাট্‌কা চড়ক টাট্‌কা-টাট্‌কাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মুহুরি দেওয়া তল্‌তাবাঁশের বাঁশি, হলদে রং-করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তইরি গুড়িয়া পুতুল, শোলায় নানাপ্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির-করা হাঁড়ি বিক্রি কত্তে বসেছে; 'ড্যানাক্‌ ড্যানাক্‌ ড্যাডাং ডাং চিংড়িমাছের দুটো ঠ্যাং' ঢাকের বোল বাজ্জে; গোলাপি খিলির দোনা বিক্রি হচ্চে। একজন চড়্‌কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে— মৈয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়্‌কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়্‌কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে নেড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল 'দে পাক দে পাক' শব্দ, কারু সর্বনাশ, কারু পৌষমাস। একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার হাজার লোক মজা দেখ্‌চেন।

পাঠক! চড়কের যথাকিঞ্চিৎ নক্সার সঙ্গে কলিকাতার বর্তমান সমাজের ইনসাইট জান্‌লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে 'সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি!'

বিবাহের জন্য পূর্ব্বরাগ আবশ্যক কি না?

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

বিবাহের পূর্বে স্ত্রী পুরুষের অন্তঃকরণে পরস্পবের প্রতি যে অনুরাগ বা ভালোবাসা জন্মে, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে পূর্বরাগ এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। কবিতার সংসারে পূর্বরাগ ব্যতীত বিবাহ এক প্রকার মহাপাতক বলিয়া ধর্তব্য করে। ইউরোপের লোকাচার মধ্যেও তাদৃশ এক সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের এই এক গুণ আছে যে, তাহাদিগের অন্তঃকরণ অতি বিশাল আয়তনবিশিষ্ট, সেই অন্তঃকরণে সর্বপ্রকার ভাব স্থান পাইয়া থাকে। মনুষ্যের মনের এমন কোনো ভাব বা চিন্তা বা প্রবৃত্তি নাই, যাহার তাৎপর্যগ্রহ করিতে ইউরোপীয়েরা অক্ষম। তাহাদিগের এই গুণের বিশেষ পরিচয় আমি অদ্য জেয়াঁ জাক্ রুশো পাঠ করিতে করিতে পাইতেছি। রুশোর নাম পাঠকেরা অনেকে অবগত আছেন। ইনি ফরাসি ভাষার একজন অত্যুৎকৃষ্ট রচয়িতা। তদ্ব্যতীত, ফরাসি-বিপ্লব নামক যে তুমুল কাণ্ড অদ্য এক শত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়া এখনও ইউরোপ মণ্ডলকে সম্পূর্ণ সুস্থিরতা লাভ করিতে দেয় নাই, রুশোর রচনা অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির রচনার সহিত সেই তুমুল কাণ্ডের সংঘটন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। রুশোর রচনা পাঠ করিলে তাহার কিছু কিছু তত্ত্বও পাওয়া যায়। এমন পরিষ্কার প্রাঞ্জল শব্দবিন্যাস অভাবনীয়; অথচ এরূপ মধুমাখা ভাবের পরিপাটি আর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। রুশোর রচনার গুণে উত্তম অধমবৎ প্রতীয়মান হয়, ধর্মের মূর্তি অধর্মের ন্যায় হইয়া যায়, অন্ধকার আলোকের রূপ ধারণ করে। আর রুশো এই ক্ষমতা কেবল তর্কের দ্বারা বা প্রৌঢ়িবাদের প্রভাবে প্রকাশ করেন না; শুদ্ধ বর্ণনার চাতুরিতে। তিনি এরূপ বর্ণনা করিয়া তুলিতে পারেন, যাহাতে আমাদিগের বোধ হইবেক যে, সভ্যতা কেবল ভ্রম মাত্র, অসভ্য জাতিরাই যথার্থ মানুষ, বিদ্যাসাগর হওয়ার চেয়ে সাঁওতাল হওয়া ভালো, কালিদাস অধ্যয়নের অপেক্ষা বন মধ্যে 'হাও হাও' করিয়া চিৎকার করা প্রশংসনীয়। সেই রুশো একস্থলে পূর্বরাগের বিষয়ে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এরূপ আছেন, যাঁহারা ইংরেজদিগের উপর এতদূর পর্যন্ত হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন যে, উহাদিগের কোনো আচার বা ব্যবহার তাঁহাদিগের ভালো লাগে না। ইংরেজদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্বে অনুরাগ পরীক্ষার নিয়ম আছে. এই নিমিত্ত উল্লিখিত কৃতবিদ্যগণ আমাদিগের চিরাগত ব্যবহারই শ্রেয়স্কর বলিয়া সমর্থন করিতে উদ্যত। তাঁহারা রুশোকে সহকারী দেখিলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন, এই নিমিত্ত রুশোর অভিমত আমি প্রকাশ

করিতেছি। রুশো এই বিষয়ে বিশেষ খেলা এই খেলিয়াছেন যে, চিরকাল 'ভালোবাসা ভালোবাসা' করিয়া উন্মত্ত এরূপ একটি স্ত্রীলোকের মুখ দিয়া ঐ সকল কথা বাহির করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম না হইতে হইতেই একজন নবীনবয়স্ক স্বীয় শিক্ষকের প্রতি প্রেমে 'হাবুডুবু' খাইয়া পরিশেষে পিতার নিতান্ত জেদে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের এক স্বামীকে পাণি দান করিয়া, তার পর আপনার পূর্ব প্রণয়ীকে কি লিখিতেছেন, পাঠক তাহা শুনুন। 'আমার বরাবর একটি ভ্রম ছিল, আর বোধ হয় তোমারও অদ্যাপি সে ভ্রম আছে যে পূর্বরাগ না হইলে দাম্পত্য সুখ পাওয়া যায় না, কিংবা স্ত্রী ও স্বামীতে ভালোবাসা না থাকিলে সুখে জীবন যাপন হয় না। কিন্তু এ সংস্কার ভ্রান্তিমূলক। যদি স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই শুদ্ধসত্ব ও ভদ্র হয়, ধর্মপরায়ণ হয়, যদি তাহাদের কতকটা মিল থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। 'মিল' বলিতে অবস্থাগত সৌসাদৃশ্য বলিতেছি না, অর্থাৎ দুজনেই যে বড়মানুষ অথবা দুজনেই যে গরিব হওয়া চাই, তাহা বলিতেছি না; অথবা দুজনেই যে সমবয়স্ক হওয়া চাই, তাহা বলি না। কিন্তু যদি উভয়ের স্বভাব ও মেজাজ কতকটা মেলে, তাহা হইলেই চলে। তাহা হইলেই উভয়ের মধ্যে কালসহকারে এরূপ একটি টান জন্মিয়া যায়, যাহা অতি উপাদেয়। পরস্পরের প্রতি সেই টানটি বিবাহ হইতেই উৎপন্ন হয়; সেটি ঠিক 'ভালোবাসা' বা 'প্রণয়' বা 'অনুরাগ' পদবাচ্য না হউক, কিন্তু সেটি ভালোবাসার মতো চমৎকারিতা ধারণ করে, ভালোবাসা অপেক্ষা উহার মিষ্টতা খাটো নহে; অথচ উহা ভালোবাসা অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী। ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে নানান্ উদ্বেগ, নানান্ জঞ্জাল; প্রথমত পাছে হাতছাড়া হয় এই আশঙ্কা, পাছে আর এক জনকে ভালোবাসে এই ভাবনা; দ্বিতীয়ত, না দেখিলে বুক জ্বলে, প্রাণ কেমন করে, মনে সুখ থাকে না। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার দাম্পত্য সম্বন্ধের পক্ষে উপযুক্ত নহে। পরিণয়ের প্রকৃতি এই যে, পরিণীত দুটি ব্যক্তি স্থিরধীর ও অব্যগ্রভাবে গৃহধর্ম পালন করিবে, সংসারসুখ অনুভব করিবে, শান্তিরস আস্বাদন করিবে, তাহার মধ্যে বুকফাটাফাটি বা মানভঙ্গ বা বিচ্ছেদ বিরহের জ্বালা, এই সকল লইয়া কি হইবে? বিবাহের তো এইমাত্র উদ্দেশ্য নহে যে দুই জনে ক্রমাগত পরস্পরের মূর্তি ধ্যান করিতে মগ্ন থাকিবে, অহর্নিশি সেই রূপ হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে, তাহারে ভিন্ন আর কাহারেও ভালো লাগে না ইত্যাদি। এই সকল অবস্থা ভালোবাসাব পক্ষে সাজে বটে, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সাজে কি? তাঁহারদিগকে কি লোকলোকতা আহার ব্যবহার দেখিতে হইবে না, কুটুম্ব সাক্ষাৎ আত্মীয়-স্বজনের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে? আর আর সামাজিক কার্যে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, গৃহস্থালি বিসর্জন দিতে হইবে, সন্তান-সন্ততির লালন পালন অপরের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে? দুজনের যদি পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকে, তো ঘটে কি? যেন পৃথিবীতে তাহারা ছাড়া আর কেহ নাই, সংসার উচ্ছন্ন যাউক না, তাহারা দুজন থাকিলে কিছুরই অভাব হইবে না, পরস্পর পরস্পরের জন্য ব্যতিব্যস্ত; কথা যেন ফুরায় না; একজন যেন অপরের মাধুরী শেষ করিতে পারে না; যেন সেই মাধুরীর ভাণ্ডার অক্ষয় অপরিসীম ও অনন্ত; যেন পরস্পরকে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো কাজই নেই; আর কোনো কর্তব্য কর্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী-

পুরুষের এরূপ হইলে চলে না; তাহাদের আরো ঢের ধান্দা আছে; কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া দুজনে বসিয়া থাকিলেই তাহাদের চলে না; অন্য অশেষ কর্তব্য তাহাদিগকে সমাধা করিতে হয়; অশেষ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হয়। বোধ হয়, মানুষের মনোমন্দিরে যতগুলি প্রবল প্রবৃত্তি সময়ে সময়ে উদয় হইয়া আধিপত্য করিয়া থাকে, ভালোবাসার বাড়া ছলনাপরায়ণ মায়াবী প্রবৃত্তি আর কেহ নাই। ভেল্‌কিই ইহার প্রাণ, ইন্দ্রজালই ইহার স্বরূপ; প্রতারণাই ইহার আধার, বিড়ম্বনাই ইহার পরিণাম। এই যে ভালোবাসা, ইহার ভাবভঙ্গি অতি প্রচণ্ড; তর্জন গর্জন লইয়াই আছেন; শান্ত মূর্তি কাহাকে বলে, আদবে জানেন না; তাই জন্যে লোকে ইহাকে সারাল জিনিস মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার যেরূপ হাঁক্‌ডাক্ বা আড়ম্বর ইহা তদ্রূপ টেকসই নহে। ইহার কিঞ্চিৎ মধুরতা আছে বটে, অন্তঃকরণ সেই মধুরতাতে আচ্ছন্ন হইয়া ভবিষ্যৎকে অতিরমণীয় বলিয়া বোধ করে; কিন্তু ভালোবাসার আখেরের কিছুই ঠিকানা নাই। যতক্ষণ ভালোবাসাটুকু থাকে, ততক্ষণ সেটুকু মিষ্টি বলিয়া এরূপ মনে করিও না যে, তেমনি বরাবর থাকিবে, যে ইহার সমাপ্তি বা অবসান হইবে না। ওটি ভ্রম। কারণ প্রেম এক প্রকার অগ্নি, উহা পুড়িয়া পুড়িয়াই নিবিয়া যাইবে। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই উহার খাঁই মিটিয়া যায়, রূপ লাবণ্যের সঙ্গে উহা মুছিয়া যায়; চুল পাকা দেখিলেই উহা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। যত দিন পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে, বোধ হয় কেহ কখনও দেখে নাই, যে দাঁত পড়িয়া যাইবার পর উভয়ে উভয়ের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে; অথবা তফাত হইলে হা-হুতাশ করিতেছে। সুতরাং প্রেম যতই তীব্র হউক না কেন, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, 'প্রাণেশ্বরী' 'জীবিতেশ্বর' এ সকল সম্বোধন চিরকালের তরে নহে। ফুল বিল্বপত্র দেওয়া, কি মাথায় করিয়া রাখা, কি হাতের তেলোর উপরে রাখা, ইহা আজীবন ঘটে না। যখন প্রেমের পুতলী ভাঙিয়া যায়, তখন তাহার ভালোবাসার পাত্রকে দেবপ্রতিমা বলিয়া মনে হয় না; সে তখন আসলে যাহা, তাহাই চক্ষে পড়ে। তখন চক্ষু যেন এদিক-ওদিক করিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহার সাবেক ভালোবাসার সামগ্রী গেল কোথা? অর্থাৎ সে আর ঠিক পায় না যে কি দেখিয়া অত মজিয়াছিল, অত মত্ত হইয়াছিল। সাবেক সামগ্রী পায় না, কিন্তু যাহা পায়, তাহাতে আর মন উঠে না, মেজাজ বিগড়িয়া গিয়াছে; তখন চিত্তির চটিয়া গিয়াছে, আর ভালো লাগে না। আশ্চর্য এই যে. যেমন প্রথমে মাটির পুতলীকে দেবতা বোধ করিয়াছিল, তেমনি এখন আর মনুয্যকেও ইতর প্রাণী জ্ঞান করে। তখন ভালোবাসার পাত্রকে কি এক চক্ষে দেখিয়াছিল, কত অলীক অবাস্তবিক কাল্পনিক আরোপিত গুণ সংযোগ করিয়াছিল, কাককে কোকিল জ্ঞান করিয়াছিল। এখন আবার আসলে যা, তাহার চেয়েও নিকৃষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। আগে মুখ ছিল চাঁদ, চক্ষু ছিল নীলপদ্ম, অঙ্গ ছিল কনকলতা; এখন গ্রন্থে শুদ্ধিপত্র যোজনা করা হয়; চন্দ্রের পরিবর্তে বড় 'পেচক'; নীলপদ্মের বদলে 'কোটর'; 'কনকলতা'র স্থানে 'ঝাটার কাটি'; এখন শালিকও ছাতারিয়া হইয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ রুশ্‌ফুকো নামক 'ঠোঁট্‌কাটা' 'হক্ কথা বক্তা' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, যখন আমার নিজের প্রতি ভালোবাসা নাই, তখন অন্যের ভালোবাসা পাইতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু ইহার চেয়ে কত অধিক লজ্জার কথা এইটি দেখ দেখি

যে, পূর্বে অত্যন্ত প্রীতি ছিল, এক্ষণে তাহাব কিছুই নাই। যদি ভ'লোবাসা প্রথমে অত্যন্ত প্রখর হয়, তবে সেই প্রখরতা নষ্ট হইয়া কাল সহকারে যে কেবল নিরুৎসুকতা (indifference) আসিবে, তাহা নহে; কিন্তু বিতৃষ্ণাও জন্মিবে। ইহার চেয়ে তো প্রথমাবধিই প্রখর ভালোবাসা না হওয়া ভালো। ভালোবাসা ক্ষয় হয় হউক, কিন্তু তৎপরিবর্তে যদি 'দেক্-বোধ' আসিয়া জুটে; যদি পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে শেষে উত্ত্যক্ত হইতে হয়, যদি অতি আসক্ত প্রণয়ীর অবস্থা হইতে দেখিলে গা জ্বলিয়া যায়, এই দশায় উপনীত হইতে হয়; তাহা হইলে গোড়াতেই সাদাসিদে ভালো; কাজ কি তীব্র প্রেমে? কারণ এক দিকে তীব্র হইলে বিপরীত দিকেও তীব্র হইবে।'

'আমার যে স্বামী, তাঁহার ও আমার মধ্যে কোনো ভেল্‌কির পর্দা বিদ্যমান নাই। আমি প্রকৃত পক্ষে যাহা, তিনি আমাকে তাহাই দেখেন; আমিও তাঁহার আসল মূর্তি অবলোকন করি। আমরা দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য প্রেমপ্রবৃত্তি দ্বারা পরস্পর গ্রথিত নহি; আমাদিগের পরস্পর বন্ধন-গ্রন্থি এই যে, তাঁহার আমার উপরে একটা টান আছে, আমার তাঁহার উপর একটা টান আছে; শিষ্ট শান্ত দুটি লোক একত্রে থাকিলেই এরূপ টান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা উভয়ে বুঝিয়াছি যে, যখন বিবাহ করা হইয়াছে তখন যাবজ্জীবন এক সঙ্গে থাকিতে হইবে; ইহা আমাদিগের অদৃষ্টের লিপি; ভবিতব্যতা দেবীর এই আজ্ঞা আমাদিগের শিরোধার্য করা উচিত এবং যতদূর সাধ্য, পরস্পরের সাচ্ছন্দ্য বর্ধন কবা আমাদিগের কর্তব্য। আমি তো দেখিতেছি যে, যদি বিধাতা আমাদিগের উভয়কে পরস্পরের জন্য সংকল্পিত করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে ইহার চেয়ে বেশি আর কি হইত। আমার মন যেরূপ প্রণয়প্রবণ, যদি স্বামীর মন তদ্রূপ হইত, তাহলে হয়তো সময়ে সময়ে ঝগড়া হইত, তিনি আমার নিকট প্রণয়ের উপহার প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু আমার তাঁহার প্রতি ভালোবাসা নাই, আমি সে উপহার কোথা হইতে দিতাম? তাহা হইলেই তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন, তাহা হইলেই উভয়ে অমিল অনৈক্য অশান্তি উপস্থিত হইত। কিন্তু তিনি আমার ভালোবাসার তোয়াক্কা রাখেন না, সুতবাং অনৈক্যের একটি কারণ অনুপস্থিত। আমি যদি আবার তাঁহারই ন্যায় সুস্থির প্রকৃতির মানুষ হইতাম, তাহা হইলে হয়তো একত্রে সংসার ধর্ম করা কষ্টকর হইত। পূর্বে আমার মন তোমার প্রতি প্রেমোম্মত্ত ছিল, এক্ষণে মনের এই অবস্থায় উপনীত হওয়া ভালোই হইয়াছে। তিনি যদি আমাকে আরো বেশি ভালবাসিতেন, তাহা হইলে তিনি হয়তো আমার নিকট হইতে অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন না প্রণয়ের প্রতিদান প্রার্থনা করিতেন, তাহা আমার উত্ত্যক্তিকব হইত। তাঁহার যে বয়স কিঞ্চিৎ বেশি, ইহা বরং ভালোই হইয়াছে; কারণ আমি নিজে অন্যের প্রেমে উন্মত্ত, যাহার প্রেমে আমি উন্মত্ত, তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবার নহে; এরূপ স্থলে আমার পক্ষে অন্য এক যুবা পুরুষের সহিত পরিণয় অধিকতর ক্লেশকর হইত। অতএব বৃদ্ধ স্বামীকে বিবাহ করা আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর হইয়াছে।'

পূর্বরাগ ব্যতিরেকে দাম্পত্য সুখের কি চিত্র, তাহা রুশো উক্তরূপে আঁকিয়াছেন। সেই প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া রচয়িতা ঐ রূপ দেশাচারকে লোকের চক্ষে আরো জঘন্য

ও হেয় করিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলা ভার। কিন্তু যাহাই হউক, যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি পূর্বরাগকে নিতান্ত অনাবশ্যক জ্ঞান করেন এবং দাম্পত্য-সুখের দৃঢ়ীকরণ পক্ষে উহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারা প্রত্যুদাহরণ (exception) হইতে ব্যাপ্তিগ্রহ করিয়াছেন। যখন মনে কর, যদি কেহ বলে যে ছাগল জাতি গরু অপেক্ষা ছোট, হয়তো এক তার্কিক পুরুষ কোথাও হইতে বৃহৎ এক রামছাগল হাজির করিয়া এবং এক মুড়ুঞ্চে গাই বাহির করিয়া দেখাইয়া দিবেন যে, ছাগলের চেয়ে গরু ছোট। যদি কেহ বলে যে, ইংরেজের চেয়ে বাঙালি কালো; সেই তার্কিক হয়তো কোনো স্বভাবপিঙ্গল (albino) বাঙালি ও কোনো জাহাজের রশিটানা গোরা, দুজনকে পাশাপাশি খাড়া করিয়া দিয়া প্রমাণ করিবেন যে বাঙালি ইংরেজের চেয়ে ফর্সা। পূর্বরাগ-বিরোধী কৃতবিদ্যগণ ঠিক্ সেইরূপে বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে দেখেন যে, ইংরেজদিগের মধ্যে দম্পতি-বিচ্ছেদ সময়ে সময়ে অতি কৌতুকাবহ মূর্তি ধারণ করে, তদ্দৃষ্টে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উক্তি করিতে থাকেন যে, আর কি? এই তো পূর্বরাগবিবাহের পরিণাম? ইহার চেয়ে আমাদের মা বাপের দেওয়া বিবাহ ঢের ভালো। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, ইংলন্ডের চারি কোটি ইংরাজজাতির দাম্পত্য সুখের অবস্থা কি প্রকার, তাহা কি ঐ দুটি দশটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সাব্যস্ত হয়? মা বাপের দেওয়া বিবাহেতে যে দাম্পত্য সুখ আদৌ অঘটনীয়, তাহা কেহই বলিতে চাহে না; কিন্তু যে স্থলে দাম্পত্য সুখ হয়, যাদৃচ্ছিক নিয়মে হয়; হওয়া না হওয়ার সম্ভাবনার উপর মানুষের কিছুই বিবেচনা চলে না। এই 'মানুষের বিবেচনা' চলার কথা মুখে উচ্চারণ করিয়াই আমি শত শত ধার্মিকের বাক্যস্রোত স্মরণ করিতেছি; সেই স্রোত প্রতিরোধ করা আমার সাধ্য নহে। তবে এই পর্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হওয়া কর্তব্য যে, ইহাও একটি রুচির কথা; রুচি সকলের সমান নহে; কেহ কেহ এরূপ উদারপ্রকৃতি যে, যে ব্যক্তির সঙ্গে বল, সে দিব্যি আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতে পারে। বঙ্কিম বাবুই কে জানে, আর দশ টাকা বেতনের রিবিট্‌ম্যানই কে জানে; আলাপ কুশলের জন্য তাহার লোক বাছিবার দরকার নাই। তেমনি কেহ কেহ এরূপ সরলস্বভাব যে, যাহার সহিত আজীবন ঘরকন্না, তাহাকে দেখিতে শুনিতে চাহে না, সচ্ছন্দে ঘরকন্না করিবে। ফলত এদেশে ঐ উদারতাই বিশ্বজনীন, তদ্বিপরীত প্রকৃতি বিরল।[১]

১. *ভারতী ও বালক*, কার্তিক ১২৯৪

দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব?

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যখন ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বোমা প্রভৃতি আপদগুলার নামও আমরা জানিতাম না, আর, বাহাত্তর সালে কোন্ জন্মে কবে একবার আমাদের এই সোনার ভারতে দুর্ভিক্ষের পদধূলি পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়-বিদারণ আখ্যায়িকা শুনিলে আমাদের মনে হইত— আর এখন আমাদের ভয় নাই, এখন আমরা রাম রাজ্যে বাস করিতেছি! যখন, যেদিকে চক্ষু ফিরাইতাম সেই দিকে দেখিতাম প্রসন্নবদনে লক্ষ্মী হাসিতেছেন— সে একদিন ছিল! তখন, আমার 'রঘুবংশে'র পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে, 'কুমার-সম্ভব'ও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ইতিমধ্যে একদিন, মাঘ-ভারবী না জানি কাণ্ডখানা কিরূপ— তাহা পাতা উল্‌টাইয়া দেখিতে গিয়া দিব্য একটি পাকা ঢঙের শ্লোক আমার চক্ষে পড়িল। তাহার শেষ চরণটি আজও ভুলি নাই; সেটা এই :— 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ হিতও যেমন মনোহারিও তেম্নি, এরূপ বচন দুর্লভ।' ইহার খোলসা তাৎপর্য এই — অপ্রীতিকর হিতবাক্যও সুলভ, আর, মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যও সুলভ; প্রীতিজনক হিতবাক্যই দুর্লভ। হিতবক্তার তবে তো দেখিতেছি মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়। তোমার শাস্ত্রে কি লেখে?

২. আমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী হইবে কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন করে না— চোখ কান বুজিয়া তাহা বলিয়া ফেলাই ভালো; যে শোনে সে শুনিবে, যে না-শোনে না শুনিবে; তুমি তো বলিয়া খালাস্! তুমি যদি জানিতে পারিয়া থাক যে গঙ্গার ঘাটে কুমীরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, তবে সে কথা শহরময় রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তবে এটা সত্য যে, জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারো প্রাণে সহে না; তাহা এক কান দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্কসদনে প্রবেশ করে— শুদ্ধ কেবল ভদ্রতার অনুগ্রহে ভর করিয়া; কিন্তু প্রবেশ করিয়া যখন দেখে যে, হৃদয়দ্বারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে না পাইয়া আর এক কান দিয়া সুড়্‌সুড়্ করিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যের কুহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কৃপাপাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, পরন্তু তাহাদের মধ্য'কার একজনকেও আজ পর্যন্ত দেখিলাম না যে, সে কাহারো হিতবাক্য শুনিয়া সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছে। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে। বলিতেছি বটে 'ঠেকিয়া শেখে' কিন্তু ঠেকিয়া শেখা বলে কাহাকে তাহা যদি

শোনো, তবে তোমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিবে— ঠেকিয়া শেখার আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানযাত্রী গামছা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছ 'জলে নাবিও না— গঙ্গায় কুমীর দেখা দিয়াছে।' পাঁচজন তোমার সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া এক-কোমর জলে, আর-পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক-হাঁটু জলে নাবিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। কোমর-জলের মহারথীরা চকিতের মধ্যেই জলগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল;— ইহারই নাম ঠেকিয়া শেখা! হাঁটু জলের অর্ধরথীরা দ্রুতগতি ডাঙায় উঠিল— ইহারই নাম দেখিয়া শেখা।

১. শুনিয়া শিখিলেই তো আপদ চুকিয়া যায়, তাহা হইলে ঠেকিয়া শিখিতেও হয় না, দেখিয়া শিখিতেও হয় না। শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ কেন?

২. লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে; তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।

১. বেশ যা হোক তুমি বলিলে! তুমি কি আর জান না যে, কচি বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, যুবা বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, প্রবীণ মনুষ্যও মনুষ্য? সত্য বলিতে কি— তোমার মতো লোকের মুখে 'মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়াছে' এইরূপ একটা আগাপাশতলা রহিত বেখাপ কথা শুনিলে আমার কেমন কেমন ঠেকে!

২. বলিলাম এক— শুনিলে আর! আমি বলিলাম 'লোকের বয়স,' শুনিলে 'মনুষ্যের বয়স!'

১. আমি তো জানি— মনুষ্য নামাই লোক।

২. সেদিন তোমার অষ্টম বর্ষীয় বালকটি যখন তোমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল যে, 'সকালে পড়া মুখস্থ করেছি, বিকালে পড়া মুখস্থ করেছি, আবার এখন রাত্রে পড়া মুখস্থ করিতে বলিতেছ! অতবার করে পড়া মুখস্থ কল্লে লোকে পাগল হয়ে যায়,' এ কথার প্রত্যুত্তরে তুমি যাহা তাহাকে বলিলে তাহা তো আমি **স্বকর্ণে শুনিয়াছি**! তুমি বলিলে 'তোর এখনো গোঁফ দাঁড়ি ওঠে নি— তুই আবার লোক হলি কবে? যা— পড়্‌গে যা।' লোক শব্দের এইরূপ বিশদ তাৎপর্যব্যাখ্যা তোমারই মুখে যখন আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তখন আমি কেমন করিয়া জানিব যে, তোমার অভিধানে মনুষ্য নামাই লোক— একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালকও লোক!

১. তুমি তো ঘর-সন্ধানী (detective) মন্দ না! বমাল শুদ্ধ আমাকে পাকড়া করিয়াছ! তোমার সঙ্গে কথা কহা দেখিতেছি বিপদ্! তুমি যদি, সখে, একটা কাজ কর— বড্ড ভালো হয়; আশপাশের ফ্যাক্‌ড়া কথার চুলচেরা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া তুমি যদি আমাকে তোমার পেটের কথাটি পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া-খালিয়া বল, তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত গোল মিটিয়া যায়।

২. বলি তবে শোন— এটা তুমি তো জানই যে ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসিরা সেদিনকার ছেলেকে বড় হইয়া টাকা উপার্জন করিতে দেখিলে আঁচলের কোণ দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলেন 'আমি উহাকে বুকে পিঠে কোরে মানুষ করেছি!' ঘোড়া পেট থেকে পড়িয়াই ঘোড়া হয়, গোরু পেট থেকে পড়িয়াই গোরু হয়; কিন্তু মানুষের একি

বিপরীত কাণ্ড— অন্যে তাহাকে মানুষ না করিলে সে মানুষ হয় না। কচি বয়সে মনুষ্য যখন পিতামাতা-র নিকট হইতে এক-মেটে শিক্ষা লাভ করে, তখন সে অর্ধ মানুষ হয়; তাহার পরে পাঠদ্দশায় যখন শিক্ষকদিগের নিকট হইতে দোমেটে শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম-ক্ষেত্রে চরিয়া খাইতে শেখে, তখনই সে পুরা-মানুষ হয়। কচি-বয়সে গৃহ মনুষ্যের জীবন-ক্ষেত্র; এই জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্য পানাহার করিতে শেখে, পায়ে হাঁটিতে শেখে, বসিতে দাঁড়াইতে শেখে, মাতৃভাষা শেখে, জীবনের যত কিছু মুখ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহারপ্রণালী সমস্তই অবলীলাক্রমে শেখে। মনুষ্যের এইরূপ কবি বয়সের শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শিক্ষা শব্দের বাচ্য নহে; কেননা এ বয়সে মনুষ্য সন্তান শিখিব মনে করিয়া কিছুই শেখে না; তাহার মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ভগ্নিরা যাহা তাহাকে গিলাইয়া দেয়, তাহাই সে হাসিয়া খেলিয়া গলাধঃকরণ করে। বাচ্চা-মনুষ্যের শিক্ষা এক প্রকার অযাচিত দানগ্রহণ। আদিম জীবন-ক্ষেত্রে ঐরূপ অযাচিত দান-গ্রহণের পথ দিয়া জীবন নির্বাহের নানাবিধ অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার কার্যে অশিক্ষিত পটুতা উপার্জন করে। জীবন-ক্ষেত্র হইতে মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্রে ভর্তি হয়, তখনই প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহার শিক্ষার গোড়া-পত্তন আরম্ভ হয়। মানস ক্ষেত্র কি? না বিদ্যালয়। বিদ্যালয়কে মানসক্ষেত্র বলিতেছি এই জন্য— যেহেতু মনোযোগই এ ক্ষেত্রের প্রধানতম শিক্ষাপ্রণালী। মনুষ্যের পাঠদ্দশায় শিক্ষকের বাক্য মন-দিয়া না শুনিলে তাহার বিদ্যাশিক্ষা অন্য কোনো উপায়ে ঘটিয়া ওঠা সম্ভবে না। পাঠদ্দশার বয়সই প্রধানত মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স। মনুষ্যের পাঠদ্দশার বয়স অতীত হইলেই সেই সঙ্গে তাহার শুনিয়া শেখার বয়স অতীত হইয়া যায়। মানস-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের, তথৈব, অধ্যাপক মহাশয়ের ছাত্রেরা মনোযোগের পথ দিয়া বিদ্যাবুদ্ধি উপার্জন করে। বুদ্ধি পরিস্ফুট হইবার পূর্বে, মনুষ্য-সন্তান, শিক্ষক যাহা বলে তাহাই শুনিয়া শেখে; বুদ্ধি পরিস্ফুট হইবার পরে—বুদ্ধি যাহা বলে তাহাই শুনিয়া চলে। বুদ্ধিবিকাশের পালা সাঙ্গ হইলে মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে ভর্তি হয়, অথবা যাহা একই কথা— বিদ্যালয় হইতে লোক-সমাজে ভর্তি হয়, তখনই সে লোক হয়। মনুষ্য যতদিন বালক থাকে, ততদিন সে কাহারো নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না; পক্ষান্তরে বুদ্ধির ফুটন্ত অবস্থায় লোক-সমাজের বাতাস গায়ে লাগিয়া বালক যখন লোক হইয়া ওঠে (ডারুইনের শাস্ত্রানুসারে— বানর যখন 'বা' পরিত্যাগ করিয়া 'নর' হইয়া ওঠে) তখন গোঁফ দাড়ির প্রাদুর্ভাবে তাহার মুখের চেহারাও যেমন ফিরিয়া যায়, পদগৌরবের প্রাদুর্ভাবে তাহার মনের ভাবও তেমনি ফিরিয়া যায়; মন তখন বলে— অন্যের নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিলে আপনার বুদ্ধিকে অপমান করা হয়। এতগুলো কথা আমার পেটের মধ্যে ছিল, তাই তুমি যখন বলিলে 'শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ কেন,' আমি তাহার উত্তর দিলাম এই যে, 'লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।'

১. তুমি যাহা বলিলে— সবই সত্য; কিন্তু তথাপি ঐ বিষয়টির সম্বন্ধে একটা বিষম ধন্দ আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে— সেটার একটা মীমাংসা আশু প্রয়োজনীয়; কথাটা

এই— মনুষ্য যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয় তখন, কচি বয়সে মাতা কিংবা ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে; পাঠদ্দশায় শিক্ষক তাহাকে সদুপদেশ দিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের পরামর্শ শুনিয়া চলিতে ভার বোধ করে, সে ব্যক্তি যদি কুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তবে কে তাহাকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে?

২. আমাদের দেশের একটি শাস্ত্রবচন এই যে, "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" ধর্মকে যে রক্ষা করে, ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে। গৃহক্ষেত্রে পিতামাতা কচি বালকের **জীবনের** নিয়ামক, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরু বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের **মনের** নিয়ামক, কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধি বিষয়ী লোকের **কর্মের** নিয়ামক; এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এটাও তেমনি দেখা চাই যে, কুশিক্ষা যেমন শিক্ষা নামের যোগ্য নহে, কুবুদ্ধি তেমনি বুদ্ধি নামের যোগ্য নহে। সুবুদ্ধিই বুদ্ধি, আর, ধর্মবুদ্ধিই সুবুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ। কর্ম **করিবার** বস্তু; ধর্ম **ধরিয়া থাকিবার** বস্তু। কর্ম বুদ্ধির **দাঁড়**; ধর্ম বুদ্ধির **হাল**। কর্মক্ষেত্রের বিষয়ী লোকেরা যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহারা আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে— কেবল যদি তাহারা ধর্ম-বুদ্ধির কথায় কর্ণপাত করে; তাহা যদি না করে, তবে আর নিস্তার নাই।

১. ধর্ম, বুদ্ধির হাল, তাহা তো বুঝিলাম; কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইবে কোন্ দিক্ বাগে? কূলবাগে অবশ্য! তবেই হইতেছে যে, কূলের ঠিকানা নির্দেশ করা সর্বাগ্রে আবশ্যক। দাঁড়, তুমি বলিতেছ কর্মকে, হাল বলিতেছ ধর্মকে ইহা শুনিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম; কূল তুমি বলিতেছ কাহাকে, সেইটিই এখন জিজ্ঞাস্য।

.২. **কূল**, আমি বলি, **পুরুষার্থকে**। পুরুষার্থ, স্বাধীনতা, স্বারাজ্য মুক্তি, শব্দ বটে চারিটা— কিন্তু বস্তু একই। মনুষ্য-পক্ষী যখন আপন পক্ষে ভর করিয়া উড়িতে শেখে উড়িতে শিখিয়া আপনি আপনার নেতা হয় তখন সর্বাঙ্গ-সুন্দরী ধর্মবুদ্ধি স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে, আর, কুব্জা পাপ-বুদ্ধি ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ-পিঞ্জরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে। এক শ্রেণীর পক্ষী অধিদেবতার আহ্বান শুনিয়া মুক্তির মুক্ত অবণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সুপথে চলে, আর এক শ্রেণীর পক্ষী উপদেবতার আহ্বান শুনিয়া ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিপথে চলে। মনুষ্য যখন মানসক্ষেত্র হইতে বিদ্যা-বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া কর্মক্ষেত্রে স্বপদে ভর দিয়া দাঁড়ায় তখন সে আপনাকে চালাইবার ভার আপন হস্তে টানিয়া লইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেইতো আর স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীন হইতে হইলে স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই। যাহারা স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সুপথে চলেন তাঁহারা স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করেন, আর যাঁহারা ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া বিপথে চলেন, তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতার অযোগ্য হইয়া পড়েন। সুপথ-যাত্রীরা প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাধীনতার যোগ্যতা উপার্জন করেন, কাজেই তাঁহারা অভীষ্ট ফললাভে কৃতকার্য হন। বিপথ-যাত্রীরা গাছে না উঠিতেই এক কাঁদির জন্য

আগ্রহান্বিত হন কাজেই অভীষ্ট ফলে বঞ্চিত হন। পুরুষার্থের কূলে পৌঁছিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় কি— তাহা বলি শোন —

এক, কূলের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া ঠিক পথে হাল বাগাইয়া ধরিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই।

দুই, রীতিমতো বিদ্যা শিক্ষা এবং কাজ শিক্ষা করিয়া মাঝ পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা চাই।

স্বাধীনতাও যা স্বরাজ্যও তা, একই; তার সাক্ষী— স্বাধীন=স্ব+অধীন অর্থাৎ আপনি আপনার অধীন; স্বরাজ=স্ব+রাজ অর্থাৎ আপনি আপনার রাজা, দুয়ের ভাবার্থ অবিকল সমান। যাঁহারা স্বাধীনতা এবং স্বরাজ্যের কাঙালি, তাঁহাদের দুইটি বিষয় সর্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্তব্য।

প্রথম স্মর্তব্য

ঈশ্বরের অধীনতা স্বাধীনতার সোপান; সৌরাজ্য (অর্থাৎ মঙ্গলরাজ্য) স্বারাজ্যের সোপান; ধর্মবন্ধন মুক্তির সোপান।

দ্বিতীয় স্মর্তব্য

স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার বিপরীত পথ, নৈরাজ্য (অর্থাৎ অরাজকতা) স্বারাজ্যের বিপরীত পথ, মোহবন্ধন মুক্তির বিপরীত পথ।

এই দুইটি বিষয় সর্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্তব্য। স্বারাজ্য কিছু আর আমাদের পোষা কুকুর নহে যে, তাহাকে আমরা ডাক দিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের পদলেহন করিতে থাকিবে! স্বারাজ্য লাভ করিতে হইলে একদিকে চাই ধর্মকে ধরিয়া থাকিয়া স্বারাজ্যভোগের যোগ্যতা লাভ করা, আর একদিকে চাই রীতিমতো জ্ঞান এবং কাজ শিক্ষা করিয়া বিধিমতো প্রকারে অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা। সৌভাগ্যশালী জাপানিরা তাহাই কবিয়াছে; আর সেই জন্য— তাহারা যে কার্যে হাত দিতেছে, তাহাতেই সোনা ফলিতেছে। তাহার পরিবর্তে তাহারা যদি অন্তর্দাহের উত্তেজনায় অথবা দুষ্ট সরস্বতীর কুমন্ত্রণায় ঐরূপ যোগ্যতা এবং উপযোগ্যতা লাভ করিবার পূর্বেই রুশীয় ভল্লুকের প্রতি গুলিগোলা চালাইতে আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তাহারা সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের নখের আঁচড়ে এবং দাঁতের কামড়ে ধনে প্রাণে মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জাপানিরা তাহাদের এই নিজ-বুদ্ধিসম্ভূত নূতন উদ্যমের প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত ধর্মকে কেমন অপরাজিতচিত্তে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে— তাহা তো আর কাহারো দেখিতে বাকি নাই! তাহারা রাগের মাথায় চীন রাজ্যকে ছারখার করিয়া দিতে পারিত— তাহা তাহারা করে নাই; উল্‌টা আরো তাহারা চীনদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য যত্নের ত্রুটি করে নাই। তাহারা কন্‌গ্রেস্‌বীরদিগের ন্যায় আপনা-আপনির মধ্যে কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি আঁচড়া-আঁচ্‌ড়ি 'এবং ঢুসাঢুসি করিয়া জাতীয় অধঃপতনের দিব্য একটা জমকালো সোপান গাঁথিয়া তুলিতে পারিত— তাহা তাহারা করে নাই; উল্‌টা আরো তাহারা প্রভূত ধন ঐশ্বর্য ব্যয় করিয়া,

আপনাদের মধ্যে যাহাতে বিবাদ বিসংবাদের চিহ্নমাত্রও না থাকে, তাহার যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বল্পমাত্রও কালবিলম্ব করে নাই। রুশীয় বন্দীদিগের প্রতি শত্রুচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিত, তাহা না করিয়া বন্ধুচিত যত্ন সমাদর এবং সম্মান-প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ভারবোধ করে নাই। এরূপ জাতির জয় হইবে না তো আর কাহার জয় হইবে? আমাদের দেশের এই যে একটি পুরাতন বাক্য "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" ইহা অব্যর্থ বেদবাক্য। ধর্মই যোগ্যতার নিদান; আর ডারুইনের কথা যদি সত্য হয়, তবে যোগ্যতাই জয়ের নিদান। ধর্মনিষ্ঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ জনসাধারণই স্বারাজ্য-লাভের যোগ্যপাত্র। জাপানের অধিবাসীরা ধর্মকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিজয়লক্ষ্মী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আপন হস্তে জাপানের গলে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন "চিরজীবী হও" আশীর্বাদ করিয়া। আমাদের দেশের স্বরাজ্যপন্থীদিগকে আমি তাই জোড়হস্তে বলি— "দেখিয়া শেখো! নচেৎ ঠেকিয়া শিখিতে হইবে!" ঠেকিয়া শেখা যে কি সর্বনেশে শেখা তাহা যে জানে সেই জানে। বিপথ-যাত্রী যখন উঠিতে পড়িতে, বসিতে দাঁড়াইতে ঘা খাইয়া খাইয়া চৈতন্য লাভ করে, তখন সে বিপদে পড়িয়া বলিবার সময় বলে "এ পথে বাপ-মা বলিয়া ডাকিলে কেহ সাড়া দিবার নাই" অথচ চলিবার সময় চলে— কি সর্বনাশ— সেই পথেরই আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ! ফল কথা এই যে, বিপথে চলা যখনই যাহার প্রাণের সামিল হইয়া হাড়ে মিশিয়া যায়— নূতন-লব্ধ জ্ঞানের নূতন পথে চলা তখন তাহার পক্ষে মৃত্যু তুল্য। একে তো এই দশা— তাহার উপরে যদি আবার বিপথ-যাত্রীর দুর্বুদ্ধি ঘাড়ে চাপে, তবে আর রক্ষা নাই! তখন সে হিত বক্তার মুখপানে খট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া দম্ভ সহকারে বলে— "আমি বিনাশের পথে যাইব— আমার খুশি! তুমি বলিবার কে? আমি তোমার হিত বাক্য শুনিতে চাহি না!" ইহার উত্তরে ভদ্রলোকটি কিই আর তাহাকে বলিবে— "খুব তুমি বাহাদুর" বলিয়া আপন মনে ইষ্ট দেবতার নাম জপিতে থাকে।

১. সভ্য জাপান সেদিনকার ছেলে বই না— তাহার গলা টিপিলে দুধ বেরোয়! পক্ষান্তরে সুসভ্য ইউরোপের বয়ঃক্রম হইতে চলিল চারি শতাব্দীর বেশি বই কম না। দেখিয়া যদি শিখিতেই হয়, তবে ইউরোপ আমেরিকার খ্যাতনামা মহাত্মাদিগের পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রণালী-পদ্ধতিই আদত পদবীতে দাঁড় করাইবার জন্য উপযুক্ত. তা বই একটা অকালপক্ক কচি ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া-শিখিবার জিনিস্‌ই নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে তো আর বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ইতিহাস-লেখকের অভাব নাই; তাঁহাদের লিখিত তরো-বেতরো অভ্যুদয় বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে যে ধর্মাধর্ম-বিচার-বর্জিত নৈরাজ্যের মধ্য হইতেই স্বারাজ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে।*

২. ফরাসি দেশের অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দীয় নৈরাজ্যের মধ্য হইতে কিরূপ স্বারাজ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা তো আর কাহারো দেখিতে বাকি নাই। সেটা যে একটা সর্বনেশে কালসর্প তেমন বিষাত্মা কালসর্প কোথাও আর দেখা যায় না!

* নিঃ + রাজ = নীরাজ = রাজ-বর্জিত। নৈরাজ্য = অরাজকতা

ইংরাজিতে তাহার নাম Revolution আর দেশীয় ভাষায় তাহার নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। সেই সহস্রশিরা সর্পটাকে সুদূরদর্শী প্রথম নেপোলিয়ন খুব ভালোমতেই চিনিতেন আর, চিনিতেন বলিয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য বিহিত বিধানে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু হইলে হইবে কি—ধর্মের নামে নহে পরন্তু গর্বস্ফীত জাতীয়-গৌরবের নামে তিনি তাহার বিষ দাঁত ভাঙিতে গিয়াছিলেন তাই হিতে বিপরীত হইল। ঐ দুরন্ত কালসর্পটার কোপে পড়িয়া অবধি, তাহার বিষশ্বাসে জ্বলিয়া পুড়িয়া ফরাসি দেশের অধিবাসীরা একদিনের জন্যও সৌরাজ্যসুখ যে কাহাকে বলে তাহা জানিল না। স্বারাজ্যের যোগাড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়া মার্কিনেরাই বা কেন (জাপানিদিগের মতো) অত্যল্পকালের মধ্যে অবলীলাক্রমে আশাতীত ফল-লাভ করিল, আর ফরাসিরাই বা কেন আজও পর্যন্ত তাহাদের হেঁট মস্তক উত্তোলন করিতে পরাভব মানিযাছে? ইহার গোড়ার কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ভূতগত উচ্ছৃঙ্খলতার ভূতগত ফল হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মার্কিনদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল ধর্মের উপরে, তাই তাহার ফল হইল নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য-লাভ; ফরাসিদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল অবিদ্যা দম্ভ মাৎসর্য এবং অধর্মের উপরে তাই তাহার ফল হইল জাতীয় অধঃপতন। পুরাকালের একটি শাস্ত্র বচন শ্রবণ কর—

"*অধর্মে নৈধতে তাবৎ*— অধর্ম দ্বারা দুরাত্মাজনের সমস্তই হস্তায়ত্ত হয়," "*ততো ভদ্রানি পশ্যতি*— তাহার পরে মঙ্গল দৃশ্য সকল দেখা দ্যায়," "*ততঃ সপত্নান্ জয়তি*— তাহার পরে শত্রুদিগের উপরে জয় লাভ হয়," "*সমূলস্তু বিনশ্যতি*— তাহার কপালে কিন্তু লেখা আছে 'সমূলে বিনাশ' "। ধর্মভ্রষ্ট ফরাসি জাতির ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। তার সাক্ষী—

এক, *অধর্মে নৈধতে তাবৎ।*

অধর্ম দ্বারা সমস্ত ফরাসি রাজ্য চকিতের মধ্যে বিপ্লব কর্তাদিগের হস্তায়ত্ত হইল।

দুই, *ততো ভদ্রানি পশ্যতি।*

তাহার পরে চারিদিকে মঙ্গলের সুখস্বপ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিল, আর, সেই সুখ-স্বপ্নের আবেশে ফ্রান্স্, ইংলন্ড আয়ারলণ্ড পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ-বিদেশের ভ্রাতায় ভ্রাতায় কোলাকুলির ধূম পড়িয়া গেল।

তিন, *ততঃ সপত্নান্ জয়তি।*

তাহার পরে ভীষণ রক্তারক্তির মধ্য দিয়া প্রথম নেপোলিযন মাথা তুলিয়া উঠিয়া তোপের ধমকে অর্ধেক ইউরোপ আপনার বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে আনয়ন করিলেন।

চার, *সমূলস্তু বিনশ্যতি।*

তাহার পরে ফরাসিদিগের স্বারাজ্য সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। বিদেশীয় রাজারাজড়ারা একজোট হইযা তাহাদের চিরাভিলষিত স্বারাজ্যের মস্তকে বজ্রাঘাত করিল।

ফরাসি দেশীয় ধর্মদ্বেষী আদিম বিপ্লব-কর্তারা যেরূপ একটা বিশাল মহাযজ্ঞের ফাঁদ ফাঁদিয়া কার্যারম্ভ করিয়াছিলেন; তাহা দক্ষযজ্ঞেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। সে মহাযজ্ঞে বড় বড় দেবতাদের সবাইকে বিহিত বিধানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সাম্যদেব-কে

(Equalityকে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, মৈত্রী দেবীকে (Fraternityকে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, স্বাধীনতা দেবীকে (Libertyকে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল; কেবল শিব-কে (মঙ্গল-কে) এবং সতীকে (সদ্ধর্মকে) অপমানিত করিয়া ঠেলিয়া রাখা হইয়াছিল। কুহকিনী অবিদ্যা-দেবীর ভানুমতি (enlightenment) নামের ভেল্কি বাজিতে দেশবিদেশে সাম্য ভ্রাতৃভাব এবং স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে হইবে— এই ছিল যজ্ঞকর্তাদিগের প্রাণগত সংকল্প। এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপারের প্রস্তাবনা শেষে গড়াইল আসিয়া কোথায়— শুনিবে? ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির সমস্ত আশাভরসা প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে সেন্ট হেলেনায় গোর প্রাপ্ত হইল; তাহার পরে ছিটা-ফোঁটা যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকি ছিল, তাহা দ্বিতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলন্ডে গোর প্রাপ্ত হইল। গড়াইল আসিয়া এইখানে!

পক্ষান্তরে মার্কিন্ দেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করে নাই— একটি কার্যেও হস্ত প্রসারণ করে নাই; অপর কোনো জাতির নায্য অধিকারের অন্তঃপাতি সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিখণ্ডেও হস্তপ্রসারণ করে নাই, আবার তাঁহাদের নেতা যিনি ওয়াশিংটন তাঁহার তো কথাই নাই! তিনি সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার ছিলেন বলিলেই হয়। তাই তাঁহাদের স্বারাজ্যের জয়-পতাকায় "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ" স্বর্ণাক্ষরে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে তারকা-বেশে।

১. তোমার ওকথা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম— যদি ইংরাজের নিকট বুয়ারেরা যুদ্ধে পরাজিত না হইত।

২. কে বলিল বুয়ারেরা পরাজিত হইয়াছে— পরাজিত হইলে তাহাদের শত্রুপক্ষেরাই পরাজিত হইয়াছে। ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক যিনিই যাহা বলুন না কেন, যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে বিগত বুয়ার যুদ্ধে ইংরাজদিগের লাঞ্ছনা গঞ্জনা, ধনহানি, মানহানি এবং প্রতাপহানির একশেষ হইয়াছে। কিন্তু বুয়ারদের কি হইয়াছে? কিছুই হয় নাই! বরং তাহারা পূর্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা জাতীয় গৌরবসোপানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে বই একধাপও নীচে নামে নাই— আর যে-এখন কোনো বলবান্ জাতি তাহাদিগকে ঘাঁটাইতে সাহসী হইবে তাহার পথ জন্মের মতো অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বুয়ারদিগকে ধর্মপুস্তক হাতে করিয়া রণে অবগাহন করিতে দেখিয়া ইংরাজ দোকানদার বণিকেরা মৃদুমন্দ হাসিতে পারেন, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বঙ্গের ধামাধরেরা হাসির চোটে ভূত ভাগাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সহস্র হাসিলেও আমার এ বিশ্বাস একচুলও টলিবে না যে, বুয়ারেরা যে পরাজিত হইয়াও জয়ী হইয়াছে তাহার কারণ ঐ। কি? না ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া।

বৃথা আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। বুয়ারদের জাপানিদের এবং মার্কিনদের প্রদর্শিত মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত কি আমাদের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্মীভ্রষ্ট বিপথপন্থীদিগের মনের এক কোণেও স্থান পাইতে পারে? তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। আমরা এতদিন ঠেকিয়া শিখিয়াও এখনও আমাদের ঠেকিয়া শিখিবার আশ মিটিতেছে না। নৈরাজ্যই আমাদের স্বারাজ্যের আদর্শ; পিপীলিকার পক্ষই আমাদের জয়পতাকার আদর্শ; আর আমাদের

রাজনৈতিক গোরা-গুরুদিগের প্রসাদাৎ একটি জপমন্ত্র যাহা আমরা শিখিয়াছি তাহাই আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র, তাহা এই— 'ঈশ্বর চাহি না— ধর্ম চাহি না— কেবল চাই স্বারাজ্য— খাঁটি স্বারাজ্য— যাহার গাত্রে ঈশ্বরের এবং ধর্মের নাম গন্ধও নাই সেইরূপ নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য!'

১. তুমি এই যে বেশ শক্ত শক্ত কথাগুলি বলিলে, তাহা হিতবাক্য হইতে পারে, কিন্তু মনোহারী একটুও না!

"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

আমি তাই বলি যে, তোমার ব্যবস্থানুযায়ী তিক্ত হিতবচনের সঙ্গে একটু আধটু মনোহারী বচনের অনুপান মিশাইয়া উহাকে সুখসেব্য করিয়া লইলে ভালো হয়। আমি একটা অনুপানের জোগাড় করিয়াছি— বোধ করি তাহা চলিতে পারে; তাহা এই—

স্বারাজ্য-পথের আমরা নূতন ব্রতী। সে পথে যাত্রা করিবার সময় পদে পদে আমাদের যে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতন ঘটিবে, তাহা ঘটিবারই কথা। পাঠশালার ছাত্রেরা যেমন লিখিতে লিখিতেই ক্রমে ক্রমে হাত তাহাদের পাকিয়া ওঠে, তেমনি আমাদের দেশের স্বারাজ্য-পন্থীরা কোমর বাঁধিয়া কাজ করিতে করিতেই ক্রমে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপনা হইতেই ঠিক্ পথে প্রত্যাবর্তন করিবে। পথের মাঝপথে তাহাদিগকে বিভীষিকা দেখাইয়া নিরুদ্যম করিয়া দেওয়া উচিত হয় না।

২. কোনো পাঠশালার ছাত্র যদি আমাকে বলে যে, "লিখিতে লিখিতেই আমার হাত পাকিয়া উঠিবে;'এটা ঠিক্ হয় নাই' 'ওটা ঠিক হয় নাই' বলিয়া লোককে বিরক্ত করিও না" তবে আমি তাহাকে বলিব এই যে, 'তোমার হাত পাকিবে তাহা তো জানি;কিন্তু চাও তুমি কি? হিজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, না সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও— সেই কথাটি আমাকে ভাঙিয়া বল। যদি হিজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে যথেচ্ছা মতে লেখনী যেমন চালাইতেছ তেমনি চালাইতে থাকো তাহা হইলেই হিজিবিজি লেখায় তোমার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে। পক্ষান্তরে, তুমি যদি সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে আদর্শ লিপি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া, যত্নের সহিত তাহার প্রদর্শিত পথে লেখনী চালনা করিতে থাকো তাহা হইলেই ক্রমে হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মতো সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিবে।' আমি তাই বলি যে, স্বারাজ্য-পন্থীরা যদি বিধিপূর্বক অভীষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই ক্রমে ভালোর দিকে, অর্থাৎ ইষ্টসিদ্ধির দিকে, তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে দেখিতে দেখিতে— তার সাক্ষী **জাপান**;আর, তাহার পরিবর্তে যদি অবিধিপূর্বক স্বাভিমত কার্যে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় চোখ কান বুজিয়া অগ্রসর হন তাহা হইলে অনিষ্টসিদ্ধির দিকে তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে তর্‌তর্ করিয়া; তার সাক্ষী— ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব। কাহাকেই বা আমি বলিতেছি বিধি আর, কাহাকেই বা আমি বলিতেছি অবিধি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে প্রণিধান কর—

অবিধি

এক, গাছে না উঠিতেই এক কাঁদির প্রত্যাশা!

দুই, স্বারাজ্যের যোগ্যতা-লাভে জলাঞ্জলি দিয়া স্বারাজ্যের অধম নাট্যাভিনয়।

তিন, জন্মভূমি যেমন মাতা, ধর্ম তেমনি পিতা, এ কথাটি ভুলিয়া-বসিয়া থাকিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার দৌরাত্ম্যে পিতাকে দেশ ছাড়া করিয়া— মাতাকে "সুজলা, শ্যামলা" প্রভৃতি ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্যালঙ্কার পরিধান করাইয়া কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা প্রদান।

বিধি

এক, ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম ধরিয়া থাকিয়া স্বারাজ্যের যোগ্যতা উপার্জন।

দুই, রীতিমতো জ্ঞান শিক্ষা এবং কাজ-শিক্ষা করিয়া বিহিত প্রণালীতে অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা উপার্জন।

তিন, পুরাতন ভারতের ভগবদগীতা প্রভৃতি লোকপূজ্য ধর্মগ্রন্থ সকলের বাক্যামৃত পানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া নব্য ভারতের হিতার্থে কাজের মতো কাজ করিয়া মানুষের মতো মানুষ হওয়া।*

*সংক্ষেপে বলিলাম, "গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যামৃতপানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া"— কিন্তু এই ক্ষুদ্র কথাটির ভিতরে ভাব যে-একটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা প্রকাণ্ড বিশাল; এমনি বিশাল যে, তাহা রীতিমতো বিবৃত করিয়া ব্যক্ত করিতে গেলে একটা বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। এখানে তাহার যৎস্বল্প ইঙ্গিত আভাস জ্ঞাপন করা ভিন্ন তাহার অধিক আর কিছুই হইতে পারে না। সে ইঙ্গিত আভাস এই—

খ্রিস্টানদিগের বাইবেল আছে; মুসলমানদিগের কোরাণ আছে; ভারতবাসীদিগের তেমন-তরো কোনো একটা ধর্মশাস্ত্র কি নাই? অবশ্যই আছে : ভগবদগীতা! গীতা যেমন আশ্চর্য ধর্মশাস্ত্র, অন্যান্য দেশের ধর্মশাস্ত্রের সহিত গীতাশাস্ত্রের প্রভেদও তেমনি আশ্চর্য প্রভেদ। তার সাক্ষী— বাইবেলের পুরাতন বিধান ইহুদিজাতির ঐকান্তিক পক্ষপাতী; বাইবেলের নববিধান খ্রিস্টানসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক পক্ষপাতী; কোরাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক পক্ষপাতী, এমন কি তাহা কাফেরদিগের প্রতি খড়্গহস্ত; কিন্তু গীতাশাস্ত্রে পক্ষপাতের নাম গন্ধও নাই— উল্‌টা আরো জগৎসুদ্ধ সর্বপক্ষের সমন্বয় তাহার পাতায় পাতায় গাঁথা রহিয়াছে। গীতাশাস্ত্র দেশ-কাল-জাত-নির্বিশেষে পৃথিবীসুদ্ধ মনুষ্যমণ্ডলীর মহাশাস্ত্র। তাছাড়া, তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানশাস্ত্র, ভক্তের ভক্তিশাস্ত্র, কর্মীর কর্মশাস্ত্র। এখানে আমি একটি ইংরাজি প্রবাদকেই সার করিতেছি— A word to the wise is sufficient। তা বই, সবিস্তারে গীতাশাস্ত্রের গুণ-কীর্তন একপ্রকার সমুদ্রে অর্ঘ্য প্রদান। ঈশ্বরারাধনার অমৃতরস, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল জ্যোতি, যোগের তেজোময় অধ্যাত্ম-শক্তি, ধর্মের ধৃতি, অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের পুরুষার্থসাধনোপযোগী যত কিছু পাথেয় সম্বল আছে, ভগবদগীতা পাঠে সমস্তই হাত মেলিয়া পাওয়া যায়। ভারতের ধর্মশাস্ত্র জাতিবিশেষের ধর্মশাস্ত্র নহে, তাহা মনুষ্যের ধর্মশাস্ত্র— আত্মার ধর্মশাস্ত্র। তাই তাহার

বাক্যামৃতপানে আত্মা পবিত্র হয়— ভগবদ্ভক্ত হয়— বিশ্বপ্রেমী হয়—কর্তব্য কর্মে উৎসাহী হয়— সদানন্দচিত্ত হয়— অকুতোভয় হয়— তেজোময় জ্যোতির্ময় এবং মধুময় হয়। ভগবদ্গীতার ধর্ম গ্রহণ করিলে মনুষ্য হিন্দু হয় না, মুসলমান হয় না, খ্রিস্টান হয় না, ইহুদি হয় না, প্রটেস্টান্ট হয় না, ক্যাথলিক হয় না; হয় তবে কি? না মনুষ্য। অর্থাৎ সর্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য— মানুষের মতো মানুষ।

২০ ডিসেম্বর ১৯০৮

☐ *নানাচিন্তা*, ১৯২০, পৃ. ৩১৯-৩৬

রাজা ও রাজ-শক্তি

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি বিপ্লব, প্রবল ঝটিকার প্রাক্‌কালীন কালিমার ন্যায়, কেবল প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন মানবীয় স্বাধীনতার স্বাভাবিক নায়ক[1] বিশ্ববিখ্যাত মেরাবো পারিসের প্রধানতম রাজনৈতিক সভার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধিরূপে, অতিগভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে,— 'রাজা, রাজপদ ও রাজদণ্ডমর্যাদা অচিরেই অবনীর পৃষ্ঠ হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে; কিন্তু জনসাধারণের কোনোকালেও বিলয় নাই।'

ফ্রান্সের তদানীন্তন জাতীয় হৃদয় প্রতপ্ত বারুদ-গৃহের উপমাস্থল ছিল। উহা সাত শতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখে দগ্ধ হইয়া একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। এই কথা উহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইল। ইউরোপ কাঁপিয়া উঠিল, ইউরোপের সিংহাসন সকল ঐ আঘাতে টল টল করিতে লাগিল, এবং সুখ-সুপ্ত ব্যক্তি যেমন অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষশ্রবণে চমকিয়া উঠে, সিংহাসনারূঢ় রাজবর্গ এবং তাঁহাদিগের প্রসাদভোজী প্রজা-রক্তপুষ্ট অভিজাতগণও সেইরূপ সহসা চমকিয়া উঠিলেন। মেরাবোর কথাটি অল্পাক্ষর-গ্রথিত, সূত্রবৎ-সংক্ষিপ্ত, এবং অবোধের কর্ণে নিতান্ত অল্পমূল্যবিশিষ্ট। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে এই ভয়াবহ প্রশ্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে যে, 'পৃথিবীতে রাজা কে?'

বালকেরা বাহিরের সাড়ম্বর দেখিয়াই বিমোহিত হয়; চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় এবং কুসুমময়ী কল্পনা বিনা, আর কিছুই তাহাদিগের মনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। যাহাদিগের মন যথার্থ শিক্ষা এবং উচ্চতর বৃত্তিসমূহের পরিচালন বিরহে বালকের অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদিগেরও ঐ দশা। তাহারাও বালকের মতো বৈভবের বাহ্যঘণ্টা দেখিয়াই ভুলিয়া যায়, এবং যেখানে দশজনকে প্রণতির অভিনয় করিতে দেখে, সেখানেই একবার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করে। সংসারে এইরূপ অশিক্ষিত শ্রেণীর লোকই অধিক,

---

১. মেরাবো নিতান্ত দুরভিমানী ও দুষ্কৃতিদগ্ধ পুরুষ হইলেও, তাঁহার বিশালহৃদয়ে একটা ভাব বড় প্রবল ছিল। সে ভাব, স্বাধীনতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ। তিনি স্বাধীনতাব সম্মান রক্ষার্থ জীবনে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন,— অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রকারে নিতান্ত অপাত্র হইয়াও, জগতের ইতিহাসে, স্বাধীনতার প্রকৃত উপাসক বলিয়া, অনন্যলভ্য পূজা পাইয়াছেন। মেরাবো ফ্রান্সের অন্তর্গত বিগনন্ নগরে ১৭৪৯ খ্রি. অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রথম-উচ্ছ্বাস সময়ে, ইনি চল্লিশবৎসর বয়স্ক প্রৌঢ়যুবা। কিন্তু ইনি সে সময়েই ফ্রান্সে অদ্বিতীয় বাগ্মী এবং অসাধারণ ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিচিত।

এবং ইহাদিগের নিকট যাঁহার মুকুট, মাথায় গলায় মণিমালা এবং হাতে কবিকল্পিত দণ্ডের মতো কোনো একটা বস্তু আছে, তিনিই একজন রাজা। তিনি পিশাচ হউন, পাপিষ্ঠ হউন, এবং যতদূর সম্ভব অযোগ্য, অপদার্থ, স্বার্থপর এবং নীচাশয় নিষ্ঠুর হউন, কোনো প্রকারে একবার সিংহাসনে উঠিতে পারিলেই তিনি রাজা হইলেন। পাপীয়সী এগ্রিপিনার পাপজ পুত্র দুর্মতি নীরো এক প্রসিদ্ধ রাজা। ক্লদিয়স রাজা, ক্যালিগুলা রাজা, ফ্রান্সের নবম চার্লস্ ও চতুর্দশ লুই রাজা, এবং ইংলন্ডের জন্, জেম্স্, তৃতীয় এড্ওয়র্ড ও চতুর্থ জর্জ্ প্রভৃতিও রাজা।[২] ইঁহাদিগের রাজত্ব অবিসংবাদিত। কারণ ইঁহারা সকলেই, মাথায় মুকুট পরিয়া, করে দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

নীরোর জন্মপ্রসঙ্গে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, তদীয় পিতা এহেনোবারবস্, পুত্র হইয়াছে সংবাদ শুনিয়া পার্শ্ববর্তী পৌর-বর্গের নিকট এক বিকট হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন যে, যিনি তাঁহার ন্যায় পিতার ঔরসে এবং এগ্রিপিনার ন্যায় মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি পৃথিবী উচ্ছন্ন করিবেন।[৩] যাঁহাদিগকে লোকে রাজা বলে, অনুসন্ধান করিলে, তাঁহাদিগের অনেকের সম্বন্ধেই এইরূপ অনেক অদ্ভুত বৃত্তান্ত সংকলন করা যাইতে পারে। যেমন রোমে ষষ্ঠ আলেকজান্ডরের ন্যায় মূর্তিমান পাপও, পোপের আসনে সমাসীন হইয়া, লোক-সমাজে পবিত্র পুরুষ এবং পিতৃদেব বলিয়া পূজিত ও অভিহিত হইয়াছে; সেইরূপ পৃথিবীতে যিনি একবার রাজা হইয়াছেন,

২ নীরো, ক্লদিয়স, ক্যালিগুলা রোমের তিন অপকীর্তিত অদ্ভুত সম্রাট। নবম চার্লস্ ফরাসি দেশের সিংহাসনে বোরবোন বংশীয়দিগের পূর্বে অধিরূঢ় ছিলেন। ইনি রক্তপিশাচি ক্যাথেরিনার গর্ভসম্ভূত এবং বোধ হয়, এই হেতুই, মনুষ্যের রক্ত দর্শনে ইঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। ইনি ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলেও স্বহস্তে বহু মনুষ্যের প্রাণসংহার করিয়াছেন। চতুর্দশ লুই ফরাসি ইতিহাসে 'Louis the Great' অর্থাৎ অলোকসাধারণ লুই নামে কীর্তিত হইয়াছেন। কিন্তু ইনি কত সম্ভ্রান্ত লোকের কুলে কালি দিয়া উল্লিখিতরূপ অতুল কীর্তি উপার্জন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। ইংলন্ডের জন ও জেম্স্ প্রভৃতি রাজবর্গ বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট অবশ্যই সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্পর্কে আর কিছু উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

৩. At Rome, eighteen centuries ago this very year, Nero was married to a maiden called Octavia. He was the son of Ahenobarbus and Agrippina, the son of a father so abandoned and a mother so profligate that when congratulated by his friends on the birth of his first child, and that child a son, father said, what is born of such a father as I, and such a mother as my wife, can only be for the ruin of the State. Octavia was yet worse born. She was the daughter of Claudius and Messalina. Claudius was Emperor of Rome, stupid by nature, licentious and drunken by long habit, and infamous for cruelty in that age never surpassed for its oppressiveness, before or since. Messalina, his third wife, was a monster of wickedness, who had every vice that can disgrace the human kind except avarice and hypocrisy: her boundless prodigality saved her from avarice and her matchless impudence kept her clean from hypocrisy. Too incontinent even of money to hoard it, she was so careless of the opinions of others that she made no secret of any vice. Her name is still the catchword for the most loathsome acts that can

তিনিই এতকাল পর্যন্ত রাজ্যভোগ্য পবিত্র অধিকার সমূহ নিরাপত্তিতে উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু কালের কঠোর পরীক্ষায় ইহা এইক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে, এবং যাঁহাদিগের মন প্রাগুক্ত বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিতেছে, তাঁহারাও সকল দেশেই ইহা এইক্ষণ ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন যে, হীরকমণ্ডিত মুকুট, স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসন, আভরণের ন্যায় সুশোভন রাজদণ্ড, রণ-ভেরী, রণ-মাতঙ্গ, সুসজ্জিত দেহরক্ষক, সংখ্যাতীত সৈনিক, সৈনিকদিগের মার্জিত অস্ত্র-শস্ত্র, ইহার কিছুই রাজতা নহে। রাজতা একটি শক্তি এবং সেই শক্তি জনসাধারণের সমবেত-শক্তির ফল অথবা সমবেত-বল।

জনসাধারণরূপ বিরাট পুরুষের রাজশক্তি বিষয়ে এ স্থলে যে গভীর সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইল, ইহার অনুকূল প্রমাণ প্রধানত দুই প্রকার;—এক দার্শনিকযুক্তিমূলক, আর প্রত্যক্ষপরীক্ষিত ঐতিহাসিকবৃত্তান্তমূলক। দার্শনিক যুক্তিপরম্পরার সারমর্ম এককথায় ব্যক্ত করিতে হইলে, ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হয় যে, মনুষ্যমাত্রই আত্মার উন্নতি এবং শরীর ও মনের সুখ-সন্তৃপ্তি বিষয়ে কতকগুলি স্বাভাবিক স্বত্ব ও অধিকার লইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সকল মনুষ্যই স্বভাবত স্বাধীন। সে যতক্ষণ পরকীয় প্রবৃত্তির অবৈধ প্রতিবন্ধকতা না জন্মায় এবং পরকীয় সুখ-স্বত্বের অন্তরায় না হয়, ততক্ষণ সে আপনিই আপনার প্রভু, এবং আপনিই আপনার রাজা। সে যত কেন দরিদ্র, যত কেন দুঃখী হউক না, এই নৈসর্গিক ঐশ্বর্যে কেহই তাহার উপর কণিকামাত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে অধিকারী নহে। এই যুক্তিসূত্র অবলম্বন করিয়া কতক দূর অগ্রসর হইলেই দৃষ্ট হইবে যে, যাঁহারা রাজা বলিয়া পৃথিবীতে রাজপূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রকৃতির দ্বারে তাঁহাদিগের সহিত সাধারণ মনুষ্যের কিছুতেই কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে যে তাঁহারা রাজা হইয়াছেন, অথবা রাজপদ পাইয়াছেন, সে কেবল জনসাধারণের প্রয়োজনসাধন অথবা সেবকতার জন্য।

দার্শনিকেরা বলেন,— এই পৃথিবীতে তুমিও ললাটে রাজটীকা লইয়া অবতীর্ণ হও নাই, এবং আমিও দাসত্বের বিশেষ কোনো লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই।

---

be conceived of. She was put to death for attempting to destroy her husband's life; he was drunk when he signed the warrant, and when he heard that his wife had been assassinated at his command, he went to drinking again.

"Agrippina, the mother of Nero, and the bitterest enemy of Messalina, took her place in a short time, and became the fourth wife of her uncle Claudius, who succeeded to the last and deceased husband of Agrippina only as he succeeded to the first Roman King— a whole common wealth of predecessors intervening. Octavia, aged eleven, was already espoused to another, who took his life when his bride's father married the mother of Nero, well knowing the fate that also awaited him. Claudius, repudiating his own son, adopted Nero as his child and imperial heir. In less than two years Agrippina poisoned her Husband, and by a *coup d'etat* put Nero on the throne, who, ere long, procured the murder of his own mother, Seneca the philosopher helping him in the plot, but also in due time to fall by the hand of the tyrant."—*Paker*

তবে তুমি কে যে, আমার উপর রাজত্ব করিবে? আমি সূর্যের উদয় হইতে সূর্যের অস্তগমন পর্যন্ত গলদ্‌ঘর্মকলেবরে পরিশ্রম করিয়া মুষ্টিমিত আহার্য বস্তু আহরণ করিব, আর তুমি শ্বেতমর্মরখচিত সুদৃশ্য প্রাসাদে স্বর্ণপর্যঙ্কে শয়ান থাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া তার সারভাগ গ্রহণ করিবে। তোমার এ অধিকার কোথা হইতে? এই প্রশ্নের এক বই দুই উত্তর নাই। সে উত্তর এই—তুমি আমার কিংবা আমাদিগের সামাজিক—প্রয়োজনসিদ্ধির সহায়তায় এবং স্বত্বাধিকারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছ; তাই তুমি আমার এবং আমার মতো আরও সহস্র লোকের প্রদত্ত বলে বলীয়ান্ হইয়া এইক্ষণ আমাদিগের সকলের উপর প্রতিনিধিপ্রভু। তোমার যত কিছু ক্ষমতা, যত কিছু বৈভব, সমস্তই আমার ও আমাদের। আমাদিগের সর্বসম্মত সাধারণ ইচ্ছাই তোমার ব্যবস্থাশাস্ত্র, এবং আমাদিগের মৌনসম্মতিই তোমার রাজকীয় সনন্দ। রাজশক্তি আমরা সকলে, তুমি আমাদিগের সেই সর্বজনীন শক্তির সেবকমাত্র। আমরা বাড়াইয়াছি বলিয়াই তুমি বাড়িয়াছ, এবং আমরা দিয়াছি বলিয়াই তুমি আমাদিগের ধনে ধনী এবং আমাদিগের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াছ।

যেমন ভৃত্যদিগের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে প্রভুর পুষ্টি সম্পাদনে এবং প্রিয়কার্য সাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই সেই পরিমাণে প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করেন; রাজাদিগের মধ্যেও সেইরূপ যিনি যে পরিমাণে জনসাধারণের হিতানুষ্ঠানে ও চিত্তবিনোদনে যত্নশীল রহেন, তিনিই সেই পরিমাণে সুখ, সম্মান ও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া লৌকিককীর্তির অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়া যান। যুগযুগান্ত হইল রাজা রামচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি লোকে তাঁহাকে বাহু তুলিয়া অভিবাদন করে; আর যুগ-যুগান্ত হইল রোমরাজ্যের চিরকলঙ্ক দুরাত্মা টারকুইন উহার পাপদেহ পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু বুজিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি লোকে রোমের পুরাবৃত্ত পাঠ করিবার সময়, উহার নামে ঘৃণা ও ক্রোধের ভাবে স্ফীত হইয়া উঠে, এবং উহাকে কথায় কথায় শতবার অভিসম্পাত করে। ইহার কারণ কি? কারণ এই — রাজা রামচন্দ্র পৌর ও জানপদবর্গের সম্মিলিত মতের সম্মানরক্ষা এবং সাধারণের প্রীতি লাভের জন্য আপনাকে পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং আপনার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; আর, টারকুইন পদে পদেই প্রাকৃত প্রভুর মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, পরিশেষে যার পর নাই বিশ্বাসঘাতকের কার্য করিয়াছে।[৪]

এইক্ষণ এইরূপ বিতর্ক হইতে পারে যে, যে কথা উল্লিখিত হইল, তাহা দর্শনশাস্ত্রের প্রলাপ মাত্র। মনুষ্যের স্বত্বাধিকার ও স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক রাজ-মর্যাদার কথা পণ্ডিতমণ্ডলীর অতীব প্রিয় তত্ত্ব হইলেও, পৃথিবীর প্রকৃত ঘটনাবলীর নিকট উহা কোনো প্রকারেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। পৃথিবীতে নীতিশাস্ত্রের নাম লইও না। সেখানে বাহুবলই সকল শাস্ত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং সমুদয় কূট প্রশ্নের চরমসিদ্ধান্ত। চাহিয়া দেখ

৪ সেক্সটস্ টারকুইন (Sextus Tarquin) রোমের যুবরাজ ছিলেন। ইঁহার পিতা, শ্বশুরের শিরশ্ছেদ করিয়া তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইনি ইঁহার এক চিরহিতৈষী সুহৃদের গৃহে, রাত্রিযোগে, বিশ্বস্ত সুহৃজ্জনের ন্যায় প্রবেশ করিয়া, আগে আতিথ্যস্বীকার, তারপর, তদীয় সহধর্মিণী লোকপূজ্যা সতী লুক্রিশিয়ার ধর্মনাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা, ইঁহারই এই মহাপাপে, রোমের সিংহাসন হইতে পশু ও পিশাচের ন্যায় তাড়িত হইয়া, বিদেশে বিষাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাহার বাহুবল আছে, সে লোকসমূহের শাস্ত্রোক্ত স্বত্ব ও অধিকার সকল অম্লানচিত্তে পাদতলে নিষ্পেষণ করিয়া রাজত্ব করিতেছে, আর জয়ডঙ্কা পাইতেছে; এবং যাহাদিগের বাহুবল নাই, তাহারা আহোরাত্র ক্রন্দন করিয়া করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের দুঃখার্ণবে আপনারা ডুবিয়া যাইতেছে। অবলার অশ্রু-বিসর্জনে সমাজে কোথাও কোনো সময়ে কি পরিবর্তন সংঘটিত হয়? রুশিয়া যখন পোলন্ড গ্রাস করিল, তখন পোলন্ডনিবাসীরা কতই না চিৎকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চিৎকারে কি ফল ফলিয়াছিল? আইরিসদিগের আর্তনাদে কাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে?[৫] আলসেস্ ও লোরেনবাসীরা অদ্যাপি প্রাণভরে রোদন করিতেছে। কিন্তু কে তাহাদিগের রোদনে কর্ণপাত করে? মৃগী যখন ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণদশনে বিদ্ধ হইয়া কাতরকণ্ঠে বিলাপ করে, তখন সেই বিলাপ-ধ্বনিতে বনস্থলী বিষাদে পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু তাহাতে ব্যাঘ্রের কি হইয়া থাকে?

যাঁহারা জনসাধারণের ন্যায্যস্বত্বমূলক রাজশক্তির বিরুদ্ধে মুকুটিতরাজাদিগের বাহুবলের প্রশংশা করিয়া পূর্বোক্তরূপে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগের যুক্তি দার্শনিকদিগের প্রতিকূল না হইয়া প্রকারত অনেক অংশে অনুকূল। তাঁহাদিগের আপত্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে আপত্তিই নহে। উহা বস্তুত দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই পরিপোষণ করে। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, বাহুবলের নিকট বিচার নাই, বিতর্ক নাই, এবং অন্য কোনোরূপ বলের আপাতত অধিকার নাই। কিন্তু সেই পশুসমুচিত বাহুবল সমাজে কার হস্তে ন্যস্ত? সমাজের অধিকারস্থ বাহুবল-সমষ্টির যথার্থ অধিস্বামী কে? রাজা—না জানপদবর্গ? একজন, না জন-সমষ্টি? যদি পৃথিবীর জন-সমষ্টিই সমাজের প্রকৃত রাজা, তবে যে সিংহাসনস্থ প্রতিনিধি—রাজারা কখনও দিনকে রাত্রি অথবা রাত্রিকে দিন করেন, এবং অসংখ্য লোকের সুখ-সম্মানের উপর দিয়া কিছু দিনের তরে, আপনাদিগের পাশব-সাহসিকতার শকট চালাইতে অধিকারী হন, ইতিহাস দর্শনশাস্ত্রেরই অনুকূল হইয়া, তাহার এই একমাত্র কারণ নির্দেশ করে যে, সাধারণের সহিষ্ণুতা সহজে বিনষ্ট হয় না। উহা জড়প্রকৃতির সহিষ্ণুতার ন্যায় আপাতত নিষ্পন্দ ও নিশ্চল—অবাতবিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় কবি-হৃদয়ের ধ্যান-যোগ্য এবং কার্যসাধন তৎপর কৃতী পুরুষের চির-আরাধ্য।

কি আশ্চর্য! সংসারে অনেকেই আপনাকে আস্তিক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং কেহ তাঁহাদিগের মত ও বিশ্বাসে নাস্তিকতার দোষ দেখাইলে, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কিন্তু, তাঁহারা, বিশ্ববিধাতার ঐতিহাসিক প্রকাশে অবিশ্বাসী হইয়া, তদীয় ন্যায়ের শাসনে অনাস্থা দেখাইয়া, এবং তাঁহারাই কর-রেখা স্বরূপ প্রকৃতির পাষাণ-কঠিন নিয়মরেখায় অভক্তি প্রদর্শন করিয়া, সত্য সত্যই যে ঘোরতর নাস্তিকের মতো ব্যবহার করেন, তাহা ক্ষণকালও মনে করেন না। তাঁহারা বর্তমানক্ষণে যাহা দেখিতে পান, তাহারই পূজা করেন; কিন্তু অতীতকালের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য এবং ভবিষ্যতের আশ্বাসনী, ইহার কিছুরই মর্মগ্রহ করিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা প্রকৃত আস্তিক, তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে,

৫. এখন কাহারও নিদ্রাভঙ্গ না হইয়াছে এমন নহে। সমাজ ও সামাজিকবন্ধনের যাহারা পরমশত্রু, তাদৃশ দুর্বৃত্ত দস্যুরাও এখন তথায় কথা কহিবার স্থান পাইতেছে। কিন্তু ছয় সাত বৎসর পূর্বে, আয়র্লণ্ডের ভালো লোকের ভালো কথায়ও কেহ কান দেয় নাই।

জনসাধারণের সুখ-সমুন্নতিবিষয়ক স্বত্ব এবং সেই স্বত্বের সংরক্ষণক্ষম সমবেত-বল বিধাননির্দিষ্ট। উহা মানব-নিবাসে এক দিন, কি এক বৎসর, কিংবা এক শতাব্দীও অবহেলিত রহিতে পারে; কিন্তু রাজা কিংবা রাজপুরুষ প্রভৃতি কোনো শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরাই উহাকে চিরকাল অবহেলা কি অবমর্দন করিয়া ত্রাণ পাইতে পারেন না।

বিধাতা যে সকল শারীরিক নিয়ম মানব-শরীরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তৃষাতুর অন্ধ মনুষ্য প্রতিদিনই তাহা ইচ্ছাপূর্বক লঙ্ঘন করিতেছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও নিশীথে, সকল সময়েই, মনুষ্য প্রাকৃতনিয়মের অবহেলা করিয়া আপনার নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তিনিচয়কে ভোগের পথে ছাড়িয়া দিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির বল কত দিন ইহা সহিয়া থাকে? এই যথেচ্ছবিচরণ কতকাল অব্যাহত চলে? অপরাধী বহু দূর যাইতে না যাইতেই, অবমানিত নিয়ম, উহার কঙ্কালময় লৌহ-হস্ত প্রসারণ করিয়া, তাহাকে গ্রীবায় ধরিয়া ফিরাইয়া আনে, এবং অনতিবিলম্বেই এমন নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেয় যে, সে হয় তাহাতে একবারে বিপন্ন হইয়া পড়ে, না হয় তাহা বহুদিন স্মরণ রাখিতে বাধ্য রহে। লোকবহুল নগরের অধিবাসীরা সাধারণের স্বাস্থ্যঘটিত নিয়মসমূহের প্রতি উদাসীন হইয়া, নগরের যেখানে সেখানে নানাবিধ দুর্গন্ধময় বস্তু পুঞ্জীকৃত হইতে দেয়, এবং আরও সহস্রপ্রকারে প্রকৃতির শক্তিকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু যখন প্রকৃতির ক্রোধ লোকমারির ভীষণনাদে চতুর্দিকে নিবেদিত হয়, এবং মৃত্যুর লক্ লক্ জিহ্বা গৃহে গৃহে ও পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন কে আর উদাসীন রহিতে সমর্থ রহে? সামাজিকেরা, সমাজের প্রতিবিধানক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিয়া, আপনাদিগের মধ্যে কোনো ভয়ানক পাপ বহুকাল পুষিয়া রাখেন। অনেকে যেমন বস্ত্র দ্বারা বহ্নিকে আচ্ছাদন করিতে চেষ্টা করে, তাঁহারাও ঠিক সেইরূপ করিতে যত্নপর হন। কিন্তু ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যখন প্রচণ্ড বাত্যার ন্যায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া, মড় মড় শব্দে সমাজতরুর শাখা পল্লব ভাঙিয়া ফেলে, এবং অবশেষে সমাজের মূল ধরিয়াই টানাটানি করে, তাঁহাদিগের অভিমান ও বল-দর্প তখন কোথায় গিয়া পড়িয়া থাকে?

জনসাধারণের সুখ-স্বত্বঘটিত-ন্যায় সম্বন্ধেও প্রকৃতির নিয়ম এইরূপ অমোঘ ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। যিনিই যাহা মনে করুন, বিধাতার উপর বিধাতা নাই। প্রবলপরাক্রান্ত রাজারা, অনেকেই আপনাদিগকে নিয়মরাজ্যের বহির্ভূত বিবেচনা করিয়া, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে চলিয়াছেন, এবং সাধারণের দীর্ঘনিঃশ্বাস এবং দুঃখ-ধ্বনির প্রতি বধির হইয়া, ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ন্যায়, নিজ নিজ স্বেচ্ছাচারিতার তৃপ্তিসাধনেই রাজ-পদের সার্থকতা জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের তথাবিধ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার যে, পৃথিবী হইতে রাজকীয় মর্যাদার চিহ্নপর্যন্তও ধুইয়া ফেলিবার কারণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা তৎকালে চিন্তা করেন নাই। লোকে যাহাকে বিপ্লব বলে, তাহার বিশুদ্ধ নাম জনসাধারণী রাজ-শক্তির অঙ্গস্ফুরণ। দণ্ডধরেরা এক জন, কি দুই জন, কি দশ জনের উপর অত্যাচার করিলে, প্রকৃতির পাষাণবক্ষ, যেন কিছুকাল, তাহা সহিয়া লয়। কিন্তু সেই অত্যাচার যখন জনসাধারণের একীভূত-হৃদয়ের উপর বিস্তারিত হয়, তখন রাজ্যের অভ্যন্তর হইতে এমন এক জ্বলজ্জিহ্ব প্রমত্ত অগ্নি বাহির হইয়া পড়ে যে, তাহার নিকট কিছুই আর রক্ষা

পায় না। সেই দিগন্তব্যাপিনী বিলোলশিখা অবলোকন করিয়া, অতি বড় দুর্দমস্বভাব সম্রাটগণও রাজ-মুকুট পরিত্যাগ পূর্বক ভৃত্যবৎ ভূমিষ্ঠ হন, এবং জনসাধারণরূপ বিরাট পুরুষই যে পার্থিব জগতের প্রকৃত রাজা, এই কথায় ভয়ে ভয়ে ও গদগদ কণ্ঠে সাক্ষ্য দান করেন।

পুরাতন রোমরাজ্য ঐতিহাসিকদিগের প্রীতির পুত্তলস্বরূপ। পৃথিবীতে অদ্য পর্যন্ত যত রাজ্য গঠিত হইয়াছে, রোমের সহিত তাহার কাহারও, কি বিস্তারে, কি বৈভবে, কি সামর্থ্যে, কি মহিমায়, কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না। রোম সর্বদংশে অতুল ছিল। উহার উচ্ছ্রিত মস্তক অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গকেও উপহাস করিয়াছে, উহার বাহুদর্পে ধরণী নিয়ত থর থর কম্পমানা রহিয়াছে। রোমীয় বীরপুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক, রোমের একটি সামান্য দূতও প্রতিবেশী রাজাদিগের নিকট রাজোচিত অভ্যর্থনা পাইয়াছে; এবং সে যাহাকে যে আদেশ করিয়াছে, তাহাই শিরোধার্য পূর্বক প্রতিপালিত হইয়াছে। লোকে সূর্য-চন্দ্রের কক্ষভ্রংশও কল্পনা করিতে পারিয়াছে, তথাপি রোমের পতন কেহ কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু রোম, যে অসভ্য জাতিসমূহের স্বত্ব ও অধিকার নিপীড়ন করিয়া, দুর্দান্ত দানবের ন্যায়, ভৈরবমূর্তিতে দণ্ডায়মান ছিল, কালে সেই অসভ্যজাতীয়েরাই সমুত্থিত-বলে রোমের মাথার মুকুট কাড়িয়া লইয়াছে, উহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়াছে— উহার রাজ-বেশ, রাজ-ভূষা, সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, এবং উহার ধরাবলুণ্ঠিত মৃতদেহের উপর স্বকীয় জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়া, সাধারণী শক্তির অসীমতার পরিচয় দিয়াছে। রোমের বিরুদ্ধে গথ ও ভেন্ডালদিগের[৬] যে অভিযান হয়, ইহাকে রাষ্ট্রবিপ্লব বলা সুসঙ্গত না হইলেও, ব্যক্তিগত রাজ-শক্তির সহিত প্রাকৃত-শক্তির সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলন্ড ও ফ্রান্স উভয় রাজ্যই যুগপৎ দুইটি বিপ্লবে বিলোড়িত হয়। ইংলন্ডে প্রকৃতিবর্গ, রাজপুরুষদিগের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, অবশেষে আপনাদিগকেই রাজ-শক্তির মূল প্রস্রবণ বলিয়া ঘোষণা দেয়; এবং ফরাসি ফ্রন্ড[৭] বিপ্লবের স্বপক্ষগণও, সেই সময়, সাধারণের প্রভুত্ব ও মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ঘোরতর চিৎকার করিয়া, অবশেষে রাজ্ঞী এন্ এবং তদীয় কূটবুদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ম্যাজেরিনকে, রাজধানী হইতে কিছু দিনের জন্য, নির্বাসিত থাকিতে বাধ্য করে। ফরাসি সিংহাসনের এন্ অবনতি স্বীকার করিয়া পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন; ইংলন্ডীয় সিংহাসনের চার্লস্ অবনতি স্বীকারের অবসর না পাইয়া, যাহাদিগকে পূর্বে 'নগণ্য' প্রজাজ্ঞানে ঘৃণা করিতেন, তাহাদিগেরই বিচারে বিকৃত রাজনীতির দণ্ডস্বরূপ প্রাণত্যাগ

৬. গথ ও ভেন্ডাল পুরাতন ইউরোপের পশ্চিমোত্তব প্রদেশবাসী দুইটি প্রসিদ্ধ অসভ্য জাতি। যিশুখ্রিস্টের জন্মগ্রহণেব একটুকু পূর্ব হইতেই ইহাবা ক্রমে অতি প্রবল হয়।

৭. এক দিকে ত্রয়োদশ লুইর বিধবা বাজ্ঞী কোপন-স্বভাবা এন্ এবং তাঁহার বাজপ্রতিনিধি অথবা মন্ত্রী ইটালিজাতীয় ম্যাজেবিন; অপবদিকে দেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও অসংখ্য দীন দুঃখী প্রজা। এই বিপ্লবই ফরাসি ইতিহাসে ফ্রন্ড বিপ্লব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাজ্ঞী ও রাজ্যাধ্যক্ষের উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতাই এই বিপ্লবের মূল।

করিলেন। ইহা অস্বীকার করিবার কথা নহে যে, ফ্রেন্ড বিপ্লবের অধিনায়কদিগের মধ্যে স্বার্থপর ও সুখ-তৃষাতুর ভণ্ড সাধুর সংখ্যাই বেশি ছিল; এবং ইহাও সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইংলন্ডীয় রাজার চরিত্র কোনো কোনো অংশে এমন মহত্ত্বগুণালঙ্কৃত ও মাধুর্যবিশিষ্ট ছিল যে, ক্রমওয়েলকে[৮] তাঁহার তুলনায় ক্রূরমতি নিষ্ঠুর বলিয়া নির্দেশ করাই উচিত। কিন্তু এই বিপ্লবদ্বয়ের বিঘট্টনে এই কথা উভয় দেশেই প্রমাণিত হইয়া রহিল, এবং মানবজাতির অক্ষয়স্মৃতিপটে জ্বলদক্ষরে লিখিত থাকিল যে, জনসাধারণের সহিষ্ণুতা একবার যখন বিচলিত হয় এবং সমগ্র জানপদশক্তি যখন এক শিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, তখন রাজা এবং রাজ-বল তাহার মুখে পতিত হইতে না হইতেই শুষ্ক তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুদয় এবং বিলয়ও সাধারণের রাজকীয় মহিমার আর এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। তদীয় অত্যাশ্চর্য জীবনবৃত্ত ইহাই অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ করে যে, প্রতিভা সাধারণের শক্তিতে পরিবর্ধিত হইলে, তৃণমাত্র অবলম্বনেও পর্বতের চূড়া ভাঙিতে সমর্থ হয়; আর সাধারণের অকৃপা হইলে, পর্বতের পৃষ্ঠে আরূঢ় রহিয়াও তৃণের কাছে পরাভব পায়। যখন উন্মাদগ্রস্ত পারিসীয়ানদিগের নিদারুণ পদাঘাতে সাধুপ্রকৃতি ষোড়শ লুইর পুরুষানুক্রমিক রাজসিংহাসন রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল, এবং তদীয় ছিন্নগ্রীবা রক্তধারা বর্ষণ করিয়া প্যারিসনগরের রাজ-পথকে সিক্ত করিল, তখন কেহই মনে করিয়াছিল না যে, ফ্রান্স আবার জীবিত হইয়া, পৃথিবীর জাতীয়-সভায় আসন গ্রহণ করিবে। রাজ-ভাণ্ডার লণ্ডভণ্ড, সেনাবল অন্নাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ, বাহিরে শত্রুর ভীষণ গর্জন, অভ্যন্তরে আত্মকলহ, আকাশ অন্ধকারময় এবং চতুর্দিকে অহর্নিশ হাহাকার! যেমন কর্ণধারহীন তরণী সমুদ্রের তরঙ্গায়িত ঘূর্ণাবর্তমধ্যে একবার ডোবে, আবার ভাসে, এবং প্রতিক্ষণেই যায় যায় হয়, অরাজক ফ্রান্সও তখন ঠিক সেইরূপ অবস্থাপন্ন। সহায়তার জন্য একটি লোকও নাই, অথচ কোটি লোকের চক্ষু উহারই উপর নিপতিত। ফ্রান্স একবার তল পড়িলেই সকলে জয়ধ্বনি দিয়া উঠে, এবং এই কথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করে যে— রাজ্যের মূলভিত্তি ও প্রকৃত জীবন রাজা,— অতএব যে রাজ্যে রাজা নাই, সে রাজ্যে জনসাধারণের কিছুই ভরসা নাই। এই দুস্তর বিপত্তির সময় কর্সিকার একটি সামান্য যুবা সহসা আসিয়া ফ্রান্সের রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। দৃষ্টিমাত্রই সকলে তাঁহাকে কার্যনির্বাহক্ষম প্রতিনিধিপুরুষ বলিয়া চিনিয়া লইল। রাজ্যের যে বিভাগে যে পরিমাণ শক্তি ছিল, তাহা তাঁহার নিকট অর্পিত হইতে লাগিল, এবং সেই একধারাপ্রবাহিত মিলিতশক্তির অজেয় প্রভাবে ফ্রান্সের রাজতরী তৎক্ষণাৎ সুস্থির হইয়া পূর্বাপেক্ষা শতগুণ অধিক বেগে অগ্রসর হইয়া চলিল। বস্তুত, নেপোলিয়নের আধিপত্য

৮. ক্রমওয়েল ইংলন্ডের অন্তর্গত হান্টিংডন নগরে ১৫৯৯ খ্রি. অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫৮ খ্রি. অব্দের ৩ সেপ্টেম্বর লোকান্তরিত হন। ইনি আগে পার্লামেন্ট সভার একজন সাধারণ সভ্য ছিলেন পরে আপনার অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ইংলন্ডের প্রতিনিধি-প্রভু হইয়া তদানীন্তন রাজা প্রথম চার্লস্‌কে সিংহাসনচ্যুত করেন, পরিশেষে ইনিই রাজার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করাইয়া রাজ্যের সমস্ত ভার স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক "পরিরক্ষক" নামে সর্বাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন।

সময়ে, ফ্রান্সের প্রতাপ দিগ্‌দিগন্তরে যেরূপ ছাইয়া পড়িয়াছিল, অন্য কোনো রাজার সময়েই উহার ঐরূপ যশোবিস্তার এবং প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রদর্শিত হয় নাই। ইউরোপের রাজগণ তখন রাজকুলের চির-প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পরস্পর হইয়া রাজদ্রোহী ফ্রান্সের সহিত পুনঃপুনঃ মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পুনঃপুনঃই আহত হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন। নেপোলিয়ন এই অলৌকিক বল কোথায় পাইয়াছিলেন? ইহা কি শুধু তাঁহারই অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেয়? না, সাধারণের সমবেত শক্তির অপ্রতিহত মাহাত্ম্য কীর্তন করে? যদি শুধু নেপোলিয়নের বীরত্বেরই প্রশংসা কর, তবে যেই তিনি সাধারণের প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করিয়া, এবং সাধারণের সহানুভূতিতে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বকীয় শক্তি সম্পদের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তিনি ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় একবারে নিপাত গেলেন কেন?

নেপোলিয়নের অদৃষ্টচর বিজয়পরম্পরা এবং অচিন্তিতপূর্ব অবসানের আদ্যোপান্ত কাহিনী পর্যালোচনা করিয়া আড়ম্বরপ্রিয় তরলমতি ব্যক্তিরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করেন, বলিতে পারি না। গূঢ়দর্শী বিচক্ষণ লোকেরা ইহাতে জনসাধারণ রাজ-শক্তির লহরী-লীলা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাদিগের চক্ষে নেপোলিয়নের পৃথক অস্তিত্ব নাই; তিনি জনসাধারণরূপ অবিনশ্বর বিরাট পুরুষের করধৃত বজ্রমাত্র। তাঁহার দ্বারা যতক্ষণ সাধারণের সুখ-সমুন্নতিমূলক উদারধর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ততক্ষণ তাঁহার হুঙ্কারে, পুরাতন রাজাদিগের কীটদষ্ট পুরাতন সিংহাসনের কথা দূরে থাকুক, পাষাণকঠিন বীর-দুর্গও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর যখন বীরচূড়ামণি সাধারণের সুখ ও উন্নতির পরিপন্থী হইয়া বিধাতৃশক্তির সামান্য একটুকু বিরোধী হইয়াছেন, তখন মশকের দংশনেই তাঁহার মহোচ্ছ্রিতশক্তি ঢলিয়া পড়িয়াছে।[৯]

ইহার পরও কি জিজ্ঞাসা করিবে যে, পৃথিবীতে রাজা কে, আর রাজশক্তি কি? আমেরিকার নূতন অমরাবতী এবং ওয়াশিংটনের অচলা কীর্তি এই প্রশ্নের কি উত্তর করিবে? ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডি[১০] প্রভৃতি লোকান্তরবাসী মহাত্মাদিগের চিরজীবিনী স্মৃতির নিকট জিজ্ঞাসুভাবে উপস্থিত হও, সেখানে কি উপদেশ পাইবে? বস্তুত ইতিহাসের

৯. দুই তিন বৎসর হইল, নেপোলিয়ন সম্পর্কে লর্ড রোজবেরির একখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সে গ্রন্থ দেখি নাই, গ্রন্থের ক-একটি প্যারাগ্রাফ *Weekly Times* নামক ইংলন্ডীয় সংবাদপত্রে উদ্ধৃত দেখিয়াছি। দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কারণ, সে উদ্ধৃত অংশ উপরি-লিখিত প্যারা দুইটির অনুবাদের মতো। 'নিভৃত-চিন্তা' দরিদ্র বাংলা ভাষাব বস্তু এবং বাঙালির লেখা। লর্ড রোজবেরি কোনো বাংলা পুস্তকের নামটিও বোধ হয় কোনোদিন কানে শোনেন নাই। অথচ 'নিভৃত-চিন্তা'ও বিশ বৎসরের পুরাতন পুস্তক। এমন অবস্থায় 'নিভৃত-চিন্তা'র লেখার সহিত লর্ড রোজবেরির 'নেপোলিয়ন' নামক পুস্তকের লেখার এইরূপ বিচিত্র সাদৃশ্য অতি সামান্য পরিমাণে হইলেও, বাংলা সাহিত্যিকদিগের পক্ষে আনন্দজনক। কথাটা একেবারে উপেক্ষার যোগ্য নয় বলিয়া আমি এস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। [প্রকাশক— শ্রীহরকুমার বসু]।

১০. ইটালীর অধিবাসীরা, যাঁহাদিগেব বুদ্ধির প্রতিভা ও বাহুবলের প্রসাদে, পঞ্চদশ শতাব্দীর পরাধীনতার পর, পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দতায় কৃতার্থ হইয়াছেন, ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডি তাঁহাদিগের অগ্রনায়ক। ম্যাট্‌সিনি বুদ্ধিদাতা মন্ত্রী, গ্যারিবল্ডি যুদ্ধরত বীর।

স্তবকে স্তবকে এবং পত্রে পত্রে এই একই কথাই অঙ্কিত দেখিবে যে—রাজা জনসাধারণের সমবেত-শক্তি, আর যাঁহারা রাজপুরুষ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা সেই শক্তিরই ছায়া কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। পুরাণ-প্রসঙ্গে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, ভাগীরথী যখন হিমাদ্রির শীর্ষদেশ হইতে সহস্রধারায় নিঃসৃত হইয়া, পুনরায় একীভূত প্রবাহে, সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিলেন, তখন এক মদমত্ত মাতঙ্গ তাঁহার সেই অদম্য বেগ অবরোধ করিতে যাইয়া, অশেষপ্রকারে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়, এবং পরিশেষে ত্রাহি ত্রাহি রবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া প্রাণমাত্র লইয়া পলাইয়া যায়। মানবজাতিরূপ বিরাট পুরুষের সর্বজনীন শক্তিস্রোতের নিকট সেই ভাগীরথীর স্রোতও কিছুই নহে। হতভাগ্য সেই রাজা, যিনি রাজগর্বে গর্বিত হইয়া, জনসাধারণের উদ্বেল হৃদয়বেগের প্রতিকূলে ঐরূপ দণ্ডায়মান হন—আর, সুখ ও সৌভাগ্য তাঁহাদিগের, যাঁহারা পুরাকালের অশোক[১১] কিংবা আকবর এবং আধুনিক ইতিহাসের দ্বিতীয় আলেক্‌জান্ডর[১২] কিংবা আয়ুষ্মতি ভিক্টোরিয়ার ন্যায়, প্রাকৃতশক্তির স্বাভাবিক প্রভুত্ব এবং আপনাদিগের প্রতিনিধিত্ব ও পবিত্র দায়িত্ব সর্বতোভাবে অনুভব করিয়া, সাধারণের সুখ-সাধনকেই মানবজীবনের মহাব্রতজ্ঞানে জীবন যাপন করেন।

১১. নন্দবংশ ধ্বংসের পর চাণক্যের শিষ্য চন্দ্রগুপ্ত ৩২৫ খ্রি. পূ. অব্দে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে সম্রাটের সিংহাসনে আসীন হইয়া, সমগ্র ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার; বিন্দুসারের পুত্র অশোকবর্ধন। অশোকের আর এক নাম প্রিয়দর্শী। পালি ভাষায় উহা *পিয়দসী* বলিয়া প্রচলিত। অশোকের মতো সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত দয়াধর্মপরায়ণ সম্রাট্ এই পৃথিবীতে অল্পই হইয়াছে। তিনি রুগ্‌ণ, ক্লিষ্ট ও দীন-দুঃখীদিগের উপকারার্থ ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে, অসংখ্য ধর্মশালা সংস্থাপন করিয়া শতকোটি সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাছে সকল ধর্মেরই সমান সম্মান ছিল।

১২. রুশ-সম্রাট্ নিকলউইচ্ আলেকজান্ডর কতকগুলি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কাপুরুষ নিহিলিস্টের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া নিহত হইয়া থাকিলেও, মনুষ্যজাতি চিরদিনই তাঁহাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া সম্মান এবং মানবজাতির উপকারী বলিয়া আশীর্বাদ করিবে। রুশ-সাম্রাজ্য সর্বতোভাবেই স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ্য। সেখানে সম্রাট্ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। কারণ রাজকীয় ক্ষমতার সঙ্গে যাজকীয় ক্ষমতাও সেখানে একমাত্র রাজার হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপ ইয়ত্তাশূন্য ক্ষমতার উপর আরূঢ় হইলে, পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই প্রায়শ অধঃপাতে যায়। কিন্তু সম্রাট্ আলেক্‌জান্ডর তাঁহার সেই অপরিসীম ক্ষমতার কোনোরূপ অপব্যবহার করা দূরে থাকুক, তিনি সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার পরক্ষণেই (মার্চ, ১৮৬১) *Serf* অর্থাৎ দাস বলিয়া পরিচিত ২,৩০,০০,০০০ শ্রমজীবীকে দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দান করিয়া রুশীয় ধনিসম্প্রদায়ের চক্ষুশূল হন, এবং তদীয় সাধুজীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত, বরাবরই সকলের প্রতিকূলে দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করিয়া, অক্ষয়কীর্তি লাভ করেন। তুর্কের নিগড়নিপীড়িত খ্রিস্টানদিগের মধ্যেও অনেকে যে এইক্ষণ স্বাধীন হইয়াছেন, তাহাও তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনি শৈশব-সংস্কারে স্বেচ্ছাতন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকিলেও জাতীয় স্বাধীনতারই পরম সুহৃৎ ছিলেন, এবং রুশীয়দিগের মধ্যে অনেক প্রকারের প্রতিনিধি সভা সংস্থাপন দ্বারা কার্যতও তাঁহার এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসম্পর্কিত করুণকাহিনীও তাঁহার মহত্ত্বেরই প্রমাণ। নিহিলিস্টেরা তাঁহাকে লক্ষ করিয়া যে বম্ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার গায়ে না পড়িয়া, তাঁহার একটি ভৃত্যের গায়ে পড়ে। তিনি সেই ভৃত্যটিকে রক্ষা করিবার জন্য, গাড়ি হইতে নাবিয়া, কতকটা পথ পদব্রজে ফিরিয়া যাইয়া, প্রাণে মারা পড়েন।

☐ *নিভৃত-চিন্তা*, ১৮৮৩

বোম্বাই রায়ত

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক দিকে এই সকল সালিসী কোর্ট আর এক দিকে কঠোর আইনবদ্ধ আদালত। বিনা ব্যয়ে আপসে বিবাদ ভঞ্জন একের কার্য— অপরের কার্য বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া অর্থী প্রত্যর্থী উভয়েরই অর্থনাশ করা। একবার আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আর শান্তি নাই— বিরাম নাই। ইহার চূড়ান্ত হইতে যে কালবিলম্ব হয় তাহাতে কত ধূর্ততা প্রবঞ্চনা মিথ্যা সাজাইবার সময় পাওয়া যায়। প্রথম কোর্টে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে জেলা জজের নিকট আপিল— তার পর বোম্বাই হাইকোর্টে— কখনও বা বিলাতে রানীর বিচারালয় পর্যন্ত না গিয়া পরাজিত পক্ষ ক্ষান্ত হয় না। ইহাতে কত বিলম্ব ও অর্থব্যয়, বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ বিদ্বেষ প্রদীপ্ত হয়। ইহা অপেক্ষা সালিসী কোর্টের সহজ ও শান্তিময় প্রণালী কত প্রার্থনীয়। বোম্বাই অঞ্চলের একজন জেলা জজ সালিসী কোর্ট ও আদালতের কার্যপ্রণালীর সম্মিলন প্রস্তাব করিয়া East Indian Association সভায় এক প্রবন্ধ[১] পাঠ করেন। তাঁহার মতে এই উভয় কোর্ট একত্রে মিলিয়া কার্য করিলে তাহা হইতে অনেক শুভফল প্রসূত হইতে পারে। তিনি বলেন ইহার প্রত্যেক কোর্টেরই দোষ গুণ লক্ষিত হয়। এই উভয় কোর্টের বিচারক বিদ্যা বুদ্ধিতে সমান নহে। পঞ্চায়তের একজন মেম্বর সুশিক্ষিত মুন্সেফের তুল্য বিচক্ষণ বুদ্ধিমান কার্যদক্ষ আইনজ্ঞ হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু তেমনি আবার আর কতকগুলি বিষয়ে পঞ্চায়ত কোর্টের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। পঞ্চায়তের লোকেরা গ্রামের মধ্যে থাকিয়া আপনার গ্রামের বৃত্তান্ত সকল জানিতেছে শুনিতেছে— গ্রামবাসীদিগের চরিত্র রীতি নীতি তাহারা বিশেষ রূপে অবগত। হয়তো সাক্ষীদের হাব-ভাব দেখিয়া তাহারা সাক্ষ্য ভালো করিয়া ওজন করিতে পারিবে, সাক্ষ্যের সত্যাসত্য সহজে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। তাহারা মোটামুটি বিচার করিয়া যেরূপে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে মুন্সেফ হয়তো সহস্র আইন খাটাইয়া তাহাতে কৃতকার্য হইবেন না। আর এক দিক্ দেখিতে গেলে মুন্সেফ হয়তো তাহাদের অপেক্ষা বিচারক্ষম বহুদর্শী, মুন্সেফ হয়তো অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দিবেন— পঞ্চায়তের পক্ষপাত-দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ক্ষণে এই দুই কোর্ট পৃথক্ পৃথক্ কার্য করিতেছে বলিয়া তাহারা

---

১. "The Panchayat; a remedy for Agrarian disorders in India" read before The East India Association by Mr. William Wedderburn (Bombay Civil Service).

তাদৃশ ফলোপধায়ী হয় না, কিন্তু তাহারা সম্মিলিত হইলে তাহাদের পরস্পরের দোষ খণ্ডন ও উপকারিতা বর্ধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই রূপে উভয় কোর্টে মিলিয়া কার্য করা আমাদের প্রাচীন প্রথার অনুযায়ী, পূর্বে মহারাষ্ট্র দেশে বাদী প্রতিবাদী প্রথমে পঞ্চায়তের নিকটে যাইয়া আপনাদের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য আবেদন করিত— সে বিচার মনের মতো না হইলে অসন্তুষ্ট পক্ষ রাজকর্মচারী ন্যায়াধীশের শরণাপন্ন হইত। এখনও কতকটা এই নিয়ম প্রবর্তিত হইতে পারে। প্রত্যেক বড় বড় গ্রামে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীসমূহে এক একটি পঞ্চায়েত কোর্ট স্থাপিত হউক। তাঁহাদের নিকট প্রথমত সামান্য ঋণ-সম্বন্ধীয় মকদ্দমার বিচার হইবে। তাঁহারা যতগুলি মকদ্দমা আপসে মিটমাট করিয়া দিতে পারেন তাহা সাধ্যমতো করিয়া দিবেন— অবশিষ্টগুলি যাহা সহজে নিষ্পত্তি হওয়া দুষ্কর তাহা মুন্সেফের বিচারালয়ে আনীত হইবে। মুন্সেফ কোর্ট একস্থানে আবদ্ধ থাকিবে না— মুন্সেফ গ্রামে গ্রামে সরকিট ভ্রমণ করিয়া বিচার কার্য নির্বাহ করিবেন। যে গ্রামে পঞ্চায়ত কোর্ট প্রতিষ্ঠিত, তথায় উপস্থিত হইলে তিনি পঞ্চায়তের মতে তাহার সভাপতি হইয়া বিচারাসনে বসিবেন ও তাহাদের সাহায্যে গুরুতর মকদ্দমা সকলের নিষ্পত্তি করিবেন। যাহাতে অর্থী প্রত্যর্থী পঞ্চায়তের ব্যবস্থা অমান্য করিয়া অকারণে আদালতে মকদ্দমা আনিতে না পারে তাহার জন্য ঐ সকল মকদ্দমার উপর স্টাম্প কর নির্ধারিত করা আবশ্যক। আর মুন্সেফ কোর্টের কার্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল রূপে চলিতেছে কি না ও তাহার বিচার-কার্য ভালো-মন্দ কিরূপ হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার জেলা জজের উপর থাকিবে। জেলা জজ ও তাঁহার সহকারীগণ মধ্যে মধ্যে সরকিট গমন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

এই পঞ্চায়ত-প্রথা প্রবর্তিত হইলে দেশের অশেষ হিত সাধিত হয়, বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট মনোযোগী না হইলে কিছুই হইবে না। গভর্নমেন্টের সাহায্য ব্যতীত এই মৃতপ্রায় তরু পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্ভব নহে। পঞ্চায়ত সভার সভাসদদিগকে কোনো সম্মানসূচক পদবি প্রদান করা মন্দ নয়। তাহা হইলে জমিদার, উচ্চশ্রেণীর বণিক, পেন্‌সনভুক লোক যাঁহাদের হাতে অগাধ সময় পড়িয়া আছে তাহা কিরূপে কাটাইবেন ভাবিয়া পান না, তাঁহারা স্থানীয় সভার সভাসদ হইবার প্রার্থী হইতে পারেন। এইরূপ সভা লোকের মধ্যে বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া জনসমাজে শান্তিরক্ষণে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ রাইয়ত কমিশনরগণ প্রস্তাব করিয়াছেন যে ছোট ছোট ঋণ-সম্বন্ধীয় মকদ্দমার বিচারের জন্য কতকগুলি বিশেষ কোর্ট স্থাপিত হওয়া উচিত। সরকিট কোর্টের ন্যায় স্থানে স্থানে তাহাদের অধিবেশন হইবে ও এই সকল কোর্টের তত্ত্বাবধানে প্রচলিত আদালতের মুন্সেফ প্রভৃতি বিচারকগণ নিযুক্ত থাকিবে। রায়ইতদিগকে আপনাদের ঘরবাড়ি কৃষিকার্য ছাড়িয়া দূরস্থিত আদালতে যাইতে বাধ্য করা তাহাদের উপর সামান্য অত্যাচার নয়। সরকিট কোর্টে ইহার অনেকটা উপশম হইতে পারে। তদ্ভিন্ন তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে বিচারের সৌকর্য ও বিলম্ব হ্রাসের সম্ভাবনা। অবিচারের নীচেই বিচারে কালবিলম্ব দূষণীয়। এইক্ষণকার বিচার-প্রণালীতে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রতা বিশেষ প্রশ্রয় পায়

বলিয়া বাদী প্রতিবাদী অনেক সময় সুবিচারের ফল হইতে বঞ্চিত হয়। এই সকল অমঙ্গল নিবারণ উদ্দেশ্যে কমিশনরগণ বলেন যে বিচারকেরা ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রধান প্রধান গ্রামে গিয়া আদালত খুলিবেন ও সেই সময়ে গ্রামের অধীনস্থ পল্লী-সমূহের সমুদায় মকদ্দমা তাঁহাদের কোর্টে উপস্থিত করিতে হইবে। গ্রামের মণ্ডলেরা প্রতিবাদীদিগকে আনিয়া হাজির করিতে আদিষ্ট হইবে— কার্যপ্রণালী যতদূর সহজ হইবার তাহা হইবে এবং প্রতিবাদীর যদি আপনার পক্ষে কিছু বলিবার থাকে সে তাহা ব্যক্ত করিবে, এইরূপ হইলে অনেক জাল প্রতারণা মিথ্যাসাক্ষ্য উঠিয়া যাইবে, প্রতিবাদীগণ মন খুলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্ষম হইবে, সাক্ষীরাও অকুতোভয়ে অন্যের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্যদান করিতে পারিবে। প্রতিবাদীগণের প্রবাস যাপনের কষ্ট দূর হইবে। এইক্ষণে যে সকল মকদ্দমার বহুকষ্টে দীর্ঘকালে মীমাংসা হয় তাহা অনতিপরিশ্রমে অল্প-সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হইবে— বিচারে ন্যায় ও ত্বরা উভয়ই রক্ষা পাইয়া অর্থী প্রত্যর্থীর সন্তোষ সাধন করিবে।

অধুনাতন আদালতে কার্য-প্রণালী রাইয়তের পক্ষে বিষম সঙ্কটাবহ তাহার আর সন্দেহ নাই। দাবিদার আসিয়া তাহার দাওয়ার আরজি দাখিল করিলে পর প্রতিবাদীর প্রতি কোর্টে হাজির হইবার সমনজারি হয়, কিন্তু অনেক সময় এই সমন যথাস্থানে পৌঁছে কিনা সন্দেহ। এমন হইতে পারে যে বেলিফ বাদীর টাকায় ক্রীত, সে সমন জারি না করিয়াও কোর্টে মিথ্যা রিপোর্ট প্রেরণ করিল। ডিক্রিজারির সময় রাইয়ত হয়তো প্রথম জানিতে পারিল যে তাহার সর্বনাশ উপস্থিত— সে অমনি দৌড়িয়া কোর্টে গিয়া নিবেদন করিল "দোহাই ধর্মাবতার, আমি এ মকদ্দমার কিছুই জানি না।" সে আপনার কথা সমর্থন করিতে পারে না পারে তাহা দৈবের উপর নির্ভর। রাইয়ত যদি বা সমন পাইল, তাহাকে কোর্টে আসিয়া দাওয়ার উত্তর দিতে হইবে— উকিল নিযুক্ত করিতে হইবে— সাক্ষীর ডাকিবার খরচা দিতে হইবে, এই সকল বিভীষিকা দেখিয়া সে আদালতে ঘেঁষিতেই সংকুচিত হয়। অতএব অধিকাংশ মকদ্দমা যে প্রতিবাদীর অবর্তমানে নিষ্পত্তি হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? তদনন্তর রাইয়তের উপর একবার ডিক্রি করিয়া লইতে পারিলেই মহাজনের কার্যসিদ্ধ হইল। সে যে সদ্য সদ্য ডিক্রিজারি করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে কিন্তু সে সেই ডিক্রি রাইয়তের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া সময়ে সময়ে তাহার নিকট হইতে টাকা শস্য গ্রহণ করে, অথবা তাহাকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করে। তৎপরে ইচ্ছা হইলে আবার সম্পূর্ণ ডিক্রিজারি করিয়া লয়। এইরূপ প্রবঞ্চনায় আইন তাহার সহায়, কেন না আইনানুসারে ডিক্রির টাকা কোর্টে আনিয়া অথবা কোর্টকে জানাইয়া ডিক্রিদারকে দিতে হইবে। কিন্তু রাইয়ত তো এ-নিয়মের কিছুই জানে না। একবার আপনার যথাসর্বস্ব বেচিয়া কিনিয়া ডিক্রির টাকা শুধিয়াছে— তাহার উপর আবার ডিক্রিজারির সংবাদ পাইয়া কোর্টে গিয়া কাঁদিয়া পড়ে "দোহাই ধর্মাবতার, আমি ডিক্রির সব টাকা শুধিয়াছি— বাদীর আর এক পয়সাও পাওনা নাই।" বিচারক কি করিবেন— তাঁহার হাত পা বদ্ধ—হয়তো বলিতে বাধ্য হন "তুই আপসে বাদীকে টাকা দিয়াছিস্— কোর্টে হাজির করা হয় নাই— এখন আর আমি এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না"— এই বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেন। দৈবাৎ কখনও এই অত্যাচার

মাজিস্ট্রেটের কর্ণগোচর হইলে ফৌজদারিতে ইহার বিচার হইতে দেখা যায় ও তখন মহাজন তাহার দুষ্কৃতির উপযুক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হয়।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে সহজে প্রতীতি হইবে, দরিদ্র প্রতিবাদীর ন্যায়-লাভ কিরূপ দুর্ঘট। প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত তাহার যন্ত্রণাভোগ। প্রথমত মকদ্দমার ব্যয়-বাহুল্য হেতু তাহার পক্ষে আদালতের দ্বার তো একপ্রকার রুদ্ধ বলিলে হয়। যদি কখনও প্রবেশ করিতে পায় তো আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া জয়লাভ করাও তাহার পক্ষে সহজ নহে। আর তাহার বিরুদ্ধে একবার যদি ডিক্রি বাহির হইল তাহা হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। তখন হইতে তাহার মন্দভাগ্য উদয়— তাহার সুখশান্তি সকলি অস্তমিত হইল— সেই অবধি সে হয়তো মহাজনের দাসত্বে তাহার সমুদায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়।

রাইয়তেরা প্রায়ই অজ্ঞান— লেখাপড়া কিছুই জানে না— আপনাদের হিতাহিত কিছুই বুঝে না। সামান্য হিসাব-জ্ঞান না-থাকায় অনেক সময় তাহারা প্রতারিত হয়। তাহারা বুঝে এক, লেখায় দাঁড়ায় আর একপ্রকার। রাইয়ত যে টাকা কর্জ করিতে চায় ও যাহার জন্য সে খত লিখিয়া দেয় অনেক সময় তাহা পুরোপুরি প্রাপ্ত হয় না— কখনও বা একেবারে কিছুই পায় না। অনেক সময় মহাজন দেনার টাকা অথবা শস্য পাইয়াও তাহা রাইয়তের হিসাবে জমা করিয়া লন না। দেনার টাকা পাইলে তাহার রসিদ দিবার তো নিয়ম নাই, সুতরাং দেনা শুধিয়াও তাহা আদালতে সপ্রমাণ করা রাইয়তের পক্ষে সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে ও কাজেই দেনা বারবার পরিশোধ করিয়াও অনেক সময় তাহার নিস্তার নাই।

রাইয়তের উপর মহাজনের যে অত্যাচার— আদালতে যে সকল ঋণ-সম্বন্ধীয় মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা হইতে তাহার রাশি রাশি প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। বোম্বাই হাইকোর্ট রিপোর্ট পাঠ করিলে পাঠকেরা তাহার কতক আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ-বিষয়ে তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নলিখিত মকদ্দমাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহা হইতে রাইয়তের ব্যবহার-জ্ঞান সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।[২]

এই মকদ্দমার পত্তন একটি বন্ধক খতের উপর। দুইজন রাইয়ত মহাজনের নিকট হইতে ৩০০ টাকা কর্জ করিয়া প্রায় বিশ বিঘা জমি বন্ধক দিয়া ১৮৬২ সালে এক খত লিখিয়া দেয়। খতের করার এই যে সুদের পরিবর্তে রাইয়তেরা উৎপন্ন শস্যের অর্ধভাগ মহাজনের বাটিতে প্রতিবর্ষে আনিয়া উপস্থিত করিবে। প্রতিবর্ষে ২০ টাকা করিয়া ৩০০ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। ১৫ বৎসরের পূর্বে সে ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলেও মহাজনকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত শস্যের অর্ধভাগ বর্ষে বর্ষে আনিয়া দিতে হইবে আর খতের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে যদি সরকারি দফতরে মহাজনের নামে জমি দাখিল করা না হয় তাহা হইলে সেই জমি মহাজনের নিকট ১০০ টাকায় বিক্রীত হইবে। অবশিষ্ট ২০০ টাকা একবৎসর পরে চাহিবা মাত্র সুদ শুদ্ধ আনিয়া দিতে হইবে। রাইয়ত যদি বার্ষিক শস্যার্ধভাগ দিতে অক্ষম হয় অথবা জমি মহাজনের নামে করার মতো দাখিল করা

২. *Bombay High Court Reports*, Vol. 3.

না হয় কিংবা প্রতিবর্ষে ২০ টাকা দিবার ব্যতিক্রম ঘটে, কি জমি পতিত রাখা হয় তাহা হইলে একশত টাকার মূল্যে সেই জমির উপর মহাজনের সম্পূর্ণ অধিকার হইল। শস্যার্ধভাগের মূল্য যতই হউক না কেন— আসল দামের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহা কখনই অদেয় থাকিবে না।

এই খতের চারিজন জামিন। তাহারাও দেনা পরিশোধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তাহাদের দুইজনে আপনাদেরও জমি বন্ধক দিয়া এই অঙ্গীকার করে যে মূল ঋণী দেনা পরিশোধে অক্ষম হইলে জামিনদারদের সেই জমি শুদ্ধ একশত টাকার মধ্যে বিক্রীত গণ্য করা যাইবে। অপর দুই ব্যক্তি এই করার করে যে উক্ত বন্ধক জমি হইতে ঋণ আদায় না হইলে আমরা যেমন করিয়া হউক আমাদের ঘর বলদ কৃষিযন্ত্র গৃহসামগ্রী সমস্ত বেচিয়াও তোমার টাকা পরিশোধ করিব।

মহাজনেরা ১৮৬৪ সালে ৫০০ টাকা মায় খরচা আদায় করিবার জন্য নালিশ করে ও তাহাদের আবেদন এই যে আসল ঋণী ও জামিনদের জমির স্বত্বের উপর তাহাদের ক্রিয়াধিকার আদালত হইতে নিরূপিত হয় ও সেই সকল জমি ও ফসলে তাহাদের দখল দেওয়া হয়। আর বন্ধকীকৃত ঘর বলদ কৃষিযন্ত্র গৃহসামগ্রী বেচিয়া তাহার ৫০০ টাকা আদায় করা হয়।

প্রতিবাদীগণ উত্তর দেয় আমরা এ খত লিখিয়া দিই নাই, আর একটি খত লিখিয়া দিয়াছি— যাহার করার অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহাতে আমরা শস্যের কতক ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছি বটে কিন্তু আমাদের দোষ নাই— আমরা সেই ভাগ বাদীদের দিতে প্রস্তুত হইলেও তাহারা তাই গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই।

মুন্সেফের বিচারে বন্ধক খত সাব্যস্ত হইল ও তিনি নির্ণয় করিলেন যে মূল ঋণীগণ তাহাদের করার মতো কার্য করিতে সমর্থ হয় নাই সুতরাং তাহাদের জমির উপর বাদীদের সম্পূর্ণ স্বত্ব জন্মিয়াছে ও তাহারা খরিদ্দার রূপে জমি দখলের অধিকারী। আদালতের ডিক্রি হইল যে ১০০ টাকা মূল্যে বাদীদিগকে সেই জমি দখল দিতে হইবে। আরও হুকুম হইল যে ঋণী ও তাহার অভাবে জামিনদের মহাজনদিগকে মূল ঋণের অবশিষ্ট ২০০ টাকা ও সুদের হিসাবে ৩০০ টাকার শস্য দেওয়া বিধেয়।

জেলা জজের নিকট আপিলে সেই হুকুমনামা বহাল রহিল।

পরে প্রতিবাদীরা এই ডিক্রির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করিল।

চিফ জাস্টিস সাহেব বলিলেন—

আমরা এই Equity কোর্টের বিচারাসনে বসিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই কোর্ট হইতে এই বন্ধক খত সদৃশ অন্যায় ও কঠোর করার পূর্ণ খত অনুমোদিত ও কার্যে পরিণত হওয়া কখনই উচিত নহে। ইহা সত্য যে, যে স্থলে প্রতারণা নাই সে স্থলে উপযুক্ত মূল্যের অসদ্ভাবে কোনো চুক্তি রহিত করা অথবা তাহা কার্যে পরিণত হইতে না দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু মূল্যের স্বল্পতার সঙ্গে যখন প্রবঞ্চনা— প্রতারণা— যথার্থ মূল্য গোপন, বিষয়ের অযথা বর্ণন, অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন— জড়বুদ্ধি কিংবা অজ্ঞান ইহার কিছু না কিছু সম্মিলিত দেখা যায় তখন Equity কোর্টের বিবেচনা-যোগ্য

যে এরূপ করার গ্রাহ্য হইবে কি না— তাহা কার্যে পরিণত করা উচিত কি না? এই সকল কারণে অনেক সময় অল্প মূল্যের বিক্রি রহিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

আমরা এরূপ কোনো সাধারণ নিয়ম বাঁধিয়া দিতে চাহি না যে জানিয়া শুনিয়া কোনো ব্যক্তি কোনো করারে প্রবিষ্ট হইলে তাহার কঠোরতা নিবন্ধন সে তাহা হইতে মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে। কিন্তু এই মকদ্দমায় যখন দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞান রাইয়ত যাহারা লেখাপড়া কিছুই জানে না— আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিতেও যাহারা অক্ষম, তাহারা যে সময়ে আপনাদের কৃষিকার্য নির্বাহের জন্য কর্জ করিতে উদ্যত, তাহাদের তখনকার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন দেখিয়া মহাজনেরা এমন কঠোর করার তাহাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে— যখন দেখিতে পাই রাইয়তেরা লিখিয়া দিয়াছে যে তাহারা শস্যের নিয়মিত অর্ধাংশ যোগাইতে অক্ষম হইলে এবং অন্যান্য কারণ উপস্থিত হইলে তাহারা আপনাদের জমি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত— এত অল্প মূল্যে যে তাহা ঋণের তৃতীয়াংশ মাত্র— যে ঋণের টাকা জমির বার্ষিক উপস্বত্বের অর্ধাংশেরও অধিক নহে— আর এরূপ করিয়াও তাহারা ঋণের অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সুদ শুদ্ধ দায়ী— যখন দৃষ্ট হইতেছে যে বার্ষিক উৎপন্ন শস্য দিবার কোনো ত্রুটি না হইলেও, করার মতো অপরাপর কার্য করিতে সক্ষম হইলেও, মূল টাকা পরিশোধ করিতে পারিলেও ১৫ বৎসর পর্যন্ত তাহারা শস্যার্ধভাগ দানে বাধ্য, তখন এই অন্যায় পীড়নকারী কঠোর-করার-পূর্ণ খত রহিত করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি, কেনা না ইহাতে ঋণিগণ একপ্রকার প্রতারিত হইয়াছে অনুমান না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। আমরা কোনো মতে বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া কোনো মনুষ্য সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ লিখিয়া দিতে সম্মত হইবে যদি তাহারা কি লিখিয়া দিতেছে তাহা ভালো করিয়া স্পষ্ট জানিতে পারে ও তাহার ফলাফল বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়। যদিও জেলাজজের মতে আমরা মত দিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই খত রাইয়তেরা লিখিয়া দিয়াছে— এই খত তাহারা লিখিয়া দিয়াছে ইহা যদিও সত্য হয় তথাপি লিখন পঠনে অসমর্থ অবোধ লোকের নিকট একবার এইরূপ লেখা পাঠ করিলেই যে তাহা তাহাদের বোধগম্য হইবে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না— এই সকল অসাধারণ দুরূহ করার তাহাদিগকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

এই বলিয়া এই ঘোর অন্যায় কঠোর বন্ধক খত হাইকোর্ট হইতে অগ্রাহ্য হয় ও রাইয়তেরা তাহাদের যথার্থ দেনার টাকা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। যদি হাইকোর্টে এই মকদ্দমার আপিল না হইত তবে গরিব বেচারি রাইয়তদিগকে কি অত্যাচারই ভোগ করিতে হইত।

দুষ্টবুদ্ধি মহাজনেরা গরিব রাইয়তের উপর শাঠ্য-জাল বিস্তার করিতে না পারে এই জন্য কমিশনরগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক তমসুক হয় কোনো রেজিস্ট্রার কি কোনো গভর্নমেন্টের উচ্চ কর্মচারীর সমক্ষে লিখিত পঠিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এইরূপ কোনো নিয়ম প্রচলিত হইলে কেবল যে রাইয়তের লাভ তাহা নহে। কিন্তু অনেক সময় সদাশয় মহাজনেরও তাহা কার্যকর হইতে পারে। অনেক মকদ্দমায় এইরূপ দেখা যায় যে, যে সকল খত সত্য সত্যই লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে ঋণী তাহা অস্বীকার

করে ও গ্রামস্থ লোকদিগকে আপনার পক্ষে ডাকিয়া তাহা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয় নাই ইহা আদালতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায়। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে এইরূপ মিথ্যা শপথের পথ অবরুদ্ধ হয়। কোন্ পক্ষ সত্য তাহা আপিলে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন— কারণ প্রথম কোর্টের জজ সাক্ষীদের ভাব ভক্তি দেখিয়া তাহাদের সাক্ষ্যের সত্যাসত্য কতকটা নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়েন— আপিল কোর্টে সুকৌশল-গ্রথিত শিক্ষিত সাক্ষীদলের অসত্যজাল আবিষ্কৃত হওয়া সহজ নহে। অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে ঋণী খত লিখিয়া দিবার সময় নাবালক ও আপনার হিতাহিত বোধে অসমর্থ, খতের মর্ম সে কিছুই বুঝে না, তথাপি ছলবল কৌশলে তদুপরি তাহার নাম স্বাক্ষরিত হয়। যখন সেই খতের দাবিতে মকদ্দমা উপস্থিত হয় তখন ঋণী অজ্ঞান আলস্য ভয় নিরাশা-বশত বিচারালয় হইতে দূর থাকে, সুতরাং অবর্তমানে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি হইয়া যায়, করারের প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। যদি কোনো নিযুক্ত কর্মচারীর সমক্ষে তমসুক লিখিয়া দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে নাবালকের উপর এরূপ অত্যাচার স্থান পায় না। একদিকে অবোধ রাইয়ত ধূর্ত মহাজনের প্রবঞ্চনা হইতে নিষ্কৃতি পায়, অন্যদিকে মহাজনের ন্যায্য টাকা মিথ্যা সাক্ষ্যে ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা দূর হইয়া সুদের দর কমিয়া যায়, তাহাতে রাইয়তের মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। যদি মহাজনের ন্যায্য পাওনা ডুবিয়া যাইবার ভয় দূর হয়— যদি ঋণের পরিমাণ সহজে সপ্রমাণ হইবার উক্তরূপ কোনো উপায় নির্ধারিত হয়— তবে যে সকল স্বল্প সম্পত্তি সম্পন্ন মহাজন এক্ষণে ভয়ে অগ্রসর হইতে চায় না তাহারা বড় বড় মহাজনের প্রতিস্পর্ধী হইতে সাহসী হইবে ও এই স্পর্দ্ধিতায় সুদের দর আপনা হইতে কমিয়া গিয়া পরিণামে রাইয়তের কল্যাণ সাধিত হইবে।

কেহ কেহ পরামর্শ দেন যে এই ক্ষণে মহাজনেরা ঋণীর নিকট হইতে অপরিমিত সুদ গ্রহণ করেন তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে সুদের এক নিয়মিত দর বন্ধন করা উচিত, তাহা অপেক্ষা অধিক দরের সুদ ধার্য হইলে আদালতে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এইরূপ সুদের সীমা বন্ধনকারী কোনো আইন করা তাঁহাদের অভিপ্রেত। হিন্দু শাস্ত্রে অপরিমিত সুদ গ্রহণ করা নিষেধ। মনু লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে পারেন কিন্তু সুদ নিয়া টাকা ধার দিতে পারিবেন না। যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ
কামং তু খলু ধর্ম্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেঽল্পিকা।

দশম অধ্যায়— ১১৭।

ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় বৃদ্ধি যোজনা করিবেন না কিন্তু যে পাপবুদ্ধি চাহিবে তাহাকে ধর্মার্থে অল্প সুদ ইচ্ছামতো দিতে পারিবেন—

সুদের প্রতিরোধক আরও কতকগুলি নিয়ম আছে, যথা—

বশিষ্টবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেৎ বিত্তবিবর্দ্ধিনীং।
অশীতিভাগং গৃহ্লীয়ান্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতে॥ ১৪০
দ্বিকং শতং বা গৃহ্লীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরণ্।
দ্বিকং শতং হি গৃহ্লাণো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী॥ ১৪১

দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং চ পঞ্চকং চ শতং সমং।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্ণীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ॥ ১৪২

—অষ্টম অধ্যায়।

বৃদ্ধি ব্যবসায়ী ব্যক্তি বিত্তবর্ধনকারী বশিষ্ঠ-বিহিত সুদ গ্রহণ করিতে পারিবেন অর্থাৎ মাসে শতের অশীতি ভাগ গ্রহণ করিবেন।
সতের ধর্ম স্মরণ করিয়া শতকরা দুয়ের হিসাবে গ্রহণ করিবেক,— যে ব্যক্তি শতকরা দ্বিক গ্রহণ করেন, তিনি অর্থ দোষে দোষী হয়েন না।
বর্ণানুক্রমে শতকরা দ্বিক ত্রিক চতুষ্ক অথবা পঞ্চক মাসিক বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেক অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দ্বিক, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ত্রিক, বৈশ্যের নিকট হইতে চতুষ্ক এবং শূদ্রের নিকট হইতে পঞ্চক।

সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের এক বিশেষ নিয়ম এই যে, এককালে সুদ শুদ্ধ দেনা গ্রহণ করিলে মূলধন অপেক্ষা অধিক সুদ গৃহীত হইবে না। যথা—

কুসীদবৃদ্ধির্দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রমতি পঞ্চতাং॥ ১৫১
কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিধ্যতি।
কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি॥ ১৫২

—অষ্টম অধ্যায়।

ঋণের টাকা এককালে আহৃত হইলে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক সুদ গৃহীত হইবে না— ধান্য, ফল, লোম অথবা বাহক জন্তু সম্বন্ধে ঋণের পঞ্চগুণ অতিক্রম করিবেক না। নির্দিষ্ট নিয়মের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিলে তাহা অসিদ্ধ— তাহাকে কুসীদপথ কহে। উর্ধ্ব সংখ্যা শতকরা পঞ্চক মাত্র ঋণীর নিকট হইতে প্রাপ্য।

উক্ত নিয়মকে "দাম দুপট" কহে ও এপ্রদেশের আদালত সকলে ঐ নিয়ম প্রচলিত। ঋণ আদায় করিবার সময় মহাজন কখনও আসল অপেক্ষা সুদের টাকা অধিক লইতে পারে না— আসলের দ্বিগুণ পর্যন্ত 'সকৃদাহৃত' সুদের সীমা। হিন্দুশাস্ত্রের এই নিয়ম ছাড়িয়া দিলে এক্ষণকার আইন অনুসারে সুদের দর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় চুক্তি অনুসারে নিরূপিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আইনকর্তাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না এই লইয়া অনেক সময় অনেক তর্ক বিতর্ক শুনা যায়। কমিশনরদিগের মত এই যে আইন দ্বারা সুদের দর নির্ধারিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।— আইন দ্বারা সুদের দর বাঁধিয়া দিলে তাহাতে যে ঋণীদিগের লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা পরীক্ষায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বার্তাশাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত এই যে, এবিষয়ে আইন বাঁধিতে গেলে ফলোপধায়ী হইবে না। ঋণীর টাকার প্রয়োজন ও তাহাকে ধার দিবার মতো মহাজনের অর্থের প্রাচুর্য— এই দুয়ের উপর সুদের দর নির্ভর করে। যদি আইনের দ্বারা সুদের দর বাজার-দর অপেক্ষা অধিক স্থিরীকৃত হয়, তাহা সুতরাং কোনো কার্যেরই হইবে না। যদি বাজার দর অপেক্ষা সুদের দর অল্প নির্ধারিত হয় আর এইরূপ নিয়ম করা যায় যে, ঐ নির্ধারিত দরের উর্ধ্বে সুদ গৃহীত হইবে না, তাহা হইলে হয়তো ধার কর্জ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। অথবা

কাহারও টাকা কর্জ করিবার যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে সে নিয়মিত দরের অপেক্ষা এত অধিক সুদ দিতে বাধ্য হয়, যাহাতে আইনভঙ্গের আশঙ্কা না রাখিয়াও মহাজনে তাহাকে ধার দিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সুদের দর বৃদ্ধির জন্য যে মহাজনেরই দোষ এরূপ মনে করা অন্যায়। যদি মহাজনেরা মিলিয়া এইরূপ চক্রান্ত করে যে, চলিত দর অপেক্ষা অধিক দরে সুদ না পাইলে টাকা ধার দিব না, তাহা হইলে উত্তমর্ণের ব্যবসায়ে এত অধিক লাভ দেখিয়া অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া সে চক্রান্ত ভাঙিয়া দিবে সন্দেহ নাই। সামান্যত বিবেচনা করিতে গেলে ঋণ-প্রার্থীকে নিজ স্বার্থ বুঝিয়া দর করিতে দিলেই ভালো হয়— মহাজনের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তাহাতে দরের সাম্যভাব আপনাপনিই দাঁড়াইবে। কিন্তু একটি কথা এই যে, যে স্থলে চুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম খাটাইলে অন্যায় করা হয়, সে স্থলে কি কর্তব্য। একজন রাইয়ত যদি নিতান্ত গরজে পড়িয়া কর্জ করিতে আসে, আর মহাজন তাহার গরজ বুঝিয়া তাহার নিকট হইতে কোনো অন্যায় কঠোর শর্ত লিখাইয়া লন, তবে সে শর্ত হয়তো আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। এই প্রকার অল্প টাকার ধারকর্জকারী রাইয়তের মহাজনের সহিত এরূপ অধীনতা সম্বন্ধ— একের উপর অন্যের অন্যায় ব্যবহার এরূপ সহজ-সাধ্য যে, এই সকল রাইয়তের রক্ষার জন্য কোনো বিশেষ আইন করিলে অযুক্তি-যুক্ত হয় না। ৫০০ টাকার অনধিক দেনার মকদ্দমায় শতকরা ৯ টাকার হিসাবে কিংবা অন্য কোনো নিয়মিত দরে সুদ ধরিয়া দেওয়া ও তদতিরিক্ত টাকা অগ্রাহ্য করা— কোর্টের এইরূপ সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। এইরূপ হইলে মহাজনের অত্যাচার হইতে রাইয়তেরা অনেকটা নিবৃতি লাভ করে। যে সকল লোকেরা ৫০০ টাকার অধিক টাকা ধার-কর্জ করে, তাহারা প্রায়ই আপনার হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম আর যে সকল মহাজনের অধিক টাকার কারবার তাহাদের ভদ্রতা-সততার উপরও বিশ্বাস করা যাইতে পারে, সুতরাং এই সকল লোকের জন্য কোনো বিশেষ আইন আবশ্যক করে না— তাহাদের পরস্পর চুক্তিই তাহাদের উপর বন্ধনকারী।

বোম্বাই প্রদেশে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলিত বলিয়া সুদের কতকটা বর্ধিতাকার দৃষ্ট হয়। এই বন্দোবস্তে সদর খাজনা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকাতে রাইয়তের ভূস্বত্বের অনিশ্চিত মূল্য— টাকা ধাব দিবার সময় মহাজন তাহাব উপর দৃষ্টি রাখিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক দরে সুদ লইতে বাধ্য হয়।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে দেনার টাকা আদায় করিবার ১২ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদ ছিল, ঐ মেয়াদ অতীত না হইলে ঋণীর নিকট হইতে নূতন খত করিয়া লইবার রীতি ছিল না। তখনকার আইন অনুসারে শতকরা ১২ টাকার অধিক সুদ আদালতে অগ্রাহ্য হইত ও আসলের অধিক সুদ এককালীন পাইবার নিয়ম ছিল না, সুতরাং কোনো মহাজন ১০০ টাকা কর্জ দিয়া এককালে তাহা আদায় করিতে গেলে বারো বৎসর অন্তে তিনি উর্ধ্ব ২০০ টাকায় ডিক্রি পাইতে পারিতেন। এক্ষণে ঐ বিষয়ে তামাদির নিয়ম ৩ বৎসর, কাজেই রাইয়তেরা প্রায় দুই বৎসর অন্তর সুদ সমেত নতুন খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। অতএব ১০০ টাকার খত শতকরা ২৫ টাকা মায় সুদ তাহা উল্লিখিত প্রকারে পুনঃ পুনঃ

নবীকৃত হইয়া ১২ বৎসরের শেষে ঋণীর স্কন্ধে ১১৩৯ টাকার বোঝা নিক্ষেপ করিবে। রাইয়ত কমিশনর মধ্যে শম্ভুপ্রসাদ নামক একজন দেশীয় কমিশনর তামাদি সংক্রান্ত ৩ বৎসরের নিয়ম রাইয়তের ঋণভারগ্রস্ত হইবার এক প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি রাইয়ত ও মহাজনের অনেকানেক পরীক্ষিত হিসাব হইতে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল হিসাব হইতে জানা যায় যে ১৮৫৯-এর পর থেকে প্রজাদিগের ঋণভার ক্রমিকই বৃদ্ধি পাইতেছে। যথা—

১৮৫৯-এর পূর্বে কর্জের টাকার সমষ্টি	...	...	২৬০০
সুদ	...	...	১৪৬০
			৪০৬০
দেনা শোধ	...	...	৩৪৭০
বাকি	...	...	৬০০
১৮৫৯-এর পরে কর্জের টাকার সমষ্টি	...	...	২৯৩০
সুদ	...	...	৪৪২০
			৭৩৫০
দেনা শোধ	...	...	২৭৪০
বাকি	...	...	৪৬১০

শম্ভুপ্রসাদের মতে তামাদির পূর্বকার মতো দীর্ঘ মেয়াদ হইলে রাইয়তের বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা। অন্যান্য কমিশনরেরা কিন্তু এই কথা বলেন যে, যদিও তামাদির নিয়ম পরিবর্তনে রাইয়তের কতকটা অসুবিধা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের হিসাব ১২ বৎসর ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা ৩ বৎসর অন্তর দেনার নূতন বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়স্কর ও তাঁহারা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে অন্যান্য বিহিত উপায় অবলম্বিত হইলে আগেকার ১২ বৎসর মেয়াদ প্রত্যাবর্তন অনাবশ্যক হইবে।

প্রচলিত নিয়মানুসারে মারওয়াড়ির অনুগ্রহের উপর রাইয়তের সকল নির্ভর। মারওয়াড়ির হস্তেই খত রক্ষিত হয়, রাইয়ত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পায় না। মারওয়াড়ি আপন ইচ্ছামতো হিসাব প্রস্তুত করে, রাইয়ত তাহা গৃহে লইয়া গিয়া সময়মতো পর্যবেক্ষণ করিতে পারে না। অনেক সময় এমন দেখা গিয়াছে যে, রাইয়ত ঘোরতর কষ্টে পড়িয়া তাহার ভূমি সম্পত্তি মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে— অনেক বৎসর পরে তাহার অবস্থা একটু ভালো হইলে সে অথবা তাহার সন্তান-সন্ততিগণ আপনাদের বন্ধক বিষয় ছাড়াইয়া লইবার জন্য যত্নশীল হয়, কিন্তু তখন মহাজন অথবা তাহার বংশজ লোকেরা বহুল কাল ভুক্ত বিষয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহে। রায়ইত

আদালতে যাইতে বাধ্য হয়। মহাজন উত্তর দেয়— "এ সম্পত্তি বাদীর নহে— ইহা তো আমাদেরই হস্তে বংশ পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে— আমরা বন্ধকের কিছুই জানি না।" খত মহাজনেরই হস্তে রক্ষিত— বাদী সে বন্ধক কি রূপে সপ্রমাণ করিবে? এই সকলের প্রতিবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। এই প্রকার অন্যায় আচরণের একটি সহজ উপায় আমাদের মনে হইতেছে। যে সকল স্ট্যাম্প-কাগজের উপর খত লিখিত হয়, তাহার যদি দুই ভাগ পরস্পর সংযুক্ত থাকে— মধ্যে ছিদ্রময় রেখা (যেমন চেক বহিতে সচরাচর দৃষ্ট হয়)— আর যখন তাহার এক ভাগে খত লিখিত হয় তখন যদি তাহার সারাংশ অপর ভাগে লিখিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে সেই শেষোক্ত ভাগটি খত হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া রাইয়তকে দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ হইলে মূল খতের এক প্রস্ত রাইয়তের হস্তে রক্ষিত হয়। এই দুই ভাগ সহজে মিলাইয়া দেখিবার জন্য দুয়ের উপরই সমান নম্বর থাকা আবশ্যক ও এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে এক প্রস্তের উপর ঋণীর নাম স্বাক্ষরিত হইবে। যদি রাইয়তের হস্তস্থিত কাগজে কোনো ভুল কি মিথ্যা বিষয় সন্নিবেশিত হয়, তাহা সহজে ধরা পড়িবে ও ঋণী তাহা মহাজনের নিকট হইতে তখনই শোধন করিয়া লইতে পারিবে। মহাজন রাইয়তকে মিথ্যা লিখিয়া দিতে সাহসী হইবে না, কেনা না যদি সে তাহার খতের দাবিতে প্রকৃত ঋণের অধিক টাকার জন্য নালিশ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার নিজনাম স্বাক্ষরিত অপর প্রস্ত আদালতে উপস্থিত হইলেই তাহার প্রতারণা আবিষ্কৃত হইবে। এখনকার নিয়ম অনুসারে দেনার টাকার কতক ভাগ পরিশোধ করিলে তাহা কখনও কখনও মূল খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সে খত মহাজনের নিকটেই থাকে— ঋণী কখনও তাহা দেখিতে পায় না ও কর্জের টাকা লইয়া "এখন খত কাছে নাই পরে লিখিয়া দিব" এই বলিয়া মহাজন অনেক সময় ওজর করিয়া কাটায়। কিন্তু খতের অপর প্রস্ত ঋণীর হাতে থাকিলে আর এরূপ হইতে পারে না— টাকা দিবার সময় সে তাহার সংখ্যা সেই কাগজের উপর লিখিয়া দিতে মহাজনকে সহজেই বাধ্য করিতে পারে। এইরূপ হইলে রাইয়ত তাহার নিজের হিসাব সহজেই বুঝিতে পারে ও মহাজন কর্তৃক তাহার প্রতারিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে আর এক প্রকার প্রবঞ্চনার দ্বার রুদ্ধ হয়। কখনও কখনও এরূপ ঘটে যে, খতের মেয়াদ অতীত হইলে পরেও রাইয়তের ধার শুধিবার সঙ্গতি নাই, মহাজনেও তাহারে বিরক্ত করিতেছে ও আদালতে যাইবার জন্য ব্যস্ত, তখন রাইয়ত অনেক বলিয়া কহিয়া পুরাতন খতের পরিবর্তে তাহাকে এক নূতন খত লিখিয়া দেয়। এই সকল স্থলে নূতন খত লিখিয়া লইয়াও প্রলুব্ধ মহাজন তাহাতে পুরাতন দেনার পরিশোধ স্বীকার করেন না। পুরাতন খতের পরিবর্তে নূতন খত লিখিত হইয়াছে রাইয়তের তাহা সপ্রমাণ করিবার কোনো উপায় নাই। যদি নূতন খতে পুরানো ঋণের কোনো উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে মহাজন এই দুই খতের পৃথক টাকা আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হয়— তাহার বিরুদ্ধে ঋণীর কোনো কথা কহিবার উপায় থাকে না। আবার ইহার বিপরীতে কখনও কখনও দেখা যায় যে ঋণী ঋণভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলে যে পুরাতন দেনার পরিবর্তে সে নূতন খত লিখিয়া দিয়াছে। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে,

রাইয়ত ও মহাজন উভয়েরই এই প্রকার অসত্য ব্যবহারের দ্বার রুদ্ধ হইবে, সুতরাং মিথ্যা মকদ্দমা উঠিয়া ন্যায়ের আদালতকে কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

এক্ষণকার আইনের বলে মহাজনের কর্জ আদায় করিবার যেরূপ সুবিধা, রাইয়ত তাহার পাকচক্র হইতে সে পরিমাণে সুরক্ষিত নহে, এই বিষয় লইয়া কমিশনরগণ অনেক কথা কহিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রচলিত আইন মহাজনের অত্যাচারের বিশেষ পোষকতা করে। পূর্বকার দেশীয় প্রথানুসারে মহাজন রাজার নিকট হইতে ঋণ আদায় করিবার বিশেষ কোনো সাহায্য পাইত না। তখনকার ঋণ আদায়ের প্রথা স্বতন্ত্র ছিল। মহাজন ইচ্ছামতো ঋণীকে কারারুদ্ধ করিয়াও খাটাইয়া লইতে পারিতেন। ঋণ আদায়ের জন্য যে-সকল উপায় অবলম্বিত হইত তাহা এই—

"তাগাদা" অর্থাৎ ঋণীকে টাকার জন্য বার বার তাগাদা করিয়া উত্ত্যক্ত করা—

"মোহস্‌সলি" অর্থাৎ তাগাদা করিবার জন্য ঋণীর নিকট দূত পাঠানো ও ঋণীকে তাহার খোরাক যোগাইতে বাধ্য করা—

"ধন্না" ঋণীর দ্বারে ধন্না দিয়া বসিয়া থাকা—

"ত্রাগা" অর্থাৎ টাকা না পাইলে ঋণীকে আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখানো—

ইত্যাদি অনেক প্রকার নিয়ম ছিল; ইহাতে যেমন ঋণীর উপর পীড়ন তেমনি মহাজনেরও সামান্য কষ্টভোগ নহে। মহাজনের টাকার জন্য রাইয়তের বলদ কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি ক্রোক করিয়া তাহাকে নিঃসম্বল করিবার নিয়ম দেশীয় রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল না। ঋণের জন্য বংশ পরম্পরা ভোগ্য ভূমি সম্পত্তি বিক্রীত হইত না। মহারাষ্ট্র দেশে কখনই এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেখানকার রাইয়তেরা অধিকাংশই মিরাসদার বলিয়া গণ্য ছিল ও মিরাসী স্বত্বের নিয়মই এই যে রাইয়ত সে স্বত্ব হইতে কখনই বঞ্চিত হইবার নয়— ছাড়িয়া দিলে যখনই ইচ্ছা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিত। ১৮২৭ সালের আইনে মহাজনের ঋণ আদায় সম্বন্ধে নিজস্ব ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হইয়া তৎপরিবর্তে আদালত সকল স্থাপিত হয়। তথাপি তখনকার আইন ঋণীর পক্ষে অনেক সুবিধাজনক ছিল— সুদের দরের সীমা নিরূপিত ছিল, মহাজনেরা তদতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিতে পারিত না; অপিচ কৃষকের স্বীয় জীবিকা ও কৃষিকার্য নির্বাহের জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, তাহার ক্রোক ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। কাল সহকারে এই সকল নিয়ম পরিবর্ত হইল। বর্তমান আইন সম্বন্ধে কমিশনরগণ নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন—

ঋণ আদায় করিতে হইলে হয় ঋণীর উপার্জিত ও অর্জনীয় বিষয় বিক্রয়, নয় তাহার ও তাহার পরিবারের কায়িক পরিশ্রম গ্রহণ করা— এই দুই উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। যে আইনে অবাধে এই সকল নিয়োজিত হয়, তাহা পারতপক্ষে মহাজনেরই বিশেষ অনুকূল। এদেশের আইন এবিষয়ে মহাজনের যেমন পক্ষপাতী আর কোনো আধুনিক আইন তেমন আছে কি-না সন্দেহ। এই আইন মতে ঋণী সপরিবারে মহাজনের নিকট ধনপ্রাণে যেরূপ আবদ্ধ, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদিও আইনে দাসত্বের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি যখন অশক্ত ঋণীকে বন্দীখানায় প্রেরণ করা মহাজনের ইচ্ছাধীন, তখন পক্ষান্তরে দাসত্বই প্রশ্রয় পাইতেছে বলিতে হইবে। কেন না অনেক

দেনাদার কারাবাস অপেক্ষা মহাজনের দাসত্ব অল্প যন্ত্রণাদায়ক জ্ঞান করিয়া তাহাতেই ব্রতী হইবে সন্দেহ নাই। কারাবাস ভয়ে যে অনেক সময় রাইয়তকে মহাজনের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তো ঋণের জন্য ঋণীর কায়িক দায়িত্বের কথা বলা হইল। তাহার বৈষয়িক দায়িত্ব সম্বন্ধে দৃষ্ট হইবে যে, আইনে মহাজনের হস্তে ঋণীর বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইবার অগাধ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। ঋণীর নিজের কিংবা তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবারের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুও সে ক্ষমতার বহির্ভূত নয়। ঋণীর পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত বিক্রয় করিবার কোনো বাধা নাই, একবার মাত্র তাহাকে হৃত-সর্বস্ব ও নিঃসম্বল করিয়া ছাড়িয়া দিলেই যে, সে নিস্তার পাইল তাহা নহে, কিন্তু যখনই আবার সে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করিতে আরম্ভ করে, অমনি মহাজন আসিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া লইতে পারে। এইরূপে তাহাকে পুনঃপুনঃ পীড়ন করিবার ক্ষমতা আইন কর্তৃক মহাজনের হস্তে অর্পিত। সভ্য জাতির আইনে মহাজনকে যতদূর আশ্রয় দেওয়া কর্তব্য, তাহার অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। যে সাধারণ সর্ববাদীসম্মত আইন অনুসারে দেউলিয়া হইয়া ঋণের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিয়ম আছে, এদেশের রাইয়তের ভাগ্যে সে লাভটুকুও নাই। এ-বিষয়ে আর কোনো দেশে ভারতবর্ষের আইনের ন্যায় কঠোর আইন আছে কি-না সন্দেহ। মুসার বিধানেও "ঋণী সাত বৎসর চাকরি করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হইত।"

কমিশনরগণ যখন এদেশীয় আইনের উপর উক্তরূপ দোষারোপ করিয়াছিলেন, তখন নূতন দেওয়ানি কার্য বিধি আইন (Civil Procedure Code) প্রচলিত হয় নাই, আইন-প্রস্তুতকারী-জাঁতায় পেষিত হইতেছিল মাত্র। এই আইনের গুণে পূর্বকার ঋণ সম্বন্ধীয় কঠোর নিয়ম সকল অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। ঋণী মহাজনের নানাবিধ অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এক্ষণে আর তাহার হলবলদ প্রভৃতি আবশ্যক সামগ্রী সকল ডিক্রিজারি দ্বারা ক্রোক ও বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই।— দেনার দরুন কারাবাসের মেয়াদ স্বল্পীকৃত হইয়াছে— যাহাতে রাইয়তের ভূসম্পত্তি প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক অল্প দরে বিক্রীত হইতে না পারে তাহার বিহিত উপায় সকল প্রবর্তিত হইয়াছে ও সে যাহাতে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে ঋণবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহার উপযোগী (Insolvency) নিয়ম সকল রচিত হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। দেনার জন্য রাইয়তের জমি হস্তান্তর হইতে দেওয়া উচিত কি না, এ-বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকানেক বিদ্বানের মত এই যে, স্থাবর-সম্পত্তি একশ্রেণীর লোকের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার নিয়ম কখনও হিতাবহ হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভূমির ব্যবস্থাও প্রতিজনের স্বেচ্ছাধীন রাখা কর্তব্য। প্রকৃতির নিয়মই এই যে বলীর হস্তে দুর্বলের পরাজয়— ধনীর নিকট দরিদ্রের পরাজয়। ধনবান্ জমিদার নির্ধন রাইয়তের স্থান অধিকার করিলে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল নাই! যে সকল লোক আপনাদের বিষয় আপনারা রক্ষা করিতে অক্ষম— বিষয়ের উন্নতি সাধনে অসমর্থ তাহাদের ঠেকা দিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? তাহাতে কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে? গভর্নমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে? আধুনিক ব্রিটিশ রাজ্যের

নিয়মই এই যে, যাহারা ইহার নবোত্থিত ঘটনাস্রোতের সহিত সন্তরণ করিয়া কার্য করিবে, তাহাদেরই জয়। লক্ষ্মী তাহাদের প্রতিই প্রসন্ন। ধন সঞ্চয় করিলেই ভূমি সম্পত্তি করিবার স্বাভাবিক স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়, তাহা কি কতকগুলি কৃত্রিম নিয়ম দ্বারা নির্বাপিত করা উচিত? রাইয়ত আবহমান কাল হইতে একখণ্ড ভূমি কর্ষণ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই কি তাহার স্বত্ব চিরস্থায়ী রাখিতে হইবে? সে যদি ঋণভারে এরূপ আক্রান্ত হইয়া পড়ে যে গভর্নমেন্টের খাজনার জন্যও তাহাকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয় তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি কৃষিকার্য সুন্দর রূপে নির্বাহ হইতে পারে— সে জমি তাহার হস্ত হইতে মহাজনকে দিলে কি ভালো হয় না?

ইহার বিপক্ষ দলের লোকেরা বলেন, এরূপ যুক্তি যেমন শ্রুতিমধুর, কার্যে তেমন ফলোপধায়ী দেখা যায় না। বার্তাশাস্ত্রের সমুদয় নিয়ম এদেশে খাটে না। দেখিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত নিয়ম এদেশের সামাজিক অবস্থার উপযোগী কি-না। জাতিভেদ প্রথা— চিরন্তন দেশাচার— কুলাচার সকল দিক ভাবিয়া তাহার ফলাফল নিরূপণ করিতে হইবে। অহিফেন সেবন অনিষ্টকারী সত্য, কিন্তু তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ভূমির উপর দেশীয়দের মমতা এরূপ প্রগাঢ়— সামাজিক নিয়ম ও কুলাচারের সঙ্গে তাহা এরূপ অনুস্যূত, যে, তাহা ভগ্ন করিয়া সেই ভূমি পরহস্তগামী করা সামান্য কঠোর কার্য নহে। এতৎ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের একান্নবর্তী পরিবারের নিয়ম বিবেচনা-যোগ্য। এক পরিবারের মধ্যে প্রতিজন স্ব-স্ব অংশ হস্তান্তর করিবার অধিকারী অথবা এইরূপ স্থলে পরিবারস্থ সমস্ত লোকের সাধারণ সম্মতি আবশ্যক কি-না— এ-বিষয়ে হিন্দু আইন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় মতভেদ দৃষ্ট হইবে। বোম্বাই অঞ্চলে বৈধ বিক্রয়ের জন্য সর্বসম্মতি আবশ্যক, এই নিয়ম হিন্দু শাস্ত্র সম্মত বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। একত্রিত পরিবারের অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে অপর কোনো ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এক পরিবারের বসতিবাটির একভাগ ক্রয় করিয়া তাহাতে যদি একজন ভিন্ন জাতীয় আগন্তুক আসিয়া বাস করে, তাহা হইলে হয়তো সমুদায় পরিবারকে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারে।

তুমি বলিতেছ ধন হইলেই ভূমি সম্পত্তি করিবার ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাহা না করিলেই বা ক্ষতি কি? সেই ধন বাণিজ্য ব্যবসায়ে পরিচালিত হইলে কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না? আরো জিজ্ঞাস্য এই, যখন মহাজন রাইয়তের যথা-সর্বস্ব বিক্রয় করাইয়া তাহার ভূমি দশমাংশ মূল্যে কিনিয়া অধিকার করে, তখন তাহারা কি সেই ভূমির উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়? কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন, বাপী পুষ্করিণী খনন— ভূমির সারবত্তা বর্ধন— মহাজন জমিদার কি এই সকল কার্যে মনোযোগী হন? তাঁহাদের যত্নে কি ভূমির মূল্য বৃদ্ধি— কৃষির উন্নতি— কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে দেখা যায়? অনেক সময় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটে। মহাজন সেই পুরাতন রাইয়তকেই নিযুক্ত করেন— ভূমি ও ফসলের অবস্থা সমানই থাকে— কৃষি কার্যের উন্নতি নাই, কেবল কৃষকের অবস্থান্তর উপলক্ষিত হয়— পূর্বে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভূস্বামী ছিল, সে এক্ষণে মহাজনের খেড়ূত হইয়া সেই ভূমি কর্ষণ করে ও আপনার শ্রমজাত সমস্ত দ্রব্য প্রভুর চরণে ঢালিয়া দেয়। এই সকল

মহাজনের অর্থোপার্জনশক্তি ভিন্ন এমন আর কি শক্তি— কি ঔদার্য— পৌরজনোচিত এমন কি গুণ আছে, যে তাহা দেখিয়া রাজা রাইয়তের সর্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্ত হইবেন?

যে সকল প্রদেশে রায়ইতওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলিত, রাজাই সেখানকার ভূস্বামী— রাজাই জমিদার। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ভূমিদান করিতে পারেন। তিনি যদি এরূপ নিয়ম করেন যে, কোনো মহাজন রাইয়তকে তাহার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তাহাতে কাহারও কোনো কথা কহিবার অধিকার নাই। রাজা বলিতে পারেন, "আমি কোনো মধ্যবর্তী ভূস্বামী চাহি না। তুমি হয় নিজে ভূমি কর্ষণ কর কিংবা অন্য কোনো কৃষককে তোমার স্থান অধিকার করিতে দেও। যদি তোমার স্বত্ব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা মহাজনের নিকট করিও না। যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য চালাইতে অক্ষম, সে যেন ভূম্যধিকারী না হয়।" রাজা এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে, তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোনো রাইয়ত তাঁহার অধিকৃত ভূমি হস্তান্তর করিতে পারিবে না। তিনি এইরূপ নিয়ম প্রচার করিতে পারেন যে, যতটুকু ভূমির উপস্বত্ব হইতে একটি পরিবারের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, তাহাতে কোনো মহাজনের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ফসল ও তাহা চাষ করিবার উপযোগী হল-বলদ প্রভৃতি এবং রাইয়তের বসতিবাটির উপর ডিক্রিজারি করিয়া তাহা নিলামে বিক্রি করাইবার অনুমতি পাইবে না। তাহার অতিরিক্ত ভূমি এবং কেবল ততটুকু মাত্র কোর্টের আদেশক্রমে নিলামের পাত্র হইতে পারে।[৩]

রাইয়তকে ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে সকল উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য উপায় বিবেচনাপূর্বক অচিরাৎ অবলম্বন করা গভর্নমেন্টের কর্তব্য। ভারতবর্ষীয় গভর্নমেন্টের আইনসভা হইতে প্রজাদিগের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাদের জন্য বর্ষে বর্ষে ভূরি ভূরি আইন বর্ষণ হইতেছে। ইহা হইতে দেশীয় সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করিয়া এক ভয়ংকর আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে রাজস্ব-বর্ধনকারী ভীষণ-দর্শন আইন-রাক্ষস সকল প্রসূত হইতেছে। কিন্তু ১৮৭৫ সালে যে কমিশন বসে, তাহার দ্বারা বোম্বাই রাইয়তের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোপযোগী যে সকল উপায় সূচিত হয়, তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া আইন প্রস্তুত করিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? রাজাই যখন জমিদার— জমিদারের অধিকারের সঙ্গে জমিদারের কর্তব্য ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে। শুদ্ধ নিয়মিত খাজনা আদায় করিয়া রাজভাণ্ডার স্ফীত করিতে পারিলেই যে তিনি সে ভার হইতে মুক্ত হইলেন তাহা নহে— রাইয়তের সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহার বিশেষরূপ দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি যদি মহাজনের অত্যাচার হইতে রাইয়তকে উদ্ধার করিতে চাহেন, তবে তিনি নিজেই মহাজনের স্থান গ্রহণ করুন। গভর্নমেন্ট হইতে যদি রাইয়তদিগকে প্রয়োজন মতো অল্প সুদে টাকা ধার দিবার নিয়ম জারি হয়, তাহা হইলে বিস্তর শুভফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এইরূপ নিয়ম জারি

৩. *The land and the law in India* by Raymond West

করিবার বিশেষ কোনো প্রতিবন্ধক নাই। যেখানে মহাজন বৎসরে শতকরা ৩৬ টাকার হিসাবে সুদ না লইয়া ক্ষান্ত হয় না, সেখানে গভর্নমেন্ট তাহার ষষ্ঠাংশ সুদ গ্রহণ করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। মহাজনের টাকা আদায় করিবার যে বিঘ্ন বিপত্তি, গভর্নমেন্টের শতাংশের একাংশও নহে। গভর্নমেন্ট মহাজনের স্থান অধিকার করিলে রাইয়ত প্রবঞ্চনার ভয় হইতে মুক্ত হয়। জাল খত, হিসাবে গোল, সকলি ঘুচিয়া যায়। গভর্নমেন্ট রাইয়তের মহাজন হউন, গভর্নমেন্ট আবার তাহাদের কোষাধ্যক্ষ হউন। রাইয়ত অনেক পরিশ্রমে অল্প স্বল্প যাহা কিছু জমাইতে পারিবে, তাহা সে গভর্নমেন্টের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিঃশঙ্ক হউক। এক্ষণে যেমন Saving's Bank স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সর্বত্র বিস্তারিত হউক, যাহাতে ক্ষুদ্র পল্লীর রাইয়ত পর্যন্ত তাহার ফলভাগী হইতে পারে।

ব্রিটিশ শাসন যদি অসংখ্য রাইয়তের কল্যাণকর না হইল, তবে আর কি হইল। পরিশ্রমী মিতাচারী বিনীত রাইয়ত, মোগল, মহারাষ্ট্রী, পিণ্ডারীদিগের লুটপাট দৌরাত্ম্যের মধ্যে যদি উন্নতশির থাকিয়া আত্মরক্ষণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ রাজ্যের আশ্রয়ে তাহাদের কত কল্যাণের সম্ভাবনা। কত বৎসর যুদ্ধ বিপ্লবের নামগন্ধ পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে— অন্যায় অত্যাচারের স্থানে বিশুদ্ধ ন্যায়ের আদালত সকল স্থাপিত হইয়াছে— বাণিজ্য ব্যবসা প্রমুক্ত হইয়াছে— অনিয়মিত করের পরিবর্তে ভূমির পরিমিত খাজনা নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও রাইয়তের এরূপ দুর্দশা কেন? চতুর্দিক হইতেই তাহার আর্তনাদ শ্রবণ করা যায়। সে দুরূহ ঋণভারে আক্রান্ত। মহাজনের দৌরাত্ম্যে তাহারা ধন প্রাণে মারা যাইতেছে। মহাজন আদালতের সাহায্য লইয়া তাহার যথাসর্বস্ব হরণ করিতেছে— তাহার বসতিবাটি— ধন ধান্য— পশু— পরিবার বস্ত্র পর্যন্ত ডিক্রিজারি করিয়া লুটিয়া লইতেছে। তাহার পিত্রার্জিত ভূমি সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে— তাহাকে চিরদাসত্বে নিযুক্ত অথবা কারাবদ্ধ করিয়া পীড়ন করিতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার ঔষধ কি? এই সকল অত্যাচার নিবারণের উপায় কেন অচিরাৎ অবলম্বিত হয় না?

আমাদের বিবেচনায় সকল অপেক্ষা রাইয়তের কল্যাণ সাধনের উৎকৃষ্ট উপায় তাহাকে শিক্ষাদান। শিক্ষাদান ব্যতীত আর আর সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইবে। যতদিন রাইয়তেরা অজ্ঞানজালে আবৃত থাকিবে, যতদিন না তাহারা আপনার হিতাহিত বুঝিয়া কার্য করিতে পারিবে, ততদিন তাহাদের নিস্তার নাই। তাহার মঙ্গল উদ্দেশে যতই কর না কেন, শিক্ষার অভাবে সে তাহার সম্যক্ লাভ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে। ফলে যদি গভর্নমেন্ট আইনের বলে তাহার সমুদায় দেনা পরিশোধ করিয়া দেন, রাইয়ত সেই অজ্ঞানান্ধ থাকিলে পরশ্ব আবার হয়তো ঋণপাশে বদ্ধ হইয়া পূর্বদশা প্রাপ্ত হইবে। শিক্ষাদানই এই সকল দুর্গতি নিবারণের একমাত্র ঔষধ। যেমন উচ্চশ্রেণীর লোকদের হিতকারী উচ্চ শিক্ষা দানে গভর্নমেন্ট ব্রতী হইয়াছেন, সেইরূপ নিম্নশ্রেণীস্থিত সাধারণ জনগণের উপযোগী সহজ লিখন পঠন শিক্ষার প্রচারেও তাঁহাদের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তে গ্রামে গ্রামে ও ক্ষুদ্র পল্লীসমূহেও বিদ্যালয় পাঠশালা সকল স্থাপিত হউক। শুদ্ধ লেখাপড়া শিক্ষা নয়, অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষাও

নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্থানে স্থানে কৃষিবিদ্যালয়— স্থানে স্থানে উন্নত কৃষিকার্যের উৎসাহ-বর্ধনকারী আদর্শক্ষেত্র সকল (Model farms) প্রতিষ্ঠিত হউক— অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হউক—তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল মার্জিত হউক— তাহাদের অবস্থার উপযোগী শিক্ষালাভের উপায় সকল কল্পিত হউক। তাহা হইলে রাজা প্রজা উভয়েরই কল্যাণ— তাহা হইলেই ব্রিটিশ রাজ্যের কীর্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষে এরূপ বদ্ধমূল হইবে যে তাহা কোনোকালেই বিলুপ্ত হইবে না।

লিখিতে লিখিতে "দাক্ষিণাত্য কৃষি-কষ্টনিবারণী বিল" আমাদের হস্তগত হইল। এই বিল সম্প্রতি কক্রেল সাহেব ভারতবর্ষীয় আইনসভায় উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, রাইয়ত কমিশনের পরিশ্রম ব্যর্থ যায় নাই, তাঁহারা রাইয়তদিগের ঋণ মোচনের যে সকল উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন তাহা লইয়া কর্তৃপক্ষদের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে ইহা এক শুভ চিহ্ন। প্রস্তাবিত আইন সেই আন্দোলনের ফলস্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে।

কক্রেল সাহেবের বক্তৃতা হইতে জানা যাইতেছে যে গত বর্ষে বোম্বাই গভর্নমেন্ট, ভূতপূর্ব গভর্নর সাহেব কর্মত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে কমিশনের সমুদায় রিপোর্টখানি সমালোচনা করিয়া ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টে এক পত্র লেখেন। মহারাষ্ট্রীয় রাইয়তদের ঘোরতর ঋণভার ও তৎকারণ বিষয়ে কমিশনরগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বোম্বাই গভর্নমেন্ট তাহার সহিত একমত হইয়াছেন, কিন্তু প্রচলিত খাজনার আকার অথবা সেই খাজনা আদায়ের কঠোর নিয়মাবলী যে রাইয়তদের বর্তমান দুর্দশার কারণ তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই।

ভূমি সম্পর্কীয় খাজনার আকার ও রাজস্ব আদায় বিষয়ে কমিশনরগণ যে সকল অস্ফুট মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বোম্বাই গভর্নমেন্টের বিবেচনায় কার্যে পরিণত করা কঠিন। তাহা করিতে হইলে ফসলে খাজনা গ্রহণ করিবার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। এই অবনতিকারক প্রথার পুনঃপ্রবর্তনে গভর্নমেন্ট কখনই সম্মতি দিতে পারেন না। আর যদি খাজনার কোনো নিয়মিত দর বাঁধিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে রাইয়তের কি দেয়, তাহা লইয়া গোল উঠিবার সম্ভাবনা। গভর্নমেন্ট ও রাইয়তের এই অনিশ্চিত সম্বন্ধ থাকিলে তাহা হইতে যে অমঙ্গল নিরাকৃত হইবার কথা হইতেছে, তদপেক্ষাও অধিক অমঙ্গল প্রসূত হইবে।

এক্ষণকার আইন ও আদালতের হাঙ্গামে রাইয়তের যে অবস্থান্তর লক্ষিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে গভর্নমেন্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, রাইয়তের বর্তমান দুর্দশার দুই প্রধান কারণ— এক দেনা আদায় সম্বন্ধীয় মকদ্দমায় তামাদি মেয়াদের স্বল্পীকরণ ও রাইয়তের বিরুদ্ধে মকদ্দমার একতরফা নিষ্পত্তির সুলভতা। অতএব তাঁহারা কমিশন রিপোর্ট প্রস্তাবিত বিষয়ের মধ্যে এই কয়েকটি বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন।

১. রাইয়তেরা মহাজনদিগকে যে সকল কর্জখত লিখিয়া দেয়, তাহা একজন গভর্নমেন্ট কর্মচারীর সমক্ষে লিখিত ও রেজিস্টরি করা হয়।

২. দেনার টাকা পাইলে রাইয়তকে অবশ্য তাহার রসিদ দিতে হইবে। রাইয়তের

ইচ্ছামত তাহাকে মধ্যে মধ্যে হিসাব দেখাইতে ও লিখিয়া দিতে হইবে।

৩. দেনার মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আদালতে যাহাতে তাহার সুবিচার হয় তাহার উপায় বিধান করা।

৪. ১৮৫৯ সালের পূর্বে দেনার জন্য যে তামাদি আইন প্রচলিত ছিল, বোম্বাই গভর্নমেন্ট তাহা পুনঃস্থাপন করিবার পরামর্শ দেন।

দেনার জন্য গ্রেপ্তার ও কারাবাস উঠাইয়া দেওয়া ও স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রিজারি করিয়া তাহা নিলাম হইতে মুক্ত রাখা— এই দুই প্রস্তাব তাঁহাদের মনঃপুত হয় নাই।

ইহার পর আবার এই বর্ষে বোম্বাই গভর্নমেন্ট নিম্নলিখিত বিষয় সকল আইনে বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন।

প্রথমত (ক) যে কোনো মকদ্দমা উপস্থিত হউক না কেন, প্রতিবাদী উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, কোর্ট তাহার সম্পূর্ণ বিচার করিতে বাধিত হইবে।

(খ) যদি কোনো ব্যক্তি কোর্টে আসিয়া পৈতৃক ঋণ শুধিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে সে অন্য কথা, কিন্তু তাহা না হইলে কেহ পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নয়।

(গ) চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest) অগ্রাহ্য, আসল টাকার অধিক সুদ কেহ এককালীন দিতে বাধ্য হইবে না।

দ্বিতীয়ত (ক) কোনো ঋণী উপস্থিত হইয়া ঋণ পরিশোধে অসামর্থ্য জানাইলেই সে তাহা হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে, তাহাকে কোর্টে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার আবশ্যক নাই।

(খ) যে জমি দেনার জন্য বন্ধক রাখা না হয়, আর সেই বন্ধক খত আইন মতো রেজিস্টরি করা না হয়, কোর্টের হুকুমে সে জমির নিলাম হইবে না।

প্রস্তাবিত আইনে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার কথা হইতেছে তাহা এই—

১. প্রতিবাদী গ্রেপ্তার না হইয়াও যদি কোর্টে আসিয়া ঋণ মুক্তির জন্য আবেদন করে, তবে তাহার অবস্থানুসারে তাহাকে দেউলিয়া স্থির করা কোর্টের ক্ষমতা থাকিবে।

২. যে জমি দেনার জন্য বন্ধক রাখা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অপর কোনো জমি দেনার ডিক্রিতে নিলামের পাত্র নহে।

৩. স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সম্বন্ধীয় চুক্তি লিপিবদ্ধ ও রেজিস্টরি করিতে হইবে।

উপরি উক্ত আইন এইক্ষণে কেবল মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কয়েকটি তালুকে আবদ্ধ— ইহার ফলাফল দেখিয়া ভবিষ্যতে ইহা অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হইবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

পরিশিষ্ট

১২৮৫ সালের কয়েক সংখ্যক *ভারতী*-তে প্রকাশিত 'বোম্বাই রাইয়ত' শিরষ্ক প্রবন্ধ পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে— তাহা প্রকাশিত হইবার অনতিকাল পরে কৃষিকষ্টনিবারণী নূতন বিধি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ বিভাগে পুণা, সাতারা, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবর্তিত হয়। ১৮৭৯ সালে এই আইন জারি হইয়া ১৮৮২ সালে ইহার

তৃতীয় সংস্করণ হয়। কৃষিদের ঋণ মোচন— বিবিধ উপায়ে তাহাদের সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন এই আইনের উদ্দেশ্য। উল্লিখিত প্রবন্ধে রাইয়ত ও মহাজনের পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম পরিবর্তন অত্যাবশ্যক বলিয়া সূচিত হয় বিচার্য আইনে তাহার কতকগুলি নিয়ম সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইবে। এই আইনসম্মত প্রধান প্রধান নিয়মগুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

ঋণ সম্বন্ধীয় ছোট ছোট মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য গ্রামের পটেল কিংবা অন্য ব্যক্তি গ্রাম্য মুন্সেফ রূপে নিযুক্ত হইতে পারে।

গ্রাম্য রেজিস্ট্রারের নিকট কৃষিদের দলিল দস্তাবেজ রেজিস্ট্রি করা বিধেয় নতুবা তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

আমরা পঞ্চায়ত সূত্রে মকদ্দমা নিষ্পত্তির সূচনা করিয়াছি— স্থল বিশেষে এই রূপ পঞ্চায়তে মকদ্দমা বিচারের ভার সমর্পণ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিচারকের হস্তে অর্পিত এবং বাদী প্রতিবাদী ইচ্ছা করিলে তাহারা আপন আপন মধ্যস্থ নিয়োগে সক্ষম।

কিন্তু এই আইনের বিশেষ বিধান এই যে, গভর্নমেন্টকে রাইয়ত মহাজনের মধ্যে কতকগুলি সন্ধিকর্তা (Conciliators) নিযুক্ত করিতে হইবে। আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে অর্থীকে সন্ধিকর্তার নিকট যাইতে হইবে। তিনি রাইয়ত মহাজনের বিবাদ আপসে মিটাইয়া দিবার সাধ্যমতো চেষ্টা করিবেন ও তাহাতে কৃতকার্য না হইলে অর্থীকে আদালতে যাইবার অনুমতি দিবেন, তাঁহার সার্টিফিকেট ভিন্ন কোনো দাওয়া আরজি গ্রাহ্য হইবে না। এই পাঁচ বৎসরে যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে এই সন্ধি-নিয়ম হিতাবহ বলিয়া অনুভূত হয়। অনেক স্থলে সন্ধিকর্তার সুপরামর্শে অর্থী প্রত্যর্থী আপসে বিবাদ মিটমাট করিয়া মকদ্দমার অর্থ নাশ মনস্তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। ইহাতে আমাদের প্রাচীন পঞ্চায়ত প্রথার গুণস্পর্শ কিয়দংশে উপলক্ষিত হয়।

রাইয়ত ঋণ শোধের টাকা মহাজনের কাছে আনিয়া দিলে মহাজন তাহাকে স্বতন্ত্র রসিদ অথবা পাসবহি মধ্যে রসিদ লিখিয়া দিতে ও প্রতিবর্ষে রাইয়তের হাতে তাহার দেনা পাওনার হিসাব দিতে বাধ্য।

আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিচারকের কর্তব্য প্রতিবাদীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার জবানবন্দী লওয়া। দেনা পাওনার হিসাব সমস্ত আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করিয়া ঋণের আসল টাকা নিরূপণ করা ও জজের বিচারে যাহা ন্যায্য সুদ তাহাই ধরিয়া হিসাব ঠিক করিয়া দেনা নির্ণয় করা কর্তব্য। সুদের উপর সুদ কিংবা অতিরিক্ত অন্যায় সুদ চুক্তিসম্মত হইলেও ধরা হইবে না।

ডিক্রি দিবার অথবা জারি করিবার সময় দেয় টাকা উচিত মতো কিস্তিবন্দী করিয়া দেওয়া সকল সময়েই কোর্টের সাধ্যায়ত্ত।

রাইয়তের ভূমি সম্পত্তি বন্ধক না থাকিলে দেনার জন্য তাহা বিক্রি হইবার নহে।

দেনার ডিক্রিজারি-জনিত কারাবাসের আদেশ নিষিদ্ধ। ডিক্রিজারির দরুন রায়ত গ্রেপ্তার না হইলেও, তাহার মালক্রোকের হুকুম বাহির না হইলেও ৫০ টাকা ও ততোধিক ঋণে যে রাইয়ত ঋণগ্রস্ত সে ইচ্ছানুসারে ইন্সল্‌ভেন্সির জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবে।

করার নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বেও কোনো বন্ধকদাতা কৃষক বন্ধক ছাড়াইবার মকদ্দমা আনিতে সক্ষম। বন্ধক-করার লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

ঋণাদায় সম্বন্ধীয় তামাদির মেয়াদ ৩ বৎসরের পরিবর্তে ৬ বৎসর কাল বিস্তৃত।

এই আইনের গুণাগুণ বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এ আইন প্রবর্তিত হইয়া অবধি এ-অঞ্চলের প্রজারা দুর্ভিক্ষ দুষ্কালের করাল গ্রাসে আজ পর্যন্ত পতিত হয় নাই, সুতরাং ইহা পরীক্ষার কষ্টিপাথরে এখনো উত্তীর্ণ হইয়াছে বলা যায় না। এই বিধির চিরন্তন জনরূঢ়ি বিরুদ্ধ বিধান-সমূহ জন সাধারণের বাস্তবিক ইষ্ট কি অনিষ্ট জনক— ভবিষ্যতেই তাহা সম্যক্ অনুভূত হইবে। আপাতত দেখা যাইতেছে এই আইন মহাজনের পক্ষে যেমন কঠোর, রাইয়তের তেমনি লাভজনক। ইহার প্রভাবে অনেকানেক ঘোর দুর্দশাপন্ন রাইয়ত ঋণমুক্ত ও নিজ নিজ পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি মহাজনের গ্রাস হইতে পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে। অন্য দিকে মহাজনের পক্ষ দেখ। মহাজন রাইয়তের উপর ডিক্রি পাইলেও তাহার তাহাতে বিশেষ লাভ নাই কেন না সে ডিক্রিজারি করা সামান্য কষ্ট সাধ্য নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মহাজন সম্বন্ধে রাইয়তের কল্যাণ সাধনে যেমন গভর্নমেন্ট তৎপর, তাঁহাদের নিজের বেলায়— নিজের স্বার্থের সঙ্গে যেখানে বিরোধ সেখানে কি তদ্রূপ মনোযোগী? গভর্নমেন্টই এ প্রদেশের জমিদার।— রাইয়ত সরকারকেই মা বাপ বলিয়া জানে, সরকারের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন রাইয়তের দুর্দশা সম্পূর্ণ ঘুচিবার নহে। রাইয়তরা কতদূর করভারে প্রপীড়িত, তাহাদের ধার কর্জের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক খুলিবার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা কত দূর যুক্তিযুক্ত, রাজস্ব আদায়ের কঠোর নিয়ম সকল শিথিল করা কতদূর প্রার্থনীয়, ৩০ বৎসর অন্তর যে রাজস্ব পরিবর্তনের নিয়ম আছে তাহার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত করা সুসঙ্গত কি-না[৪] এই সকল বিষয় বিবেচনা পূর্বক গভর্নমেন্ট যথাকর্তব্য বিধান করুন পরিশেষে এই আমাদের প্রার্থনা।

---

৪. নূতন জমাবন্দী বান্ধিবার সময় রাইয়তের স্বযত্নসম্ভূত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া করবৃদ্ধি করা বিধেয় নহে এই সাধারণ নিয়ম কিন্তু কার্যত অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, এই নিয়ম সংশোধিত হইয়া বোম্বাইয়ে এক নূতন আইন প্রবর্তিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

☐ *বোম্বাই চিত্র*, ১৮৮৯, পৃ. ১৯৮-২৪১

অভিনয় ও অভিনেতা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অভিনয় সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন, কবির ন্যায় অভিনেতা জন্মগ্রহণ করেন— শিক্ষায় গঠিত হন না। কবি ও অভিনেতার উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু কেবল উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই কবি বা অভিনেতা হওয়া যায় না। অভিনেতার অভিনয়োপযোগী আকার স্বভাবপ্রদত্ত। উপন্যাসে নায়ক বর্ণনায় দেখা যায়, নায়ক অঙ্গসৌষ্ঠববিশিষ্ট, অনেক সময়েই দীর্ঘকায়, প্রশস্তললাট, উজ্জ্বলচক্ষু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধরযুক্ত, পীনবাহু, বিশালবক্ষ ইত্যাদি। উপন্যাস-বর্ণিত নায়কের কণ্ঠস্বর পুরুষোচিত সুমিষ্ট হইলেই চলে, কিন্তু উপন্যাসের নায়ক রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উচ্চকণ্ঠ না হইলে চলিবেই না। উপন্যাসের নায়কেরও বীরকণ্ঠের আবশ্যক, কিন্তু শুধু বীরকণ্ঠ হওয়া রঙ্গমঞ্চের নায়কের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কারণ নিম্নকণ্ঠে বিরলে পরামর্শ দূরস্থ শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতে হইবে, উচ্চকণ্ঠে সৈন্যকে উৎসাহ প্রদান ব্যতীত নায়িকার সহিত নায়কের মৃদু প্রেমকথা শুনিতেও দর্শক উপস্থিত থাকেন। রঙ, পরচুলা প্রভৃতির সাহায্য অভিনেতা পান বটে কিন্তু কাঠামোটা এক রকম উপযোগী না থাকিলে সুনিপুণ বহুরূপীর শিল্পেও তাঁহার নায়কত্বের অধিকার হইবে না। স্বভাব তাহাকে নট করিয়া না গড়িলে চলিবে না। কুরূপ নায়কের দৃষ্টান্ত যে নাই তাহা নয়, যথা— ভিকটর হুগোর *Black Dwarf of Notre Dame*-এর নায়ক। বর্ণিত আছে— উক্ত নায়ক কুৎসিতের রাজা বলিয়া আমোদপ্রিয় যুবকেরা তাঁহাকে লইয়া সমারোহে রাজপথে ভ্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ নায়ক আর খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

গুরুগম্ভীর ভূমিকায় (serious part) উপযোগী আকারের যেরূপ আবশ্যক, হাস্যরসাত্মক ভূমিকায়ও সেইরূপ। তবে এ ভূমিকায় বেশকারীর নিপুণতার সাহায্য অনেক পাওয়া যায়। তথাপি মুখভঙ্গি প্রভৃতি স্বভাবদত্ত হইলে, উৎকৃষ্ট হয়। উচ্চদন্ত হাস্যরসে বিশেষ উপযোগী। যথাযোগ্য আকার কণ্ঠস্বর প্রভৃতি অভিনেতার অবশ্য প্রয়োজন বলিয়াই অনেক রঙ্গালয়-প্রবেশ-প্রার্থীর আবেদন রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ গ্রাহ্য করিতে পারেন না। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আবেদন করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজ নিজ শিক্ষার পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা একথা বুঝেন না যে কেবল শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নহে। কণ্ঠস্বর ও আকারাদিগত ত্রুটি অভিনেতার পক্ষে বিষম অন্তরায়। এই কারণেই পূর্ববঙ্গের বা রাঢ় অঞ্চলের উচ্চারণ কলিকাতার রঙ্গালয় প্রবেশের একটি বিশেষ বাধা।

স্বভাবের দান ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। নটের কার্য— 'To give to airy nothings a local habitation and a name. কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। আন্তরিক ও বাহ্যিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য হয় না— যে ভূমিকা অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না।'[১]

নাট্যকার যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা কিরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, নট তাহা অনন্যমনা হইয়া চিন্তা করেন। সে চরিত্র যদি স্বয়ং নাটককার তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, তথাপি নটের চিন্তা ফুরায় না। নাটককার যে ভাবাপন্ন হইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন, নাটকীয় চরিত্র বুঝাইবার কালে তিনি সে ভাবাপন্ন নহেন, কিন্তু নাটকে চিন্তাযোগে সেই ভাবাপন্ন হইতে হইবে। অনেক সময় নটকর্তৃক নাটকীয় চরিত্রের অনুভূতিতে (conception) নাটককারকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি— ভিক্টর হ্যুগো একখানি নাটক লিখেন। যে রঙ্গালয়ে ইহার অভিনয় হইবার কথা হইতেছিল, তাহার প্রধান অভিনেত্রীর মতে নাটকখানি ভালো হয় নাই, কিন্তু তথাপি নাটকের মহলা (rehearsal) চলিতে লাগিল। উক্ত অভিনেত্রীর ভূমিকা (part) ব্যতীত সকল ভূমিকাই উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রী ভাবিল যে নাটকের তো কেহ নিন্দা করিবে না, আমিই নিন্দাভাজন হইব। তখন সে অভিনেত্রী নিজের ভূমিকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিল। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া ভিক্টর হ্যুগো চমৎকৃত! তিনি দেখিলেন যে সে চরিত্র সম্বন্ধে অভিনেত্রীর কল্পনা এত উচ্চ যে তিনি স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। *সধবার একাদশী*-র 'জীবনচন্দ্রের' অভিনয় দর্শনে প্রতিভাবান্ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তদভিনেতা অর্দ্ধেন্দুকে 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা *"Improvement on the author"* বলিয়া যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভিক্টর হ্যুগো কর্তৃক উক্ত অভিনেত্রীর প্রশংসার অনুরূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত *কৃষ্ণকুমারী*-র ভূমিকায় নটগুরু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আভাস পাওয়া যায় যেন মধুসূদন নিজ নাটকের রচনা উক্ত নটের নিকট যাচাই করিয়া লইতেছেন।

নটের কল্পনা যে সামান্য নয়, তাহা বহুদৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যায়। নাটকের চরিত্র লইয়া নট, তচ্চরিত্র প্রস্ফুটনে কিরূপ পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে উপযুক্ত হইবে ও শিল্প দ্বারা নিজ অবয়বে কিরূপ পরিবর্তনই বা আবশ্যক, তাহা দর্পণ সাহায্যে স্থির করেন। চরিত্র সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা করাতেই অভিনেতার কার্যের অবসান হয় না। তাঁহার অবয়ব স্বেচ্ছানুসারে চালিত হওয়া চাই। শুনা যায়, জগদ্বিখ্যাত অভিনেতা সার্ হেন্‌রি আর্‌ভিং ফরাসি মন্ত্রী 'রিশ্‌লু'র ভূমিকার অভিনয়ে রাজার সম্মুখে নিজ মৃত্যু যেন আসন্ন দেখাইতেন। কিন্তু রাজা 'রিশ্‌লু'কে মার্জনা করিয়া চলিয়া যাইবার পরেই শত্রুদমনোৎসুক আরভিং-রিশ্‌লু ভীষণ মূর্তিতে দণ্ডায়মান হইতেন। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় ভারতের

১ মৎপ্রণীত 'বঙ্গনাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। [গি.ঘোষ]

সীমান্ত যুদ্ধে (চিত্রল সমরে) আর্‌ভিং দেখিতে আসিয়াছিলেন কিরূপে গুলির আঘাতে সতেজ সৈনিক মৃত হইয়া পড়ে। তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও সে সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই; তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল— রক্তোৎফুল্ল বীরমদোজ্জ্বল মুখমণ্ডল কি প্রকারে সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ও তাহাতে মৃত্যুর ছায়া পতিত হয়। দেহের উপর এরূপ আধিপত্য লাভ অল্প অভ্যাসের কার্য নহে। কল্পিত চরিত্রের সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধ্যান করা, চরিত্রের অনুরূপ কথাকওয়া, তাহার হাবভাব আনা— নটের অতি কঠোর সাধন।

কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাব নহে। সৈনিক পুরুষ কথা কহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারি-মুখে ব্যূহ-রচনা চিত্রিত করিতেছে; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলি-ভঙ্গিতে মালা গাঁথে; কেরানি কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে অঙ্গুলি দিয়া কি লেখে; প্রেমিক মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সুন্দর বস্তু দেখিয়া অন্যমনা হয়; বেদিয়া চলিতে চলিতে ডিগবাজি খায়, গায়ক শিস্ দেয়, বাজিয়ে অঙ্গ বাজায়— এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য— যেন অভিনয়কালে এই সকল ভাবভঙ্গি স্বভাবপ্রসূত বলিয়া দর্শক মনে করেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গ-রঙ্গালয় হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ন্যাশান্যাল থিয়েটারে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *কৃষ্ণকুমারী* নাটকে বীরেন্দ্রসিংহের ভূমিকায় মরুদেশের রাজদূতের সহিত ধনদাসের বাদানুবাদের মাঝে দাঁড়াইয়া যখন ভূমিস্পর্শী পিধান দ্বারা ব্যূহ রচনা করেন, তখন ভাবুক দর্শক তাঁহার সে কার্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বেলবাবু (যিনি কাপ্তেন বেল নামে পরিচিত) *ধীবর ও দৈত্য* নামক নাটকে ধীবরের ভূমিকায় দৈত্যকে কৌশলে পিপের মধ্যে আবার প্রবেশ করাইয়া— পিপের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া— যখন তাহার উপর বসিতেন, আর দৈত্য 'আমায় খুলিয়া দাও' বলিয়া অনুনয়বিনয় করিতে থাকিত, তখন রোষাবিষ্ট বেল মস্তক চালিয়া বলিত— "কভি নেই" এবং নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তাহার জাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে কি না। জেলে না হইলে এরূপ অবস্থায় জালের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখে না— দৈত্য পাছে বাহির হয়, এই ভয়েই বিব্রত থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে, সহৃদয় দর্শক বর্তমান প্রবন্ধকারের অভিনয়ের অনেক স্থলে প্রশংসা করিয়াছেন। কাশিমবাজাবে *প্রফুল্ল* নাটকের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি। যখন যোগেশ সর্বস্বান্ত হইয়াছে,— পথিকের নিকট মদের পয়সা প্রার্থী, স্ত্রীকে রাস্তায় পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছে ও বলিয়াছে "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল!"— তাহার পর ভগ্নহৃদয় ও মদে জীর্ণ 'যোগেশ' সাজিয়া যখন আমি বাহির হইয়াছিলাম ও পা টানিয়া চলিয়াছিলাম, তখন আমার এই গমনভঙ্গি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লক্ষ্য করেন। অভিনয়-শেষে তিনি কাশিমবাজারের ঐরূপ দুর্দশাগ্রস্ত এক ব্যক্তির নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি কি না? আমি 'না' উত্তর করায়, মহারাজ বলেন— "আপনার চলন ঠিক তাহারই অনুরূপ হইয়াছিল।" এই প্রশংসায় আমার আত্মতৃপ্তি জন্মিয়াছিল, কারণ আমি যাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা লক্ষিত হইয়াছিল।

নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড় অল্পায়াসসাধ্য নহে। যাঁহার পূর্বোল্লিখিত ধ্যান-ধারণা-শক্তি নাই, তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ বিড়ম্বনা। তিনি সুপাঠক হইলে যথাযোগ্য উচ্চারণের সহিত দর্শক-সমীপে নিজ ভূমিকা বুঝাইয়া পাঠ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অভিনয় নহে। অভিনয়ের পন্থা কঠোর— কুসুমাবৃত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অতএব যে কার্যে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, তাহা বিষবৎ পরিহার্য। অন্তর্দৃষ্টি করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তিসকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে, দৃষ্টিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটে। এই বিশ্লেষণ কার্যে মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা বুঝিয়া আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্যের বিশেষ সহায়তা হয়। ভূমিকা কোথায়ও ক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা অভিনয়কালে অক্ষুণ্ণ করিয়া প্রদর্শন করা যায় কি না, সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে, নট নাটককারের যোগ্য ভাবপ্রকাশক হন না— প্রকৃত বন্ধুজ্ঞানে নাটককার তাঁহাকে অভিবাদন করেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মাইকেল মধুসূদন রামকে ভীরুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত *মেঘনাদ বধ* উচ্চকাব্য হইয়াও হিন্দুর নিকট দূষণীয় হইয়াছে। নাটকাকারে পরিবর্তিত *মেঘনাদ বধ* নাটকে রামের ভীরুতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। যখন নৃমুণ্ডমালিনী রামকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন তখন রামকে দৃপ্তস্বরে বলিতে হয়—

"জনম রামের, রমা, রঘুরাজকুলে
বীরেশ্বর"— ইত্যাদি।

তার পর যখন বিভীষণ বলেন—

"দেখ
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি। দেখ দেব, অপূর্ব কৌতুক।
না জানি এ বামাদলে কে আঁটে সমরে
ভীমরূপা, বীর্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ কুল-অরি।"

তদুত্তরে রাম উপেক্ষাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করেন—

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর। যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি"—

ইত্যাদি।

এই ঈষৎ হাস্যে নট প্রকাশ করিতে চাহেন যে রাবণের সহিত যুদ্ধার্থে অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘনপূর্বক লঙ্কায় আসিয়াছি— রমণীর বীরত্ব আর কি দেখিব। কিন্তু রামের ভীরু স্বভাব উক্ত কাব্যে এত স্থানে প্রকাশিত যে, তাহা ঢাকিবার জন্য নটের এ কৌশল কতদূর সফল হয়, তাহা বলা যায় না।

অনেক সময়ে নাটক প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত, নট কৌশল করিয়া নাটকীয় কথার এরূপ বিকৃত উচ্চারণ করেন যে তাহা শ্রোতার কানে লাগে। যে অংশটি ঐরূপ

বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় তাহার প্রতি দর্শকের লক্ষ পড়ে। দর্শকের পক্ষে এইরূপ আকর্ষণ করিতে না পারিলে নটের কার্য সম্পন্ন হয় না। যেখানে নাটকের কোনো পংক্তিতে একটি বিশেষ ভাব আছে, সেখানে সেই ভাবটি দর্শক যদি লক্ষ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে নট অভিনয়ে যে প্রণালীতে চলিতেছেন, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিবেন না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইয়াগো (Iago)-র ভূমিকা অভিনয়ে কোনো নট এইরূপ অভিনয় করেন, যেন ইয়াগো বিনা কারণে, কেবলমাত্র তাহার স্বভাব দোষে ওথেলোর (Othello) অনিষ্টকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিভাবান অন্য এক নটের অভিনয়ে প্রকাশ পাইত— ইয়াগো যেন ঈর্ষাবশত সমস্ত অনিষ্ট করিয়াছে। ইয়াগো বলিতেছে—

> "I hate the Moor;
> And it is thought abroad
> That 'twixt my sheets'
> He has done my office :
> I know not if't be true;
> But I for mine suspicion in that kind
> Will do as if for surety.

—মূরের প্রাত আমার বিদ্বেষ; এমন একটা কথাও আছে যে সে আমার শয্যা কলুষিত করিয়াছে। সত্য কি না জানি না, কিন্তু এই সন্দেহের ছায়াটুকু ধ্রুব সত্য মনে করিয়াই আমি প্রতিহিংসা সাধন করিব।" ইয়াগোর এই উক্তিটুকু বলিবার কালে উল্লিখিত নট *'twixt'* (my sheets) শব্দটি ভান করিয়া ভুলিয়া যাইতেন এবং তৎপরিবর্তে *between* উচ্চারণে ছন্দঃপতন করিয়া এই বিশেষ কথাটির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এরূপ কৌশল সুবক্তাকেও কখনও কখনও করিতে হয়। যে সকল নটের কল্পনা ছিল যে, স্বভাবজাত দুর্বৃত্তিবশত ইয়াগো ওথেলোর সর্বনাশ করিয়াছে, তাঁহাদের অভিনয়ে প্রকাশ পাইত যেন ওথেলোকে যন্ত্রণা দেওয়া তাহার আমোদপ্রদ কার্য ছিল। যেমন নিষ্ঠুরভাব ব্যক্তি কোনো প্রকার শত্রুতা না থাকিলেও পরকে দুঃখ দিয়া বা পরের দুঃখ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু ঈর্ষাজনিত শত্রুতাচরণ অন্য প্রকার। কীন্ (Kean) কর্তৃক এই ইয়াগো অভিনয়ে প্রকাশ পাইয়াছিল, কুটিলস্বভাব ব্যক্তি সামান্য সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপ ভয়ংকর শত্রুতা সাধন করে এবং তাহার সন্দেহ-সৃষ্ট শত্রুর যন্ত্রণায় সে রোষের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ উল্লসিত হয়। ইয়াগোর উল্লিখিত দুই প্রকার অভিনয় লইয়া নানা বাদানুবাদ থাকিলেও শেষোক্ত প্রথাটি প্রতিভাবান নট কর্তৃক নাটকীয় চরিত্র প্রস্ফুটনের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

অভিনয়কালে প্রকৃত নট কখনও অবহেলার সহিত অভিনয় করিবেন না। ভাবুক দর্শক থাকুক বা নাই থাকুক, অভিনেতার দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা উচিত। সংগীতাচার্য স্বর্গীয় গোপাল চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার ছাত্রগণকে বলিতেন— "যেমন সভাই হউক, তুমি অনাস্থার সহিত গান করিও না। সে আসরে একজনও সমজদার থাকিতে পারেন — তাঁহাকে ব্যথা দিও না। সেই একজনের তৃপ্তি তোমার আশাতীত

পুরস্কার জ্ঞান করিবে।" সংগীতাচার্যের এই অমূল্য উপদেশ নটের প্রতিও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

রঙ্গালয়ে শুনা যায়, অমুক ব্যক্তি এই ভূমিকা (part) 'জ্বালাইয়া দিয়াছে'— অর্থাৎ সে ভূমিকা ঐ ব্যক্তির দ্বারা এত উৎকৃষ্ট অভিনীত হইয়াছে যে, তাহা অন্য ব্যক্তি গ্রহণ করিলে তুলনায় তাঁহাকে অতিশয় নিন্দনীয় হইতে হইবে। ইহা নটের যোগ্য কথা নহে। যে কোনো ভূমিকা যতই উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হউক না কেন, সে ভূমিকা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ প্রকৃত নটের পক্ষে নিন্দার কথা। এই নিন্দা অপেক্ষা অভিনয় করিতে গিয়া নিন্দনীয় হওয়া শ্রেয়। ভূমিকাটি সুন্দররূপে অভিনয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা নটের নিতান্ত কর্তব্য। দাবা খেলোয়াড়েরা বলিয়া থাকেন— ভাবিলেই চাল বাহির হয়। আমরা নট, আমাদের কার্যও সেইরূপ— ভাবিলেই চাল বাহির হয়। মিস্ সিডন্‌স্ (Miss Siddons)-এর 'লেডি ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় জগদ্বিখ্যাত। 'হ্যাজ্‌লিট'এর মমতাহীন লেখনীতেও সে অভিনয়ের সুখ্যাতি ধরে না। কুমারী সিডন্‌স্ দীর্ঘকায়া ছিলেন— লেডি ম্যাক্‌বেথের কঠোর অংশ অভিনয়ের উপযুক্ত করিয়াই যেন তাঁহার সে গঠন। তিনি এই ভূমিকা যেভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে দর্শক বুঝিলেন যে লেডি ম্যাক্‌বেথ অতি উৎকট চরিত্র। তাঁহার সে অভিনয় দর্শনে বহুদিন ধরিয়া লোকের এই ধারণা ছিল যে, সে চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে আর কেহই দাঁড়াইতে পারিবেন না। ইহার পর কয়েক বৎসর রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিয়া কুমারী সিডন্‌স্ যখন বৃদ্ধাবস্থায় লেডি ম্যাক্‌বেথরূপে পুনরায় দর্শকসমীপে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার যৌবনের অভিনয়ের সহিত তুলনায় হ্যাজ্‌লিট্ তাঁহার নিন্দা করেন, কিন্তু সে নিন্দাও অনেকের পক্ষে উচ্চ প্রশংসা।[২] মিস্ সিডন্‌স্-এর পর, অধুনা সারা বার্নহার্ট (Sara Barnhardt— যাঁহাকে লোকে, Divine Sara বলে) লেডি ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সারার 'লেডি ম্যাক্‌বেথ' দর্শনে লেডি ম্যাক্‌বেথের চরিত্র দর্শকের মনে ভিন্নরূপ অঙ্কিত হইল। দর্শক দেখিল — যেন স্বামী-অনুরাগিণী স্বামীর উচ্চপদাকাঙ্ক্ষিণী প্রেমিকা রমণী রঙ্গমঞ্চে বিচরণ করিতেছেন। সে স্বার্থত্যাগিনীর স্বামীর স্বার্থই স্বার্থ। স্বামীর যে উচ্চকামনা ছিল— তাহা সে জানিত, পতির আজীবনের বাসনা পূর্ণ হউক — এই উদ্দেশ্যেই সে পতিকে উত্তেজিত করিয়াছে এবং অনুতাপদগ্ধ স্বামীকে অনুতাপিনী স্বপ্নাবস্থাতেও স্নেহভরে সান্ত্বনা দিয়াছে। পতিদুঃখে দুঃখিনী উন্মাদিনী বলিতেছে—

"Fie my Lord, fie, a soldier afraid? What need we fear, who knows it, when none can call our power to account?" ছিঃ প্রভু ছিঃ—

২. মিস্ সিডন্‌স্ সম্বন্ধে এরূপ একটি গল্প আছে। লেডি ম্যাক্‌বেথ অভিনয়ের পর তিনি দর্শকবৃন্দের এতই প্রশংসাভাজন হন ও তাঁহার যশ এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে, একদিন তিনি সজ্জিত হইয়া যানারোহণে যখন রঙ্গালয়ে আসিতেছিলেন, তখন জনৈক বিখ্যাত চিত্রকর পথিমধ্যে তাঁহার গাড়ি থামাইলেন। তাহাতে সিডন্‌স্ জিজ্ঞাসা করেন — 'কেন তুমি আমার গাড়ি থামাইলে, তুমি কে?' চিত্রকর উত্তর দিলেন — 'আমি চিত্রকর, আপনার সজ্জিত মূর্তি নিকটে দেখিবার জন্যই গাড়ি থামাইয়াছি।' মুগ্ধনেত্রে চিত্রকর সে মোহিনীমূর্তি দেখিলেন; ঈষৎ হাসিয়া অভিনেত্রী তখন রঙ্গালয়ে গেলেন।

তুমি যোদ্ধা হয়ে ভয় পাও? যে জানে, জানুক, কিসের ভয়? আমাদের শক্তির বিরোধী হয়ে কে দোষী করতে সাহসী হবে?

পরে আবার পতিকে সান্ত্বনা দিতেছে— "I tell you yet again Banquo's buried. He cannot come out of his grave." আমি তোমায় বলছি— ব্যাঙ্কো কবরে— গোর থেকে উঠে আসতে পারবে না। স্বপ্নাবস্থায় এই সকল অতি মধুর সান্ত্বনাবাক্যে সারা-লেডি ম্যাক্‌বেথ বলিয়াছিলেন।

শেষে বলিতেছে— 'Come, come, come, come, give me your hand. what's done, cannot be undone. To bed, to bed, to bed." এসো, এসো আমার হস্তধারণ করো, যা হয়েছে— তা আর ফিরবে না— শয্যায় চলো— শয্যায় চলো।

শেষের এই স্থলে সারার অঙ্গভঙ্গিতে দর্শক দেখিত, যেন প্রেমিকা অতি যত্নে ভয়কম্পিত পতির হস্ত ধারণ করিয়া শয্যায় লইয়া যাইতেছে। এই উদাহরণে বুঝা যায় যে লেডি ম্যাক্‌বেথের ভূমিকার কল্পনা উক্ত দ্বিতীয় প্রকার উচ্চ কল্পনা হইতে পারে। সিডন্‌স্ ও সারা উভয়েই প্রশংসার যোগ্য। সিডন্‌স্ লেডি ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা "জ্বালাইয়া দিয়াছে" প্রতিভাশালিনী সারা এ কথা বলেন নাই। তবে লেডি ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা লইয়া এই তর্ক চিরকালই চলিতে পারে— সেক্‌সপিয়রের স্বকৃত কল্পনা সারা সিডন্‌স্-এর অনুরূপ?

আমাদের এদেশে *রামলীলা*-য় বৎসর বৎসর যেমন রাম লক্ষ্মণ বদল হয়, বিলাতে *রোমিও জুলিয়েট* ও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসরই নূতন রোমিও জুলিয়েট ভূমিকায় একটি নূতন প্রকার পরিবর্তন করে। এই নূতনত্ব কেবলমাত্র নটের চিন্তাশক্তিফলপ্রসূত। প্রতি বৎসরেই ওই দুই ভূমিকা "জ্বলিয়া যায়"; কিন্তু আবার প্রতি বৎসরই দর্শকজন-মনোহারী নূতন অভিনয় হইয়া থাকে।

বিলাতি রঙ্গালয়ের ইতিহাসে আছে, ব্যারী নামে এক ব্যক্তি গ্যারিকের ছাত্র ছিলেন। তিনি গ্যারিকের দ্বারা এরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন যে, দর্শকবৃন্দ তাঁহাকে গ্যারিকের তুল্য অভিনেতা মনে করিতে লাগিল। প্রশংসায় গর্বিত হইয়া ব্যারী গ্যারিককে ত্যাগ করিয়া গেলেন; গ্যারিক চিন্তিত, ব্যারীকে কিরূপে পরাজিত কবিবেন। বহুচিন্তার ফলে তিনি শেষে ব্যারীকে পরাজিত করেন। লোকে গ্যারিকের ও ব্যারীর পার্থক্য লিয়ার (Lear)-এর অভিনয়ে বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া বলিতে লাগিল— "For Barrie we have laughter, for Garrick only tears"—ব্যারীকে দেখিয়া হাসি আসে— অশ্রু কেবল গ্যারিকের জন্যই। অভিনয়ের পার্থক্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। *King Lear*-এ আছে— "That she may feel how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child." কৃতঘ্ন কন্যা Gonerilকে লক্ষ্য করিয়া Lear এই অভিসম্পাত করিতেছেন— "তাহার যেন কুসন্তান জন্মে, কৃতঘ্ন সন্তানের জ্বালা সর্পদংশন অপেক্ষা কত যে তীব্রতর, তাহা যেন সে অনুভব করিতে পারে।" গ্যারিক "That she may feel" ইত্যাদি বাক্যটি একবার খাদে বলিয়া ওই পংক্তিটি পুনর্বার অতি তীব্রসুরে

উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, গ্যারিক ব্যারীর জয়-পরাজয় এই অভিনয় ভঙ্গিতেই দর্শক বুঝিতে পারিয়াছিল। আর একস্থলে যখন প্রান্তর মধ্যে ঝঞ্ঝাবাত্যাক্রান্ত লিয়ার— ভূতদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন — "I tax not you, you elements with unkindness; I never give you Kingdom, called you children, you owe me so subscription."

তথায় গ্যারিকের অভিনয় এমনই হৃদয়ভেদী হইয়াছিল যে, ব্যারী গ্যারিকের পার্থক্য সম্বন্ধে দর্শকবৃন্দের পূর্বোক্ত মত (For Garrick only tears) বর্ণে বর্ণে অন্বর্থ হইয়াছিল।

উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত ভূমিকা যে চিন্তার দ্বারা উৎকৃষ্টতর অভিনীত হইতে পারে, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত আমাদের বঙ্গরঙ্গালয় হইতেও দেওয়া যাইতেছে। *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের ভীমসিংহের অভিনয়ে "মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ— এখনি তাহাকে বধ করিব"— এই অংশে মানসিংহ পদটি একই সুরে তিনবার উচ্চারিত হইত। পরবর্তী অভিনেতা কর্তৃক এ-অংশের অভিনয় এইরূপে পরিবর্তিত হইল — প্রথম মানসিংহ এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, যেন নামটি ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায় পতিত হইল, দ্বিতীয় মানসিংহের উচ্চারণে বোধ হইল যেন সেই ছায়া কিঞ্চিৎ দীপ্তি পাইয়াছে— যেন কি দুর্ঘটনা স্মরণ হইতেছে; তৃতীয়বারে ক্ষিপ্ত রাজার স্মৃতিপটে শত্রু মানসিংহ সুস্পষ্ট দাঁড়াইল; এই শেষের মানসিংহ দেখিবামাত্র অসি মোচনপূর্বক ভীমসিংহ তাহাকে বধ করিতে ছুটিল। এই ভীমসিংহের ভূমিকার আর একস্থলে রাজা ক্ষিপ্ত অবস্থায় বলিতেছেন— "কে ও? মহিষী যে। তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ?" এই অংশে প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে অভিনীত হইত; পরিবর্তিত অভিনয়ে কান্না ছিল না। কৃষ্ণা যেন কোথায় গিয়াছে — রাজা প্রিয় দুহিতাকে খুঁজিতেছেন, এইরূপ ভাবেই অভিনীত হয়। পরিবর্তিত অভিনয় পূর্বের রোদন অপেক্ষা হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।

যখন প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাশান্যাল থিয়েটার ত্যাগ করিয়া আমি স্টার থিয়েটারে আসি, তখন প্রতাপচাঁদের থিয়েটারে মহেন্দ্রলাল বসু মৎপ্রণীত *সীতার বনবাস* নাটকে লক্ষ্মণের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। স্টারে *সীতার বনবাস* অভিনয় আরম্ভ হইলে, অমৃতলাল মিত্র লক্ষ্মণের ভূমিকা গ্রহণ করেন। উভয়েরই অভিনয় উৎকৃষ্ট হইলেও অমৃতলালের অভিনয়ে একটু বিশেষ পার্থক্য দেখা গেল। লক্ষ্মণ আসিবামাত্র হঠাৎ যখন রামের মুখে শুনিলেন— "সীতা দুষ্টা নারী, তাহাকে বনে রাখিয়া আইস"— তখন অমৃতলাল-লক্ষ্মণ অমনি বসিয়া পড়িলেন; অমৃতলালের এই নূতন অভিনয়টি দর্শকের বড়ই মর্মভেদী হইয়াছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারে যখন *মেঘনাদ বধ*-এর অভিনয় হইত, তখন রামের ভূমিকা মেঘনাদের তুলনায় দর্শকের চক্ষে নিকৃষ্ট বোধ হইত। কিন্তু ন্যাশান্যাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয়ে রামের ভূমিকা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও মেঘনাদের ভূমিকার প্রায় সমতুল্য হইয়াছিল।

গোপাল নামে ন্যাশান্যাল থিয়েটারে একজন অভিনেতা মাইকেলের *বুড়ো শালিকের*

ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে গদা খানসামা সাজেন। এই খানসামা-অভিনয়কালে সিদ্ধ অভিনেতা অর্ধেন্দু তাঁহাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দিতেছিলেন— ইহাতে গদা চটিয়া আগুন; তিনি বলিলেন, "কর্তাবাবু, তোমার কোনো পুরুষে খানসামাগিরি জানে না, তুমি খানসামাগিরি আমায় কি শেখাতে এসেছ?— আমরা সাতপুরুষে খানসামা।" সে সময়ে যদি মাইকেল হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইতেন, তবে তিনি গদার মুখে এই অভিনব কথাগুলি শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেন,— এ আবার কোন্ *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* অভিনয় হইতেছে! গোপালের এই গদার অভিনয় অন্য সকল গদা হইতে পৃথক হইয়াছিল এবং ইহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সকলে 'গদাগোপাল' বলিয়া ডাকিত। তিনি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটির প্রহসনে মুন্সেফের ভূমিকা পাইয়াছিলেন। এই মুন্সেফের ভূমিকা তৎপূর্বে ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করিয়া "জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন" বটে, কিন্তু 'গদাগোপাল' স্বীয় নিপুণতায় এ ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুর পার্শ্বে দাঁড়াইবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছিলেন।

বর্তমান সময়ে সুধীগণ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, একই ভূমিকা শ্রেষ্ঠ অভিনেতাগণ স্ব স্ব প্রথায় সুন্দর অভিনয় করিয়া থাকেন। উক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে— "অমুক অভিনেতা এই ভূমিকা জ্বালাইয়া দিয়াছে"— এরূপ কথা সমীচীন নহে।

একই ভূমিকা যে দুইভাবে অভিনীত হইতে পারে, তাহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পূর্বোক্ত 'সিডন্‌স্' ও 'সারা'র লেডি ম্যাক্‌বেথ। এখানে প্রসঙ্গত আর একটি বৈদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে বলেন যে "To be or not to be that is the question, etc etc." হ্যামলেটের এই অংশটুকু দুই ভিন্ন রঙ্গালয়ে দুইজন ভিন্ন অভিনেতা ভিন্নরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। একজন ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে— আর একজন চিন্তামগ্ন— ধীরভাবে। রায় মহাশয় বলেন যে, উভয় নটই কৃতী; তবে এই দুই নটের দুই প্রকার আখ্যার মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে কেন স্থির করিতে পারেন নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। হ্যামলেট সম্বন্ধে হাজ্‌লিটের "Character of Shakespear's plays" নামক প্রবন্ধে আছে এবং অধিকাংশ সমালোচকেরই মত এই যে "It is not a character marked by strength of will or even of passion, but by refinement of thought and sentiment," অর্থাৎ এই চরিত্রে ইচ্ছাশক্তির বল বা মনোবৃত্তির বেগ নাই। মার্জিত ভাব ও চিন্তাই ইহার বিশেষত্ব। সুতরাং এই চরিত্র বিশ্লেষণের সার্থকতা— "To be or not to be etc."— এই স্বগত উক্তিতে যেরূপ পরিস্ফুট, অন্য স্থলে সেরূপ নহে। হ্যামলেট বলিতেছে— "জীবন ধারণ কিংবা বিসর্জন— ইহাই তো সমস্যা আমার। মৃত্যু— হয়তো সে নিদ্রামাত্র। কিন্তু স্বপ্ন যদি রহে সে নিদ্রায়— ঐ তো হতেছে ভয়।" হ্যামলেট নির্জনে তন্ন তন্ন করিয়া পূর্বপক্ষ ও তাহার উত্তর বিচার করিতেছে। অতএব হ্যামলেটের এ ভূমিকায় যে অভিনেতা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করে, সে

ব্যক্তি— আমাদের রঙ্গালয়ে যাহারা বীররসে তর্জন গর্জন ও করুণরসে পুরুষের ভূমিকায় স্ত্রীলোকের ন্যায় হাউ হাউ করে, তাহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ অভিনেতা বলিয়া উক্ত হইতে পারে। সে যে আদৌ সেক্সপিয়ার বোঝে নাই— ইহা নিশ্চিত হইতে নিশ্চিততর।

একই অংশের বিভিন্নভাবে অভিনয় সম্বন্ধে দেশীয় রঙ্গালয় হইতে পুনশ্চ একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। নটশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার প্রশংসা কথনে উক্ত রায় মহাশয় অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় *বিল্বমঙ্গল* নাটক হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেন। নাটকের এক স্থলে চিন্তামণিকে লক্ষ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল পুনঃপুনঃ বলিতেছে— "তুমি অতি সুন্দর,— অতি সুন্দর!" পূর্বে একজন অভিনেতা এই "অতি সুন্দর" ছত্রটি উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কর্তৃক শিক্ষিত নট এইস্থলে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্নকণ্ঠ করিয়া আনিত। রায় মহাশয় বলেন, অর্দ্ধেন্দু কৃত এই পরিবর্তন বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমি বিনীতভাবে বলিতেছি, তাহার এই মতের সহিত আমার অনৈক্য আছে। রায় মহাশয় বলেন যে উত্তরোত্তর চিৎকারে কামভাব প্রকাশ পায় কিন্তু ক্রমে নিম্নকণ্ঠে বলিলে কামভাব বর্জিত হয়, সেইজন্য দ্বিতীয় প্রকারের অভিনয় তাঁহার চক্ষে সুন্দর। আমার মতে এ স্থলে কামপ্রভাব প্রকাশই নটের উচিত। ক্রমে কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করিলে প্রদর্শিত হয় যে, সরলহৃদয় কুহকিনীর রূপজালে জড়িত হইয়াছে। সেই মায়াজাল ছিন্ন করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম "অতি সুন্দর" আছে— "নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও" এই কথার পর। দ্বিতীয়বারে আছে— "চিন্তামণি আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!" তৃতীয়বারে এইরূপ— "নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী, কিন্তু অতি সুন্দর— অতি সুন্দর!" বিল্বমঙ্গল 'অতি সুন্দর' বলিয়া চিন্তামণির রূপের প্রশংসা করিতেছে না— বলিতেছে— এ রাক্ষসীর মায়াজাল, দৃশ্যে সুন্দর, কিন্তু ঘৃণিত। কাম-দৃষ্টিতে সুন্দর কিন্তু বস্তুত রাক্ষসীর রূপ। কণ্ঠস্বর ক্রমে নিম্ন করিয়া আনিলে প্রকাশ পাইত, অতি সুন্দর রূপ দর্শনে রূপের পূজা অন্তরে বিকাশ পাইয়াছে; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের রূপ পূজা করিবার অবস্থা নয়। এতদিন সে পূজা করিয়াছে, এখন সে ঘৃণা করিতে চায়। বিল্বমঙ্গলের তখন উৎকট অবস্থা, উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে "অতি সুন্দর— অতি সুন্দর" আবৃত্তি করিলে সে অবস্থা প্রকাশ পায়। কামশূন্য রূপপূজা সাধনার চরম— যে চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিল্বমঙ্গল রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি দর্শনে "আহা" বলিয়াছিলেন। কামভাব প্রকাশ হওয়াতে বিল্বমঙ্গল ছোট হয় না। কাম ঈশ্বরে অর্পিত হইলে ভাবের অত্যুৎকৃষ্ট ভাব— মধুর ভাব লাভ হয়। বৃন্দাবনে গোপীদের এই ভাব লাভ হইয়াছিল। ভাগবতে আছে— "গোপ্যঃ কামাৎ"— গোপীরা কামের দ্বারা ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন— কামই শ্রীরাধার অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের জনক। রায় মহাশয় বক্তৃতায় বিদ্যাপতি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়া কবির প্রশংসা করেন, তাহার ভাব কামজনিত এই অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের অন্তর্গত।[৩]

শুনিতে পাই, বিল্বমঙ্গলের এই স্থল নিম্ন সুরে অভিনয় করাতে খুব করতালি

৩. এইস্থলে রায় মহাশয় ভ্রমক্রমে Burnsএর নাম না লইয়া Shelleyর কবিতার সহিত বিদ্যাপতির কবিতার তুলনা করিয়া বিদ্যাপতিকে উচ্চাসন দেন। কিন্তু Shelleyর কবিতা ও বিদ্যাপতির কবিতা

পড়িয়াছিল। উচ্চ সুরে অভিনয় করিলে যদি করতালি না পড়ে, আর নিম্ন সুরে ঘন করতালি পড়িতে থাকে তবে প্রকৃত নটের তাহা উপেক্ষা করা উচিত। *মেঘনাদ বধ* -এর অভিনয়ে যদি কেহ পরীক্ষা করেন, তবে দেখিবেন যে, মন্দোদরীর নিকট বিদায় লইবার সময়ে মেঘনাদ তর্জন গর্জন করিলে খুব করতালি পড়িবে। কিন্তু এরূপ তর্জন গর্জন প্রকৃত নটের ঘৃণার সহিত ত্যাজ্য। তর্জন গর্জন বীররসব্যঞ্জক নহে— অভিনয়ে বীররসের অপর লক্ষণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বীরবাহু-বধের পর আছে—

"বাপের অবস্থা দেখি হইল অস্থির।
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর॥
মেঘনাদ বলে, পিতা ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নরবানরের রণে॥
লুকায়ে থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বাবেক দেখিব যুদ্ধ করে॥"

আবার কাশীদাসের মহাভারতে সুভদ্রাহরণস্থলে যাদবগণকে পশচাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া অর্জুন সারথি দারুককে বলিলেন—

"ফিরাও দারুক রথ— ডাক ক্ষত্রগণে।
না দিয়ে প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥"

কিন্তু যে রথ হইতে কৃষ্ণসখা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিবেন, সে রথ কৃষ্ণভক্ত দারুক ফিরাইতে অসম্মত হইয়া যখন বলিল—

"গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত"

তখন অর্জুন উত্তর করিলেন—

"কৃষ্ণপুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা ভীম যুধিষ্ঠির সমরে প্রবেশে॥

উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি অতি উচ্চ বীররসব্যঞ্জক। এসকল স্থলে তর্জন গর্জন করিলে রঙ্গালয় করতালি-ধ্বনিতে ফাটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই করতালি-প্রত্যাশী নট নটনামের

সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর— Shelley কঠোর; সমালোচক বলেন— Shelleyর ভাব তারার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ, কিন্তু তারার শোভা যেমন অন্ধকারে, Shelleyর ভাবের দীপ্তিও তেমনি দুর্ভেদ্য তমোময় পটের উপরে।

যে দেশে রাধাকৃষ্ণ নাই, সে দেশে বিদ্যাপতি হয় না। Burns বিদ্যাপতি নয়, তিনি বিদ্যাপতির অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর কবি। Burns গাহিয়াছেন—

"Had we never loved so blindly
Had we never loved so blindly
Never met— or never parted,
We had ne'er been broken-hearted."

বৈষ্ণব-কবি রচিত এই ভাবের গান বাংলার বৈষ্ণব ভিখারিদিগকে গাহিতে শুনা যায়।

যোগ্য থাকেন না।

বিল্বমঙ্গল-এর উক্ত অংশ অভিনয়ে হয়তো কথিত প্রকার উত্তরোত্তর নিম্নসুরে "অতি সুন্দর— অতি সুন্দর" আবৃত্তি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত মধুর হয়, কিন্তু তাহাতে বিল্বমঙ্গলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে না। নাটকেও পরে প্রকাশ আছে, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াও কামের হাত এড়াইতে পারেন নাই, সুতরাং স্থানীয় একটু মাধুর্যের অনুরোধে চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা নটের কর্তব্য নহে। কবি বলেন—

> "It not an eye or a lip
> we beauty call,
> But the joint result add the
> full force of all."

অর্থাৎ কেবল সুন্দর চক্ষু বা সুন্দর ওষ্ঠ থাকিলে যে সুন্দর হয় তাহা নহে, সমস্ত অঙ্গের সুসম্মিলন দেখিয়াই আমরা সুন্দর বলি।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় বুঝিয়াছিলাম যে, মৎকর্তৃক অর্দ্ধেন্দুর প্রশংসা কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন নিন্দা জ্ঞান করিয়াছেন।[৪] তাঁহাদের ধারণা আমি যেরূপ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় বর্ণন করিয়াছি, তাহা প্রকৃত নয়। তাঁহাদের এরূপ ধারণা বোধ হয় আমার দোষেই হইয়া থাকিবে, বুঝি বা তাঁহাদের মস্তিষ্ক-উপযোগী ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহারা বলিতে চান যে যখন অর্দ্ধেন্দু তাঁহার ভূমিকা লইয়া তন্ময় হইতেন, তখন তিনি আদৌ অর্দ্ধেন্দু থাকিতেন না; যদি তাঁহাদের বোধ থাকিত যে, ঠিক তন্ময় হইলে অভিনয় হয় না, তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। মদ খাইয়া মাতাল মাতলামোতে তন্ময় হয়। কিন্তু সে মাতাল মাতালেরও অভিনয় করিতে পারে না— নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন— এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে, তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কিনা— নাটকের কথা ভুল হইতেছে কিনা— প্রতিযোগী অভিনেতা (co-actor) ঠিক চলিতেছে কিনা— যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কিনা— রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কিনা?— এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশে অভিনয় চলে, সে অংশের তন্ময়ত্ব প্রয়োজন, মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, তন্ময় অংশই অধিক। কিন্তু হাস্যরসের অভিনয়ে কখনও কখনও সাক্ষী-অংশ বেশি হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই অংশ বেশি থাকিত।

৪. অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুর তিন দিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহাতে বলিয়াছিলাম— "অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই— অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন...দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দুর কি ভূমিকা তাহা নয়...অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে (সেইরূপ) আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকবর্ণিত চরিত্রের ঠিক উপলব্ধি হয়...*বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর* নামক পুস্তিকা (৭-১০ পৃষ্ঠা)।

একটি প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতেছি। অর্দ্ধেন্দুর পক্ষপাতী জনৈক অভিনেতার মুখে শুনিয়াছি— কোনো এক ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু 'হরে চাকর'কে ডাকিলে জনৈক দর্শক উত্তর দিলে— "আজ্ঞে যাই"; অর্দ্ধেন্দু তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলিলেন— "ও গুওটা, তুমি ওখানে বসে আছ"— এ উত্তর অর্দ্ধেন্দুর মনের সাক্ষী অংশ দিয়াছিল— তন্ময় অংশ নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধেন্দুর প্রত্যেক অভিনয় হইতেই দেওয়া যায়। অন্য অভিনেতার পক্ষে এরূপ রহস্যকরণ দোষের হইত, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর এরূপ অসাধারণ অর্দ্ধেন্দুত্ব অনেক সময়েই দোষের না হইয়া গুণের হইত—কারণ অর্ধেন্দুকে লোক অর্দ্ধেন্দু দেখিতে ভালোবাসিত। অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি এখানে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহা যদি আমার অপর পক্ষ না বুঝেন, তবে তাঁহাবা অভিনয় বিষয়ে কিছু পাঠ করিবেন— অন্তত *Recent Actors* নামক পুস্তকে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা প্রশংসা— প্রচ্ছন্ন নিন্দা নয়।

অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচকের মুখে আর একটি নূতন কথা শুনিলাম— তাহা এত বৎসর অর্দ্ধেন্দুর সহিত বেড়াইয়া জানিতে পারি নাই। তিনি কাহাকে নাকি বুঝাইয়াছিলেন যে, অভিনয়কালে স্বরেব হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে বাংলায় কবিতা পাঠ তো সুন্দর হয়ই, গদ্য পাঠও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে সুন্দর হইয়া থাকে। কখনও গুরুগম্ভীর ভূমিকায় 'দীন' অর্থে দরিদ্র, দিবা নয়, ইহা বুঝাইবার জন্য দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকেও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কথা কহিতে প্রায় দেখা যায় না। বরঞ্চ কোনো আঘাত লাগিলে বৈপরীত্যই দেখা যায়। 'দীনহীন' শব্দটি তখন দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় না— 'দিনহিন' এইরূপ হ্রস্বই উচ্চারিত হইয়া থাকে। অভিনয় স্বভাবের ছবি— এইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণে অভিনয়— বিসদৃশ হইবে। বলেন্দ্রসিংহ ভীমসিংহের ভাই হইলেও তাঁহার মুখে "এইবারে দূত মহাশয়" এরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বজায় রাখা চলিবে না। রানির কথাতেও চলিবে না, কৃষ্ণকুমারীর কথাতেও চলিবে না। *কৃষ্ণকুমারী* নাটক সাধুভাষায় লিখিত, তাহাতেও ওরূপ উচ্চারণ চলে না, চলিত ভাষায় যাহা লিখিত, তাহাতে তো চলিবেই না— আর কবিতায়—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুবলী বে বাধিকাবমণ।"

এই সুললিত ছন্দ, 'নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী' ইত্যাদি রূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কেমন সুন্দর হইবে, তাহা পাঠক একবার পড়িয়া দেখুন।

সংস্কৃত রচনায়— হ্রস্ব-দীর্ঘ যাহার জীবন— তাহাতেও পাঠ সুললিত করিবার জন্য কখনও কখনও হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্জ্জন করিতে হয়, যথা ছন্দোগ্রন্থ "পিঙ্গলসূত্রে" উদাহৃত "তং প্রণমামি বালগোপালম্" এই স্থলে 'গোপালের' 'গো' দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। উক্ত গ্রন্থে ইহার বিশেষ সূত্র আছে। সংস্কৃত নাটকের যে সকল ভূমিকা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত তাহা অভিনয়কালে কখনও কখনও হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্জন করিয়া অভিনয় করিতে হয়। বাংলা নাটকে অবশ্য ক্বচিৎ কোনো ভূমিকায় স্থল বিশেষে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা— ভীমসিংহের ক্ষিপ্তাবস্থায় আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া— "রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও

নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডারূপে গর্জন কচ্চেন!" ইত্যাদি স্থলের অভিনয়কালে। কিন্তু তাই বলিয়া যত্রতত্র বর্ণে বর্ণে হ্রস্ব-দীর্ঘ লক্ষ্য করিলে চলে না।

উক্ত সমালোচক মহাশয় আমার অভিনয়-শিক্ষার পদ্ধতির জন্য আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া কয়েকজন অভিনেত্রীর অভিনয়ের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। তৎসঙ্গে প্রতিভাশালী স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের উপরও তীব্র কটাক্ষ আছে; কিন্তু বর্তমান রঙ্গালয়ে অমৃতলালের পদতলে বসিয়া শিক্ষা লাভের যোগ্য ব্যক্তি কয়জন আছেন, তাহা আমি জানি না। আর একটি কথা চলিয়া আসিতেছে যে, অর্দ্ধেন্দু ও আমার শিক্ষাপ্রণালী পৃথক্। উক্ত সমালোচকের মতে আমার শিক্ষার সুর অস্বাভাবিক। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সুরবর্জ্জিত— স্বাভাবিক। সমালোচক মহাশয় যদি বুঝিতেন যে, স্বভাব আমাদের কথা কহিবার জন্য ছন্দ দিয়াছেন ও ভাব প্রকাশের জন্য সুর দিয়াছেন,— সমস্ত কথাই ছন্দে সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয়, এবং ছন্দ ও সুর কলাবিদ্যাবলে সুন্দররূপে পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের সুর হয়, অর নট ভাব প্রকাশক সুরেই অভিনয় করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ের আলোচনায় বৃথা কাগজ-কালি ব্যয় করিতেন না এবং কণ্ঠস্বরও নষ্ট করিয়া বেড়াইতেন না। বোধ হয় সমালোচক মহাশয়ের ধারণা— গদ্যে যাহা রচিত হয়, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে— গদ্য স্বাভাবিক নয়। ছন্দোবন্ধে আমরা কথা কহি— সুতরাং ছন্দোবন্ধই স্বাভাবিক। সুরে আমরা ভাব প্রকাশ করি, অতএব সুরই স্বাভাবিক। তবে সুর বেশি মাত্রা করিলে তাহা ঢং হয়, আর অর্দ্ধেন্দুর অশিক্ষিত অনুকরণকে ভাঁড়ামো বলে। নাটক শিক্ষার প্রণালী দুই প্রকার হয় না। কোনো এক নাটক দুইজন নট দুই ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, দুই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ দুই নট সেই নাটক একভাবে গ্রহণ করেন, তবে ব্যাখ্যা একরূপই হইবে, তাহাতে দুই প্রণালী হইতে পারে না। ব্যাখ্যার ভুল হইতে পারে— কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ যিনি যেরূপে নাটকের ভাব কল্পনা করিয়াছেন— তদনুসারে। কিন্তু ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যকে শিক্ষার প্রণালী বলে না। আমরা যে ছন্দে কথা কহি ও সুরে ভাব প্রকাশ করি, ইহা ভাবিয়া বুঝিতে হয়। যদি কেহ তাহা না বুঝিতে পারেন, তবে তাঁহার নিমিত্ত আমাকে কি দায়ী হইতে হইবে? কলাবিদ্যা ভাবুকের, সকলের নয়।

নটের আর একটি বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। রঙ্গালয়ের চিত্রকর যে সকল দৃশ্যপট চিত্রিত করেন, নিকটে তাহা ঠিক বোঝা যায় না; অনেক সময় 'পোঁচড়া' টানা মনে হয়, কিন্তু দর্শক দূর হইতে চিত্রকরের কৌশল বুঝেন ও প্রশংসা করেন। দূর হইতে দেখিবার জন্য সেগুলি চিত্রিত হইয়াছে। নট মুখে রং মাখেন, কিন্তু দৃশ্যপটের ন্যায় নিকটে তাহা কদর্য দেখায়। যখন মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম *ম্যাকবেথ* অভিনয় হয়, তখন সুযোগ্য বেশকারী পিম্‌সাহেব আসিয়া রং মাখান, নিকটে তাহা অতি কদর্য বোধ হইত, কিন্তু দূর হইতে অন্যরূপ দেখাইত— কৃষ্ণবর্ণ নটকেও গৌরবর্ণ মনে হইত— অস্বাভাবিক বোধ হইত না। বর্ণ সমাবেশের ন্যায় অভিনয় সম্বন্ধেও দূরে উক্তি ও নিকটে উক্তিতে প্রভেদ আছে। কথা দূরে শুনাইবার জন্য কৌশলের প্রয়োজন আছে। সে কৌশল মহলা

দিবার সময়ে কঠোর বোধ হয়। যিনি এই কৌশল জানেন না তিনি শিখাইবার সময় অভিনয় স্বাভাবিক করিবার জন্য যাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন, তাহাতে অভিনয় হয় না। যেমন সরু কাজ রঙ্গালয়ের দৃশ্যে চলে না, সেইরূপ রঙ্গমঞ্চের মন্ত্রণা দৃশ্যে মন্ত্রণা পরামর্শাদি স্বভাবত চুপি চুপি করা হইলেও নটের পরামর্শ চুপি চুপি করিলে চলিবে না। যাহাতে দূরস্থ দর্শক শুনিতে পায়, এরূপ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিতে হইবে— rehearsal -এ তাহা শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইবেই। প্রেমিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সখীকে মনোবেদনা জানাইতেছে— অভিনেত্রী তাহা দর্শককে শুনাইবে— দীর্ঘশ্বাস যে পড়িয়াছে, তাহা অন্তত নিকটস্থ দর্শক শুনিবে, আর দীর্ঘশ্বাসজনিত মাংসপেশী সঞ্চালন তো প্রত্যেক দর্শক দেখিবেই। নট-নটীর এইরূপ অভ্যাসের সময় নিকটে থাকিলে তাহাদের কার্য অস্বাভাবিক বোধ হইবে কিন্তু দর্শকশ্রেণীর মধ্যে বসিয়া দেখিলে ওরূপ বোধ হয় না। যিনি অভিনয় শিক্ষা দিবেন, শিক্ষার্থীকে তাঁহার ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষার সময় অনেক কৌশলই নিকট হইতে অস্বাভাবিক মনে হইবে কিন্তু ঐ সকল কৌশলই রঙ্গালয়ের উপযোগী। বৈঠকখানার অভিনয় ও রঙ্গালয়ের অভিনয়ে অনেক পার্থক্য। স্বভাব— স্বভাব— স্বভাব বলিয়া যে সমালোচক চিৎকার করেন, তিনি Shakespeare-এর স্বগত উক্তিগুলিকে (soliloquies) কিরূপ স্বাভাবিক মনে করেন? কেহ তো কাহাকেও শুনাইয়া মনের কথা বলে না। আবার শুনাইয়া না বলিলেও হ্যামলেটের "To be, or not to be— that is the question" ইত্যাদির ন্যায় উচ্চ অংশসকল Shakespeare-এর অভিনয় হইতে বাদ পড়িবে। রঙ্গালয়ের অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, যিনি বিচার করিতে চান, তাঁহার শিক্ষিত-দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত, নচেৎ কাগজ কলম পাইয়াই অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

নটের আর একটি লক্ষ্যের বিষয় আছে। যাহার সহিত তিনি অভিনয় করিতেছেন, তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া কর্তব্য। কোনোরূপে তাহাকে বাধা প্রদান করিলে নাটকের যে কত ক্ষতি হয়, তাহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। *রাণাপ্রতাপ* নাটকে পৃথ্বীরাজের ভূমিকা হাস্যরসাত্মক ও যোশীবাই এর ভূমিকা গুরুগম্ভীব। একবার এই নাটকের অভিনয়ে পৃথ্বীরাজের ভূমিকায় নট হাস্যরস প্রবল করিবার চেষ্টা করায়, যোশীবাই-এর অভিনয়ে বিশেষ বাধা ঘটিয়াছিল। এই প্রকার বাধা প্রদানে নট যে কেবল নাটক নষ্ট করেন তাহা নহে, তাঁহার হৃদয়েরও প্রশংসনীয় পরিচয় নয়। আবার সেই নট যাহাকে দাবাইয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করেন, সে যদি তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট অভিনেতা হয়, তবে রঙ্গালয়ে তাঁহার এ দোষ অমার্জনীয়। নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যাহাতে বিকাশ পায়, তাহার প্রতি যত্নবান্ হওয়া নটের একটি প্রধান কর্তব্য।

অভিনয়ের প্রতি নটের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা আবশ্যক। অর্দ্ধেন্দুর এই অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, রঙ্গালয়ে অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার তর্কবিতর্কে এমনই মগ্ন হইতেন যে, আহারাদির কথা এক প্রকার ভুলিয়াই যাইতেন। সেস্থলে উপস্থিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কাহারও পালাইবার উপায় থাকিত না। অর্দ্ধেন্দু তাহাদের সকলকে আটক করিয়া অভিনয় বিষয়ক তর্কবিতর্ক শুনাইতেন। অভিনয়

সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুর এই আদর্শ অনুরাগ আলোচনা করিয়া অনুরাগ শিখিতে হয়— তাঁহার অভ্যাস দেখিয়া নটের কার্য অভ্যাস করিতে হয়। দেহের উপর আধিপত্য থাকা যে নটের প্রয়োজন, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। *দুর্গেশনন্দিনী*-র অভিনয়ে যে অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুর 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' দেখিয়াছেন, তাঁহার স্মরণ হইবে যে, আহারান্তে জলপান কালে 'বিদ্যাদিগ্‌গজে'র গলার নলী এরূপভাবে সঞ্চারিত হইতেছে যেন "গজপতি" সত্যই জলপান করিতেছেন। অভিনেতা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এ সামান্য কার্যও কিরূপ অভ্যাস-সাপেক্ষ। বস্তুত অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাট্যজীবন নটের আদর্শ।

অভিনয় সম্বন্ধে এত বলিবার কথা আছে, অভিনয়প্রিয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং বিষয়টি সুধীগণের এতই আলোচনার যোগ্য যে, তৎসম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এই এক প্রবন্ধে কিছুই বর্ণিত হয় নাই বলিলেও চলে। এক প্রবন্ধে এই বিশাল বিষয়ের সকল কথা বিবৃত করা অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাধ্য। কারণ রঙ্গভূমি পৃথিবীর ক্ষুদ্র অনুরূপ— সমস্ত পৃথিবী একটি রঙ্গালয় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন যে— তিনি অভিনয়ে যোগদান করিতেন এবং নটের কার্য যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে সকলের নিকট সম্মানের নয়, তথাপি কালে অভিনয় কার্যের গরিমা প্রকাশ পাইবে এবং সর্বসাধারণে নটের আদর করিবে। সভাপতি মহাশয়ের একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে আদরলাভের পথ-পরিষ্কার বর্তমান নটমণ্ডলী— আমাদিগকেই করিতে হইবে। অভিনয় কার্যের কেন, কোনো কার্যেরই আদর প্রথমে হয় না। এই ইংরাজি চিকিৎসা, যাহার ইদানীং এত পূজা, আমরা বালককালে শুনিয়াছি; তাহা "মানুষ খুন" করা নামে অভিহিত হইত। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে নটের আদর নাই তাহার কারণ— সাধারণ যাত্রা পাঁচালিতে ভাঁড়ামো ও কুৎসিত রুচি দেখিয়া অনেকে মনে করেন, সাধারণ অভিনয়ও ঐ শ্রেণীর। কিন্তু যদি আমরা রঙ্গালয় হইতে বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারাই হইতেছে— কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক সুর সৃষ্টি করিতেছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গস্থল সুসজ্জিত করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তব-ভ্রম উৎপাদন করিতেছেন— যদি আমরা দেখাইতে পারি, রঙ্গালয় হইতে সর্বপ্রকার কলাবিদ্যার উন্নতি হইতেছে যদি আমরা বুঝাইতে পারি যে, অভিনয়বিদ্যাও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয়স্থল— তবে নট সুধীজনসমাজে তাঁহার যোগ্য মর্যাদা— তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার— তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিবেন।

অভিনেতার ধ্যান

আমরা "বহুরূপী" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, যে ভূমিকা যাহার আকারের উপযোগী, সেই ভূমিকাই তাহার গ্রহণ করা কর্তব্য। যথা, লম্বোদর, স্থূল, কুৎসিত, উচ্চদন্ত ব্যক্তি হাস্যরসের ভূমিকায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে কিন্তু গভীর রসের ভূমিকায়

(serious part) সাফল্য লাভ তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলাও অত্যুক্তি নহে। সে ব্যক্তি ভূমিকার ভার গ্রহণে অদ্বিতীয় হইতে পারে, হয়তো কাহাকেও শিক্ষা প্রদানে সক্ষম, যে শিক্ষা-বলে ছাত্র অত্যুৎকর্ষ লাভ করিবে, তথাপি স্বয়ং তাহার সে ভূমিকা গ্রহণ করা চলিবে না। দৈহিক অন্তরায় কলাবিদ্যায় দূর হইবে না। কিন্তু এমন ভূমিকাও অনেক আছে, যাহা সচরাচর দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর উপযোগী নহে,— কিন্তু সেই ভূমিকা সাধারণ-চক্ষে তাহার অনুপযোগিতা বোধ হইলেও বিশেষ ক্ষমতাশালী অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাহা তাঁহার উপযুক্ত করিয়া লইতে পারেন। একটি সাধারণ ভ্রম আছে— যেন মাধুর্য দুর্বলতার চিহ্ন, সুঠামগঠন শ্রমশীল কার্যে অক্ষম, এই ভ্রমবশতই অনেক সময়ে আমরা বলিয়া থাকি যে, এ ভূমিকা এ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে; কিন্তু অভিনয়-কলাবিদ্যায় সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি দেখিতে পান যে, সাধারণ-চক্ষে যাহার কোনো ভূমিকা গ্রহণে অন্তরায় জ্ঞান হইতেছে, তাহা অন্তরায় না হইয়া অনেক সময়ে সেই অংশের নূতন বিকাশ প্রদান করে। অভিনয় ও নাটকের কথা হইলেই প্রথমে সেক্সপিয়রের নাম উঠে। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা সেক্সপিয়রের চরিত্র হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস-এর পোর্সিয়ার চরিত্র তিন অবস্থায় তিন রূপ। প্রথম যখন ব্যাসানিও সিন্দুক খুলিয়া তাহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবে যে, সে পোর্সিয়াকে পাইবে কি না, সে সময়ে প্রেমিকা সরলা— যাহার প্রতি হৃদয় আকর্ষিত, সে তাহার হইবে কি না— এই ভয়ে অভিভূতা ব্যাকুলবিহ্বলা যুবতী। কিন্তু যথায় আন্টানিওর পরীক্ষা হইতেছে, তথায় আইনজ্ঞ পোর্সিয়ার আর সে ভাব নাই। গম্ভীর মুখকান্তি তীব্রদৃষ্টি হাবভাবে লোকের উপর আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম, যাহার বুদ্ধিশক্তি বলে "সাইলকের" কুটিলতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র বিফল হইল— এ আর এক ভাবের পোর্সিয়া। আবার যখন স্বামীর নিকট যে অঙ্গুরি উকিলবেশে ছলপূর্বক লইয়াছেন, সেই অঙ্গুরি লইয়া স্বামীর সহিত রসপ্রসঙ্গকারিণী পোর্সিয়া— পোর্সিয়ার অপর ছবি। এক্ষণে কিরূপ গঠনের অভিনেত্রীর পোর্সিয়ার ভূমিকা হওয়া উচিত, তাহা হয়তো বিভিন্নরূপে স্থিরীকৃত হইবে। কেহ প্রেমিকা পোর্সিয়ার ভাবে বিভোর হইয়া মাধুর্যসম্পন্না কৃশাঙ্গী কৃশোদরী পোর্সিয়া স্থির করিবেন। কেহ বা "আদালত-দৃশ্যে" বিমুগ্ধ হইয়া দীর্ঘাকার পুরুষোপযোগী অবয়বসম্পন্না পোর্সিয়া মনোনীত করিবেন এবং কেহ বা রসিকা, নাতিদীর্ঘ-নাতিক্ষুদ্রদেহী স্বামী-মনোহারিণী চতুরা পোর্সিয়ার ছবি হওয়া উচিত স্থির করিবেন। কিন্তু কলাবিদ্যাবিদ্ অভিনেত্রী এই ত্রিবিধ আকারের যে আকারসম্পন্নাই হউন, পোর্সিয়ার ভূমিকায় যশস্বী হইতে পারিবেন। ব্যান্ডম্যান সম্প্রদায়ের মিস বুডে (Miss Budet) যখন পোর্সিয়া সাজিয়া দর্শকের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,— "By my tooth, Nerrissa"— দর্শকের মনে হইল যে, পোর্সিয়ার অপর আকার হওয়া কোনোরূপেই উপযুক্ত নহে। কিন্তু পোর্সিয়ার ভূমিকায় এলেন টেরির বহুচিত্র আছে, তাহা দেখিবামাত্র মনে হয় যে, এলেন টেরি ব্যতীত পোর্সিয়া হওয়া আর কাহারও উচিত নহে। কিন্তু এলেন টেরি স্বয়ং বলেন যে, ঐ ভূমিকায় যিনি মিস্ মার্লোকে দেখিয়াছেন তাঁহার বোধ হইবে যে, যেন সেক্সপিয়ার মিস্ মার্লোকে

চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক দৃশ্যে প্রত্যেক অবস্থায় মিস্ মার্লো যেন কবিকল্পনা-প্রসূত পোর্সিয়া। বেশ, চলন-বলন, ভাবভঙ্গি সমস্তই পোর্সিয়ার, মিস্ মার্লোর চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। মার্লোর পোর্সিয়া অভিনয় কলাবিদ্যার্থীর আদর্শ। এলেন টেরি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অথচ এলেন টেরির পোর্সিয়াও দর্শককে মুগ্ধ করিয়াছিল। মিস্ মার্লো তাঁহার চক্ষে প্রশংসাভাজন, তিনিও বহু দর্শকের চক্ষে সেইরূপ প্রশংসাভাজন হন।

উক্ত অভিনেত্রীত্রয়ের আকার যদিচ ভিন্ন, তথাপি এক ভূমিকায় তাঁহারা তিন জনেই কি প্রকারে এতাদৃশ কৃতিত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার কারণ কলাবিদ্যা-সমালোচক অনুমান করেন যে, কবির চিত্র প্রকৃতি অনুসারে কল্পিত হয় এবং সেই কল্পনা (ধ্যানই কলাবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভের একমাত্র উপায়), ধ্যান দ্বারা অভিনয়কালীন হৃদয়ে আকার সম্পন্ন হয়, তাহার হাবভাব চালচলন সমস্তই অনুভূত হয়। তাহার সহিত একরূপ কথা চলে। সেই ধ্যানগঠিত মূর্তির ছবির সহিত আপনাকে মিলাইয়া সেইরূপ সজ্জিত হইয়া— সেইরূপ হাবভাবসম্পন্ন হইয়া— রঙ্গমঞ্চে কলাবিদ্যাবিদ্ অবতরণ করেন। নাটক-চিত্রিত এক চরিত্র অপর অভিনেতা যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা যিনি রঙ্গস্থলে উপস্থিত, তাঁহার হৃদয় ছবির সহিত পার্থক্য থাকিলেও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন না; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ছবি তাঁহার পক্ষে তৃপ্তিকর। যখন তিনি নিজে অভিনয় করিয়াছেন, তখন দর্শক মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয়ের ছবির অনুরূপ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিমুগ্ধ হন না, তবে তাঁহার চিত্তের অনুরূপ না হইলে ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কিন্তু যখন সেই অভিনেতা অপর কোনো কলাবিদ্যাবিদ্ অভিনেতাকে অভিনয় করিতে দেখেন, তখন তিনি অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইবার অবসর পান।

আমরা পূর্ব প্রবন্ধে মিস্ সিডন্সের লেডি ম্যাক্‌বেথ-এর অভিনয় উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার আকার দীর্ঘ ছিল, দেখিলেই তেজস্বিনী রমণী অনুমান হইত, অনেকেরই ধারণা, সেই কারণেই লেডি ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা উচ্চাভিলাষিণী রমণীর ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এ ধারণা অতি অমূলক, কারণ *ফেটাল ম্যারেজ* নামক নাটকে তিনি প্রথম যশস্বিনী হন। সে নাটকে তাঁহার ভূমিকা প্রেমিকা নায়িকার ছিল। নায়ক তাঁহাকে বিবাহ করায় ধনী পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত, তাঁহাকে রাখিয়া যুদ্ধে গিয়াছে; নায়িকার নিকট সংবাদ আসিল— নায়ক যুদ্ধে পতিত; নিরুপায় হইয়া নায়িকা শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেল, আশ্রয় না পাইয়া নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন; তখন তাহার প্রেমাসক্ত অপর ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুমি কি করিবে?" নায়িকা উত্তর করিলেন,— "Do— do nothing!" অর্থাৎ কি করিব— কিছুই নয়। এই একটি ছত্র এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, যাহাতে সমস্ত দর্শক মুগ্ধ এবং মিস্ সিডন্সের যশও দৃঢ়মূল হইল।

আমরা তাঁহার লেডি ম্যাক্‌বেথ-এর কথা বলিতেছিলাম; এই ভূমিকায় তাঁহার নাম আজও অতি উজ্জ্বল। তিনি একভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি একটি মন্তব্য (note) রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সারা বার্নহার্ট পান; এবং সেই মন্তব্য অনুসারে 'সারা' অভিনয় করিয়াছিল। পূর্বপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, সারা বার্নহার্টের

লেডি ম্যাক্‌বেথ প্রেমিকারমণী, স্বামী সোহাগিনী, স্বামীর সাহায্যকারিণী। মিস্ সিডন্‌সের অভিনয়ের এক ভাব ছিল, এই স্বতন্ত্র অভিনয় দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত । এখন তর্কের বিষয়, সারা বা সিডন্‌স্ কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট? এস্থলে বিচার্য যে, সিডন্‌স্ অন্যমত অভিমত লিখিয়া গিয়া কেন ভিন্নরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন?— তাহা মীমাংসা করিব— আমরা এরূপ স্পর্ধা করি না; কিন্তু আমাদের ধারণা— যখন ভোজের অন্তে ম্যাক্‌বেথ ও লেডি ম্যাক্‌বেথের কথাবার্তা হইতেছে, যেরূপ স্নেহপূর্ণ ভাবে লেডি ম্যাক্‌বেথ, ম্যাক্‌বেথের সহিত কথা কহিতেছে তাহাতে প্রেমিকা লেডি ম্যাক্‌বেথ উজ্জ্বল হয়। কিন্তু যখন "Out— out ye damn'd spot" বলিয়া হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে পাপ-তাড়নায় নিদ্রিত অবস্থায় লেডি ম্যাক্‌বেথ দর্শকের সম্মুখীন হন, তখন পাপীয়সী লেডি ম্যাক্‌বেথের ছবি সম্পূর্ণ সার্থকতা করে। যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রকাশ যে, এক চরিত্রের কল্পনা এতদূর ভিন্ন হইতে পারে,— ধ্যানের কার্য ধ্যানের দ্বারাই সফলতা লাভ করে।

অহংকার অভিনেতার ধ্যানের প্রধান অন্তরায়। সারা বার্নহার্ট তাঁহার আত্মজীবনীতে তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিনয় শিক্ষা হইত, শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর রঙ্গালয় নিযুক্ত করিত। অভিনয়ের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার দিন উপস্থিত। সারা ও তাঁহার সহযোগিনী অপর বালিকা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কোনো এক ভূমিকায় সারা ভাবিয়াছিলেন যে, সে ভূমিকায় তিনি সর্বপ্রথমা হইবেন এবং পদক পাইবেন। এ সম্বন্ধে এতদূর নিশ্চয় হইয়াছিলেন যে, তিনি সর্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন, পদক লইতে তাঁহাকে নিশ্চয় ডাকিবে। কিন্তু ডাক হইল— তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর। সারা মর্মাহত হইলেন। মনে হইল— পরীক্ষকগণ পক্ষপাতী। গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় তাঁহার ত্রুটি। এইতো যেরূপে যে পংক্তি উচ্চারণ করা উচিত, তাহা তিনি করিয়াছেন— হস্ত সঞ্চালন, মুখভঙ্গি দর্পণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোনো দোষ নাই। যেরূপভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে, তবে কিরূপে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ইলাইজা তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন? চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হঠাৎ উদয় হইল যে, তিনি ঠিক বলেন, হস্তপদ সঞ্চালন করেন,— কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভাবহীন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর আবৃত্তি ভাবপূর্ণ। ভাবের দ্বারাই শ্রেষ্ঠতালাভ হয়। তিনি কিছুদিন পরে পরীক্ষকগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার উক্ত ভূমিকা আর একবার পরীক্ষিত হয়। তিনি পুরস্কারপ্রার্থিনী নন, তবে কতদূর শিখিয়াছেন, তাহা তিনি পরীক্ষা করিতে চান। পরীক্ষকেরা স্বীকার করিলেন। সারা আবৃত্তি করিলেন। পরীক্ষকগণ চমৎকৃত! সেই দিনই তিনি রঙ্গালয়ের কার্যে অভিনেত্রীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বেশভূষা সম্বন্ধে সারা বলেন যে, যোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে তাহার ইচ্ছানুরূপ বেশভূষা করিতে দেওয়া রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের অতি কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ বলেন, তাঁহার শিক্ষার সময় কোনো এক হাস্যোদ্দীপক ভূমিকা অভিনীত হইবে। পরীক্ষক মাত্রেরই ধারণা ছিল যে, এ ভূমিকায় কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে পারিবে না। সারার অভিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে নিশ্চয়। গৃহ হইতে সারা বেশভূষা করিয়া আসিবেন। তাঁহার মাতা অতি ব্যস্ত, সারা দীর্ঘকেশী ছিলেন। তাঁহার কেশবিন্যাস

কিরূপ হইবে, পূর্বরাত্রি হইতে আন্দোলন হইতেছে। সারার মাতাও দীর্ঘকেশী ছিলেন; কোনো এক ব্যক্তি তাঁহার কেশবিন্যাস করিয়া দিত। তাহাকেই ডাকা হইল। বিন্যাসকারী আসিয়া গম্ভীরভাবে সারাকে বসাইয়া একবার এদিকে ঘাড় ফিরাইয়া লয়, একবার ওদিকে ঘাড় ফিরাইয়া লয়, একবার ঘাড় উঁচু করে, একবার খাড় নিচু করে। তাহার পর সারা বলেন পঞ্চ ঝুঁটি বাঁধিয়া দিয়া কেশবিন্যাস শেষ করিল। তাহার মাতার প্রশংসার অবধি নাই— চমৎকার হইয়াছে, কিন্তু সারা দর্পণে মুখ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সারা বলেন, আমায় এক জন্তু সাজাইয়া দিয়াছে। পরীক্ষার্থে গিয়া রোদন সংবরণ করিতে পারেন না। তথায় গিয়া অন্যরূপ কেশবিন্যাস হইল বটে, কিন্তু প্রথমে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাঁহার অভিনয় কিছুই হইল না।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজ বেশ মনোনীত করিতে দেওয়া উচিত সত্য, কিন্তু যদি অযোগ্য অভিনেতা বা অভিনেত্রী এরূপ প্রশ্রয় পায়, তাহা অতি দোষের হইয়া উঠে। রক্ষক বা দাসী সাজিয়াছে— অযোগ্য ব্যক্তি রাজরানীর পোশাক মনোনীত করিবে, তাহার ভূমিকার ধ্যান নাই, কিসে তাহাকে ভালো দেখায়— সেই চেষ্টাই তাহার বলবতী হইবে। যোগ্য অধ্যক্ষই বুঝিতে পারিবেন, কাহাকে নিজের পরিচ্ছদ মনোনীত করিতে দেওয়া উচিত, এবং কাহার আকাঙ্ক্ষা দমন করা কর্তব্য। কিন্তু যে অধ্যক্ষ রঙ্গালয়ের উন্নতি করিতে চান, তাঁহার প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য যে, কোন্ পরিচ্ছদ তাহার ভূমিকার উপযুক্ত, সে বিবেচনা করে। পরিচ্ছদ নির্ণয় করিতে গিয়া অভিনেতার কতকটা ধ্যানের কার্য হইবে, অসঙ্গত ইচ্ছা দমিত হইবে। কেবল নিপুণ কলাবিদ্যাবিদ্ ব্যক্তিই আপন পরিচ্ছদ নির্বাচিত করিতে পারে— অশিক্ষিত ব্যক্তির তাহা বিড়ম্বনা।*

এই প্রবন্ধ *অর্চনা* মাসিক পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ, আষাঢ় ও ভাদ্র, ১৩১৬ সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়। শেষাংশ (অভিনেতার ধ্যান) *নাট্য মন্দির* মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল) প্রথম বাহির হয়।

ফুলের ভাষা

চন্দ্রনাথ বসু

১

আকাশে নক্ষত্র ফোটে; পৃথিবীতে ফুল ফোটে। নক্ষত্র অন্ধকারের ভিতর দিয়া ফুল দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস বলিয়া আমি ফুটি; ফুল অন্ধকারের ভিতর দিয়া নক্ষত্র দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস বলিয়া আমি ফুটি। আকাশ বিশ্বের আধখানা; পৃথিবী বিশ্বের আর আধখানা। তাই বলি যখন আকাশে নক্ষত্র ফোটে আর পৃথিবীতে ফুল ফোটে, তখন আর আধাআধি ভাব থাকে না। তখন বিশ্বের উপরার্ধ এবং বিশ্বের নিম্নার্ধ মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফুলের ডোরে উপর-নীচে বাঁধা।

আবার ফুলের ডোরে নীচে সব বাঁধা। এখানেও ফুল আর নক্ষত্র একই বস্তু, কেন না নক্ষত্রের কিরণ ডোরেও নীচে সব বাঁধা। একটু ভাবিয়া দেখ। মনুষ্যের ইতিহাসের যুগযুগান্তরের পিছনে গিয়া দাঁড়াও। ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ভুলিয়া যাও; গ্রীস রোম পারস্য ভুলিয়া যাও; তাজমহল, পার্থিনন, ভুবনেশ্বর, কোনারক ভুলিয়া যাও। সব ভুলিয়া সভ্যতাবিহীন, শাস্ত্রবিহীন, ইতিহাসবিহীন, অন্নবস্ত্রবিহীন কালুদীয় মেষপালকদিগের মধ্যে গিয়া দেখ তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে ভেড়া চরাইতেছে, রাত্রে নক্ষত্র ভাবিতেছে। অথবা গো-মহিষ সম্বল ভারতীয় আদিম আর্যগণের মধ্যে গিয়া দেখ, তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে গো-ধন বাড়াইবার জন্য কত গব্য-কাষ্ঠ জ্বালাইতেছে, রাত্রে আকাশে সপ্তর্ষি দেখিয়া সাধের গো-ধন পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে। তারপর সেই আদিমকাল হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হও। হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষের এক চক্ষু পৃথিবীর জিনিসে আর এক চক্ষু আকাশের নক্ষত্রে। নক্ষত্র মনুষ্যের চিরন্তন চিন্তা, আবহমান আকাঙ্ক্ষা, গূঢ়নিহিত কৌতূহল। আবার পিছাইয়া যাও— সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা, বস্ত্র, অলংকার, গৃহ অট্টালিকা, অর্ণবযান, বাষ্পীয়যান প্রভৃতি সমস্ত বাহ্য সম্পদ এবং সভ্যতাসূচক বস্তু ভুলিয়া, আদিম মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া আদিম মনুষ্যকে দেখ। দেখিবে তোমার যাহা আছে তাহার সে সব কিছুই নাই। কেবল তোমার যে ফুলটি আছে তাহারও সেই ফুলটি আছে। তারপর ক্রমে অগ্রসর হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর জেলার মধ্যে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষ সব পরিবর্তন করিতেছে, কিন্তু যে ফুল প্রথমে তুলিয়া পরিয়াছে এখনও সেইফুল তুলিয়া পরিতেছে। ফুল মানুষের চিরন্তন সাধ, আবহমান অনুরাগ, গূঢ়নিহিত ভাব। তাই বলি যে

আকাশের নীচে ফুলের ডোরে আর নক্ষত্রের কিরণ-ডোরে সব বাঁধা। সেই জন্যই বুঝি ঐ দুইটি ডোর মিশিয়া স্বর্গ-মর্ত্য বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ফুল! তুমি কি কঠিন। তোমার কল্পনাতীত কমনীয় কান্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা। তবে বুঝি বাঁধিতে হইলে কমনীয়তা দ্বারা বাঁধিতে হয়?

ফুল, তুমি মানব-গুরু। মানুষে মানুষ আছে আর পশু আছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্বটুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভূত হওয়া অবধি আজ পর্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কত ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে, কত দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, কত স্কুল, কলেজ, টোল করিয়াছে, কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কার্য— ফুল তোলা। যে দিন আদিম মনুষ্য আদিম পশুর ন্যায়, ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া পশুবধকরত মধ্যাহ্নে বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া সহচর সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় নিদ্রার দ্বারা ক্লান্ত দেহের শান্তি সম্পাদন করিয়া অপরাহ্নে অস্তাচলগামী সূর্যের মৃদুমধুর সুবর্ণজ্যোতি দেখিয়া, কি জানি কেন, বিলম্বিত লতা হইতে একটি সুবর্ণজ্যোতি পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল সেই দিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেইদিন জানা গেল যে, মহারণ্যনিবাসী সহচর সিংহ ব্যাঘ্র অনন্তকাল মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিম সহচর মনুষ্য মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহা সম্পদ সৃষ্টি করিবে। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহ ব্যাঘ্রে কেবল পৃথিবী আছে, কিন্তু মনুষ্যে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই আছে। সেইদিনই জানা গেল যে সহচর সিংহব্যাঘ্র চিরকাল নতশিরে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কিন্তু মনুষ্য অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া বিশ্বের ঊর্ধ্বতম প্রদেশে উঠিবে। সেইদিন মনুষ্যের অনন্ত শিক্ষার, অনন্ত উন্নতির সূত্রপাত হইল। সে শিক্ষা, সে উন্নতির মূলে— ক্ষুদ্র, কোমল কমনীয়, ফুল। কেনা না ঊর্ধ্বতম স্বর্গ, অনন্ত নক্ষত্ররূপী ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর আর কিছুর সহিত বাঁধা নাই, কেবল ফুল-ডোরে বাঁধা। অতএব যদি স্বর্গাভিমুখী হইতে হয়, যদি অনন্ত উন্নতির পথে চলিতে হয়, তবে আদি গুরু ফুল ভুলিও না। আদি ছাড়া অন্ত নাই। ফুলের কোমলতা, ফুলের কমনীয়তা ফুলের গগনস্পর্দ্ধী নির্মলতা হারাইলে উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে, স্বর্গযাত্রা অকালে বন্ধ হইবে। অতএব ভাই সকল, আমাদের মহারণ্যবাসী আদিপুরুষ যেমন মাথায় ফুল রাখিতেন, তেমনি করিয়া মাথায় ফুল রাখিয়া অগ্রসর হও।

ফুল, তুমি জগতের গূঢ় রহস্য।

[illegible] এই ফোটে। মরুভূমিতেও ফোটে, উদ্যানপ্রদেশেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তর সীমার তুষাররাশির মধ্যেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তপ্ত কটিদেশেও ফোটে, মনুষ্যের বাসস্থানেও ফোটে, মনুষ্যের অগম্য প্রদেশেও ফোটে। ফুল সর্বব্যাপী।

আমিও এখানে, ওখানে কি আছে জানি না। তুমি ওখানে, এখানে কি আছে জান না। ভারতে ইংলন্ড নাই, ইংলন্ডে ভারত নাই। ফ্রান্সে আমেরিকা নাই, আমেরিকায় ফ্রান্স নাই। এ স্থান মৃত্তিকাময়, এখানে সমুদ্র নাই। ও স্থান অগাধ সমুদ্র, ওখানে মৃত্তিকা নাই। তুমি সব জান না, আমি সব জানি না, ভারত ইংলন্ড জানে না, ইংলন্ড ভারত জানে না, মৃত্তিকা সমুদ্র জানে না, সমুদ্র মৃত্তিকা জানে না। ফুল সর্বত্র ফোটে। ফুল সব জানে। ফুল সর্বজ্ঞ।

ভারতবর্ষ, পারস্যদেশ, আরবদেশ, আফ্রিকা মহাদেশ— এই সকল স্থান প্রখর রবির প্রখর রঙ্গভূমি। এই সকল স্থানে প্রখর রবিকিরণে সকলই জ্বলিয়া যায়, পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, জল শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যায়, জলাধার নদীগর্ভ ফাটিয়া বিকটাকার ধারণ করে। কিন্তু এ সকল স্থানে ফুল ফোটে। আবার লাপ্‌ল্যান্ড, গ্রীনল্যান্ড, নোভাজেমলা প্রভৃতি স্থানে হিমের পরিমাণ নাই। উপরে হিম, নীচে হিম, চতুষ্পার্শ্বে হিম— যেন হিমাংশুর হিমঋতুর হিমশয্যা— হিমদেহ, হিমপ্রাণ, হিম-আত্মা। সে হিমে কিছুই হয় না, কিছুই বাঁচে না, মানুষ জমাট হইয়া যায়, জল জমাট হইয়া যায়, জগৎ জমাট হইয়া যায়। কিন্তু সে হিমে ফুল ফোটে। ফুল সর্বশক্তিমান। ফুলের কোমলতা শক্তির প্রাণ।

সুগন্ধিনিশ্বাস বিবৃদ্ধ তৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফ্‌ম।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টি— লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী॥

এখন বুঝিতেছি ফুল সর্বত্রই ফোটে কেন। একজন কবি-নাম-খ্যাত ইংরেজ বলিয়াছেন—

Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air.

মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়া অপচয় হয় মাত্র। মিথ্যা কথা। অসার কথা। অগভীর আত্মার কথা। প্রশস্ত মরুভূমি— জীবশূন্য, তৃণশূন্য, বারিশূন্য— জ্বালাময়, অগ্নিময়— প্রকৃতির রুদ্র, বিকট, ভয়ংকর মূর্তি। যেমন করিয়া দেখ, সে মূর্তি হইতে কেবল অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে; রুদ্রভাব ফাটিয়া বাহির হইতেছে; কঠোরতা, কঠিনতা, নিষ্ঠুরতা প্রশ্বাসিত হইতেছে। কিন্তু ঐ দেখ ঐ ভয়ংকর মরুভূমিতে একটি ফুল ফুটিয়াছে— ঐ কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর, রুদ্রমূর্তিতে একটি অনির্বচনীয় কোমলতা অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রকৃতি ঐ কোমলতায় অনুপ্রাণিত। ঐ কোমলতা লইয়া প্রকৃতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রকৃতি আপনাকে সার্থক মনে করিতেছে। তুমি দেখ আর নাই দেখ, তুমি বুঝ আর নাই বুঝ, প্রকৃতি ঐ কোমলতার গুণে পূর্ণতার ভাবে ভোর হইয়া রহিয়াছে, সজীবতা অনুভব করিতেছে, আপনার প্রাণবায়ু আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছে। ফুল, তুমি মরুভূমিতে ফুটিও নহিলে, মরুভূমি প্রাণশূন্য হইবে এবং মহাশক্তি শক্তিহীন হইবে। বিশ্বনিন্দিত পৌরাণিক কবি ইহা বুঝিতেন। বুঝিয়া বিকটদশনা, ভীমনয়না, খড়্গধারিণী, অসুরঘাতিনী, রক্তাক্তকলেবরা রণরঙ্গিণীকে কোমলতম নীলোৎপলসদৃশ অপরাজিতায় সুশোভিত করিয়াছেন। মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে মরুভূমি কি পৃথিবীতে থাকিত? না মহাশক্তির প্রকৃতশক্তি বুঝা যাইত? মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে আকাশের নক্ষত্র কেমন করিয়া মরুভূমিকে পৃথিবী বলিয়া চিনিত? তুমি মরুভূমি দেখ আর নাই দেখ, কিন্তু মরুভূমিকে তো নক্ষত্রের কাছে পরিচিত হইতে হইবে। তাই মরুভূমিতে ফুল ফোটে। ফুলডোর ব্যতীত পৃথিবীকে আকাশের সহিত বাঁধা যায় না।

মহারণ্যে মহান্ধকার। কোথায় কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না— যেন কোথাও কিছু

নাই। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে একটি ফুল ফুটিল। আর্যকবি গাহিলেন—

জবাকুসুমসঙ্কাশং ক্যাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ইত্যাদি।

সেই অবধি আর্য ভক্ত মহাশক্তির পদে জবাপুষ্পে অঞ্জলি দিতেছেন।

আর্যকবিগণ বুঝিয়াছিলেন যে ফুল জগতের গূঢ়রহস্য। তাঁহাদের মতন ফুলের ভাষা আর কোথাও কেহ বুঝিতে পারে নাই। গ্রীক্ কবিগণ ফুলে যত মানসিক সৌন্দর্য দেখিতেন, তদপেক্ষা শারীরিক সৌন্দর্য দেখিতেন। তাঁহারা বেশি ফুল কোরিনথিয়ান-স্তম্ভের শিরোপরি চাপাইতেন। রণপ্রিয় রোমানেরা রাজপথে ফুলের মালা ঝুলাইয়া জয়োল্লাস প্রকাশ করিতেন। ইংলন্ডে সেকস্‌পীয়র ফুলের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনেক কথা বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কথাই পৃথিবী সম্বন্ধীয়। *Midsummer Night's Dream*-এও তদপেক্ষা বেশি নাই। কেবল ভারত ফুলে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই দেখিয়াছে। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি ফুলে পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিবার তাহা দেখিয়াছেন; পৌরাণিক কবিগণ ফুলে স্বর্গের অথবা বিশ্বরহস্যের সম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়াছেন।

ফুল জগতের গূঢ় রহস্য। ফুল জগতের প্রাণ। ফুল-ডোরে স্বর্গ এবং মর্ত্য বাঁধা। ফুল ছাড়া গতি নাই, ফুল ছাড়িলে স্বর্গের দ্বার খোলা যায় না। অতএব, ভারতসন্তানগণ, তোমাদের পূর্ব পুরুষগণের ন্যায় ফুল মাথায় করিয়া অগ্রসর হও। কিন্তু ফুলকে শুধু জগতের গূঢ় রহস্য, মহাশক্তির শক্তি, প্রকৃতির প্রাণ স্বর্গদ্বারের চাবি বলিয়া না জানিলে তোমাদের যুগ-যুগান্তরের ফুলে— মেল ভাঙিয়া যাইবে— তোমরা পৃথিবীর হাড়ি হইয়া পড়িবে।

২

সমস্ত দিন পৃথিবী দগ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর রবি নিস্তেজ হইয়া অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় জ্যোতি অল্পে অল্পে প্রখরতা হারাইয়া অনির্বচনীয় মাধুর্যে পরিণত হইয়াছে। জ্যোতির বর্ণ সুবর্ণ-নিন্দিত। সুবর্ণ-নিন্দিত জ্যোতি ঈষৎ ম্রিয়মাণ, যেন ষোড়শীর সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষে ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের ছায়া পড়িয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী হাস্যময়। সেই হাসিতে ফুলগাছে ফুলের কুঁড়ি একটি একটি করিয়া দেখা দিতেছে। স্বর্গ-মর্ত্যের হাসিতে ফুলের জন্ম। ফুলের কুঁড়ি বিশ্বের হাসির উচ্ছ্বাস— বিশ্বের হাসির সাকার মূর্তি।

অল্পে অল্পে ঐ সুবর্ণ-নিন্দিত জ্যোতি মলিন হইয়া আসিতেছে। অল্পে অল্পে ফুলের কুঁড়িগুলি ঐ মলিন আবরণে লুকাইয়া পড়িয়াছে। এখন আর সে মলিন জ্যোতিও নাই— এখন সব অন্ধকার। এখন সেই কুঁড়িগুলি কোথায় কি হইতেছে কে বলিবে? কিন্তু ঐ দেখ আকাশে একটি একটি করিয়া কত নক্ষত্র ফুটিয়া পড়িয়াছে, আর ঐ নক্ষত্রের মধ্যে চতুর্থীর চাঁদ নির্মল, শীতল, সমধুর, পবিত্র হাসি হাসিতেছে। আর নীচে পৃথিবীতে নির্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র আলোকরাশির মধ্যে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া নির্মল, শীতল, সমধুর, পবিত্র হাসি হাসিতেছে। এখন আর সে কুঁড়ি নাই। এখন সব কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইল কে বলিবে? কে বলিবে? কে বুঝিবে?

এ রহস্য ভেদ করা কাহার সাধ্য? এ রহস্য কেহ কখনও ভেদ করিতে পারে নাই। ভিক্টর হুগো বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন— "But yesterday she was a child, today she is an incomprehensible woman".

সূর্যের বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী আলোক এবং চন্দ্রের ছায়ারূপী আলোক এই দুই রকম আলোকের মধ্যবর্তী অন্ধকারের ভিতর কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হয়; সেই অন্ধকারের মধ্যে কোনো পবিত্র শক্তি গোপনে, নির্জনে, নিস্তব্ধভাবে ফুলের কুঁড়ি ফুটাইয়া দেয়। মানুষ সে শক্তি দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না। মানুষ কেবল সেই শক্তির কার্য দেখিয়া চমৎকৃত হয় আর আপনাকে চরিতার্থ মনে করে। ইহাই ফুল ফুটিবার প্রণালী। সে প্রণালী মানুষের বুদ্ধির অতীত বলিয়াই মানুষ ফুল দেখিয়া এত মুগ্ধ। পৃথিবীতে মানুষ মুগ্ধ— হৃদয়ের কার্যে এবং প্রতিভার কার্যে। ফুল, তোমাকে ফুটিতে দেখি, কিন্তু কেমন করিয়া ফোট তাহা বুঝিতে পারি না। তাই বলি তুমি বিশ্বের প্রতিভার কীর্তি। তোমার মতন রহস্য, তোমার মতন কাব্য, তোমার মতন দৃশ্য পৃথিবীতে আর আছে কি?

আবার ফুল, তুমি বিশ্বের হৃদয়ের স্ফূর্তি। সেই মধ্যাহ্ন রবির প্রখর শাসন মনে কর দেখি। তাপের পরিমাণ নাই। মাটি উত্তপ্ত হইয়া উত্তপ্ত কটাহের ন্যায় স্পর্শমাত্রে স্পর্শকারীর হস্তপদ যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় যে সকল পশু পক্ষী মাঠের উপর বিচরণ করিতেছিল তাহারা আর সেই অগ্নিবৎ ভূমিখণ্ডোপরি বিচরণ করিতে না পারিয়া কেহ বৃক্ষচ্ছায়ায় কেহ বৃক্ষশাখায় নিরাশার প্রতিমূর্তির ন্যায় মুমূর্ষুবৎ বসিয়া আছে বা শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এমন কি দুর্ধর্ষ শৃগাল কুক্কুর এবং বায়সগণ কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। নদ নদী, তড়াগ পুষ্করিণীর বারিরাশি এমনই উত্তপ্ত হইয়াছে যে, তৃষ্ণার্ত পথিক তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে তথাপি এক গণ্ডুষ জল লইয়া পান করিতে সাহস করিতেছে না এবং মৎস কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণ জলক্রীড়া আহারান্বেষণ প্রভৃতি কার্য করিতে অসমর্থ হইয়া বারিরাশির নিম্নতম প্রদেশে পঙ্কের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কোনো মতে প্রাণরক্ষা করিতেছে; মানুষ সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া রবির উত্তাপে মৃতবৎ হইয়া, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রুদ্ধশ্বাস রোগীর ন্যায় ঘরের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী ধূধূ কবিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। আর দেখিতে পারি না— আর সহিতে পারি না— আর বলিয়া জানাইতে পারি না। কাহাকেই বা জানাইব? সকলেই তো আমার মতন পুড়িয়া যাইতেছে। বিশ্বশক্তি কঠিন নিষ্ঠুর সংহার মূর্তি ধারণ করিয়াছে। যেন ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কণামাত্র দয়া নাই, কৃপা নাই, করুণা নাই। সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে করুণা নাই? সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে হৃদয় নাই? আছে বৈ কি। ঐ দেখ সেই প্রখর রবি এখন অস্তাচলে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। বিশ্বশক্তি বিশ্বের ক্লেশে কাতর হইয়া এখন বিশ্বের সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিতেছেন। ঐ দেখ অসীম বিশ্ব এখন বিশ্বশক্তির করুণার নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে, মুগ্ধান্তঃকরণে গদ্‌গদ ভাবে বিশ্বের হৃদয়ে ডুবিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে শীতল মধুর বায়ু বহিতেছে। নিঃশব্দে নিস্তব্ধভাবে পৃথিবীর বারিরাশি সুমধুর সুশীতল শ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত মধুময়, মাধুর্যময় করিয়া তুলিতেছে। বৃক্ষ লতা, কোমল তৃণ হইতে কি এক অনুপম কল্পনাতীত মধুরিমা নির্গত হইতেছে। অনুপ্রাণিত জীববৃন্দের

প্রাণের প্রাণ হইতে কি এক অপূর্ব রসের লহরী নিঃসৃত হইতেছে। এই সমস্ত মধুরতা চতুর্থীর চাঁদের নির্মল, সুশীতল, সুমধুর চন্দ্রিকায় মিশিয়া যাইতেছে। আর সেই মুগ্ধ চন্দ্রিকার প্রাণের প্রাণ ফুলরূপে ফুটিয়া পড়িতেছে। সেই বিশ্বের হৃদয়রূপ ফুলের নেশায় মানুষ ভোর হইয়া উঠিতেছে। মানুষ সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া সেই ফুলের ভিতর গলিয়া যাইতেছে। ফুল রসে ভরিয়া উঠিতেছে। অনন্ত আকাশ সমস্ত রাত্রি সেই কোমল ফুলে কোমল সুধা ঢালিয়া দিতেছে কোমল উষাকালে ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত ভ্রমর, ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত মধুমক্ষিকা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সেই হৃদয়রূপ ফুলের হৃদয়গত সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফুল, এ জগতে ক্ষুদ্রের নিমিত্ত কাহারও হৃদয়ে সুধা নাই, কেবল তোমার আছে। তুমি যথার্থই বিশ্বের হৃদয়ের হৃদয়। তোমার হৃদয়ের গুণে তুমি রাজার উদ্যানেও ফোট, গৃহস্থের প্রাঙ্গণেও ফোট, দরিদ্র কৃষকের গোময়স্তূপোপরিও ফোট। তোমাকে কেবল জটাজুটধারী সন্ন্যাসী-সদৃশ ঝাউ, দেবদ্রুম, সরলদ্রুম প্রভৃতি গোটাকতক গাছে দেখিতে পাই না; এবং বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় বহুলোকাশ্রয় বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি দুই চারিটা গাছে দেখিতে পাই না। কিন্তু ঐ সকল গাছের অন্তর খুঁজিলে তোমাকে দেখিতে পাই কি না বলিতে পারি না।

ফুল, তুমি ফোট কেন? আকাশে নক্ষত্র ফোটে বলিয়া? তা তো জানি। কিন্তু আমি জানিতে চাই, ফুটিয়া তোমার কি লাভ? তুমি কি জন্য ফোট? একথা আমি তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সন্ধ্যায় আধ-ছায়া আধ-আলোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। গভীর নিশীথে অনন্ত আকাশের দিব্য দিয়া, অনন্ত নক্ষত্র-রাজির দিব্য দিয়া, অনন্ত পথের পথিক চন্দ্রের দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি। নিশাবসানে উদয়াচলস্থ রাগরূপী সূর্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া, সত্য কথা না বলিলে ঐ অগ্নিশর্মা তোমাকে পোড়াইয়া মারিবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোনো উত্তর দাও নাই। তোমাকে কত স্তব স্তুতি করিয়াছি, কত খোসামোদ করিয়াছি, কত তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোনো উত্তর দাও নাই। কেবল একটিবার মাত্র যখন তোমাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে, উত্তর না দিলে ঐ যে ক্ষুদ্র মক্ষিকাটি তোমার বুকের অমৃত পান করিতেছে, ঐটিকে মারিয়া ফেলিব, তখন ব্যাকুল হইয়া, তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তাই জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন? উত্তর দিতে কি তোমার ভয় হয়? তা তো নয়। যখন তোমাকে পোড়াইবার ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখন তো তোমাকে ভয়ে জড়সড় হইতে দেখি নাই? তখন তো তোমার সেই স্বাভাবিক লজ্জাশীল, বিনয়নম্র, প্রফুল্লতাময় মুখখানি বই আর কিছুই দেখি নাই? কোনো কোনো কবি বলিয়া থাকেন যে তুমি ফোট কেন, না, ফুটিয়াই তোমার সুখ। কিন্তু সে কথাটি আমার মনে লাগে না। সে কথায় আমি তোমার হৃদয়ের তত্ত্ব পাই না। ফুটিয়াই যদি তুমি সুখী হইতে, তাহা হইলে তোমার মুখেই তো সে কথা শুনিতে পাইতাম। যার ফুটিয়াই সুখ সে তো আপনার শক্তি, আপনার তেজ আপনি বুঝে; সে তো আপনার তেজে আপনি তেজস্বী, আপনার তেজে আপনি ফাটিয়া পড়ে; সে তো আপনার সুখের নেশায় আপনি উন্মত্ত; সে তো

আপনার মদে আপনি মত্ত; সে তো স্ফূর্তিশীল, বাচাল, দাম্ভিক। সে তো স্তবে তুষ্ট হয়, সুখ নাশের ভয়ে শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করে। কিন্তু তোমার তো সে রকম প্রকৃতি নয়। তুমি চন্দ্রের শীতল, সুধাময় আলোকে উন্মত্ত হও না, আবার প্রচণ্ড রবির বিশ্বদগ্ধকারী রশ্মিতে অকাতরে তোমার ক্ষুদ্র কোমল বুকটুকু পাতিয়া দাও, সে বুকটুকু সে অগ্নিতে পুড়িয়া গেলেও তুমি দুঃখিত নও। তবে, ফুল, তুমি ফোট কেন? তুমি এ-কথার উত্তর দিবে না তা জানি। বুঝিতেছি তুমি এ-কথার অর্থ জান না— কেমন করিয়া উত্তর দিবে? কিন্তু তোমাকে দেখিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে রকম সুখী, তুমি যেমন অকাতরে কি বড় কি ছোট, কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র সকলকেই সমান আদরে তোমার হৃদয়ের সুধা ঢালিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত কর, তুমি যে-রকম করিয়া মরুভূমিকেও হাস্যময় করিয়া তোল, তুমি যেমন অকাতরে আপনার কোমল হৃদয় পোড়াইয়া ফেলিতে পার, তাহা ভাবিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি যে ফুটিয়া তোমার সুখ নয়, ফুটাইয়াই তোমার সুখ। তুমি স্বয়ং এ-কথা বলিবে না তা জানি, বলিতে পারিবে না তা জানি, কেন না ফুটাইয়াই যাহার সুখ, সেই জগতে মহৎ, সে আপনাকে আপনি জানে না, সে সব ফুটায় কিন্তু মারিয়া ফেলিলেও আপনি ফুটিতে পারে না। ফুল, এ জগতে ফুটানো কেবল তোমারই ধর্ম তোমারই কর্ম, তোমারই ব্রত। তুমিই এ জগৎ রক্ষা করিতেছ, তুমিই এ জগতের প্রাণ। তুমি পৃথিবীরূপে স্বর্গ।

তাই বুঝি, ফুল, তুমি চিরকাল ভাবরূপী। স্বর্গ কেহ কখনও বুঝিল না; স্বর্গ চিরকালই ভাবময়— ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, তোমাকেও কেহ কখনও জ্ঞানের দ্বারা বুঝিল না; তুমি চিরকালই ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, এমন ভাব নাই যাহা তোমাতে দেখিতে পাই না। গাম্ভীর্য বল, প্রফুল্লতা বল, নম্রতা বল, লজ্জাশীলতা বল, সরলতা বল, উল্লাস বল, শোক বল, বিষাদ বল, বিমর্ষ বল, চপলতা বল, সংকোচ বল, সকলই তোমাতে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই বটে কিন্তু কেমন করিয়া বুঝাইতে হয় তাহা জানি না। কেমন করিয়াই বা বুঝাইব? তোমাতে যখন যে ভাব দেখি, তখন সেই ভাবে ভোর হইয়া যাই, তখন সমস্ত জগৎ সেই ভাবে ভোর বলিয়া অনুভূত হয়। তবে কেমন করিয়া বুঝাই? আর বুঝাইলেই বা বুঝিবে কে? সকলেই তো আমার মতন তোমার ভাবে ভোর। তুমি ক্ষুদ্র ফুল, তোমার শক্তি অসীম। যেখানে তুমি, সেখানে আর কিছুই থাকিতে পারে না, সেখানে সবই তুমি। ক্ষুদ্র ফুল, তুমি অমোঘ মন্ত্র। তোমার ভাবরূপ নিশ্বাসে, সকলই গলিয়া ভাবময় হইয়া যায়। পাথরের পাহাড়ে তুমি হাসিলে পাথরের পাহাড়ও হাসির পাহাড় বলিয়া বোধ হয়। ফুল, তুমিই পৃথিবীর ভাবের ছাঁচ। তুমিই পৃথিবীতে ভাবরূপী মন্ত্র।

আর সেই জন্যই, ফুল তুমি সুন্দর এবং সৌন্দর্য। জগতে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। যে দিকে ফিরি সেই দিকেই সৌন্দর্য দেখিতে পাই। উর্ধ্বে চাহিয়া দেখি আকাশ সৌন্দর্যময়। আবার আকাশ অপেক্ষা উর্ধ্বতর প্রদেশ, যাহা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাহাও ভাবিয়া দেখলে সৌন্দর্যময়, সৌন্দর্যের উৎস বলিয়া মনে হয়। এ সৌন্দর্যের অর্থ কি? এ সৌন্দর্য কিসে হয়? অনেকে ভ্রান্ত হইয়া এই কথার কত ভ্রান্তিমূলক উত্তর দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বর্ণবিশেষের নাম সৌন্দর্য— বর্ণবিশেষ সৌন্দর্যের কারণ বা

উপাদান। যাহাতে সে বর্ণ আছে তাহা সুন্দর, যাহাতে সে বর্ণ নাই তাহা সুন্দর নয়। ফুল তোমাকে দেখিলে তো এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমাতে কোনো বর্ণ নাই?— নীল, পীত, হরিৎ, শ্বেত, যত বর্ণ আছে এবং যত রকমে সেই সকল বর্ণের সংযোগ এবং মিশ্রণ হইতে পারে সকলই তো তোমাতে আছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে বর্ণবিশেষের গুণে সৌন্দর্য? আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আকারবিশেষের নাম সৌন্দর্য— আকারবিশেষ সৌন্দর্যের উপাদান। কিন্তু ফুল, তোমাকে দেখিলে একথাও তো সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমার কোনো নির্দিষ্ট আকার নাই, তোমাতে অনেক আকার দেখিয়া থাকি। কিন্তু তোমাকে যে আকারে দেখি তুমি সেই আকারেই সুন্দর। তবে কি, ফুল, তুমি সৌরভের গুণে সুন্দর? তাই বা কেমন করিয়া বলি? কত ফুল ফোটে যাহার সৌরভ নাই, কিন্তু সে ফুলও তো সুন্দর। তাই বলি, ফুল, তুমি কেবল তোমার ভাবের গুণে সুন্দর এবং সৌন্দর্য। এবং তুমি, ক্ষুদ্র ফুল, তুমিই জগৎকে এই মহাতত্ত্ব বুঝাইয়া দেও যে স্বর্গে এবং মর্ত্যে যাহা কিছু সুন্দর আছে তাহা কেবল ভাবের গুণেই সুন্দর। একজন ইংরাজ কবি জগদ্বিখ্যাত তাজমহল দেখিয়া বলিয়াছেন—

It is a sigh made of stone

যিনি একথা বলিয়াছেন তিনি প্রকৃত সৌন্দর্যতত্ত্ব বুঝিয়াছেন।— তিনি বুঝিয়াছেন যে সৌন্দর্য চক্ষে দেখা যায় না, কেবল ভাবের ঘোরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলি, ভাই সকল, যদি সুন্দর হইতে চাও, যদি জগতের প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে ফুলের কাছে যাইও, ফুল তোমাকে শিখাইয়া দিবে যে, সৌন্দর্য রূপে নাই, সৌন্দর্য গুণে; সৌন্দর্য আকারে নাই, গঠনে নাই, রঙে নাই, সৌরভে নাই, সৌন্দর্য ভাবে। ফুলের কাছে এই শিক্ষা লইয়া ফুলের ভাবে ভরিয়া থাকিও, দেখিবে তোমাদের সুখের সীমা নাই, তোমাদের অদৃষ্টচক্র অনন্ত উন্নতির পথে, অনন্ত সুখধামের দিকে ঘুরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু ফুল, তোমাকে হৃদয়রূপেই দেখি, ভাবরূপেই দেখি, আর সৌন্দর্যরূপেই দেখি তুমি যে কি রহস্য তাহা তো বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দেখ, যখন সন্ধ্যার মৃদুমধুর শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ঐ দেবালয় সম্মুখস্থ শেফালিকা-মূলে উপবেশন করি, তখন আমার ক্ষুদ্র দেহের সামান্য সংঘর্ষে রাশি রাশি শেফালিকা বৃন্তচ্যুত হইয়া চারিদিক্ ছাইয়া ফেলে; অথবা যখন প্রাতঃকালের সঞ্জীবনী সমীরণে উৎসাহিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই, তখন কেবলমাত্র আমার গমনজনিত বায়ুসঞ্চালনে ঐ প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থ কামিনীবৃক্ষ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামিনীফুল ঝর ঝর করিয়া খসিয়া পড়ে। এ দিকে তো দেখি, ফুল, তুমি এমনি কোমল, এমনি অসহিষ্ণু, এমনি ভঙ্গুর যে শুধু যেন একটু নিশ্বাস গায় লাগিলে, ভাঙিয়া চুরিয়া কি এক রকম হইয়া যাও। কিন্তু আবার ঐ দেখ দেখি ওখানে তোমাকে কি ভিন্ন প্রকৃতির দেখিতেছি। ঐ দেখ আজ মহাসমুদ্রে নিদাঘ ঝটিকা উঠিয়াছে। অপরাহ্ণ-রবি অদৃশ্য হইয়াছে। আকাশ মেঘ-যুদ্ধে সংক্ষুব্ধ। অসংখ্য মেঘ-খণ্ড ভীমরবে গর্জন করিতে করিতে অনন্ত আকাশে পরস্পরকে তাড়না করিয়া বেড়াইতেছে; এক

একখানা মেঘ ক্রুদ্ধ হইয়া অপর মেঘের প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, আর অমনি দিগ্‌দিগন্ত ঝলসিয়া উঠিতেছে এবং বিকট শব্দে চমকিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের নীল জল কালো হইয়া উঠিয়াছে। সেই কালো জলে প্রচণ্ড ঝটিকোত্থিত ভীষণ তরঙ্গ সকল নভোমণ্ডলস্থ মেঘখণ্ডের ন্যায় পরস্পরকে তাড়না করিতেছে এবং রাগে ফেনা ভাঙিতে ভাঙিতে গর্জন করিয়া চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। আকাশে মেঘ-গর্জন, সমুদ্রে তরঙ্গ-গর্জন, আকাশসমুদ্রে ঝটিকা-গর্জন, আর সেই সমস্ত গর্জন-রাশি ভেদ করিয়া ঝটিকা-পক্ষীর উৎকট চিৎকার— যেন এই মহাপ্রলয়ের অন্তরাল হইতে প্রলয়শক্তি প্রলয় তূর্য ধ্বনিত করিতেছে। এই মহাপ্রলয়ে পড়িয়া একখানা প্রকাণ্ড অর্ণবযান খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। বড় বড় মোটা মোটা পাস তরঙ্গাঘাতে ছিঁড়িয়া কুটি কুটি হইয়া যাইতেছে বড় বড় মাস্তুল ভাঙিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকাকারে ভাসিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ একটি ক্ষুদ্র ফুল কোথা হইতে আসিয়া ঐ ঝটিকা-তাড়িত ভীষণ তরঙ্গোপরি অসীম সাহসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, প্রলয়যন্ত্রণা দেখিয়া ভিজিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু একটিও পাপ্‌ড়ি খসে নাই, একটিও পাপড়ি সরে নাই। ফুল, কে বলে তুমি কোমল? তুমি দৃঢ়তম অপেক্ষা দৃঢ়। কে বলে তুমি অসহিষ্ণু? তুমি সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শ। কে বলে তুমি ভয়-কুণ্ঠিত? তুমি সাহসের, তুমি বীরত্বের জীবন্ত প্রতিমা। তোমার অপেক্ষা রহস্য এ জগতে আর কি আছে। তুমি বৈপরীত্যের আধার। এই জন্য মানুষ সমাজের প্রারম্ভ হইতে কোমলহৃদয় কবি এবং সাহস সহিষ্ণুতা এবং শক্তির আদর্শরূপী ধর্মবীর এবং কর্মবীর, উভয়েরই শিরোপরি ফুলের মালা চাপাইয়া কোমলতার এবং বীরত্বের পুরস্কার করিয়া আসিতেছে। যে মহাপুরুষ এ জগতে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য, কেবল তিনিই মাথায় ফুল পরিতে পারেন। এতএব, ভারত-সন্তানগণ, যদি তোমরাও মাথায় ফুল পরিতে চাও, তবে দেহ, মন, প্রাণ সংকল্প করিয়া যাহাতে হৃদয়ের কোমলতা-গুণে এবং জগতের কর্মক্ষেত্রে বীরত্বগুণে মনুষ্য সমাজে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য হও, তাহার চেষ্টা কর। আশীর্বাদ করিতেছি, তোমাদের চেষ্টা যেন সফল হয়, বীরভূষণ ফুল যেন তোমাদের শিরে শোভা পায়।

সুবিস্তীর্ণ কাননে সন্ধ্যা-সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। গাছের পাতা অল্প অল্প নড়িতেছে। আকাশে নক্ষত্র মিট্-মিট্ করিতেছে। দুই একখানা পাতলা শাদা মেঘ আস্তে আস্তে উড়িয়া যাইতেছে। সেই মেঘের ভিতর দিয়া একরাশি ছায়ারূপী জ্যোৎস্না একখানা আবেশময় আবরণে আকাশ, পৃথিবী, দিগ্‌দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কাননে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। শরীর আবেশময়, মন আবেশময়, পৃথিবী আবেশময়। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। চক্ষে কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, যেন কি একখানা হইয়া গিয়াছি, যেন এই আবেশময় দৃশ্যে মিশিয়া গিয়াছি। এই একরকম হইয়া পড়িয়া আছি আর কত কি দেখিতেছি, কত কি শুনিতেছি। শুনিতেছি, কানন পৃথিবী, অনন্তশূন্য জুড়িয়া এক অপূর্ব, অস্ফুট, সুমধুর সংগীতধ্বনি হইতেছে। সে সংগীত ক্ষুদ্র তৃণ হইতে নির্গত হইতেছে, কত শত লতা হইতে নির্গত হইতেছে, কত ছোট ছোট, কত বড় বড় গাছ হইতে নির্গত হইতেছে, কত সলিলরাশি

হইতে, কত প্রস্তর কত পর্বত হইতে নির্গত হইতেছে, ভূগর্ভ হইতে ঊর্ধ্বতম আকাশ হইতে নির্গত হইতেছে। যেন তৃণ, লতা, পাতা, গাছ, পাথর, পর্বত. জল, জঙ্গল সকলে মাতিয়া একসুরে একতানে গাহিতেছে— আজ আমরা সব এক হইয়াছি, আজ আমাদের মধ্যে ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই, আজ আমরা বিরোধশূন্য, বিদ্বেষশূন্য, বিকারশূন্য, আজ আমরা চক্ষু পাইয়াছি, এক চক্ষে সকলে সকলকে এক-আত্মা দেখিতেছি, আজ আমরা প্রাণ পাইয়াছি, আজ আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণে মিশিয়াছি। এই মোহকর সংগীতে মজিতেছি আর দেখিতেছি কত অশরীরী, ছায়ারূপী, নির্মল, সুন্দর, হাস্যময় মূর্তি আসিতেছে, যাইতেছে, উড়িতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে, ফুলের ভিতর লুকাইতেছে, ফুল দেখিতে দেখিতে যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছে। কত শান্ত, সুধীর, সরল, ভাবময় মূর্তি ধীরে ধীরে, অস্ফুট সংগীতধ্বনি করিতে করিতে শূন্য হইতে নামিয়া কত ফুলের গাছ বেষ্টন করিয়া গদগদভাবে ফুল-স্তোত্র গাহিতেছে আর ফুল তুলিয়া ফুলকে অঞ্জলি পুরিয়া উপহার দিতেছে। এক একটি পবিত্র জ্যোৎস্নাময় মূর্তি আস্তে আস্তে ফুলের কাছে আসিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছে আর কি জানি কি শুনিয়া উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া অসীম শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে, এবং নিমেষ মধ্যে নামিয়া আবদ্ধ মুষ্টি খুলিয়া ফুলটিকে বলিতেছে— এই লও তোমার সাধের বুধগ্রহ লও। তখন সেই সব স্বপ্নময় মূর্তি সেই অপূর্ব আবেশময় পুষ্প-কাননে দাঁড়াইয়া একস্বরে এক তানে এক অশ্রুতপূর্ব ফুলস্তোত্র পড়িয়া সগর্বে গাহিয়া উঠিল—

Over hill, over dale,
Through bush, through briar,
Over park, over pale,
Through flood, through fire,
We do wonder everywhere,
Swifter than the moon's sphere.

গান শুনিয়া আমার চমক হইল। আমি বুঝিলাম যে, এই সকল মহাপুরুষ ফুলকে কল্পনার চক্ষে কল্পনাময় দেখিয়া অনন্তশক্তি লাভ করিয়াছে, রাগ দ্বেষাদি বিবর্জিত হইয়া প্রেম-বলে এক-প্রাণ এক-আত্মা হইয়া গিয়াছে, এবং প্রতিভাবলে এই অসম্পূর্ণ জগতে এক অপূর্ব আদর্শ-জগৎ স্থাপন করিয়াছে। এতএব, ভাই সকল, তোমরা ফুলকে শুধু হৃদয় বা ভাব বা সৌন্দর্যরূপে দেখিয়া ক্ষান্ত হইও না। তাহা হইলে ফুলের সম্পূর্ণ শক্তির অধিকারী হইতে পারিবে না। তোমরা ফুলকে কল্পনার চক্ষে দেখিও তাহা হইলে ফুল হইতে অনন্তশক্তি লাভ করিবে এবং যে জগৎ এখন শুধু কল্পনায় রহিয়াছে সত্য সত্যই সেই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে।

☐ *বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র, আশ্বিন ১২৮৮

কোম্‌ত দর্শন

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কোম্‌ত দর্শন লইয়া এক্ষণে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক তদীয় প্রধান প্রধান মতগুলি পর্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

কোম্‌ত কেবল দার্শনিক নহেন, তিনি একজন নূতন ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তক। এই সম্বন্ধে আমরা তদীয় Positive philosophy অর্থাৎ "প্রামাণিক দর্শনের" স্থূল স্থূল কথাগুলি বলিব।

কোম্‌ত বলেন যে, জগৎকার্য সম্বন্ধে মনুষ্যসমাজে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইয়া থাকে; প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক; দ্বিতীয়, দার্শনিক, কাল্পনিক শক্তিমূলক; তৃতীয় বৈজ্ঞানিক প্রামাণিক বা নিয়মমূলক। সকল বিষয়ে জ্ঞানেরই উন্নতি পথে ক্রমান্বয়ে এই তিনটি সোপান আছে।

লোকে যখন প্রথমে বিশ্ব ব্যাপার বুঝিতে যায়, তখন প্রত্যেক কার্যের একটি একটি সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার একটি গূঢ় কারণ আছে। আমাদিগের জ্ঞান স্ফূর্তি হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, আমরা যে সকল কার্য করি, সে সকল আমাদিগের সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতেই সমুদ্ভূত। এ নিমিত্ত প্রথমাবস্থায় যেখানে যে কার্য প্রত্যক্ষ করি, সেখানেই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তার কল্পনা করি। এই কারণেই শিশুগণ গতিবিশিষ্ট বা কার্যকাবী নির্জীব পদার্থদিগকে সজীব জ্ঞান করে। এই কারণেই প্রাচীনকালে মানবগণ প্রচণ্ড ঝটিকাপ্রবাহে, ক্ষুব্ধ সিন্ধুসলিলে, তিমিরবিনাশী দিবাকরে, গৃহকাননগ্রাসী অনলরাশিতে, বিদ্যুন্মালাশোভিত বজ্রগর্জনে, দেবতা দেখিতেন। এইরূপে পুরাকালে পুরাণবর্ণিত বায়ু, বরুণ, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, জ্ঞানের প্রথম সোপানকে পৌরাণিক বলা গিয়াছে; আর প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান ও ইচ্ছা বিদ্যমান দৃষ্ট হইত বলিয়া, পৌরাণিক ব্যাখ্যাকে আধ্যাত্মিক ও ইচ্ছামূলক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কালে কালে যত জগতের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, ততই লোকে জানিতে পারে যে পূর্বে যে সকল পদার্থকে সচেতন বিবেচনা করিয়াছিল চৈতন্যের পরিচায়ক লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই। তখন তাহাদিগের দ্বারা কিরূপে কার্য সাধন হয় এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত

হইয়া, স্থিরীকৃত হয় যে, তাহাদিগের অন্তর্নিহিত কার্যসাধিকা শক্তি আছে। এ প্রকার অনুমান অস্বাভাবিক নহে। ইচ্ছার চৈতন্যাংশ বাদ দিলে, কার্যসাধিকা শক্তি ভিন্ন আর কি থাকে? কিন্তু এতদ্দ্বারা কি কোনো কার্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়? আদিমাবস্থায় লোকে ভাবে, অগ্নি দেবতা, আমাদের ন্যায় ইচ্ছাপূর্বক বস্তুনিচয় ধ্বংস করেন; দ্বিতীয়াবস্থায় লোকে কল্পনা করে যে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে তাহাতেই পদার্থ সকল দগ্ধ হয়। কিন্তু অগ্নিতে পদার্থনিচয় দগ্ধ হয়, এতদতিরিক্ত কি জ্ঞান দাহিকাশক্তির নিকটে পাওয়া গেল? যখন পৌরাণিক মতে অনাস্থা জন্মিয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার আরম্ভ হয়, তখন ঈদৃশ শক্তি সকল পরিমাণে কল্পিত হয় বলিয়া, জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপানের নাম দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক রাখা হইয়াছে।

পরিণামে অনেক দেখিয়া শুনিয়া লোকে অবগত হয় যে সকল কার্যেরই নিয়ম আছে; অর্থাৎ নির্দিষ্ট পূর্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা কোনো বিষয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং কার্যসাধিকা শক্তি পরিত্যাগ পূর্বক নিয়মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই। নিয়মই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য এবং বিজ্ঞান পদে পদে প্রমাণ চায়। এ নিমিত্ত জ্ঞানের চরম সোপানের নাম বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক, বা নিয়মমূলক বলিয়া নির্দেশ করা গিয়াছে।

কোম্‌ত বলেন যে বিশ্বমণ্ডলের সকল বস্তুই নিয়মের অধীন। আকাশে যে ধূমকেতু কখনও কখনও দেখা যায়, আর মানুষের মনে যখন যে ইচ্ছা উদিত হয়, সকলই নিয়মের অধীন। পৃথিবীতে লোকের পদাঘাতে যে রেণুরাশি উড়িতে থাকে, নভোমণ্ডলে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণ বিরাজিত, মনুষ্যসমাজে যখন যে ঘটনা ঘটে, সকলই নিয়মের অধীন। উল্কা ছুটিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, পাখি উড়িতেছে, মৎস্য সন্তরণ করিতেছে, মানবসন্তান হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, নাচিতেছে, গাইতেছে, সমাজ বিশেষের উদয় উন্নতি বা বিলয় হইতেছে, সকলই নিয়মানুসারে। কিন্তু কোম্‌ত যদিও নিয়ম-ভক্ত, তথাপি তিনি অদৃষ্টবাদী নহেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতি অদৃষ্টবাদ দোষ যে আরোপিত হইবে, ইহা আশ্চর্য নহে। কারণ যখন কোনো প্রকার কার্য ইচ্ছার অধিকার হইতে নিয়মের অধিকারে আইসে, নিয়মের স্থৈর্য ইচ্ছার অস্থিরতার সহিত তুলনায় এত অবিচলিত লক্ষিত হয় যে, অদৃষ্টশাসনবৎ প্রতীয়মান হইবারই কথা। প্রথমে গগনের জ্যোতিষ্কগণের গতি হইতে নৈসর্গিক নিয়মের যে প্রকার জ্ঞানলাভ হয়, তাহাতেও এইরূপ ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা; যেহেতু যত কেন ইচ্ছা করি না, আমরা তাহাদিগের গতি পরিবর্তন করিতে সক্ষম নহি। যদিও প্রকৃতির নিয়মাবলী অপরিবর্তনীয়, তথাপি জ্যোতিষাধিকার-বহির্ভূত জগৎকার্য সকল অনেকদূর পরিবর্তনীয়। তাপ, তাড়িত প্রভৃতি পদার্থ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিবিধ প্রকার জীব, এবং সামাজিক ঘটনা, কত দূর মনুষ্যের ক্ষমতাধীন, প্রতিদিনই দৃষ্ট হইতেছে। যদিও নিয়মানুসারে সকলই ঘটে তথাপি ইচ্ছানুসারে তাপ, তাড়িত প্রভৃতি কমাইয়া বাড়াইয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন করিয়া, জীববিশেষকে কার্যবিশেষে নিয়োগ করিয়া, কোনোরূপ সমাজ সংস্কার কার্যের

সূচনা করিয়া অভিমতানুরূপ সংযোগ বিয়োগ দ্বারা মানবগণ জগতে কত প্রকার পরিবর্তন সংঘটন করিতেছে।[১]

কোম্‌ত যদিও বিবেচনা করেন যে জগৎকার্য এবং তদীয় নিয়ম এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার অধিকার আমাদের নাই, যদিও তিনি বলেন জগতের মূলকারণ ও চরম লক্ষ্য অপরিজ্ঞেয়, তথাপি তিনি নাস্তিক নহেন। তাঁহার মতে নাস্তিকেরা অজ্ঞেয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত; তাহারা জগতের উৎপত্তি, জীবের উৎপত্তি, প্রভৃতি অননুসন্ধেয় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত। তিনি কহেন যে, যদি নৈসর্গিক নিয়মাতিরিক্ত জগৎকার্য শৃঙ্খলসমুৎপাদক গূঢ় কারণের তত্ত্বানুসন্ধান কর, তাহা হইলে তন্নিহিত বা তদ্বহিঃস্থ ইচ্ছাবিশেষ কল্পনা করা যেমন সঙ্গত এমন আর কিছুই নহে; কারণ এরূপ অনুমান দ্বারা আমাদিগের কার্যসম্ভবা ইচ্ছার সহিত তাহার সাদৃশ্য রক্ষিত হয়। দার্শনিক শিক্ষাজনিত অহংকার না থাকিলে, কেহই এমন সহজ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ কষ্টকল্পনা করিতে যাইত না; এবং যত দিন না লোকে নির্বিকল্পক সত্যানুসন্ধানের নিষ্ফলতা বুঝিয়াছিল, ততদিন এই ব্যাখ্যাতেই মনুষ্যবুদ্ধি সন্তুষ্ট ছিল। কোম্‌তের বিবেচনায় প্রকৃতির পদ্ধতিতে নিঃসন্দেহ অনেক দোষ আছে; কিন্তু সচেতন ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এ অনুমানটি যেমন সঙ্গত, অচেতন যন্ত্রবাদ তেমন নহে। সুতরাং তিনি বলেন যে নাস্তিকেরা পৌরাণিকদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিহীন; কারণ তাহারা পৌরাণিক বিষয় লইয়া ব্যস্ত, অথচ তদুপযোগী অনুসন্ধান প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছে।[২]

কোম্‌ত প্রকৃতির পদ্ধতিতে কিরূপে দোষারোপ করেন, আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার চক্ষে যাহা দোষ বলিয়া লাগে, তাহাই কি প্রকৃত দোষ? বিজ্ঞানবিৎ ও বহুদর্শী হইয়া তিনি কি প্রকারে এরূপ অযৌক্তিক মত প্রচার করিলেন আমরা জগতের একদেশ মাত্র দেখিতেছি, তদুপযোগী যাহা লক্ষিত না হয়, সমুদয় বিশ্বমণ্ডল সম্বন্ধে তাহার

১ See *A General view of positivism* translated from the French of Auguste Comte by J.H. Bridges, pp- 57 and 58.

২ "If we insist upon penetrating the unattainable mystery of the essential Cause that produces phenomena, there is no hypothesis more satisfactory than that they proceed from Wills dwelling in them or outside them; an hypothesis which assimilates them to the effect produced by the desires which exist within ourselves. Were it not for the pride induced by metaphysical and scientific studies, it would be inconceivable that any atheist, modern or ancient, should have believed that his vague hypotheses on such a subject were preferable to this direct mode of explanation. And it was the only mode which really satisfied the reason, until men began to see the utter inanity and inutility of all search for absolute truth. The Order of Nature is doubtless very imperfect in every respect but its production is far more compatible with the hypothesis of an intelligent Will than with that of a blind mechanism. Persistent atheists therefore would seem to be the most illogical of theologists; because they occupy themselves with theoligical problems, and yet reject the only appropriate method of handling them." *A General View of Positivism.*

অস্তিত্বের আবশ্যকতা নাই, আমরা কি সাহসে বলিব? যদি বলিতে যাই, তাহা হইতে কি আমরা ধরিয়া লই না যে আমরা সকল বস্তুর বা প্রকৃতির কার্যের চরম উদ্দেশ্য জানি? যাহারা বিবেচনা করে যে সূর্য, চন্দ্র, তারা আমাদিগকে আলোক প্রদান করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির কার্যে দোষারোপ করিয়া কি কোম্‌ত তাহাদিগের দলে পড়িতেছেন না?

জগতীস্থ সমস্ত ব্যাপারই যে নিয়মের অধীন, কোম্‌ত যদিও এ-মতের প্রতিপোষক অনেক কথা বলিয়াছেন, তথাপি তিনি ইহার সংস্থাপক নহেন। বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিৎ সমাজে এমনটি চলিয়া আসিতেছে; এবং বহুবিস্তীর্ণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে। এক একটি নৈসর্গিক নিয়মের অবিক্রিয়া ইহার আর একটি মূল;এবং প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির যত্নে ইহার পুষ্টিসাধন হইয়াছে। কিন্তু বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে ইহার প্রভাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। গালিলিও গতির নিয়ম, এবং নিউটন মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে গগনমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্কগণ নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ। ল্যাভয়শির, ডেভি, ফ্যারাডে, ডালটন প্রভৃতির যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে যে পদার্থ সকল নির্দিষ্ট নিয়মে সংযুক্ত বিযুক্ত হয়। বিষা (Bichat) গল (Gall) প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে শারীরিক যন্ত্র নিচয়ের কার্য সকলও নিয়মের অধীন। অর্থশাস্ত্রবিৎ, নীতিশাস্ত্রবিৎ এবং পণ্ডিতেরা সামাজিক ঘটনা সমূহের নিয়মপরতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে বিজ্ঞানবেত্তৃদলে এই সংস্কারটি দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, যে সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্যন্ত নির্জীব ধূলিকণা হইতে যুক্তিশালী মনুষ্য মনের চিন্তা পর্যন্ত, সমুদয় বিশ্ব ব্যাপারই নিয়মের অধীন।

আমরা জগৎ কার্য সম্বন্ধে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বন করি এমতটিও সম্পূর্ণরূপে নূতন নহে। হিউম্‌ এবং তুর্গোর গ্রন্থে ইহার আভাস পাওয়া যায়। [See Hume's *Natural History of Religion* and Turgot's *Sur les Progress successifs de Pesprit humain*] কিন্তু কোম্‌ত যেরূপ নানাপ্রকার ঘটনার ব্যাখ্যা এতদ্দ্বারা করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহই করেন নাই, এবং ইহার কীদৃশ বহুবিস্তীর্ণ প্রয়োগস্থল আছে, আর কেহই বিশদরূপে বুঝিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সুতরাং সম্পূর্ণ রূপ নূতন না হউক কোম্‌ত যে ইহাকে অনেক নূতনত্ব দিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং এক প্রকার যে তিনি ইহার প্রকাশক নামের অধিকারী তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, পিথাগোরাস এবং আর্যভট্ট যদিও পূর্বকালে একথা কহিয়াছিলেন, তথাপি কোপার্নিকস এতৎ সংক্রান্ত প্রবল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ সৌরকেন্দ্রিক জ্যৌতিষিক মত সংস্থাপক রূপে পরিগণিত, তদ্রূপ জ্ঞানোন্নতি বিষয়ক সোপানত্রয়ের আভাস হিউম এবং তুর্গোর লিখিত প্রবন্ধে লক্ষিত হইলেও কোম্‌তকে উহার সংস্থাপক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জ্ঞানানুশীলনের প্রারম্ভ সময়ে সমুদায় বিজ্ঞান শাখার সমান অবস্থা ছিল; সর্বত্রই পৌরাণিক ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইত। কিন্তু সমকালে সকল শাখা সমান উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কোনোটা বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে, কোনোটা দার্শনিক সোপানে;

কোনোটা বা পৌরাণিক সোপানেই পড়িয়া রহিয়াছে। কোম্‌ত বলেন, যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হইয়াছে। বিষয়ের জটিলতা নিবন্ধন কোনোটা বা দার্শনিক, কোনোটা বা পৌরাণিক সোপানেই আছে। এইরূপে দৃষ্ট হয় যে একই ব্যক্তির কোনো বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মত, কোনো বিষয়ে দার্শনিক মত, এবং কোনো বিষয়ে পৌরাণিক মত। জাতিভেদেও ভিন্ন ভিন্ন ফল লক্ষিত হয়। যে বিষয়ে জাতিবিশেষের বৈজ্ঞানিক মত, তদ্বিষয়েই জাত্যন্তরের দার্শনিক বা পৌরাণিক মত। এই প্রকারে সংসারে অনেক মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। প্রথমে যেমন সকল বিষয়ে পৌরাণিক ব্যাখ্যা গৃহীত হইত বলিয়া লোকসমাজে ঐকমত্য ছিল, পরিশেষে কোম্‌তের বিবেচনায় বিজ্ঞান দ্বারা তদ্রূপ একতা সংস্থাপিত হইবে। যে সকল শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে বৈজ্ঞানিক পদ পাইয়াছে, পণ্ডিত সমাজে তাহাদিগের সম্বন্ধে মতভেদ অত্যল্পই দেখা যায়; যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্ট হয় তাহাও বিষয়ের জটিলতার ফল। ক্রমেই বিজ্ঞানের অধিকার বাড়িতেছে এবং দর্শন ও পুরাণের অধিকার কমিতেছে। সুতরাং এরূপ আশা করা অন্যায় নহে যে, কালক্রমে বিজয়ী বিজ্ঞানের রাজ্য সর্বব্যাপ্ত হইয়া সর্বত্র ঐকমত্য বিধান করিবে। ভূমণ্ডলের বর্তমান অবস্থা এবং ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সাধারণত কোম্‌তের মতের সত্যতা অনেক দূর দেখা যায়। জ্ঞানবিভূষিত ইউরোপখণ্ডে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব ও রসায়ন বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে; কিন্তু শারীরতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের অনেকাংশ দার্শনিক বা পৌরাণিক সোপানে রহিয়াছে। এতদ্দেশে কেহ চন্দ্রসূর্যকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের উপাসনা করিতেছেন, কেহ তাহাদিগকে জড় বিবেচনা করিয়াও তাহাদিগের শুভাশুভফলবিধায়িনী শক্তিতে প্রত্যয় স্থাপনা করেন, এবং কেহ বা তাহাদিগের আকার, গতি প্রভৃতি জানিয়াই সন্তুষ্ট। ভারতবর্ষে জল প্রথমে বরুণদেবের আবাস বলিয়া গণ্য হইত; পরে স্নেহশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহার কার্যকলাপের ব্যাখ্যা হইত; এক্ষণে উদজান ও অম্লজানের সমষ্টি বলিয়া উহা শিক্ষিত সমাজে পরিগৃহীত। অগ্নি পূর্বে দেবতা ছিলেন, পরে দাহিকা শক্তিশালী বলিয়া দহননিপুণ হইয়াছিলেন; এক্ষণে রাসায়নিক কার্যবিশেষের ফল বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু ভালো করিয়া কোম্‌তের মত বুঝিতে হইলে তদীয় বিজ্ঞানবিভাগের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি বলেন যে বিজ্ঞানসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ মুখ্য বা সামান্য এবং ২ গৌণ বা বিশেষ। সম্ভব স্থূল মাত্রে খাটিবে, এরূপ নিয়মাবলীর আবিষ্কার করা মুখ্য বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং এই সকল নিয়ম দ্বারা বর্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।[৩]

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, শারীরতত্ত্ব মুখ্য বিজ্ঞান, কিন্তু উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং

৩. **"We must distinguish the two classes of Natural Science— the abstract or general which have for their object the discovery of the laws which regulate phenomena in all conceivable cases and the concrete, particular, or descriptive, which are sometimes called Natural Science in a restricted sense whose function it is to apply these laws to the actual history of existing beings,"** ***Positive Philosophy***, **freely translated and condensed by Harriet Martineau.**

প্রাণিবিদ্যা গৌণ বিজ্ঞান, রসায়ন মুখ্য বিজ্ঞান এবং খনিজবিদ্যা গৌণ বিজ্ঞান, ইত্যাদি। প্রত্যেক গৌণ বিজ্ঞানে অনেকগুলি মুখ্য বিজ্ঞানের সাহায্য লাগে। উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে কেবল শারীরতত্ত্ব জানিলে চলিবে না। উদ্ভিদ্ এবং জীবদেহে তাপাদির কার্য বুঝিতে পদার্থতত্ত্ব, পুষ্টিসাধনাদি বুঝিতে রসায়ন, এবং বর্তমান জীবোদ্ভিদ্‌গণের সংস্থান ও গুণ সকল বুঝিতে মনুষ্যপ্রভাব-প্রকাশক সমাজতত্ত্ব জানা আবশ্যক। এইরূপ খনিজবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে, রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব জানা চাই। পাথুরিয়া কয়লাও একটি খনিজপদার্থ, কিন্তু পদার্থতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব না জানিলে কে উহার প্রকৃতি এবং উপাদান প্রভৃতি নির্ণয় করিতে পারে?

মুখ্য বিজ্ঞানদিগকে আবার পরস্পরের সাপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া কোম্‌ত শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমস্থান তিনি গণিতকে দিয়াছেন; কারণ ইহার বিষয় সংখ্যা, বিস্তৃতি ও গতি, এবং এ সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে অন্য কোনো বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার মতে জ্যোতিষ দ্বিতীয় স্থানের যোগ্য, কারণ ইহাতে গাণিতিক তত্ত্বাতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মাত্র লইতে হয়। তৃতীয়স্থান পদার্থতত্ত্বকে প্রদত্ত হইয়াছে; যেহেতু উহাতে গণিতের সাহায্য আবশ্যক এবং মাধ্যাকর্ষণজনিত গুরুত্বাতিরিক্ত তাপ, তাড়িত, শব্দ প্রভৃতির তত্ত্ব নির্ণীত হয়। চতুর্থস্থানে রসায়ন সংস্থাপিত হইয়াছে; কেননা তাপতাড়িতাদির সহায়তায় পদার্থ-সংযোগের নিয়মাবলী নিরূপণ করাই রসায়নের উদ্দেশ্য। পঞ্চমস্থানে শারীরতত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে; কারণ ইহাতে রাসায়নিক কার্যাতিরিক্ত অনেক দৈহিক ব্যাপারের মীমাংসা করিতে হয়। ষষ্ঠস্থান সমাজতত্ত্বকে দেওয়া হইয়াছে; কারণ শারীরিক তত্ত্বনিচয়কে মূল করিয়া সামাজিক নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করাই ইহার অভিপ্রায়। সপ্তমস্থানে নীতিতত্ত্ব রক্ষিত হইয়াছে; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ নিরূপণ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। বিজ্ঞানশাখাগুলির পরস্পর সাপেক্ষতানুসারে শ্রেণীবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে যে, যাহার বিষয় যত জটিল তাহাই তত অন্যসাপেক্ষ, এবং যাহার বিষয় যত সরল তাহাই তত অন্য নিরপেক্ষ। গণিতের বিষয় সর্বাপেক্ষা সরল; এবং গণিতই সর্বনিরপেক্ষ। নীতিতত্ত্বের বিষয় সর্বাপেক্ষা জটিল, এবং নীতিতত্ত্বই সর্বসাপেক্ষ। অন্যান্য বিজ্ঞানশাখাগুলির জটিলতার তারতম্যানুসারে অপরসাপেক্ষ।

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে, যে বিজ্ঞানশাখা যত দূর অন্যসাপেক্ষ, তাহা তত বিলম্বে বৈজ্ঞানিক সোপানে আরোহণ করিবে। ইতিহাসও এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, গণিতই সর্বাগ্রে বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে; তদনন্তর জ্যোতিষ; তারপর পদার্থতত্ত্ব; তৎপরে রসায়ন। শারীরতত্ত্বের কিয়দংশমাত্র বৈজ্ঞানিক পদে উন্নত হইয়াছে; সমাজতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব প্রায় সর্বত্রই পৌরাণিক বা দার্শনিক সোপানে পড়িয়া রহিয়াছে। কালসহকারে বিজ্ঞানশাখানিচয়ের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্তীর্ণ হয়।

কোম্‌ত মুখ্য বিজ্ঞানগুলিকে যেরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দুইটি দোষ দৃষ্ট হয়; প্রথম এই যে, তিনি অন্যায়পূর্বক জ্যোতিষকে মুখ্য বিজ্ঞান দলভুক্ত করিয়াছেন,

এই যে, তিনি মনস্তত্ত্বকে অবিবেচনাপূর্বক উক্ত দলে স্থান দেন নাই। তিনি যখন বলিয়াছেন যে, বর্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং যখন তিনি এই কারণে খনিজবিদ্যা, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, এবং প্রাণিবিদ্যাকে গৌণবিজ্ঞান শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তখন তিনি কি প্রকারে জ্যোতির্বিদ্যাকে গৌণ বিজ্ঞান না বলিবেন? বর্তমান সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং তারকাপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করাই জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। যদি বল সম্ভব স্থল মাত্রে খাটে এরূপ মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম নির্ণয়ও জ্যোতিষের কার্য, আমাদিগের বিবেচনায় এটি ভ্রম। গণিতের যে ভাগ দ্বারা গতির নিয়মাবলী নির্ণীত হয়, মাধ্যাকর্ষণ তাহারই আলোচ্য একটি বিষয় মাত্র।

আমাদিগের বোধ হয় যে সমাজতন্ত্রের অব্যবহিত পূর্বেই মনস্তত্ত্বসংস্থাপন করা আবশ্যক। কেবল কতকগুলি শরীরীর সংযোগে সমাজ সংগঠিত হয় না। কাননে অসংখ্য তরুলতা একত্রে আছে; কিন্তু সেখানে আমরা সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। যেখানে আমরা মনের সহিত মনের ঘাত প্রতিঘাত উপলব্ধি করি, যেখানে অনেকের মন একত্রিত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত দেখি, সেখানেই কেবল আমরা সমাজ আছে বলিয়া থাকি। অতএব যে মন সমাজের মূলস্বরূপ, তদ্বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সংগ্রহ না হইলে সমাজ তত্ত্বের ভিত্তিনির্মাণই হয় না। সুতরাং সমাজতত্ত্বের পূর্বে মনস্তত্ত্ব সন্নিবেশ করা চাই। আবারও ভাবিয়া দেখ, শরীরীমাত্রেই মনবিশিষ্ট নহে। জন্ম, পুষ্টিসাধন, বংশবৃদ্ধি, মৃত্যু প্রভৃতি শরীরী সকলেরই আছে; কিন্তু অর্ধেকের প্রায়, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জদলের কাহারও, মন নাই। সুতরাং শরীরী মাত্রের সাধারণ তত্ত্বগুলি শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানের বিষয় রাখিয়া মানসিকতত্ত্ব সমুদায় লইয়া একটি বিজ্ঞানশাখা সংস্থাপন করা উচিত। এতৎসম্বন্ধে আরও একটা কথা বলা যাইতে পারে। গণিত হইতে শারীরতত্ত্ব পর্যন্ত সকল শাস্ত্রের তথ্যনির্ণয়ার্থে আমরা কেবল বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ। মনস্তত্ত্বানুসন্ধানার্থে আমরা একটি নতুন যন্ত্র পাইতেছি; সেটি আমাদিগের অন্তরিন্দ্রিয়। কোম্‌ত বলেন যে আন্তরিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিবার শক্তি আমাদিগের নাই; কারণ যখনই আমরা কোনো মানসিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিতে যাই, তখনই তাহা বিলীন হইয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই, যখন আমরা প্রতিক্ষণে জানিতে পারিতেছি যে, আমাদিগের মনে সুখ দুঃখ কি কোনোরূপ চিন্তা উদিত হইতেছে, তখন আমাদিগের আপন আপন মানসিক ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের কিয়ৎ পরিমাণে আছে, তাহার সন্দেহ নাই। আর ইহাও কাহারও অবিদিত নহে যে স্মৃতি দ্বারা বিগত মানসিক অবস্থার জ্ঞান অনেকদূর লাভ করা যায়। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সত্য নির্ণয় বিষয়ে কোম্‌তের আপত্তি বিফল হইতেছে।

কোম্‌তের মতে জ্ঞানোপার্জনের উপায় তিনটি; পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার পর্যালোচনাকে পর্যবেক্ষণ বলে। ইচ্ছাপূর্বক অবস্থা পরিবর্তন করিয়া কোনো বিষয়ের পর্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুসন্ধেয় তত্ত্বটি বিশদ করিয়া বুঝিবার জন্য দেশকালপাত্রভেদে তদীয় পর্যালোচনাকে উপমা বলে, আমাদিগের বোধ হয় যে, অন্তরিন্দ্রিয়গোচর বলিয়া আমাদিগের মানসিক ব্যাপারও পর্যবেক্ষণের বিষয়; এবং উপমাটি এক প্রকার

কৌশলপ্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা মাত্র। কোম্‌ত দেখাইয়াছেন যে বিষয়ের জটিলতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বনিরূপণের উপায় বৃদ্ধি ঘটে। গণিতে পর্যবেক্ষণ করিতে হয় কি না আমরা বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষে কেবল চক্ষুদ্বারা পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়নে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা চলে। শারীরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, এবং নীতিতত্ত্বে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, এবং উপমা তিনটিরই অনেক স্থলে ঘটে। কোম্‌ত যদি মনস্তত্ত্ব পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে আর একটা তত্ত্বনির্ণায়ক উপায়ের বিশেষ উল্লেখ করিতেন, ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র।

আহ্বান

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

আর যে পারি না। এ দুর্ভর যন্ত্রণাময় জীবন আর যে বহিতে পারি না! যে চাকরিতে আমাদের দেশ মাতিয়া রহিয়াছে, সে চাকরির মদে আমার মন মত্ত হইতেছে না কেন? আমার মন সর্বদা হু হু করে কেন? আমার প্রাণ সর্বদা কাঁদে কেন? অন্তরে সর্বদা রাবণের চিতা জ্বলিতেছে কেন? খুনী, আসামীর অন্তরের যে নিরন্তর অন্তর্দাহী যাতনা, তাহা আমি ভোগ করি কেন? উচ্চ পদের পোশাক পরিয়া সকলেই অহংকারে টল মল হইয়া হাসিয়া খুসিয়া আমোদ আহ্লাদে নিতান্ত বিভোর হইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে পোশাক, আমার শেল বোধ হইতেছে কেন? শ্বেতচরণে অঞ্জলি দিতে কত পোশাকধারী নবীন উৎসাহে মাতিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু সে দৃশ্যে আমার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় কেন? মধুর সংগীত শুনিয়া আর সকলের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে, কিন্তু আমার মন কাঁদিয়া উঠে কেন? সকলের মুখে গাল-ভরা হাসি, কিন্তু আমার চক্ষে ফল্গুর অন্তর্বাহিণী ধারা কেন? অন্তঃস্থিত বজ্রের স্ফুরণে সকলকেই চমকিত করিতে— তাহার প্রহারে নিরুপায় স্বদেশীয়ের মস্তক চূর্ণীকৃত করিতে, আমাদের দলের বড় আমোদ, কিন্তু তাহাতে আমার হৃদয় কাতর হয় কেন? দলে দলে বসিয়া বৃথা জল্পনায় পরের নিন্দায় সকলেই মনের স্ফূর্তিতে জীবন কাটাইতেছে, কিন্তু আমার হৃদয় বিষাদে পূর্ণ কেন? বিলাতি পরিচ্ছদে দাস-দেহ বিভূষিত করিয়া বিলাতি চর্ব্য-চোষ্যে লেলিহমান রসনাকে পরিতৃপ্ত করিয়া ও বিলাতি পেয়ে দুর্বল মস্তিষ্ককে বিঘূর্ণিত করিয়া, বঙ্গীয় যুবক আনন্দে কেমন জ্ঞানশূন্য! কিন্তু কি পাপে এ দৃশ্যে তুষানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়? এ বিশ্বব্যাপী আনন্দে— এ সর্বগ্রাসী আমোদ আহ্লাদে আমি যোগ দিতে পারি না কেন? চতুর্দিকে শ্বেতাননের পূজার ঘোর ঘটা। ভ্রাতৃবৃন্দ ভক্তিতে গদ্‌গদচিত্ত— পঞ্চ আননে শ্বেতাননের স্তব করিতেছেন, বাছিয়া বাছিয়া পুষ্প চয়ন করিয়া চরণে অঞ্জলি দিতেছেন, ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত, লম্বোদর উপাসকগণ ঘণ্টা বাদন করিতেছেন; অণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব বলি পড়িতেছে, বেতনের পরিমাণের বা আশার অনুরূপ নৈবেদ্যের আয়োজন হইতেছে! দেবদেবীর প্রসাদ ভক্তেরা ভক্তিভাবে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিতেছেন। আনন্দের সীমা নাই। যেন ভারতে কি সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইয়াছে। যেন আট শত বৎসরের পর ভারতের অদৃষ্ট-গগনে আবার সৌভাগ্যসূর্য সমুদিত হইয়াছে! এমন উৎসবের সময় আমার প্রাণ কাঁদে কেন? কাঁদে কেন কাহাকে বলিব? যাঁহাদের জন্য কাঁদিতেছে, তাঁহারাই

যে উৎসবে উন্মত্ত। তাঁহারাই যে দেব-যাত্রায় সং সাজিতে বিশেষ মজবুত। শ্বেত দেবতার সন্তোষার্থ তাঁহারা বহুরূপী হইয়া পড়িয়াছেন। কখন রাজা, কখন রায় বাহাদুর, কখন ডেপুটি, কখন চাপরাশি, নানা রূপ ধারণ করিতেছেন। পরকে ভুলাইবার জন্য সং সাজুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু সং সাজিতে সাজিতে ক্রমে আসল সং হইয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহাই যে সর্বনাশের মূল। তাঁহাদের জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই— অথবা লক্ষ্য নাই বা কেমন করিয়া বলি? নিজের বেতন-বৃদ্ধি, নিজের বেশ-ভূষা, নিজের আসবাব, নিজের ভোজন পারিপাট্য প্রভৃতিই তাঁহার জীবনের সর্বগ্রাসী লক্ষ্য। তাঁহার স্বজাতি নাই, স্বদেশ নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই; জ্ঞাতি নাই, কুটুম্ব নাই— আত্মাই তাঁহার সর্বস্ব। 'স্বদেশ রসাতলে যাউক; স্বজাতির ধ্বংস হউক, আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব অনাহারে মরুক— সে সকল ভাবনা ভাবিয়া মাথা ঘুরাইতে পারি না। যাহারা পাগল, তাহারা ও-সকল ভাবনা ভাবুক'— তাঁহার স্বার্থসর্বস্ব মন এই বলিয়া কথঞ্চিৎ আত্মগ্লানির হস্ত এড়াইয়া থাকে। 'ড্যাম্ খুড়া জেঠা মামা খুড়ী জেঠি মাসি— তাঁহারা বসিয়া থাকিবেন, আর আমরা কপালের ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইব— আলস্যের ভরা পূর্ণ করিব— এতো পারি না,' এই বলিয়া তিনি নিজের স্বার্থ-অন্ধ চরিত্রের সমর্থন করিয়া থাকেন। যখন তিনি অসংখ্য ডিস্-শোভিত টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার চামচ কন্টকীর সঞ্চালনে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, তখন স্বর্গ যেন তাঁহার করতলস্থ হয়! সে সুখ ছাড়িয়া কে স্বজাতি-গৌরব ও স্বদেশানুরাগ লইয়া বৃথা সময় কাটাইবে? যে সকল উন্মত্ত যুবকের খাইয়া দাইয়া আর কাজ নাই তাহারা ঐ সকল পাগলামি লইয়া থাকুক— বিলাতি লোহিত জলে যখন মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়, মহম্মদী ডিসের সর্বসঞ্চারী রসে যখন রসনা গলিয়া যায়, তখন বঙ্গীয় যুবকের মুখে এই সব মর্মভেদী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যে সকল যুবক বিদ্যামন্দিরের উচ্চতম সোপানে উঠিয়াও আজ কাল কর্মাভাবে অন্ন বিনা মারা যাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাহাদিগের শুষ্ক রসনায় এরূপ তেজের কথা বাহির হইতে পারে না। যাঁহারা বিদ্যার জোরে বা মুরব্বি বলে হাকিমি পাইয়াছেন, বা ওকালতিতে সাইন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখেই এইরূপ কথা শুনিতে পাই। অদৃষ্টের কথা কি বলিব? যাঁহারা জনক জননীর চক্ষু অন্ধ করিয়া প্রিয়তমাকে পাগলিনী করিয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন, সকলেই আশা করিয়া ছিলেন যে, তাঁহারা বিলাতি তেজ, বিলাতি স্বাধীনতা স্পৃহা লইয়া আসিয়া নিস্তেজ ভারতের শিরায় শিরায় সেই সকল সংক্রামিত করিবেন— পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে আঁধার ভারতের লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন; কিন্তু হায়! কি পাপে আমরা তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে দেখিতে পাই? তাঁহারা দেশকে তুলিবেন কি? বিলাত হইতে দেশে পদার্পণ করিয়াই তাঁহাদিগের মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। হোম (Home) ছাড়িয়া আসিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগের মন হু হু করিতে থাকে। বাঙালির অর্ধাচ্ছাদিত দেহ দেখিয়া তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হয়েন। ভাই বন্ধুর গায় জামা নাই, পায় মোজা নাই, পেণ্টুলেন্ কোট্ পরা নাই দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে, তাঁহা-

দিগের সহিত মেশামিশি করিতে, অধিক কি ভাই বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেও, লজ্জা বোধ করেন। আমি জজ, আমি ম্যাজিস্ট্রেট্, আমি সিবি্ল সার্জন, আমি ব্যারিস্টার— আমার বাপ, আমার ভাই, আমার বন্ধু অর্ধাবৃত দেহে বাড়িতে থাকে, আসনে বসিয়া আঙুল চাটিয়া অসভ্যের মতো ভাত খায়, অসজ্জিত ঘরে সামান্য শয্যায় শয়ন করে, এ তো প্রাণে সহে না— কেমন করিয়া ইহাদিগকে বাপ, ভাই, বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিব? কেমন করিয়া এ লজ্জার কথা সাহেবের কাছে বলিব? সাহেব ইহা টের পাইলে যে আর দলে মিশিতে দিবে না? এই সকল চিন্তায় বিলাতফেরৎ বাঙালি আকুল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া অনন্যোপায় হইয়া শেষে 'তফাৎ' থাকাই শ্রেয় মনে করেন।

এ দিকে জমিদার শ্রেণী বিলাসিতার ক্রোড়ে চিরলালিত। পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদে না। কেন না, অভাব কি পদার্থ, তিনি জানেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত তিনি তোষামোদকারিগণেই পরিবেষ্টিত। তাহাদিগের মুখনিঃসৃত যশঃসৌরভে তাঁহার চিত্ত সতত আমোদিত। তাহাদিগের মুখে তিনি ধর্মে যুধিষ্ঠির, বিক্রমে ভীম, দানশৌণ্ডে দাতাকর্ণ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিদ্যায় তর্কপঞ্চানন! তিনি সর্বগুণের আধার। তাঁহার এমন বন্ধু নাই যে, তাঁহার দোষ দেখাইয়া দেয়, অথবা বন্ধু থাকিলেও, তাহার সাহস হয় না যে, তাঁহাকে তাঁহার দোষ দেখাইতে পারেন। কারণ, তাহা হইলে বন্ধু তৎক্ষণাৎ তাঁহার দরবার হইতে নিষ্কাশিত হইবেন। তিনি হাই তুলিলেন, সকলে এক সঙ্গে তুড়ি দিতে লাগিল। তাহার মাথা ধরিলে সকলে একবাক্যে আহা করিয়া উঠিল। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে একটা জড়পিণ্ডবৎ হইয়া উঠেন। তাঁহার নিজের ভাবনা ভাবিতে হয় না। কারণ, তাঁহার পর্যাপ্ত ধন আছে। পরের জন্য কিরূপে ভাবিতে হয়, সে শিক্ষাও তিনি পান না। তিনি ক্রমে স্বার্থ-পরার্থ বিহীন এক মুক্ত পুরুষ হইয়া উঠেন, কিন্তু পূর্ণ মুক্তি তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তিনি সকল বিষয়ে নিঃস্পৃহ হইয়াও, এক বিষয়ে স্পৃহাবান্। তিনি উপাধি-ভিখারি— এই জন্য তিনি শ্বেতাননের উপাসক। তাঁহার যথা-সর্বস্ব দিয়াও যদি একটি উপাধি কিনিতে পারেন, তিনি তাহাতেও কুণ্ঠিত নহেন। পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদে না, আপনা হইতে সুতরাং পরের দুঃখমোচনে তিনি এক পয়সা দিতে প্রস্তুত নহেন। তবে শ্বেতাননের ইঙ্গিতে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত। কি বিষয়ে অর্থব্যয় হইবে, তাহা তিনি জানিতে চান না, কেবল দেবতার তুষ্টি-বিধানই তাঁহার জীবনের এক-মাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইলেই তিনি চরিতার্থ। কলেজ কর, দুর্ভিক্ষে ব্যয় কর, খাল কাটাও, রাস্তা কর, অথবা আপনারা খাও— কিছুতেই তাঁহার আপত্তি নাই। তাঁহার পক্ষে সবই সমান। শ্বেতানন। তবে তিনি কেবল তোমার নিকট এক বিষয়ের ভিখারি। তিনি তোমার নেক্‌নজর প্রার্থী। তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি উপাধি দাও। পতনোন্মুখ রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় তুমিও উপাধিদান-বিষয়ে মুক্তহস্ত। তোমার কটাক্ষপাতে যখন দীন দুঃখীও রাজা হইতেছে, তখন যাহাদের কিঞ্চিৎ আছে, তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে?

এইরূপ অন্তঃসার-শূন্য, নির্লক্ষ্য, আপাতভোগ তুষ্ট, ভাবিদর্শন-বিরহিত, স্বার্থমোক্ষ জড়পিণ্ডসকল লইয়া আমাদের সমাজ গঠিত। তাহার জন্যই বৈদেশিকেরা আমাদিগকে ক্রীড়া পুত্তলীর ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা ও যে প্রকারে ইচ্ছা সঞ্চালিত করিয়া থাকেন। এই

জন্য আমাদের জাতীয় জীবন নাই, জাতীয় গৌরব নাই, জাতীয় মমতা নাই। বৈদেশিকেরা আমাদিকেও কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন— আজ জুতা লাথি খাইলেও কাল আসিয়া তাহারা হাজির হইবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা স্বার্থের জন্য সমস্ত সহিতে পারে। তাহাদিগের মান অপমান বোধ নাই, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, আত্মগ্লানি নাই। তাহারা কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধির জন্য— একটি উপাধি পাইবার জন্য, কখন কখন শুদ্ধ ভবিষ্য স্বার্থসিদ্ধির আশায়— বৈদেশিকের চরণে জাতীয় স্বার্থ বলি দিতে পারে। তাহাদিগের উপযাচক হইয়া স্বদেশীয় ভ্রাতার ভুল ধরিয়া কার্যের ত্রুটি দেখাইয়া, তাহার নিন্দা করিয়া বৈদেশিকের প্রীতিভাজন হইতে লজ্জা বোধ হয় না। তাহাদিগের প্রভুর ফটোগ্রাফ্ মাথায় করিয়া দাসীকে (পত্নীকে) দেখাইবার জন্য গৃহে লইয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে ঘৃণা বোধ হয় না। তাহাদিগের— আমি তোমার গোলামের গোলাম, আমার চৌদ্দ পুরুষ তোমার গোলাম— ইত্যাদি লজ্জাকর স্তুতি-বাক্যে প্রভুর মনস্তুষ্টি-বিধানে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না।

আর কত বলিব? এ মর্মভেদী কাহিনী যে আর গায়িতে পারি না। এ আত্মগ্লানিকর জাতীয় দুর্গতির কথা লেখনীতে আর যে লিখিতে পারি না। এই সকল জাতীয় অগৌরবের ইতিহাস আর যে প্রচার করিতে পারি না! বুক যে ফাটিয়া যাইতেছে। চক্ষু দিয়া যে রক্ত বাহির হইতেছে। কাহার নিন্দা করিতেছি? যাহার নিন্দা করিতেছি, সে-যে আমার প্রাণ! আমি-যে পৃথিবীতে আর কিছু জানি না! ভারতবাসিন্! তুমিই যে আমার জীবন-সর্বস্ব! আমার ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— সবই যে তুমি। তবে কেন নিন্দা করিতেছি? ভাই! প্রাণাধিক! তোমার নিন্দা সহিতে পারি না বলিয়াই তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছি। ক্ষমা কর, আমার তিরস্কারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া আত্মদোষ সংশোধন কর। তুমি যে চিরদিন বৈদেশিকের চরণে দলিত হইবে, ইহা আমি দেখিতে পারিব না, এই জন্য ক্ষত-স্থান দেখাইয়া দিতেছি। ক্ষত স্থান বাড়িতে দিও না। সঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ কর। আবার জাতীয় জীবন পাইবে! এখন আমোদের সময় নয়। উন্মত্তের ন্যায় নির্লক্ষ্য হাসি হাসিয়া দিন কাটাইও না। জাতীয় তরী ডুব ডুবু হইয়াছে, এখন নৃত্য রাখ। একার কাজ নয়। আইস— আমরা বিংশতি কোটি মিলে জল ছেঁচিতে আরম্ভ করি। যে জল ঢুকিয়াছে, কত দিনে তাহা ছেঁচিয়া উঠিতে পারিব, বলতে পারি না; তবে 'কালস্য কুটিলা গতিঃ।' কে বলিতে পারে যে, আমরা একদিন ছেঁচিয়া উঠিতে পারিব না? ঐ দেখ, প্রাচ্যে নগণ্য জাপান ঠেলিয়া উঠিতেছে! ঐ দেখ প্রতীচ্যে পতিত ইতালি আবার উঠিয়াছে! তবে কেন ভয়। মিলে সব ভাই এক মনে এক্ প্রাণে নামি স্বদেশের কাজ! ভাই ভাই গানে এস মাতাই ভারত।

☐ *চিন্তাতরঙ্গিণী*, (১৮৯০) পৃ. ১-৫

গগন-পটো

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

গগন-পটোকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ; পথে-খাটে দাঁড়াইয়া কতবারই দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা সকলে তাহার গুণাগুণ জান না, তাই আমাদিগকে আজ তোমাদের কাছে সেই পরিচিতের পরিচয় দিতে হইতেছে।

কারিগর লোক প্রায়ই একটু খাম্‌খেয়ালি হয়; কেহ বদমেজাজের উপর খাম্‌খেয়ালি, আর কেহ-বা রস্‌খ্যাপার উপর খাম্‌খেয়ালি। কিন্তু গগন-পটোর মতো খাম্‌খেয়ালি রস্‌খ্যাপা লোক আর দুনিয়ায় নাই। সে যদি কখনও কাহারও ফরমাশ মতো চিত্র করিল! আপনার মনে আপনার ঝোঁকে নিয়তই আঁকিতেছে, আর পুঁছিতেছে, কিন্তু যখন যেটা দাঁড় করাইবে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত। যেমন রং আর তেমনি 'শেড্'; যেমন ভাব-ভঙ্গি, তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠব! তাহাতেই বলিতেছিলাম, গগন-পটো খাম্‌খেয়ালি বটে, কিন্তু মস্ত কারিগর।

তবে গগনের অনেক সময় সময়-অসময় বোধ নাই। প্রথম আলাপে সেইজন্য গগনের উপর বড়ই বিরক্ত হইতে হয়; কিন্তু তাহার পর ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝা যায়, লোকটা অসাময়িক হইলেও বদ্‌রসিক নহে; রস্‌খ্যাপা বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে লুকানো ছাপানো সহৃদয়তা বিলক্ষণ আছে। তবে সহিষ্ণুতা না থাকিলে, ঘনিষ্ঠতা না হইলে তাহার সেই ভাবটুকু কিন্তু বুঝিয়া উঠা ভার।

তুমি স্বজনের সদ্যোনাশে শোকে জরজর, সংসার আঁধার দেখিতেছ, থাকিয়া থাকিয়া তলদেশে মেদিনী ঘুরিতেছে, বাতাসে হুহু করিয়া সেই স্বজনের নাম ধ্বনিত হইতেছে, বুকের ভিতর বামদিকে কে যেন কীলক পুঁতিয়া দিয়াছে,— ঘোরতর বিষাদে তুমি অবসন্ন হইয়াছ। আকুলস্বরা কুলকুলনাদিনী কল্লোলিনীর তীরে তুমি অবসাদে উপবিষ্ট হইয়া আছ। দূরে গগন-পটোর চিত্রপটে তোমার দৃষ্টি পড়িল। সে যেন তোমাকেই ভুলাইবে বলিয়া রং ফলাইয়া বসিয়াছিল; তুমি চাহিবা মাত্র অমনই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পটে আঁকিতে বসিয়া গেল। শোকগভীর হৃদয় সহজেই এক-মনস্ক হয়,— তুমি একমনে সেই অপূর্ব চিত্রণ দেখিতে লাগিলে। তোমার সেই স্বজনের সৌম্যমূর্তিই-বা আঁকিবে। তা-তো নয়!— ভীষণ-দংষ্ট্র একটা বিষম ব্যাঘ্র কাহাকে যেন কামড়াইয়া রহিয়াছে। তোমার বোধ হইল, সেই ব্যাঘ্র-দষ্ট ব্যক্তিই যেন তোমার স্বজন। তোমার বুকের শেল কে যেন নাড়িয়া দিল, তোমার মর্ম-জ্বালা হইল,— গগন-চিত্রকরকে মহা নিষ্ঠুর

স্থির করিয়া মহা বিরক্ত হইলে।

তুমি মুখ ফিরাইবে, এমন সময় চকিতের মধ্যে দেখিলে যে, চিত্রপটে আর সে ভয়ানক ব্যাঘ্র নাই, তোমার সেই ভূপাতিত বন্ধু সৌম্যমূর্তিতে গগনের পট শোভা করিতেছেন, আর, একখানি সুন্দর হস্ত যেন তাঁহাকে আস্তে আস্তে কোথায় মন্দ মন্দ লইয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যেন একটু শীতল হইল, তুমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে; ভাবিলে, গগন-পটো খ্যাপা হউক, আর যাহাই হউক— মনের কথা বুঝিতে পারে,— পোড়া মন একটু শীতল করিতে পারে। মনে যদি একবার ধারণা হয় যে, লোকটা সহৃদয় এবং তোমার ব্যথার ব্যথী, তাহা হইলেই তাহাকে ভালোবাসিতে হয়। আর হৃদয় যখন শোকে-তাপে গম্ভীর, তখন ভালোবাসাও এক দিনে— এক মুহূর্তে প্রগাঢ় হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিলে যে, গগন তোমার ব্যথার ব্যথী, অমনই যেন তাহার উপর তোমার একটু ভালোবাসা জন্মিল। তুমি নদীতীরস্থ শষ্পশয্যায় শায়িত হইয়া একমনে, স্থিরনয়নে গগনের খাম্‌খেয়ালির কারিগরি পর্যালোচনা করিতে লাগিলে।

গগন আঁকিল— একটা বৃহৎ কুম্ভীর, সূচালো মুখ, কর্কশ গাত্র, কণ্টকিত লাঙ্গুল, কপিল বর্ণ, ভয়ঙ্কর ভঙ্গি— সব ঠিকঠাক হুবহু,— যেন অগাধ নীল জলে সাঁতার দিতেছে। হঠাৎ কুম্ভীর দ্বিখণ্ডীকৃত হইল, গায়ের কাঁটাগুলি তুলার মতো ফুলো ফুলো হইল, মুখ-কোণ সংযত হইল, রংটা কেমন একটু ঘোলা ঘোলা হইল। পরক্ষণেই দেখ, দুইটি নিরীহ মেষ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সেই নীল প্রান্তরে শনৈঃশনৈঃ বিচরণ করিতেছে। তুমি ভাবিতেছ, ভয়ঙ্কর কুম্ভীর যমজ মেষশিশু হইল; ভাবিতে না ভাবিতেই সে চিত্র নাই। সেই মেষদ্বয়ের স্থলে বিচিত্র বর্ণের বৃহৎ এক সদণ্ড পতাকা, খর খর বাতাসে যেন ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে। স্বজন-বিয়োগ-চিন্তা তোমার মন হইতে ক্ষণেকের তরে অন্তর্হিত হইল। বিষম রসখ্যাপা গগন তোমাকে আপনার পাগলামির কীর্তি দেখাইয়া তোমাকে হাসাইল। তোমার সেই মলিন ম্লান মুখের অধর-প্রান্তে সেই অন্তরের হাসি ঈষৎ দেখা দিল। তুমি অন্তরে বলিলে, পাগলা পটোর ভিতরের কথাটা ঠিক— সংসারের সকলই তো এইরূপ পরিবর্তনশীল, তা ঐ কেবল স্থাবর চিত্র আঁকিবে কেন?

এই চিন্তায় তুমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলে,— দেখিলে সে বিচিত্র নিশান আর নাই,— মৃদু আভায় একটি স্থির চিতা যেন ধীরিধীরি জ্বলিতেছে। সেই চিতার মধ্যে অস্পষ্ট অবয়বে তোমার সেই স্বজনের শবমূর্তি। শবদেহ কিন্তু নিষ্প্রভ নহে,— সূর্যাস্ত-কালের পূর্বদিকের পাত্‌লা মেঘের উপর ক্ষীণ রামধনুর ন্যায় একটু হাসি যেন সেই মুখ-প্রান্তে দেখা দিতেছে, চক্ষুর্দ্বয়ের প্রশান্ত শীতল জ্যোতি গগনের চিত্রান্তরে যেন স্থাপিত রহিয়াছে। সে চিত্র গগনের আর এক অপূর্ব কীর্তি। স্বর্ণময়ী একটি দিব্যাঙ্গনা সতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জায়, অথচ প্রৌঢ়-প্রোষিত-ভর্তৃকার স্বামী-সমাগমের আগ্রহে এবং বনশোভিনী সদ্যঃকুসুমিতা বসন্ত-লতার প্রফুল্লতা ভরে সেই চিতার সজীব, সহাস্য শব-দেহটিকে সুকোমল হস্ত-প্রসারণে আহ্বান করিতেছেন। সেই কাঞ্চনময়ী দিব্য মূর্তিতে তুমি তোমার বন্ধুর মৃতা পত্নীর মুখশ্রী লক্ষ্য করিলে— সেইরূপ পুরু পুরু জোড়া ভ্রূ— যেন তেমনই করিয়াই নীচের দিকে নামানো আছে, সেই স্থির নয়নে যেন তেমনই করিয়াই জ্যোৎস্না মাখানো আছে।

উপর স্তরে দিব্যাঙ্গনা ভাসিয়া ভাসিয়া নিম্নস্তরের চিতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিম্নস্তরের চিতাও শবদেহ লইয়া দিব্যাঙ্গনার দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল,— কাছাকাছি হইল, তোমার চক্ষুতে জল আসিল; চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলে সে সব আর কিছু নাই,— গগন-পটো নীল পটের এখানে সেখানে কেবল কাঁচা সোনার স্তবক আঁটিতেছে, আর তাহাতে জরদ, ধূমল, পাংশু কত বিচিত্র রঙের শেড্ দিতেছে। তুমি উঠিয়া বসিলে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে, এবার মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলে,— 'গগন সকলকেই জানে,— সকলকেই চেনে; আমরা কিন্তু উহাকে কেহই চিনিতে পারিলাম না। দেখ, আমাদের সকল সংবাদই রাখে, আমরা কিন্তু উহার কিছুই জানি না।'

গগনের কার্য-সাধন হইয়াছে। তাহার সহিত একবার ঘনিষ্ঠতা করিলেই সে তাহার অস্থাবর পট দেখাইয়া তোমার কিছু-না-কিছু ভালো করিবেই। হয় তোমার মনের কবাট খুলিয়া দিবে, নয় তোমার শোকের সান্ত্বনা করিবে। কখনও হয়তো তোমার আনন্দের সংবর্ধনা করিবে, আবার কখনও হয়তো তোমাকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিবে। আজ সে তোমার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়াছে, তোমার মাথা হাল্‌কা হইয়াছে বটে,— এখন আর ঘুরিতেছে না; বাতাস এখনও হু হু করিতেছে— এখনও পিলুরাগিণীতে ভরিয়া আছে, কিন্তু এখন তো আর তোমার বন্ধুর নাম করিয়া কাঁদিতেছে না; বুকে এখনও শেল বাঁধিয়া আছে বটে, কিন্তু তেমন করিয়া আর তো কেহ তাহাকে মোচড় দিতেছে না। গগনের কার্য সমাধা হইয়াছে। গগন তোমার শোকবহ্নির প্রখরতা নষ্ট করিয়াছে। তুমি এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া দেখিলে পশ্চিমের দিক্-চক্রবাল ব্যাপিয়া ঘন সন্নিবেশিত শাল-বিটপি-আচ্ছাদিত পর্বত-বেদীর উপরি জ্বলন্ত কাঞ্চনরাগে এক অপূর্ব প্রতিমা দীপ্তি পাইতেছে। গগন-পটোর সেই এক প্রিয় প্রতিমা। মাস মাস ধরিয়া প্রত্যহই আঁকে, আর প্রত্যহই পুঁছিয়া ফেলে,— তাহার বিরক্তিও নাই, তৃপ্তিও নাই।

ঐ প্রতিমা একখানি আশ্চর্য ছবি। গগন-পটো প্রায়ই প্রত্যহ আঁকে, আর আমরাও তো প্রায়ই প্রত্যহ দেখি, তবু নিত্যই নূতন। পুরাণের পুরাণ মহাপুরাণকে নূতন করিয়া দেখাইতে গগন-পটো যেমন পটু, এমন আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু কেবল তাই বলিয়া যে পশ্চিমের প্রতিমা আশ্চর্য ছবি, তাহা নহে। ও-এক আজগুবি কাণ্ড।— মুখ নাই অথচ দেখ কেমন হাসিতেছে; চোখ নাই, ভ্রূ নাই— তবু দেখ কেমন চোখ রাঙাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া রহিয়াছে। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য— ঐ মধুর হাসিতে আর ঐ ভীষণ ভ্রূকুটিতে দেখ দেখি কেমন মাখামাখি. কেমন মেশামেশি। পৌরাণিকী অন্ধকারময়ী কালীমূর্তিতে একবার প্রসন্নাং স্মিতাননাং করালবদনাম্ দেখিয়াছ, আর একবার গগন-পটোর ঐ জ্বলন্ত চিত্রে ললিতে-ভৈরবে, কোমলে-ভীষণে অপূর্ব মিলন দেখ। ঐ দেখ কেমন অপূর্ব হাসি! ঢল ঢল তপ্ত কাঞ্চনসাগরে যেন অমৃতের লহরী উঠিল। ঐ দেখ কেমন রাগ! ব্রহ্ম-কোপানলে যেন খাণ্ডব দাহ হইবে। ঐ দেখ নিঃশব্দ, তবু যেন তোমাকে স্বর্গের বার্তা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেছে; চক্ষু নাই, তবু যেন তোমার মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। আর দেখ, নিশ্চল, সুস্থির— তথাপি যেন হাত তুলিয়া তোমাকে অভয়দান করিতেছে, আশীর্বাদ করিতেছে। এস, আমরা প্রণত হই। সঙ্গে সঙ্গে মহাশিল্পী গগন-

চিত্রকরকে নমস্কার করি এবং তাহার ওস্তাদকে একবার দেখাইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করি।

গগন-দাদা! তোমার খ্যাপামিতে ক্ষান্ত দিয়া একবার আমাদের গুটিকত কথা শুন। গঙ্গার উপর তোমার প্রভাতচ্ছবি, পর্বত-পৃষ্ঠে তোমার এই সন্ধ্যার প্রতিমা, প্রাবৃটের সেই ঘনকৃষ্ণ সিংহাসন, নিদাঘের সেই রৌদ্রমূর্তি— ও-সকল কারিগরি তোমার অনেকবার দেখিয়াছি। তোমার বিচিত্র পট দেখিয়া অনেকবার জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি; কিন্তু ঐ সকল বিচিত্র চিত্রে আত্মহারা হই বটে, অথচ পরমার্থ পাই না, তুষ্টি হইলেও তৃপ্ত হয় না। না দাদা আর খ্যাপামি করিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার এই সকল ছায়াময়ী প্রতিমার অন্তরস্থ প্রতিমা আমাকে সেই সে দিনের মতো আর একবার দেখাও। তোমার সেই বিষম ভেল্‌কি আর একবার ভাঙিয়া দাও। এই ছায়াবাজির ছায়া-পট একবার ক্ষণ-মুহূর্ত-জন্য সরাইয়া দাও— আমি আর একবার তোমার সেই নীল, নীল, অতি নীল বাজিঘরের অভ্যন্তরস্থ তোমার ওস্তাদকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব। সে দিন তুমি দেখাইলে বটে, কিন্তু আমি যে কি দেখিলাম, তাহার কিছুই বুঝিলাম না। কোমলের কোমল অতি কোমল বংশীরবে আমার মোহ হইল; নীল-মধ্যে অতি নীল দেখিতেছিলাম, সমস্ত জগৎ নীল আভায় প্রতিভাত হইল— আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর তুমি তোমার ছায়াপটে তুলারাশি ছড়াইয়া হাসিতে লাগিলে। না দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, এবার আর ও-সময়ে খ্যাপামি করিও না; ভালো করিয়া তোমার ওস্তাদকে একবার দেখাও।

□ *নবজীবন*, ২য় ভাগ, পৌষ ১২৯২

তৃতীয় মুকুল

মীর মশাররফ হোসেন

জন্মভূমি কাহার না আদরের? মানুষের তো কথাই নাই,— পশু পক্ষী কীট পতঙ্গগণও জন্মস্থানের মায়া মমতা বোঝে,— আদর যত্ন করে। কোনো শাস্ত্রে বলিয়াছেন "জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী।" অর্থাৎ গৌরবযুক্ত, পূজনীয়, মহিমান্বিত, মাননীয়। কোনো প্রাচীন কবি জন্মভূমির কি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। যথা— হাজরাত সোলেমানের অপূর্ব সুখপ্রদ সিংহাসন হইতেও জন্মভূমি অতি উৎকৃষ্ট, সুখশান্তিময় প্রিয় স্থান। জন্মভূমি কণ্টকাকীর্ণ অতি কদর্য হইলেও সুগন্ধিময় সুরঞ্জিত সুন্দর লতা-সজ্জিত নয়ন-সুখ পরিবর্ধক প্রীতিকর পুষ্পোদ্যান হইতেও আরামের স্থান।

হায়রে জন্মভূমি! জন্মভূমির দৃশ্য নয়ন-মন-প্রীতিকর। বসবাসে আনন্দে সুখচ্ছ্বাসে হৃদয়ের শান্তি যাহার প্রীতিপদ স্থান, মহা পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র, ধূলিময়লা আবর্জনা— প্রকৃত সুসন্তান পক্ষে স্বর্ণ রজত অপেক্ষাও মূল্যবান। পূতিগন্ধবিশিষ্ট অপেয় জল, স্বর্গীয় সুগন্ধীময় বারি অপেক্ষাও সুমধুর। যাহার কর্দমরাজি সুগন্ধী চন্দনসদৃশ। বনপুষ্প সকল নন্দনকাননের পুষ্প হইতেও আদরের। এ সকল কাহার পক্ষে? মাতৃদ্রোহী সন্তানের পক্ষে নহে, স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারের পক্ষে নহে। জন্মভূমি-বৈরি নিষ্ঠুর পামরের পক্ষে নহে। এ দৃশ্য জন্মভূমির যথার্থ সন্তান প্রকৃত পুত্রগণের আর অতিপ্রিয় বংশধরগণের পক্ষেই শোভা পায়।

হাজরাত মোহাম্মদ (দঃ) শত্রুগণের শত্রুতায় পবিত্র জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগের পর, ছয় বৎসর অন্তর গত বর্ষে পর্বোপলক্ষে সঙ্গিগণসহ যাত্রীব বেশে জন্মভূমির মুখদর্শন আশে গমন করিয়াছিলেন। কোরেশগণ মক্কার নিকটবর্তী স্থানে বাধা দিয়া নগরাভিমুখে তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দেন নাই। এই মাসে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ, মহাপাপের কার্য, তাই নিরুপায় হইয়া দশ বৎসরের জন্য সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।[১] সন্ধিপত্রের মর্মানুসারে এবারে অর্থাৎ বারোমাস পরে নিরস্ত্রভাবে মক্কায়, তীর্থদর্শন উপলক্ষে দলবলসহ যাইবার অধিকার আছে, কিন্তু যথেচ্ছ কাল থাকিয়া জন্মভূমি মুখদর্শন সাধ্য নাই। মাত্র তিন দিন জন্মভূমিতে বাস করিতে পারিবেন। সেই তিন দিন যে জন্মভূমির মুখ দর্শন, সুখসেব্য বায়ু রৌদ্র আহার্য ভোগ করিবেন, স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া নয়ন মন

১. মোসলেম বীরত্বের অষ্টম সোপান দেখুন।

শীতল করিবেন, এইক্ষণে সেই আশাই তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জন্মভূমির কথা হাজরাতের মনে পড়িতেই আর কি কথা আছে? সমুদায় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমির মুখদর্শনে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। প্রধান প্রধান ঘটনা ও কার্যের মীমাংসা ও উপদেশ কিছুই না করিয়া সমুদায় কার্য স্থগিত রাখিয়া মাত্র তিন দিন যে জন্মভূমির সেবা করিতে পারিবেন, তাহাতেই প্রাণ, মন ঢালিয়া দিয়া বহুসংখ্যক শিষ্যসহ সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে মক্কা যাত্রা করিবেন।

পথিমধ্যে বাধা বিঘ্ন কিছুই ঘটিল না। কোনো অসুবিধা হইল না, দলবলসহ মহাহর্ষে মহানগরী মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কোরেশগণ হর্ষ বা বিষাদ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। হাজরাত মোহাম্মদকে সাধারণ যাত্রীর ন্যায় সাধারণভাবে গ্রহণ করিলেন। ধর্মের ডঙ্কা স্বভাবতই বাজিয়া উঠে। সত্যের জয় বিনা চেষ্টায় প্রায় স্বভাবতই হইয়া থাকে। হাজরাত মোহাম্মদ অনুচরগণসহ মক্কায় অবস্থিতি করিতেছেন, এই শুভবিজ্ঞাপন ডঙ্কা, ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল। ইসলাম ধর্মের সত্যতা দুন্দুভি ভেরি ইত্যাদি যেন নগরচতুর্দিক হইতে স্বভাবত বাজিয়া সর্বসাধারণ জনগণকে আকুলিত করিয়া তুলিল। গৃহে প্রাঙ্গণে, রাজপথে, শয়নশয্যায়, প্রান্তরে, শৈলশিখরে, পর্বতগুহায় নরনারীমুখে ইস্‌লাম ধর্মের গুণগরিমা বিশদরূপে বর্ণিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হাজরাতের প্রেরিত তত্ত্ব পয়গম্বরী বিষয় বিশেষরূপে সমালোচিত হইতে আরম্ভ হইল। অনেকের চিত্তক্ষেত্রে করুণাময় খোদাতালার সুদৃষ্টির সূক্ষ্মাগ্র অংশ দ্বারা জ্যোতির্ময় অক্ষরে অঙ্কিত হইল—

"লা এলাহা এল্লাল্লাহ্
মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্।"

আর ভয় কাহার? দেবদেবী ঠাকুর দেবতা, জ্ঞাতি সমাজ এবং কোরেশগণের ভয় দূর করিয়া শত শত নরনারী হাজরাত মোহাম্মদের পদাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। হাজরাতের সুজনতা, অমায়িকতা, সহৃদয়তা, সরলতা, স্নেহ ও দয়া দেখিয়া, বিশেষরূপে হৃদবোধ করিয়া অনেক পাষাণ প্রাণ কোরেশের মন গলিয়া গেল। মহাবীর মোহাম্মদ খালেদ, যিনি ওহোদ যুদ্ধে পরাক্রম করিয়া মোসলেমগণের অতি বিধ্বস্ত শেষে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আজ সেই মহাবীর খালেদ হাজরাতের বক্তৃতায় মজিয়া— সদ্ব্যবহার সরলতা এবং খোদা প্রেমে অনুরক্ত দেখিয়া, পৌত্তলিকতা অসার মিথ্যামূর্খতার আদর্শ বিবেক বুদ্ধির অন্তরায় বুঝিয়া, মহাআগ্রহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। মহাকবি আহম্মদ— যাঁহার রচনার কৌশলে বর্ণনার বৈচিত্র্যে শব্দযোজনার অপূর্ব শক্তিপ্রভাবে, ভাব অর্থে বিদ্রূপ-শ্লাঘার সুতীক্ষ্ণ বিষবাণে মোসলেমগণের হৃদয় যে বিদ্ধ হইতেছিল, রচিত পদ্যের এক একটি পদ সুধার ছুরিকা আঘাতের ন্যায় কলেজা পার করিতেছিল, এলাহিকৃপায় বিনা আহ্বানে আরবের সুবিখ্যাত মহাকবি আজ হাজরাতের চরণতলে সজলনয়নে মার্জনাপ্রার্থী হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

আবু সুফিয়ান এবং দলের প্রধান প্রধান কোরেশগণ ইসলামধর্মের অপূর্ব আকর্ষণ শক্তি ও ক্ষমতা দেখিয়া মহাভয়ে আতঙ্কিত হইলেন। বলিতে লাগিলেন, "হায়! একি ব্যাপার! একি কাণ্ড দেখিতেছি! অনুরোধ নাই, আহ্বান নাই, বলপ্রয়োগের কথা নাই, ভয়

প্রদর্শন নাই,— তীর্থ যাত্রী; তাহারই উপদেশে তাহারই বক্তৃতায় স্বর্গীয় সুখশান্তির বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া, প্রাচীন-প্রবীণ শক্তিশালী বীর, সাধারণ যুবা— দলে দলে যুবতী বন্ধা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া মোহাম্মদের প্রচারিত ধর্ম মনের আনন্দে গ্রহণ করিতেছে। কি আশ্চর্য! গতকল্য যে ব্যক্তি মোহাম্মদের শত কুৎসাপূরিত গান-গাথা রচনা করিয়া গাহিয়া সহস্র প্রকারে আনন্দ অনুভব করিয়াছে, আজ একি শুনিতেছি— হায়! হায়! একি শুনিতেছি। প্রাতে যাহার মুখে পূর্বপুরুষানুমোদিত পূজিত পৌত্তলিক ধর্মের শত শত প্রশংসা ধর্মের গুণানুবাদ ধর্মরক্ষার্থে জীবনপণ! ধর্মের নিকট জীবনের মূল্য কি? এই সকল মূল্যবান কথা শুনিয়াছি, দিবা অবসান হইতে না হইতেই একি শুনি? হায়! হায়! একি শুনি! সেই ব্যক্তিগণ মোহাম্মদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। কি আশ্চর্য ব্যাপার।

কি গুরুতর ভয়ের কথা! কাল যে ব্যক্তি দেবদেবীর পদ চুম্বন করিয়া মাথা ঠুকিয়া দেবতার পদলেহন করিয়া দেবদেবীর পদপ্রান্তে গড়াগড়ি দিয়াছে, কত ভক্তিভাবে পূজার আয়োজন করিয়া পূজা করিয়াছে, আজ সেই ব্যক্তি তাহার পূর্বপুরুষগণ স্থাপিত গৃহদেবতা, পূজনীয় পরমেশ্বরকে সম্মার্জনী দিয়া সম্ভাষণ করিয়া পদাঘাতে দূর করিয়া দিতেছে। কেহ ঘৃণার সহিত অতি কদর্য স্থানে দেবতাগণকে নিক্ষেপ, কেহ বা অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা বিদূরিত করিতেছে। অধিক আশ্চর্যের কথা ধর্মভীরু কোমলপ্রাণা কুলকামিনীগণ— হৃদয়ে স্তরে স্তরে 'পৌত্তলিক ধর্ম অসার অকর্মণ্য মিথ্যা' এই সকল কথা প্রবেশ-মাত্রই যেন শঙ্কিত হইয়া, ইসলামধর্ম গ্রহণে আকুলিতা করিয়া তুলিয়া মোহাম্মদের পদানত করিতেছে। কেহ পরকাল ভয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছে, ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করিয়া তখনই যেন সুস্থির হইতেছে। একি কথা! গৃহ-দেবতাদিগের লাঞ্ছনা অবমাননা অমর্যাদার সীমা নাই। চিরকাল আদরে রক্ষিত— ভক্তিভাবে মহাযত্নে পূজিত— সেই দেবদেবীর মুখে আজ নিষ্ঠীবন— থুথু, কফ, কাশি গয়ার নিক্ষেপ করিয়া মহানন্দে সুখভোগ করিতেছে। কোনো কোনো সীমান্তিনী দেবদেবীর নাক কান কাটিয়া রক্তরাগরঞ্জিত চরণে দলিয়া অতি জঘন্য স্থানে ফেলিয়া দিয়াছে। মোহাম্মদের কুহকমন্ত্রে— বক্তৃতারূপ মোহমন্ত্রের পেঁচাও পেঁচে, মহাপাপ ভয়ে কি ইহাদের অন্তর হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে? একেবারে হৃদয় ছাড়িয়া বোধশক্তির সীমার অতীত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। না— যায় নাই— যায় নাই! ইহার পরিণাম আছে। এত বাড়াবাড়ির শেষ আছে। পূজনীয় দেবতাগণের এত অপমান আমাদেরই অসহনীয়। তাঁহারা দেবতা। কি কারণে যে এতক্ষণ চুপ করিয়া আছেন, কিছুই বলিতেছেন না। নরাধমদিগের সমুচিত শাস্তির বিধান করিতেছেন না, কারণ কি? আক্ষেপের বিষয়— শত আক্ষেপের বিষয়!— উহারা শীঘ্রই অধঃপাতে যাইবে। এদেশে সচরাচর যাহা ঘটে না তাহাই ঘটিবে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইয়া উহাদিগকে সর্বাংশে সবংশে নিপাত করিবে।

কেহ বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে মোহাম্মদ অজেয়। মানবশক্তি তাহার ক্ষমতার নিকট কোনো পদার্থেরই নহে। যাদুমন্ত্রে সে এতই পরিপক্ক যে, আজ পর্যন্ত

তাহাকে কেহ কিছুতেই পরাস্ত করিয়া হীনবল করিতে পারিল না। প্রাণসংহার করা তো পরের কথা। কতবার কত প্রকার কত পথে তাহার প্রাণসংহারের যোগাড়যন্ত্র করা গিয়াছে, কৈ কে কি করিতে পারিয়াছে? তাহার মস্তকের একগাছি কেশও উৎপাটন করিতে পারে নাই। এখন তার শক্তি অজেয়। রাজা বলিলেও হয়। সম্রাট্ বলিলেও হয়। যাদুমন্ত্রেও তাহার অসীম ক্ষমতা। যাহাই হউক— এক্ষণে আমাদের আপন আপন ঘর রক্ষার উপায় উপযুক্ত মতে করিতে হইতেছে। যাহারা ইস্‌লামধর্মের পক্ষ হইয়া গৃহ-দেবতার অবমাননা করিতেছে, তাহারা কোথায় গিয়া বাঁচিবে? নিশ্চয়ই দেবতাদিগের ক্রোধে দৈবশক্তি তাহাদিগকে অচিরেই আক্রমণ করিবে, শাস্তির অবধি থাকিবে না। কর্মানুযায়ী ফল অবশ্যই ফলিবে— প্রাপ্ত হইবে। তবে যতদিন মোহাম্মদ এ নগরে থাকিবেন ততদিন দেবতাগণ ঐসকল ধর্মদ্রোহী, দেবতা-বিদ্বেষীদিগকে কিছু নাও বলিতে পারেন। কারণ, এ সকল বাজে দেবতা মোহাম্মদকে দেখিয়া নিশ্চয়ই ভয় করিয়া থাকেন। মোহাম্মদের নামে কাঁপিতে থাকেন, তাহা না হইলে, এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও একটু নড়াচড়া, গা-ঝাড়া দিয়া খাড়া হইয়া চক্ষুরাঙানি কি তাড়াহুড়া কিছুই করিতেছেন না। আমাদের রক্ষিত চিরপূজিত কাবাগৃহের দেবতাদিগের নিকট মোহাম্মদ আসুন দেখি? হাবাল দেবের এক দৃষ্টিতে কোথায় ভস্ম হইয়া যাইবেন, তাহার সন্ধানও পাওয়া যাইবে না।"

আর একজন প্রাচীন প্রবীণ কোরেশ বলিলেন, "অহো ভ্রাতঃ! তাহাই বা কি করিয়া বুঝি! মোহাম্মদ যখন মক্কায় ছিলেন, সে সময় কাবাগৃহের দেবতাদিগকে কত মন্দ বলিয়াছেন, কৈ, তাঁহারা তো কিছুই করিতে পারিলেন না। মোহাম্মদের প্রাণ-বিনাশ জন্য কত পূজা করা হইয়াছে, সাত রাত সাত দিন ধন্না দিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়া হইয়াছে, কৈ দেবতারা তো কিছুই করিলেন না?

—"আবু জেহেল" যুদ্ধযাত্রার সময় শত প্রকার ভোগ দিয়া, কত প্রার্থনা করিয়া, করুণস্বরে কত কান্না কাঁদিয়া, যুদ্ধ জয় হইলে হীরামতির অলংকারে মনোমতো সাজাইবে আশা দিয়া, যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়া মোহাম্মদের প্রাণবিনাশ করিতে পারিলে 'হাবাল দেব' 'লাত' 'গোরী' এই তিন প্রতিমার আপাদমস্তক হীরকাভরণে জড়াইয়া দিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল— কি হইল? আবু জেহেলই পরাস্ত হইল— প্রাণও হারাইল। এই সকল দেবলীলা, দেবমহিমা দেখিয়া আমাদের মনে নানারূপ সন্দেহ হইয়াছে। এ কি ভাবের খেলা। দেবদেবীর এ আবার কিরূপ লীলা?— এ দিকে মেরেকুটে সর্বনাশ,— ওদিকে কথাটি নাই।"

প্রথম বক্তা বলিলেন—

"অহে! ও সকল দেবলীলা ঠাকুরে খেলার কথা রাখিয়া দেও,— আমাদের দলের প্রধান প্রধান নেতাগণ মোহাম্মদ সম্বন্ধে কি যুক্তি করিয়া আসিলেন, তাহাই শুনা যাউক। দেবতারা যাহা পারিবেন, যাহা করিবেন, তাহার নমুনা মোহাম্মদের মক্কা আগমনেই বুঝিতে পারিয়াছি।"

প্রাচীন প্রবীণ কয়েকজন কোরেশকে, কাবাগৃহের নিকটস্থ রাজপথপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া, আবু সুফিয়ান, প্রভৃতি দলপতিগণ, তাহাদের নিকটস্থ হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই

কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আবু সুফিয়ান বলিলেন—

"মানুষেরই ভুল হয়। দেখুন! এত চিন্তা করিয়া সন্ধিপত্র লিখা হইল— মোহাম্মদকে নানা চক্রে ফেলিয়া এরূপভাবে সন্ধি করা হইল যে, নিয়ম ও শর্তগুলি সমুদায় আমাদেরই অনুকূলে। আমাদের স্বার্থ— পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিয়া সন্ধিপত্র পূর্ণ করা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় এ প্রথাটা কাহারও মনে উদয় হয় নাই যে, মোহাম্মদ অস্ত্রবিহীন হইয়া সঙ্গিগণসহ যে তিন দিন মক্কা নগরে বাস করিবেন, সে তিন দিন মধ্যে তীর্থদর্শন, তীর্থের কার্যাদি সম্পন্ন করা ভিন্ন, কোনো প্রকার বক্তৃতা কি ধর্ম কোনোরূপ উপদেশ অথবা ধর্মপ্রচার করিতে পারিবেন না। মক্কা অবস্থান কালে ঐ তিন দিনের মধ্যে কোনো নর-নারীকে ইস্‌লামধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন না। অপর অপর যাত্রিগণ যেমন পর্বোপলক্ষে নীরবে আসিয়া— নীরবে চলিয়া যায়, মোহাম্মদকেও সেই ভাবে আগমন, সেই প্রকার গমন করিতে হইবে। সন্ধিপত্রে এই কথা লিখা থাকিলে কি উপস্থিত ঘটনা সকল এইক্ষণে ঘটিতে পারিত? যাহা হইবার হইয়াছে। গতবিষয়ে আর অনুতাপ অনুশোচনা করিয়া কি করিব। কোনো উপায় নাই। উপস্থিত কথার সিদ্ধান্ত ইহাই হইল যে— তিন দিনের অতিরিক্ত এক দণ্ডও মোহাম্মদকে এ নগরে থাকিতে দেওয়া নয়। তিন দিন তো অতীত। এই সন্ধ্যার পর রাত্র, রাত্রের পরেই প্রভাত। কি জানি মোহাম্মদ যদি প্রভাতে নগর পরিত্যাগ না করেন, কি আরও দুই এক দিন থাকিতে ইচ্ছা করিয়া আমাদের নিকট সময় চাহিয়া পাঠাইলে সময় না দেওয়া অসরল ভাবের লক্ষণ বুঝাইবে, তাহাতেই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, রাত্র প্রভাত হইলেই তাঁহাকে জানানো হইবে যে তিন দিন অতীত হইয়াছে, আপনি নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউন। একথা বলিলে, আর তিনি তিলার্ধ কালও এ নগরে বাস করিবেন না। তাঁহার যে কথা সেই কার্য। দুই এক দিন থাকিতে ইচ্ছা থাকিলেও সে কথা আর মুখে আনিবেন না, নগরেও থাকিবেন না।

"কারণ— তাঁহার প্রস্তাবের আগেই যদি আমরা তাঁহাকে যাইতে বলি তিনি অবশ্যই যাইবেন। থাকিতে ইচ্ছা থাকিলেও আর সে কথা মুখে প্রকাশ করিবেন না। যাই হউক, আগামীকল্য অতি প্রত্যুষে মোহাম্মদকে এ নগর হইতে যাইতে অনুমতি করিতে হইবে। এক মুহূর্ত কালও মক্কায় থাকিতে দেওয়া হইবে না। অগ্রে বুঝিতে পারিলে তিন দিন নগরে থাকার কথায় কখনও স্বীকার হইতাম না। নিতান্তই অবোধ ও অদূরদর্শী আহম্মকের ন্যায় কার্য করা হইয়াছে। বৎসরে বৎসরে এইরূপ তিন দিনের জন্য মক্কায় আসিলে আমাদের আর কিছুই থাকিবে না।"

যাঁহারা পূর্ব হইতেই দণ্ডায়মান ছিলেন— কথাবার্তা কহিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন—

'কি বলিতেছেন? সত্য সন্ধান কি কিছু প্রাপ্ত হন নাই? বৎসরে বৎসরে তিন দিনের জন্য আসিলে, "থাকিবে না" বলিতেছেন? সে কি কথা? এবারেই যে প্রায় যায় যায় হইয়াছে।'

আবু সুফিয়ান দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন— "সেইজন্যেই তো বলিতেছি। আগামী প্রত্যুষেই নগর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। আগামী বৎসরে যাহাতে না

আসিতে পারে, তাহার উপায়ও করিতে হইবে।"

পূর্ববক্তা একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,— "আবু সুফিয়ান! এখন আর কি উপায় করিতে পার? সন্ধিভঙ্গ না করিতে পারিলে আর কোনোরূপ আশা— মনের কোণেও স্থান দিও না।

"সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও ভাবিয়া রাখিও— আক্রমণের ক্ষমতা জন্মিল না— সন্ধিও ভঙ্গ হইল না। মোহাম্মদ এবারে যেমন আসিয়াছেন, আবারও আসিবেন। সন্ধিমতানুসারে যাত্রীর বেশে নিরস্ত্র হইয়া কতক সঙ্গিগণসহ নগরে আসিলেন। তোমরা বাধা দিতে পার না— বাধা দেওয়া হইল না, নির্বিঘ্নে মক্কানগরে আসিয়া আড্ডা গাড়িলেন। তৎপর দিনই সশস্ত্র মোস্‌লেম-বাহিনী ভীম পরাক্রমে আসিয়া যদি তোমাদিগকে আক্রমণ করে তখন তোমরা কি করিবে? তোমরা অপ্রস্তুত, তোমরা নিরস্ত্র —তাহারা সাজিয়া গুজিয়া অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিবে। তোমরা যদি বাধা দিতে সাহসী হও— বাধা দিতে পারিবে না— তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিবে না। তোমরাই সন্ধিভঙ্গ করিতেছ বলিয়া মোহাম্মদের সঙ্গিদল তোমাদের পশ্চাৎ হইতে স্পষ্টভাবে আক্রমণ করিবে। ভায়া! তখন উপায়?"

আবু সুফিয়ান একথার কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন,— "যাহাতে সন্ধি ভঙ্গ হয় অগ্রে তাহারই চেষ্টা করিব। এখন সে সকল কথার আলোচনা করা হইবে না। মোহাম্মদ নগর পরিত্যাগ করিলে মনের কপাট খুলিয়া সকলে একত্রে পরামর্শ করিব। স্থূল কথা, এ সন্ধি ভাঙিয়া নতুন সন্ধির বিধানে মোহাম্মদকে বাঁচিতে হইবে। এইক্ষণে এই স্থির হইল রাত্রি প্রভাত মাত্রেই মোহাম্মদকে নগর ছাড়িয়া যাইবার আদেশ করা যাইবে।"

"তাহা করুন। কিন্তু নগরের অনেক নর-নারীর মনের ভাব অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছে। মুখে যাহাই বলুক— অনেকেই হৃদয়ের সহিত মোহাম্মদের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা প্রকাশ্য ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা তো আমাদের দল চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া গিয়াছে— অনেকেই যায় যায় করিয়া স্থির করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আর দুই একদিন মোহাম্মদ এই নগরে থাকিলে নগরবাসিমধ্যে প্রায় অর্ধাংশ নর-নারী তাহার ধর্ম গ্রহণ করিবে।"

আবু সুফিয়ান বিমর্ষভাবে বলিলেন,— "দেখা যাক্‌, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? প্রত্যূষের কার্য যেন, কার্যকর্তাগণ অতি প্রত্যূষেই সাধনা করেন।"

এই কথা স্থির করিয়া কোরেশগণ স্ব স্ব গম্য পথে গমন করিলেন। আরব-গগনের সূর্যও মানব-চক্ষের অন্তরাল হইল।[১]

১. *বিষাদ-সিন্ধু*, ১৮৮৫-৯১

☐ *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, পৃ. ১৫-২৩

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা

শিবনাথ শাস্ত্রী

অতঃপর আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইতেছি। ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিগেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল। তাহার ক্রম কিঞ্চিৎ নির্দেশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

ইংরাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া কিরূপে রাজা হইয়া বসিলেন, সে ইতিবৃত্ত আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বণিকদিগের মনে রাজভাব প্রবেশ করা, ইহা দুই দশ দিনে ঘটে নাই। যতদিন তাঁহারা বণিক ছিলেন, ততদিন ভাবিতেন এদেশের লোকের সুখ দুঃখের সঙ্গে, উন্নতি অবনতির সঙ্গে, আমাদের সম্বন্ধ কি? আমরা বৈধ অবৈধ যেরূপ উপায়েই হউক এখান হইতে অর্থোপার্জন করিয়া লইয়া দেশে যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ। এইভাব কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মনে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সমুদয় কর্মচারীর মনে বহুদিন প্রবল ছিল। প্রথম প্রথম কোম্পানির কর্মচারীগণ এরূপ স্বল্প বেতন পাইতেন যে, সেরূপ স্বল্প বেতনে ভদ্রলোক এত দূরদেশে আসে না। কিন্তু অবৈধ অর্থোপার্জনের উপায় এত অধিক ছিল যে, তাহার প্রলোভনে লোকে এদেশে আসিতে ব্যগ্র হইত। এই সকল কর্মচারীর অধিকাংশকে ফ্যাক্টর বা কুঠিওয়ালা বলিত। কুঠিওয়ালাগণ কোম্পানির কুঠি সকলের পরিদর্শন করিতেন, বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, হিসাবপত্র রাখিতেন এবং বিবিধ প্রকারে কোম্পানির সওদাগরি কার্যের সহায়তা করিতেন।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি যখন দেওয়ানি সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির কর্মচারীদিগকে লইতে হইল। ফৌজদারি কার্যের ভার মুরশিদাবাদের মুসলমান গভর্নমেন্টের হস্তেই থাকিল। যখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে আসিল, তখন কুঠিওয়ালাগণই কালেক্টর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানির এজেন্টের ন্যায় সওদাগরির তত্ত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেক্টরের কাজও করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ

করিল না। যেরূপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাবটা তাঁহাদের মনে প্রবল থাকিল। আমরা দেশের রাজা, প্রজাদিগের সুখ দুঃখের জন্য আমরা দায়ী, এভাব তাঁহাদের মনে প্রবেশ করিল না। প্রমাণ স্বরূপ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অগ্রেই বলিয়াছি নবপ্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন প্রজাকূলের দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ নিবারণের জন্য কিছুই করেন নাই। কেবল তাহা নহে; ইহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ হয় যে, দুর্ভিক্ষের বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রজা-সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তথাপি রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়া হয় নাই। সে বৎসরে যাহা আদায় হইতে পারে নাই পর বৎসরে সে সমগ্র আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তদানীন্তন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস বাহাদুর ১৭৭২ সালে ৩ নভেম্বর দিবসে ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষকে যে পত্র লেখেন তাহাতে রাজস্ব আদায়ের নিম্নলিখিত তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৬৮-৬৯ সালে ১৫২৫৪৮৫৬ টাকা; ১৭৬৯-৭০ সালে ১৩১৪৯১৪৮ টাকা; ১৭৭০-৭১ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরে ১৪০০৬০৩০ টাকা; এবং ১৭৭১-৭২ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পর বৎসরে, ১৫৭২৬৫৭৬ টাকা। তবেই দেখা যাইতেছে তখন রাজগণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাবৃন্দের রক্তশোষণ করিতে ছাড়েন নাই। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, দুর্ভিক্ষের বৎসরে প্রজা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যদি কালগ্রাসে পতিত হইল, তবে পর বৎসরে এত রাজস্ব আদায় হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে হেস্টিংস বাহাদুর তাঁহার পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

> "It was naturally to be expected that the diminution of the revenue should have kept an equal pace with the other consequences of so great a calamity. That it did not was owing to its being violently kept up to its former standard. To ascertain all the means by which this was effected will not be easy. * * * * One tax, however, we will endeavour to describe, as it may serve to account for the equality which has been preserved in the past collections, and to which it was principally contributed. It is called Najar, and it is an assessment upon the actual inhabitants of every inferior description of lands to make up for the loss, sustained in the rents of their neighbours, who are either dead or fled from the country."

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়া রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের নিকট হইতে সুদে আসলে বলপূর্বক আদায় করা হইয়াছিল। এই ব্যবহারের স্বপক্ষে হেস্টিংস বাহাদুর এইমাত্র বলিয়াছেন যে, এরূপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল। এবং গভর্নমেণ্ট সাক্ষাৎভাবে এ প্রকারে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ করেন নাই। কিন্তু ইহাতে সংশয় নাই, তাঁহারা অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ গর্হিত উপায়ে রাজস্ব আদায় হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার মূল বক্তব্য এই যে, ইংরাজগণ দেশের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও বহুদিন রাজার দায়িত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। রাজার দায়িত্ব বুঝিলে প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার সম্ভব নয়। গ্রামের একজন সামান্য জমিদার যাহা করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহারা করেন নাই। দেশীয় রাজগণ সর্বদাই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিপদের সময় রাজস্ব রেহাই দিয়া থাকেন এবং এখনও দিতেছেন। আমাদের বাস-গ্রামে জনশ্রুতি আছে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের জমিদারগণ পর্বত সমান অন্নের স্তূপ ও শালতি ভরিয়া ডাল রাঁধিয়া শত শত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাকে বহুদিন আহার করাইয়া বাঁচাইয়াছিলেন।

এইরূপে বণিকদিগের রাজা হইয়া বসিতে ও রাজার কর্তব্য সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে অনেক দিন গেল। অপর দিকে প্রজাদিগেরও নূতন রাজাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিল। প্রথম প্রথম এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজেরা এদেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবেন কি না? পলাশীর যুদ্ধে তাঁহারা দেশ জয় করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে অন্তর্বিদ্রোহ চলিল। একদিকে মুসলমান নবাবদিগের সহিত বিবাদ, অপরদিকে পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ও পূর্বে মগদিগের সহিত বিরোধ চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যেও বিষ্ণুপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে দলে দলে বিদ্রোহী দেখা দিতে লাগিল। ১৮২৫ সালের মধ্যে এই সকল উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদেশীয়গণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ইংরেজরাজ্য স্থায়ী হইল এবং তাঁহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নূতন রাজাদিগের প্রয়োজনানুসারে গঠিত হইতে হইবে। ইংরাজ-রাজপুরুষগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন যে, ভারত-সাম্রাজ্য বহুবিস্তীর্ণ হইতে যাইতেছে; এবং সেই সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার তাঁহাদের মস্তকে।

রাজা ও প্রজা উভয়ের মনে এই পরিবর্তন ঘটিয়া উভয় শ্রেণীর মনে একই প্রশ্নের উদয় হইল। রাজারা ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এদেশ শাসন করি, প্রাচীন বা নবীন রীতি অনুসারে? প্রজাগণও চিন্তা করিতে লাগিলেন, কাহাকে এখন আলিঙ্গন করি— প্রাচীনকে বা নবীনকে? ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত উভয় প্রশ্নের বিচার ও মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া ঐ কালকে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছি। যেরূপে মীমাংসা হইয়াছিল তাহা পরে নির্দেশ করিতেছি।

নূতন রাজারা যতদিন এদেশ ও এদেশবাসীদিগকে বুঝিয়া লইতে পারেন নাই, ততদিন কোনো বিভাগেই লঘুভাবে প্রচীনকে বিপর্যস্ত করেন নাই। সর্ববিভাগেই ভয়ে ভয়ে প্রাচীনের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রাজনীতি বিভাগে সর্বাগ্রে দেশীয় কর্মচারীদিগের দ্বারা, দেশীয় রীতিতেই, সকল কার্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম প্রথম এক একজন এদেশীয় নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন। কিন্তু বহুকালের পরাধীনতাজাত দায়িত্বহীনতা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের এমনি দুর্গতি হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে এই নায়েব-দেওয়ানগণ মনে করিতেন বিদেশীয়েরা তো বেশ লুটিয়া লইয়া যাইবে, আমরা লাভ লোকসানের ভাগী নই, সুতরাং আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ

করিতে পারি করিয়া লই; এইরূপে তাঁহাদের উৎপীড়ন ও উৎকোচাদিতে লোকে এত জ্বালাতন হইয়া উঠিল যে অবশেষে সে সকল পদ তুলিয়া দিতে হইল। ক্লাইভের নায়েব-দেওয়ান গোবিন্দরামের ও হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এইরূপে কিছুদিন গেল; শেষে, লর্ড কর্নওয়ালিস বাহাদুর এদেশীয়দিগকে উচ্চ উচ্চ পদ হইতে অপসারিত করিয়া সেই সকল পদে ইউরোপীয়গণকে স্থাপন করিলেন। তখন হইতে এদেশীয়গণ সর্ববিধ উচ্চপদ হইতে চ্যুত হইয়া হীনদশায় পতিত হইলেন। তৎপরে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত এদেশীয়দিগের সেরেস্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিল না। এই কালকে এদেশীয়দিগের প্রকৃত পতনের কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ এই সময় হইতেই এদেশীয়গণ সর্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকৃত হইয়া উন্নতির সম্ভাবনা ও তজ্জনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে বিদূরিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার গর্তে এদেশীয়গণ এখনও পড়িয়া রহিয়াছেন। এই লক্ষ্য, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্রতাকে পরাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ শোচনীয় ফল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। কারণ কোনো জাতি কিছুকাল এই অবস্থাতে বাস করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন হইতে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভের স্পৃহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আইন আদালত সম্বন্ধেও রাজারা ভয়ে ভয়ে বহুকাল যথাসাধ্য প্রাচীন রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি বিলাত হইতে নবাগত সিভিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা ও এদেশীয় আইন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য উইলয়ম কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বহুবৎসর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক একজন হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবি রাখার নিয়ম হয়; তাঁহারা এদেশীয় আইনের ব্যাখ্যা করিয়া জজের সাহায্য করিতেন।

শিক্ষা বিস্তার বিষয়েও তাঁহারা যে বহুবৎসর প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন তাহাও পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। এমন কি এদেশীয়দিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখাইবার জন্য কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে চরক সুশ্রুতের ক্লাস ও মাদ্রাসার সঙ্গে আবিসেন্নার ক্লাস রাখা হইয়াছিল। ইহার বিবরণ পরে বিস্তৃতভাবে দেওয়া যাইবে।

অতএব ইহা নিশ্চিত যে, ইংরাজগণ লঘুভাবে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক প্রকৃষ্ট রাজনীতি বোধে, তাঁহারা প্রারম্ভে সর্ববিষয়ে প্রচীনকে রক্ষা করিয়াই চলিতেন। এই সন্ধিক্ষণের মধ্যে মহা তর্ক-বিতর্কের পর প্রাচীনকে বিপর্যস্ত করিয়া নবীনের প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি হইয়াছিলেন।

এই আন্দোলন এদেশীয়দিগের মনেও উঠিয়াছিল। তাঁহারাও এই সন্ধিক্ষণে বিচার করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইহার মধ্যে কাহাকে বরণ করিবেন? তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে, প্রাচীনকে বর্জন করিয়া নবীনকেই বরণ করিতে হইবে। দেশীয় পক্ষে রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্য কার্যের ভার লইয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন। তবে ইহা স্মরণীয় যে, তাঁহাতে যাহা ছিল অপর কোনো নেতাতে তাহা হয় নাই। তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ত্ব তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে, পাশ্চাত্যনীতি পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক সকল প্রকার বিপ্লবেরই একটা ঘাত প্রতিঘাত আছে। প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ এক দিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণও অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গিয়াছিলেন। যাহা কিছু প্রাচীন সকলি মন্দ এবং যাহা কিছু নবীন সকলি ভালো, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল পরে নির্দেশ করিতেছি।

এই নবীনে অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিল। ফরাসি বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাঁহারা শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মন ও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসিবিপ্লবজনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ, এই তাঁহাদের মনের ভাব দাঁড়াইল। ইহাও অতিরিক্ত পাশ্চাত্য পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ। ফরাসি-বিপ্লবের এই আবেগ বহুবৎসর ধরিয়া বঙ্গসমাজে কার্য করিয়াছে; তাহার প্রভাব এই সুদূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে।

যে ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক হইয়া আসিলেন, সেই মার্চ মাসেই তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট এদেশ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার পদাভিষিক্ত লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সমুদ্রপথে আসিতেছেন। পরবর্তী জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এদেশে পৌঁছিলেন। বঙ্গে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। একদিকে রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এবং নবপ্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার উন্মাদিনী শক্তি, অপরদিকের বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের শুভাগমন— বিধাতা যেন সময়োপযোগী আয়োজন করিলেন।

এই নবযুগের প্রবর্তনের সময় সর্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত রাজপুরুষের যে দুইটি সদ্‌গুণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কে সেই গুণদ্বয় পূর্ণমাত্রাতে বিদ্যমান ছিল। তাঁহাতে কর্তব্য-নির্ধারণের পূর্বে ধীরচিত্ততা, বিচারশীলতা, সকল দিক দেখিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি, যেমন দেখা গিয়াছিল, কর্তব্য পথ একবার নির্ধারিত হইলে তদবলম্বনে দৃঢ়চিত্ততা তেমনি দৃষ্ট হইয়াছিল। সহমরণ নিবারণ, ঠগিদমন, ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন,

মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রভৃতি সমুদয় কার্যে তাঁহার গুণের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তিনি এদেশের সর্ববিধ উন্নতির সহায় হইবেন এই সংকল্প করিয়া রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে সপ্ত বৎসর গভর্নর জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এদেশে পদার্পণ করিলে রামমোহন রায়ের কার্যোৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাঁহার বন্ধু উইলিয়ম আডাম ত্রিশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হওয়ার পর তাঁহাকে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিগণের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। তদবধি শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ রামমোহন রায়ের প্রতি জাতক্রোধ হন; এবং বৈরভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে খ্রিস্টীয়দিগের সহিত রামমোহন রায়ের ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায় উপর্যুপরি Precepts of Jesus, Appeals to the Christian public, Brahmanical Magazine প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। অগ্রে হিন্দুগণ তাঁহার বিরোধী ছিলেন, এক্ষণে খ্রিস্টীয়গণও বিরোধী হইলেন। রামমোহন রায় কিছুতেই স্বীয় অভীষ্টপথ পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন না। মিশনারিগণ আপনাদের প্রেসে তাঁহার লিখিত ইংরেজি গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি ধর্মতলাতে 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' নামে একটি প্রেস স্থাপন করিলেন; *হরকরা* নামক তদানীন্তন ইংরাজি সংবাদপত্রের অফিস গৃহের উপরতলায় তাঁহার বন্ধু আডামের জন্য সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন; আচার্যরূপে আডামের ভরণ পোষণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং স্বীয় সন্তানগণ ও বন্ধুগণ সহ তাঁহার উপাসনালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বন্ধুবর আডামের জন্য রামমোহন রায় দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ইহা তিনি নিজে দিয়াছিলেন কি চাঁদা তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। বোধ হয় ইহার অধিকাংশ তাঁহার প্রদত্ত ও অপরাংশ বন্ধুদিগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

লর্ড আমহার্স্ট বাহাদুরের রাজত্বের প্রারম্ভেই সহমরণ নিবারণের জন্য যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা এই ১৮২৮ সালেও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। সে বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত জানা, ইংলন্ডের প্রভুদিগের সহিত চিঠিপত্র লেখা, নানাস্থান হইতে সহমরণ প্রথা সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করা হইতেছিল। তৎকালের নিজামত আদালতের কোর্টনি স্মিথ, (Courtney Smith) আলেকজান্ডার রস (Alexander Ross) আর. এইচ. রাট্রে (R. H. Rattray) প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ প্রথা নিবারণের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোনো কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী সতর্কতার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে নন-রেগুলেশন প্রদেশে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, প্রজারা সহ্য করে কি না। এই সকল সংবাদ ও মত সংগ্রহ করিতে ১৮২৭ সাল অতীত হইয়া গেল। ১৮২৮ সালের প্রারম্ভে লর্ড আমহার্স্ট লিখিলেন— "I think there is reason to believe and expect that, except on the occurrence of some very general sickness, such as that which prevailed in the lower parts of Bengal in

1825, the progress of gencral instruction and the unostentatious exertions of our local officers will produce the happy effect of a gradual diminution, and at no very distant period, the final extinction of the barbarous rite of suttee."— অর্থাৎ এরূপ আশা করা যায় যে, শিক্ষা বিস্তারের গুণে ও গভর্নমেন্টের কর্মচারীদিগের চেষ্টায় অচিরকালের মধ্যে এই নৃশংস প্রথা তিরোহিত হইবে। বলা বাহুল্য গভর্নর জেনারেলের এইরূপ মীমাংসা রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহারা এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। এখন তাঁহাদের প্রধান কার্য এই হইল যে, কোনো স্থানে কোনো রমণী সহমৃতা হইতেছেন এই সংবাদ পাইলেই কতিপয় বৎসর পূর্বে এই প্রথাকে দমনে রাখিবার জন্য যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিপালিত হইল কি না তাঁহারা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, সেই কারণে তাঁহারা দলে দলে সহমরণের স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। এই চেষ্টা এ প্রথা দমনের পক্ষে অনেক সহায়তা করিতে লাগিল।

এই বৎসরের (১৮২৮ সাল) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতায় চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখানা ভাড়া লইয়া সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। একদিন রবিবার রামমোহন রায় বন্ধুবর আডামের উপাসনা হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। তখন তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার গাড়িতে ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন— 'দেওয়ানজী বিদেশীয়ের উপাসনাতে আমরা যাতায়াত করি, আমাদের নিজের একটা উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না?' এই কথা রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি কালীনাথ মুনশি, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয়-সভায় বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার্থ একটি বাড়ি ভাড়া করা স্থির হইল। তদনুসারে উক্ত ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি ভাড়া করিয়া তথায় সমাজের কার্য আরম্ভ হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মোপাসনা হইত। কার্যপ্রণালী এইরূপ ছিল, প্রথমে দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেন। তৎপরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করিলে সংগীতানন্তর সভা ভঙ্গ হইত। তারাচাঁদ চক্রবর্তী এই প্রথম সমাজের সম্পাদক ছিলেন।

ব্রহ্মসভা স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্দুসমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল। তাঁহাদের অনেকে রামমোহন রায়েব সভার কার্যপ্রণালী পরিদর্শনের জন্য সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন তাহা নহে, সামাজিক বিষয়ে তাঁহার আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় লইয়া পথে ঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায়, রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্বদা কটূক্তি বর্ষণ হইত।

যখন একদিকে এই সকল বাগ্‌-বিতণ্ডা ও আন্দোলন চলিতেছে তখন হিন্দু কলেজের মধ্যে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা দৃষ্ট হইল। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে পদার্পণ করিয়াই চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে সেইরূপ কলেজের প্রথম চারিশ্রেণীর বালককে

কিরূপ আকৃষ্ট করিয়া লইলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সম্বন্ধ, কেহ কখনও দেখে নাই। ডিরোজিও তিন বৎসর মাত্র হিন্দুকলেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার শিষ্যদলের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়া দিলেন যাহা তাঁহাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের অনেকেই উত্তরকালে এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যে বিভাগেই গিয়াছিলেন, কেহই ডিরোজিওর শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অপরাপর প্রধান প্রধান শিষ্যের পরিচয় পরে দিব, একজনের বিষয় সাধারণের জ্ঞাত নহে এই জন্য কিছু বলিতেছি।

একবার বোম্বাই প্রদেশে গিয়া তথাকার প্রার্থনাসমাজের সুযোগ্য ও সম্মানিত সভ্য পরকালগত নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে, তাঁহাদের যৌবনকালে বোম্বাই শহরে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার অবলম্বিত নামটি এখন বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি ইংরেজি ভাষাতে সুশিক্ষিত ছিলেন। সন্ন্যাসী বোম্বাই হইতে গুজরাটের অন্তর্বর্তী কাটিওয়াড় প্রদেশে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ কোনো সংবাদপত্রে "Misgovernment at Katiwad"—'কাটিওয়াড়ে অরাজকতা' নাম দিয়া পত্র সকল মুদ্রিত হইতে লাগিল। ঐ সকল পত্রে এমন বিজ্ঞতা, রাজনীতিজ্ঞতা ও লোকচরিত্রদর্শন ক্ষমতার পরিচয় ছিল যে, কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে চতুর্দিকে সেই চর্চা উঠিয়া গেল। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট হইল। কাটিওয়াড়ের রাজা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কে এই সকল পত্র লিখিতেছে। ক্রমে সন্ন্যাসী ধরা পড়িলেন। সন্ন্যাসী কিছুই গোপন করিলেন না; রাজাকে বলিলেন— 'আপনার প্রজারা আমার নিকট আসিয়া কাঁদে, তাই তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া লিখিয়াছি, ইচ্ছা হয় আপনি শাসনকার্যের উন্নতি করুন, নতুবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।' রাজা সন্ন্যাসীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ন্যাসী একবর্ষকাল কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। এদিকে দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিল। একবর্ষ পরে রাজা সন্ন্যাসীকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন— 'আমার রাজপদের লালসা নাই, থাকিলে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিব কেন? তবে মহারাজ যদি দেশ সুশাসন করিতে চান, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারি।' তদবধি সন্ন্যাসীর রাজত্ব আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে, 'পুরাতন উৎকোচগ্রাহী কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া তৎ তৎ পদে ইংরেজি-শিক্ষিত ও ইংরাজ গভর্নমেন্টের কার্যকলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে।' তদনুসারে সন্ন্যাসী বোম্বাই শহরে আসিলেন এবং একদল ইংরেজি-শিক্ষিত কর্মচারী লইয়া গেলেন। নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা প্রায় এক বৎসরকাল সন্ন্যাসীর অধীনে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে পূর্বপদচ্যুত কর্মচারীদিগের চক্রান্তে রাজার আবার মতিভ্রম হইল এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে, সন্ন্যাসীর দলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাটিওয়াড় ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তদনুসারে সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহারা সকলে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি সন্ন্যাসী ও তাঁহাদের নিকট তাঁহার গুরু

ডিরোজিওর নাম সর্বদা করিতেন এবং তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেন। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাঁহাদের দলের মধ্যে কে সন্ন্যাসব্রত লইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না।

ডিরোজিওর কার্য গ্রহণের পর একবৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যগণ এক ঘননিবিষ্ট দলে পরিণত হইয়া পড়িলেন। এই ১৮২৮ সালের মধ্যেই শিষ্যদলের মনের উপরে ডিরোজিওর কি প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহার বিবরণ তৎকালীন কলেজের কেরানি হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে ডিরোজিওর জীবনচরিত লেখক মি.·এডওর্ডস কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—

> "The students of the first, second and third classes had the advantage of attending a conversazione established in the school by Mr. Derozio, where readings in poetry, and literature, and moral philosophy were carried on. The meetings were held almost daily after or before school hours. Though they were without the knowledge or sanction of the authorities yet Mr. Derozio's disinterested zeal and devotion in bringing up the students in these subjects was unbounded, and characterised by a love and philanthropy which, up to this day, has not been equalled by any teacher either in or out of the service. The students in their turn loved him most tenderly; and were ever ready to be guided by his counsels and imitate him in all their daily actions in life. In fact, Mr. Derozio acquired such an ascendancy over the minds of his pupils that they would not move even in their private concerns without his counsel and advice. On the other hand, he fostered their taste in literature; taught the evil effects of idolatry and superstition; and so far formed their moral conceptions and feelings, as to place them completely above the antiquated ideas and aspirations of the age. Such was the force of his instructions, that the conduct of the students out of the College was most exemplary and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of *truth.* Indeed, the *College boy* was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which, those that remember the time, must acknowledge, that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy'."

ডিরোজিও এইরূপ উপাদান লইয়া তাঁহার (Academic Association) অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিএশনের কার্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কিছুদিন অন্য কোনো স্থানে উক্ত সভার

অধিবেশন হইয়া, শেষে মানিকতলার একটি বাটিতে অধিবেশন হইত। ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি ও উমাচরণ বসু নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে, উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেভিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি Col. Benson, পরবর্তী সময়ের এডজুটান্ট জেনারেল Col. Beatson, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Mills প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও অসংকুচিতভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ডিরোজিওর শিষ্যদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাঁহারা অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি নীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইল তাহা পূর্বোক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

> "The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects; the sentiments of Hume had been widely diffused and warmly patronised * * * *. The most glowing harangues were made at Debating Clubs which were then numerous. The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people. The degradation of the female mind was viewed with indignation; the question at a very large meeting was carried unanimously that Hindu women should be taught; and we are assured of the fact that the wife of one of the leaders of this movement was a most accomplished lady, who included amongst the subjects, with which she was acquainted, moral philosophy and mathematics."

হিন্দু কলেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বৃদ্ধদিগের সহিত বালকদিগের বিবাদ, কলহ ও তাহাদিগের প্রতি অভিভাবকগণের তাড়না চলিতে লাগিল। ডেভিড হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন— 'ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ

করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের *ইলিয়ড* গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।' আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত; তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 'আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো' বলিয়া চিৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, 'এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি' এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।

তখন শহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে বলিয়া বেড়াইত যে, ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই ধর্মাধর্ম নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে দোষ নাই; দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে শহরে একটা হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। হিন্দু কলেজের কমিটি প্রথমে হেড মাস্টার ডি. আন্সলেম সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন মাস্টারেরা স্কুলের সময় বা অপর সময়ে বালকদিগের সহিত ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন না করেন। হেড মাস্টার ডিরোজিওর উপরে চটিয়া গেলেন। একদিন ডিরোজিও তাঁহার কার্যের বিবরণ দিবার জন্য হেড মাস্টারের নিকট গেলেন, তখন মহাত্মা হেয়ার সেখানে দণ্ডায়মান। আন্সলেম সাহেব উক্ত কার্য বিবরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ খুঁত ধরিয়া ডিরোজিওকে মারিতে গেলেন। ডিরোজিও সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আন্সলেম রাগিয়া হেয়ারকে খোসামুদে বলিয়া গালি দিলেন। হেয়ার হাসিয়া বলিলেন— 'কার খোসামুদে?' হেয়ারের অপরাধ এই যে, তিনি ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে ভালোবাসিতেন। হিন্দু স্কুল কমিটি আবার আদেশ করিলেন যে, শিক্ষকেরা বালকদিগের সহিত ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন না এবং স্কুলঘরে খাবার আনিয়া খাইতে পারিবেন না।

একদিকে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে, তখন অপরদিকে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ করিয়া নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিলেন—

> "It is hereby declared, that, after the promulgation of this regulation, all persons, convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall be deemed guilty of culpable homicide and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment".— *Regulation of 4th December, 1829.*

ইহার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১১ মাঘ দিবসে রামমোহন রায় তাঁহার নবনির্মিত গৃহে ব্রহ্মসভাকে স্থাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিনে সেই ভবনের ট্রাস্টডীড্ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে, ঐ ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের ব্যবহারার্থ থাকিবে, এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে; তদ্ভিন্ন তথায় কোনো পরিমিত দেবতার পূজা হইবে না।

উক্ত উভয় ঘটনাতে কলিকাতাবাসী হিন্দুগণকে অতিশয় উত্তেজিত করিয়া তুলিল। রাধাকান্ত দেব সারথি হইয়া ধর্মসভা নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। মতিলাল শীল কলুটোলাতে তাহার এক শাখা ধর্মসভা স্থাপন করিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পূর্ব হইতেই *চন্দ্রিকা*-র সম্পাদক রূপে কার্য করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে দিন ধর্মসভার অধিবেশন হইত সে দিন শহরের ধনীদের গাড়িতে রাজপথ পূর্ণ হইয়া যাইত। সভাতে সমবেত সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, তাঁহারা অনেক দিন রামমোহন রায়ের সভার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, আর উপেক্ষা করিবেন না, এবার তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন। এই আক্রোশ কার্যেও প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারা রামমোহন রায়ের দলস্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এমন কি যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার দলস্থ লোকদিগের ভবনে বিদায় আদায় গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকেও বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে সমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া গেল। রামমোহন রায় অবিচলিত চিত্তে আপনার কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গিয়া উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, তিনি উপাসনা মন্দিরে আসিবার সময়ে পদব্রজে আসিতেন, ফিরিবার সময় নিজ গাড়িতে ফিরিতেন। গাড়িতে যাইবার সময় কোনো কোনো দিন পথের লোকে ইট পাথর, কাদা ছুড়িয়া মারিত ও বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ির দ্বার টানিয়া দিতেন ও বলিতেন, 'কোচম্যান হেঁকে যাও'। সতীদাহনিবারণ ও ব্রহ্মসভা স্থাপন নিবন্ধন কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের মন এমনি উত্তেজিত হইয়াছিল যে, সতীদাহ নিবারণ-বিষয়ক আইন রদ করিবার জন্য এক আবেদন পত্রে বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর হইতে লাগিল। রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে সহমরণ নিবারণের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন পত্র লিখিলেন তাহাতে তাঁহার কতিপয় বন্ধু ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর করিলেন না।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সুবিখ্যাত খ্রিস্টীয় মিশনারি আলেকজান্ডার ডফ কলিকাতাতে পদার্পণ করিলেন। তখন রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন। ডফ রামমোহন রায়ের সহিত কথাবার্তা কহিয়া অনুভব করিলেন যে, এদেশে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিয়া ইংরেজি শিক্ষার ভিতর দিয়া খ্রিস্টধর্ম প্রচার করিতে হইবে। তদনুসারে তিনি এক প্রকার স্কটলন্ডস্থিত কর্তৃপক্ষের অনভিমতে

একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। রামমোহন রায় সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব ব্যবহৃত ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি নামক বাটি স্থির করিয়া দিলেন; এবং প্রথম ছয়টি ছাত্র জুটাইয়া দিলেন। সেই কতিপয় ছাত্রের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পরে শহরের বড়লোক হইয়াছিলেন।

ডফ স্কুল স্থাপন করিয়া নবশিক্ষিত যুবকদলের নিকটে থাকিবার আশয়ে বর্তমান হিন্দু কলেজের সন্নিকটে বাসা করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায় ডফকে স্বীয় কার্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। কলেজের বালকেরা অনেকে ডফ ও ডিয়ালট্রির বক্তৃতাতে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহাও হিন্দু কলেজ কমিটির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা আদেশ প্রচার করিলেন যে, কলেজের বালকগণ কোনো বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারিবে না। এই আদেশ প্রচার হইলে চারি দিকে লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোকের স্বাধীন চিন্তার উপরে এতটা হাত দেওয়া কাহারও সহ্য হইল না।

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে কলেজ কমিটির হিন্দুসভ্যগণ ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় হিন্দুসভ্যগণের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া এক বিশেষ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়া সভা ডাকিলেন। ঐ সভায় এই প্রশ্ন উঠিল—ডিরোজিওর স্বভাব চরিত্র এরূপ কি না এবং তাঁহার সংসর্গে বালকদিগের এরূপ অপকার হইতেছে কি না, যাহাতে তাঁহাকে আর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত বোধ হয় না? ডাক্তার উইলসন ও মহামতি হেয়ার ডিরোজিওর সপক্ষে মত দিলেন, এবং হিন্দুসভ্যগণের অনেকেও এতটা বলিতে প্রস্তুত হইলেন না। অবশেষে এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া আর একভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল যে, দেশীয় সমাজের বর্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কলেজের অনিষ্ট হইবে কি না? উইলসন ও হেয়ার দেশীয় সমাজের অবস্থা বিষয়ে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়া এ-বিষয়ে সাহসের সহিত কিছু বলিতে পারিলেন না; সুতরাং কোনো পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন না। অধিকাংশের মতে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা স্থির হইল।

ডাক্তার উইলসন ডিরোজিওকে এই সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহার প্রতি যে যে দোষারোপ করা হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। বলিলেন তিনি কখনই নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ দুই যুক্তি তুলিয়া বালকদিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে; ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এরূপ অদ্ভুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন নাই; এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, সেরূপ ব্যবহার কোনো বালকে দেখিলে তাহাকে সাজা দিয়াছেন।

ডিরোজিও কলেজ পরিত্যাগ পূর্বক *ইস্ট ইন্ডিয়ান* নামক একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়া তাহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। ঐ কাগজ ত্বরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ডিরোজিও কলিকাতার ফিরিঙ্গিদলের এক জন নেতা বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

তৎপরে যে কয়েকমাস তিনি জীবিত ছিলেন, সে সময়ের মধ্যে ফিরিঙ্গি সমাজের উন্নতির জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনো কাজ হইত না। এইরূপে খাটিতে খাটিতে ১৮৩১ সালের ১৭ ডিসেম্বর শনিবার তিনি দুরারোগ্য ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন তিনি রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র, মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যদল আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দিন রাত্রি পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। ২৪ ডিসেম্বর প্রাণবায়ু তাঁহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ইহার পরে *ইস্ট ইন্ডিয়ান* কাগজ একজন অপদার্থ ইংরাজের হস্তে গেল। সে ব্যক্তি ডিরোজিওর মাতা ও ভগিনীকে ধনে প্রাণে সারা করিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহারা জন্মের মতো সমাজসাগরবক্ষে চিরবিস্মৃতির তলে ডুবিয়া গেলেন। ডিরোজিও অন্তর্হিত হইলে কিছুদিন তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল; এবং তদর্থ একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কালাবর্তে সকলি মিলাইয়া গেল! নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষা-গুরুর চিহ্নমাত্রও রহিল না।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজ ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া গেলেন তাহা আর থামিল না। ১৮৩১ সালের ২৩ আগস্ট তাঁহার শিষ্যগণ এক মহা বিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। সে সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে ডিরোজিওর শিষ্যদলের একটা আড্ডা ছিল। উক্ত দিবস কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার যুবক বন্ধুগণ সেখানে জুটিলেন। তখন তাঁহাদের সর্বপ্রধান সৎসাহসের কর্ম ছিল মুসলমানের রুটি ও বাজার হইতে সিদ্ধ করা মাংস আনিয়া খাওয়া। সেইরূপ আহারের পর হাড়গুলি পার্শ্বস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়া দিয়া যুবকদল চিৎকার করিতে লাগিলেন, 'ঐ গোহাড়, ঐ গোহাড়।' আর কোথায় যায়! সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার মার শব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। যুবকদল যিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন। তৎপরে প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধরিয়া বসিল— 'আপনার দৌহিত্রকে বর্জন করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব না।' ব্রাহ্মণ স্বীয় দৌহিত্রের প্রতি কোপে অধীর হইয়া গেলেন। বেচারা কৃষ্ণমোহন এ-সকলের কিছুই জানেন না। তিনি সায়ংকালে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর আশ্রয় পাইলেন না। সে রাত্রে যান কোথায়, উপায়ান্তর না পাইয়া স্বীয় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তখন কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কৃষ্ণমোহন এই বৎসরের মে মাস হইতে *Inquirer* নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই পত্রে তিনি নির্যাতনকারী হিন্দুদিগের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নব্যদলের সমরভেরী বাজিয়া উঠিল।

১৮৩২ সালের ২৮ আগস্টের *Inquirer* পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে, ডিরোজিওর শিষ্যদলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। মহেশ বাল্যকালে অত্যন্ত জেঠা, ইয়ার ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া বিদিত ছিলেন। একারণে রামগোপাল

ঘোষ তাঁহার সঙ্গে বড় মিশিতেন না। কিন্তু ডিরোজিওর সংস্রবে আসিয়া মহেশের জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তিনি ধর্মানুরাগ ও সচ্চরিত্রতাগুণে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

সেই ১৮৩২ সালে ১৭ অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি তখন এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, হিন্দু কলেজের সমুদয় ভালো ভালো ছাত্র খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করিবে।

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরে রামমোহন রায় ইংলন্ডের ব্রিস্টলনগরে ২৭ সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিলেন; এবং রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ও মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের পরামর্শে গভর্নমেন্টের অধীনে উচ্চ উচ্চ পদ এদেশীয় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য উন্মুক্ত হইল। ঐ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভারতশাসনের উন্নতিবিধানের উদ্দেশে এক নূতন আইন লিপিবদ্ধ করেন। তাহার ৮৭ ধারাতে লিখিত হইল—

> "And be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident therein, shall by reason only of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under this said Company."

লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় হইতে এদেশীয়গণ হাজার বড় হইলেও সেরেস্তাদারের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিতেন না। এমন কি রামমোহন রায়ও পদে উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতবাসকালে এদেশ শাসন সম্বন্ধে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দেওয়ার বিষয়ে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বিধি প্রচার হওয়ার পর সে দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর করা হইতে লাগিল। অতএব এই ১৮৩৩ সাল হইতে এদেশীয়দিগের বক্ষ হইতে একখানি পাথর তোলা হইল। সুখের বিষয় সে সময় হইতে এদেশীয়দিগকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা তাহার অপব্যবহার করেন নাই, প্রত্যুত ঐ সকল পদকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

□ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৯

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা

রমেশচন্দ্র দত্ত

অবিমিশ্র সন্তোষের সহিত না হউক, কিয়ৎপরিমাণ গর্বের সহিত ইংরাজেরা ভারতবর্ষে তাহাদের শাসনফল পর্যালোচনা করিবার অধিকারী। লোকসমাজে যাহা সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক,— শান্তি—তাহা তাঁহারা ভারতে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা এমন একটি শাসনতন্ত্র গঠন করিয়া তুলিয়াছেন, যাহাতে সংস্কারের আবশ্যকতা থাকিলেও, তাহা দৃঢ় ও কার্যকর। তাঁহারা উত্তম আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। দেশময় বিচারালয় সংস্থাপন করিয়াছেন—যাহার দেশীয় ও বিদেশীয় বিচারকর্তাগণ নিরপেক্ষতায় ও সাধুতায় কোনো দেশের তুলনায় ন্যূন নহেন। এই ফলসমন্বয় প্রত্যেক সমালোচকেরই প্রশংসার যোগ।

অপরপক্ষে কোনো নিরপেক্ষ ইংরাজই, ভারতবাসীর অর্থগত অবস্থার পর্যালোচনা করিলে, সে সন্তোষটুকু লাভ করিতে পারেন না। বর্তমান সময়ে ভারতের দারিদ্র্যের তুলনা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নাই। বিগত শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে যে সকল দুর্ভিক্ষ ভারতকে আক্রমণ করিয়াছে তাহার বিস্তার ও তীব্রতার তুলনাও ইতিহাসে নাই।

অর্থনীতিবিদ্ কোনো দেশের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইলে সচরাচর কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন? জিজ্ঞাসা করেন— কৃষিকার্য কি উন্নতি লাভ করিতেছে? শিল্পাদির অবস্থা কিরূপ? শাসনকর্তাগণ দেশের ধনবৃদ্ধির পথ বিস্তৃত করিতেছেন তো? রাজকোষের আয়-ব্যয়প্রণালী কি প্রকার— প্রজাগণ যে পরিমাণ রাজকর দেয়, তাহার অনুরূপ উপকারপ্রাপ্ত হয় কি?— ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার অনুসন্ধান করিলে এই সকল প্রশ্নই জিজ্ঞাস্য। সর্বদেশে যে অর্থনীতি বলবতী,— ভারতেও তাহাই। অন্যান্য দেশে যে সকল কারণে ধনবৃদ্ধি হয়, ভারতেও সেই সকল কারণ বর্তমান থাকিলে ধনবৃদ্ধি হইবে, যে সকল কারণ অন্যদেশে দারিদ্র্য আনয়ন করে, সেই সকল কারণ ভারতবাসীকেও দরিদ্র করিয়া তুলিবে।

ব্রিটিশ শাসনকালে যে ভারতবাসীর ধনাগমের পথ নানাপ্রকারে সংকীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কোনো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় রাজকর্মচারীই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ শুধু একটি সুবৃহৎ শস্যপ্রসূ ভূমি ছিল না,— ভারতীয় শিল্পজাত এশিয়া ও ইউরোপখণ্ডের নগরে নগরে বিক্রয় হইত। ইংরাজের

স্বার্থান্ধতায় ক্রমে ক্রমে আমাদের সে শিল্প কেমন করিয়া নাশপ্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে[১] দেখাইয়াছি। তাহার পর, আমরা যখন ইউরোপের অনুকরণে বস্ত্রাদি বয়নের বাষ্পযন্ত্র সংস্থাপন করিলাম— তখন ইংলন্ডীয় তন্তুবায়গণ মহাভীত হইয়া উঠিল। ১৮৯৮ সালে তাহাদের প্ররোচনায় গভর্নমেন্ট আমাদের স্বনির্মিত তুলাজাতের উপর কর বসাইয়া দিলেন। জাপান ও চীনের সঙ্গে আর আমরা প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

কৃষিই এখন ভারতবাসীর একমাত্র ধনাগমের পথ। শতকরা ৮৫ জন লোক এখন স্বতঃ বা পরতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। অথচ ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের ভূমিকর শুধু যে অত্যধিক তাহা নহে, আবার অনিশ্চিত! অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে ভূমিকর এক পাউন্ডে এক সিলিং হইতে চারি সিলিং পর্যন্ত ছিল--অর্থাৎ জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর শতকরা ৫্ হইতে ২০্ অবধি ছিল। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে এই কর স্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন হইয়াছে। কিন্তু ১৭৯৩ হইতে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর শতকরা ৯০্ পরিমাণ এবং উত্তর ভারতে ৮০্ পরিমাণ রাজস্ব ধার্য হইয়াছিল। কর ধার্য বিষয়ে ব্রিটিশরাজ যে মুসলমান বাদশাহগণের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু বিভিন্নতা এই যে, মুসলমানরাজ যাহা চাহিতেন তাহা সম্পূর্ণ আদায় করিতেন না, কিন্তু ব্রিটিশরাজ যাহা চাহিলেন তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইলেন। বঙ্গের শেষ মুসলমান রাজা তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসরে (১৭৬৪ খ্রি.) ভূমিকরস্বরূপ ৮১,৭৫,৫৩৩্ টাকা আদায় করিয়াছিলেন— সে সময় হইতে ত্রিশ বৎসরে ইংরাজরাজ বঙ্গের বার্ষিক ভূমিকর ২,৬৮,০০,০০০ টাকা করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এলাহাবাদ ও অন্য কতিপয় জেলা ইংরাজকে হস্তান্তরিত করেন। এই সকল জেলার মুসলমান নবাব বার্ষিক ১,৩৫,২৩,৪৭০্ টাকা দাবি করিতেন। তিন বৎসরের মধ্যে ইংরাজ সেই জেলাগুলি হইতে বার্ষিক ১,৬৮,২৩,০৬০্ টাকা আদায় করিলেন। এই দাবি ও আদায়গত পার্থক্য ছাড়া আরও একটি বিশেষ পার্থক্য ইংরাজ ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে রহিয়াছে। মুসলমান যাহা আদায় করিতেন তাহা ভারতবর্ষেই ব্যয় করিতেন— দেশের লোকের হস্তে আবার ফিরিয়া যাইত; ইংরাজ যাহা আদায় করেন, তাহার একটি বৃহৎ অংশ ইংলন্ডে আসিয়া ব্যয়িত হয়। কালিদাস বলিয়াছেন—

প্রজানামেবভূত্যর্থং সত্যভ্যোবলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ॥

সকল জাতিই আশা করে যে দেশ হইতে সংগৃহীত কর দেশেই ব্যয়িত হইবে। পূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে সর্বাপেক্ষা উৎপীড়নকারী রাজার সময়েও ভারতবাসী যাহা দিত তাহা ফিরিয়া পাইত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন তখন হইতেই পরিবর্তন আরম্ভ হইল। তাঁহারা ভারতবর্ষকে ব্যবসায়ের জিনিসস্বরূপ গণ্য করিতেন। বড় বড় রাজকার্যে নিজেদের লোক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ১৮৩৩

১. 'ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি'। *ভারতী*, শ্রাবণ, ১৩০৮'।— সম্পাদক।

খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায় বন্ধ হইল, এবং ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি ভাঙিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের অবলম্বিত "পলিসি" অক্ষুণ্ণ রহিল। ভারত গভর্নমেন্ট ঋণ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ ব্যবসায়ীদের মূলধন ফিরাইয়া দিলেন। সেই ভারতের জাতীয় ঋণের সূত্রপাত। ব্রিটিশরাজ বণিকগণের নিকট হইতে ভারতরাজ্য ক্রয় করিলেন— কিন্তু মূল্য কে দিল? ভারতবাসী দিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সে ঋণের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তাহা প্রায় দ্বিগুণিত হইল। তাহার পর ৪০ বৎসর ধরিয়া অবিরাম শান্তি, অথচ ঋণের পরিমাণ বর্তমান সময়ে ৩০০ কোটি টাকা। হোম চার্য যাহা বৎসর বৎসর ভারত গভর্নমেন্ট ইংলন্ডে প্রেরণ করেন, তাহার পরিমাণ ২৪ কোটি টাকা। উচ্চ রাজকর্মচারীগণের বেতন—উচ্চ রাজকর্ম বলিতে গেলে সবই ইংরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত—তাহারও পরিমাণ দশ কিংবা বারো কোটি টাকা। ভারতের বার্ষিক রাজস্ব (Net Revenue) ৬৫ কোটি টাকা—তাহার অর্ধাংশ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ভারতের রাজসূর্য যে অর্থবাষ্প শোষণ করিতেছেন, তাহা ভারতে বৃষ্টিস্বরূপ না পড়িয়া অন্য দেশে পড়িতেছে—অন্য দেশকে ফলশালী করিয়া তুলিতেছে।

প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তাঁহাদেরই সব দোষ যে তাহা নহে। লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড মিন্টো, লর্ড হেস্টিংস— উপর্যুপরি তিনজন গভর্নর জেনারেল ভারতবর্ষের ভূমিকর স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইস্ট [ইন্ডিয়া] কোম্পানি তাহা মঞ্জুর করেন নাই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উঠিয়া যাইবার পরও তিনজন গভর্নর জেনারেল—লর্ড ক্যানিং, লর্ড লরেন্স, লর্ড রিপন এ প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু ভারতসচিব তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। বর্তমান সময়ের মধ্যে তিনবার ভারতীয় 'টেরিফ' ইংরাজ বণিক ও কারিগরগণের আজ্ঞানুসারে পরিবর্তিত হইয়াছে। শুধু যে ভারতবাসীর অমতে, তাহা নহে— গভর্নর জেনারেলের সদস্যসভার অধিকাংশ সভ্যের অমতে। আসাম চা বাগানের কুলিগণের দুরবস্থার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যাহাতে তাহাদের কষ্টলাঘব হয়, তিনবার গভর্নমেন্ট সেরূপ উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি আসামের চিফ্ কমিশনর অনরেবল মিস্টার কটন এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন— আইনও পাস হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ চা-করগণের প্রবল প্রতিবন্ধকতায় লর্ড কার্জন দুই বৎসর সে আইন বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় গভর্নর জেনারেলগণ নাচার। তাঁহারা যাহা করিতে চান তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না।

ভারতীয় শাসনকর্তাগণ ভারতবাসীদিগের নিকট হইতেও যথেষ্ট অবলম্বন ও সাহায্য প্রাপ্ত হন না। প্রজার সহিত গভর্নমেন্টের আন্তরিক যোগ নাই। ভারতীয় গভর্নমেন্ট অর্থে ভাইসরয় ও তাঁহার সদস্য ছয় জন সভ্য। সকলেই গভর্নমেন্টের বেতনভোগী— গভর্নমেন্টের স্বার্থসাধনে যত্নবান, প্রজার স্বার্থের প্রতিনিধি কেহ নাই। সকল সভ্যই কোনো না কোনো ব্যয়বিভাগের শীর্ষস্থানীয়। এই সভ্যগণ উচ্চরাজকর্মচারী। প্রজার স্বার্থের প্রতি যে তাঁহাদের কতকটা দৃষ্টি আছে তাহার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যে যে বিভাগের অধিপতি, সেই সেই বিভাগের স্বার্থরক্ষা—অস্বচ্ছলতা নিবারণ করিবার

চেষ্টাও তাঁহাদের স্বাভাবিক। শক্তিগুলি সমস্তই ব্যয়ের মুখে নিয়োজিত। ব্যয় সংকোচের মুখে কোনো শক্তিই নিযুক্ত নাই। এই সভায় যাহা কিছু ধার্য হয়, তাহা আদালতে 'একতরফা ডিক্রির' মতো। সভার সভ্যগণ পারদর্শী, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, কিন্তু বিজ্ঞতম বিচারকও শুধু এক তরফের বক্তব্য শুনিয়া, সদ্বিচার করিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং অনেক সময় যে প্রজার স্বার্থ পদদলিত হইয়া যায় ইহার আর বিচিত্র কি?

আমরা এক[২] প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন—

> "The Government of a people by itself has a meaning and a reality, but such a thing as the government of one people by another does not and cannot exist. One people may keep another for its own use, a place to make money in, a human cattle firm to be worked for the profit of its own inhabitants."

এই তীব্র উক্তির মধ্যে প্রথমে যতটা সত্য আছে বলিয়া মনে হয়, তাহার অপেক্ষাও গভীরতর সত্য নিহিত আছে। এক জাতি অন্য জাতিকে শাসন করিতেছে, অথচ শাসিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকিতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উদাহরণ একটিও নাই। মনুষ্যজাতি এখনও পর্যন্ত এমন কোনো উপায়ের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই যাহাতে শাসিতের স্বার্থ বিপদশূন্য হয়।— সে স্বার্থকে বিপদশূন্য করিতে হইলে, বিজিত জাতিকে শাসনভারের কিয়দংশ বহন করিতে দিতেই হইবে— ইহাই একমাত্র প্রতিকার।— এই প্রকার জেতৃশাসন শুধু যে বিজিতের পক্ষে হানিজনক তাহা নহে— জেতৃগণ নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষের সংস্রবে, বাণিজ্যই ইংলন্ডের প্রধান স্বার্থ। গত দশ বৎসর ধরিয়া, এই বাণিজ্য প্রায় বৃদ্ধিহীন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে যে পঞ্চবর্ষের শেষ হইয়াছে, সেই পঞ্চবর্ষে ভারতের বার্ষিক গড়পড়তা আমদানি (যদিও সমস্ত নহে— তথাপি অধিকাংশই ইংলন্ড হইতে) চারি কোটি সত্তর লক্ষ পাউন্ড হইয়াছিল। তাহার পরবর্তী পঞ্চবর্ষের বার্ষিক গড়পড়তা চারি কোটি নব্বই লক্ষ পাউন্ড মাত্র হইয়াছে। হিসাবে দাঁড়ায়, প্রত্যেক ভারতবাসী, ইংলন্ডের নিকট বৎসরে আন্দাজ তিন সিলিংয়ের মাল খরিদ করিয়াছে। গভর্নমেন্ট যদি এমন উপায় অবলম্বন করেন যে ভারতবাসী ধনশালী হয়, তবে প্রত্যেক ভারতবাসী বৎসরে পাঁচ ছয় সিলিংয়ের মাল ইংলন্ডের নিকট নিশ্চয়ই ক্রয় করিতে পারে। দরিদ্রতা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে দুর্ভিক্ষের যেরূপ প্রবলতা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইংলন্ডের ভারতীয় বাণিজ্য যে ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিবে, ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

বর্তমান সময়ে ইংলন্ডের অনেকগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন উপনিবেশ। এই উপনিবেশগুলি এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইবার পূর্বে ইংরাজগণ ভারতবর্ষ নিজস্ব করিয়াছেন। এখনি সহজে অনুমান করা যায়—সময়ক্রমে এই উপনিবেশগুলি ইংলন্ডের সিংহাসনের অধীনতা

২. 'বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন কাল'— সম্পাদক।

পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইবে—কিন্তু ভারতবর্ষ তখনও ইংরাজেরই থাকিবে। বিজ্ঞজনেরা উপনিবেশকে বৃক্ষের ফলের সহিত তুলনা করিয়াছেন,—যথাসময়ে পাকিয়া পড়িয়া যাইবে। ইংলন্ডের উপনিবেশগুলির ধনজনবল যেরূপ দ্রুত বর্ধিত হইয়া চলিতেছে—তাহাতে, যদি কোনো ভবিষ্যৎবক্তা বলেন যে অস্ট্রেলিয়া কিংবা কানাডা বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও অধীনে থাকিবে—তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সাহসী। ভারতবর্ষ কিন্তু বাস্তবিকই এখন দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংলন্ডের সহিত সম্পর্ক রাখিবার জন্য সমুৎসুক। 'আমাদের শাস্ত্রে আছে রাজভক্তি পরম ধর্ম,' ইত্যাদি ইত্যাদি, সেন্টিমেন্টের জন্য নহে— স্পষ্ট বলিতে সংকোচ নাই,— স্বার্থেরই জন্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাধুসঙ্গমে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ করিবার আছে। আমরা ইংলন্ডের সহিত আমাদের অদৃষ্ট মিলাইয়াছি—আমরা বাস্তবিকই ইচ্ছা করি ব্রিটিশ শাসন ভারতে স্থায়িত্বলাভ করুক। তবে আমরা বর্তমান শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী নহি। এ প্রণালী ৭০ বৎসর পূর্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই ৭০ বৎসরে দেশে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে; দেশের শিক্ষিত লোক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহারা তাহাদের স্বদেশের উচ্চ রাজকর্মে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে চাহে। সাম্রাজ্যের উচ্চতম কর্তৃসভায় তাহারা তাহাদের কণ্ঠ উত্থিত করিতে চাহে। তাহাদের এই দাবি অগ্রাহ্য করা সহজ। এইরূপে এই ক্ষমতাবান জনাংশের অসন্তোষ বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখা সহজ। তাহাদের সাহায্য না লইয়া— সাম্রাজ্যের এই শক্তিকে অবহেলা করিয়া— ক্ষীণভাবে শাসন করা সহজ। কিন্তু এরূপ না করাই বিজ্ঞের কার্য হইবে। এতটা শক্তি অপচয় হইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য নহে। ভারতবাসীকে তাহাদের স্বার্থ, তাহাদের শিল্প, তাহাদের কৃষির প্রতিনিধিত্ব দেওয়া উচিত। তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগকেই দায়ী করা উচিত, তখন যদি দুর্ভিক্ষ হয়, আর ভারতবাসী বলিতে পাইবে না, রাজার দোষে দুর্ভিক্ষ হইল।

ভারতবাসীরা হঠাৎ পরিবর্তন বা বিপ্লবের পক্ষপাতী নহে। একটা অসাধারণ কিছুর আবদার তাহাদের নাই। তাহারা বর্তমান প্রথারই কিঞ্চিৎ সংস্কার চাহে মাত্র। তাহারা চাহে যে রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তি মিলিত হইয়া রাজতন্ত্র দৃঢ়তর হউক; রাজায় প্রজায় আন্তরিক যোগ স্থাপিত হউক। তাহারা গভর্নর জেনারেলের সদস্যসভায় কতিপয় ভারতবাসীকে সদস্যরূপে দেখিতে চাহে। তাহারা প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যসভায় ভারতবর্ষীয় সদস্য দেখিতে চাহে। শাসনবিষয়ক সমস্ত বাদানুবাদে তাহারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে চাহে।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা আছে; ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুসারে এই সভাগুলিতে কতিপয় নির্বাচিত ভারতবাসী প্রবেশ লাভ করেন। এই প্রণালী সন্তোষজনক ফল উৎপাদন করিয়াছে। এই ব্যবস্থাপক সভাগুলি যদি আরও বিস্তৃতিলাভ করে, তবে রাজতন্ত্র দৃঢ়তর হইবে এবং রাজায় প্রজায় আন্তরিক যোগ বর্ধিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে কুড়ি হইতে চল্লিশটি করিয়া জেলা আছে। এক এক জেলায় দশ লক্ষ বা তাহারও অধিক জনসংখ্যা।—প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার জন্য সকল জেলা না হউক, বৃহৎ বৃহৎ জেলাগুলি একটি করিয়া সভ্য নির্বাচন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে।

১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মহারানি ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে, সমস্ত উচ্চ রাজকর্মে ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু নামত প্রবেশাধিকার না দিয়া, কার্যত দেওয়া উচিত। সিভিল সার্ভিস, শিক্ষাবিভাগ, পূর্তবিভাগ, ডাকবিভাগ প্রভৃতি সর্বত্র ভারতবাসীর উন্নতি অব্যাহত হওয়া উচিত। এই সকল বিভাগে ইংরাজও যে প্রয়োজন তাহার কোনোই সন্দেহ নাই। আমাদের সহায়স্বরূপ, নেতাস্বরূপ আমরা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইব। তবে তাঁহারা ঐ সকল পদগুলি একচেটিয়া করিয়া লইবেন, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। বাৎসরিক হাজার টাকা বা তাহার অধিক বেতনের যতগুলি রাজকর্ম আছে তাহাতে বেতন ও পেন্সনে ইংরাজগণ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড পান, আমরা পাই ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড মাত্র। শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রতি ইহা নিতান্ত অবিচার।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আছে, এবং অনেক গ্রামে গ্রামসমিতি গঠিত হইতেছে। পূর্বকালে এরূপ সমিতি বা মণ্ডলী (Village Community) ছিল। হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যকালে দেশময় এইরূপ স্বায়ত্তশাসনকারী মণ্ডলী বিস্তৃত ছিল। ইংরাজ শাসনে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। এই নতুন গ্রামসমিতিগুলি সেই পুরাতন, মণ্ডলীরই অনুকরণ। গভর্নমেন্ট যদি যত্নের সহিত ও বিশ্বাস স্থাপনের সহিত সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন তবে দেশের অনেক মঙ্গল হয়। এই সমিতিগুলিকে কতকটা ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদের হস্তে কোনো কোনো প্রয়োজনীয় কার্যভার দেওয়া যাইতে পারে। গ্রামে যে সমস্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিবাদ উপস্থিত হয়, সে সকলের বিচারভার নহে—আপসে মিট্‌মাট্ করিয়া দিবার ভার এই গ্রাম-সমিতিগুলিকে দেওয়া যাইতে পারে। তাহার স্থানীয় অভিজ্ঞতা সহযোগে সহজে উচিত মীমাংসায় উপনীত হইতে সক্ষম হইবে। সাক্ষিগণ দূর আদালতে যাওয়ার কষ্ট ও পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাইবে। সর্বোপরি, এই গ্রামসমিতি, রাজা ও প্রজার আন্তরিক যোগের সেতুস্বরূপ হইবে।

ভারত গভর্নমেন্টকে প্রজার সহিত অধিকতর সংযোগে আনিবার জন্য গভর্নমেন্টকে সমধিক লোকপ্রিয়, লোকহিতকর ও দৃঢ় করিবার জন্য, এই কতিপয় উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। ভূতকালে বিজ্ঞতম শাসনকর্তাগণ—যেমন মন্‌রো, এলফিন্‌স্টোন, বেন্টিঙ্ক—ভারতবাসীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া, দেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান ছিলেন। মহাজনগণ কর্তৃক প্রদর্শিত সেই পন্থার অনুসরণই এখন আবশ্যক। সমস্ত সভ্য দেশেই, সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিবার পক্ষে জনসাধারণের সহায়তা একান্ত আবশ্যক। অন্য দেশের পক্ষে যাহা প্রয়োজন—ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা আরও অধিক প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির খাদ্যাখাদ্যবিচারে যে পরিমাণ সাবধানতার আবশ্যক, রোগীর পক্ষে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক সাবধানতা অবলম্বনীয়। ভারতবর্ষ দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষপীড়ায় জর্জরিত।

□ *ভারতী*, ফাল্গুন, ১৩০৮

পঞ্চানন্দের বক্তৃতা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১. বক্তৃতার হেতুবাদ

শ্রীযুক্ত মিস্টার্ লালমোহন বাবু[১] বিলাতে গিয়া ভারি এক তরঙ্গ তুলিয়া আসিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আজি হউক, কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, ভারতবর্ষের বিলক্ষণ একটা উপকার না হইয়া যায় না। আপাতত বিলাতি বক্তৃতাতে ভারতবর্ষের নাম খুব বেশি বেশি হইতেছে, ইহাই এক উপকার।

ভারতবর্ষের কথা লইয়া একটা আন্দোলন হইলে, সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 'ভারতবর্ষের জন্য ইংলন্ড কি করিয়াছেন,'—এই কথাকে ধুয়া ধরিয়া হন্টার্ সাহেব খুব বকাবকি করিয়াছেন; ইহার উতোর দিবার জন্য আর এক সাহেব 'ভারতবর্ষের ঘাড়ে ইংলন্ড কি চাপাইয়াছেন'—এই প্রসঙ্গ কবিয়া অনেক লেখালেখি কবিয়াছেন। ইহাই তো যথেষ্ট সৌভাগ্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু যখন কপাল ফলে তখন জলে প্রদীপ জ্বলে—সৌভাগ্যের শেষ ঐখানেই না হইয়া পঞ্চানন্দের ঘাড়েও বক্তৃতার ভূত চাপিয়াছে। সেই জন্যই সকল বক্তৃতার সার যে বক্তৃতা, তাহার সার নিম্নে সুবিন্যস্ত হইতেছে।

ভারতের জন্য ইংলন্ড কি করিয়াছেন? কি করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য, কেননা বলা নিষ্প্রয়োজন। দেখিয়া হউক, ঠেকিয়া হউক অন্যের নিকট শিখিয়াই বা হউক, কি করিয়াছেন তাহা সকলেই টের পাইতেছেন, কিংবা পাইয়াছেন। তবে এ প্রশ্ন কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর আঁচলা ভাগে, বর্তমান কালের এই পুচ্ছাংশে তবে এ প্রশ্ন কেন?—বক্তৃতা করিতেই হইবে, সেই জন্য। সূর্যের অধোদেশে সকলই পুরাতন, যেহেতু কিছুই নূতন নাই। ইহা পুরাতন প্রবাদ, যেহেতু কিছুই নূতন নাই। তথাপি সেই পুরাতনকে ভাঙচুর করিয়া আবার গড়িয়া পিটিয়া, মাজিয়া ঘষিয়া, নূতনের মূর্তি দিবার জন্য সমগ্র সংসারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে। সকলেই যাহা দেখিতেছে, সকলেই যাহা শুনিতেছে, সকলেই যাহা জানিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য, তাহাই শুনাইবার জন্য, তাহাই জানাইবার জন্য বক্তৃতা করিতে হয়। অতএব, ভারতের জন্য ইংলন্ড কি করিয়াছেন?—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়; আপনা-আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর স্বরূপ একটা বক্তৃতাও করিতে হয়। বক্তৃতাই সমাজের জীবনী-শক্তি।

১ রেভারেন্ড লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্তৃতা যে অবশ্যকর্তব্য, তাহা প্রতিপন্ন করা গেল। কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে কয়জন লোক কাজ করিতে প্রস্তুত হয়? আমি দেখাইব যে, বক্তৃতা যেমন কর্তব্য কর্ম, তেমনি লাভজনকও বটে।

মনের কথা যে খুলিয়া বলে, সে যে পাগল, ইহা সর্ববাদিসম্মত। পক্ষান্তরে মনের ভাব গোপন করিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি ইহাও পণ্ডিতের কথা। এতএব বুঝিয়া কথা কহিতে পারিলে অর্থাৎ যেখানে উৎপীড়ন নাই, সেখানে সত্য কথাটা না বলিয়া অন্য কিছু বলিলেই, দুই দিক্ রক্ষা করা হয়,— সাপ মরে, অথচ লাঠিখানি ভাঙে না— নাম হয়, অথচ মিথ্যাবাদী বলিয়া বদনাম হয না। কে বলিবে বক্তৃতা লাভজনক নয়? যে বাঙালি, ইংরেজিভাষায় বক্তৃতা করে, অথচ 'দেশের হিতের জন্য আমার জীবন ধারণ,' কথায় বা ব্যবহারে এই ভাব প্রকাশ করে, সে-ই প্রকৃত সারগ্রাহী ব্যক্তি—দুর্লভ মানব জন্মে, তাহার ন্যায় মানব ততোধিক সুদুর্লভ। যাহাকে বলিতেছি, সে আমার মনের ভাব জানিতে পারিল না; যাহার হইয়া বলিতেছি, সে আমার কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিল না— বক্তৃতার ইহা অপেক্ষা বেশি বুজরুকি আর কি হইতে পারে বলো? এ প্রকার বক্তা অপেক্ষা অধিকতর মর্মজ্ঞ লোক কোথায় পাইবে বলো?

অতএব হে মহিলাকুল এবং ভদ্রগণ! আমি বক্তৃতা করিতেছি। ইংরেজি ভাষা আর গোমাংস, দুই আমার উদরে আছেন; কিন্তু হিন্দুর ছেলে, হিন্দু সমাজে চলাফেরা করি; দুই চাপিয়া রাখিতে হইবে। সেই জন্য ইংরেজিতে না হইয়া বাংলায় আমার বক্তৃতা। দোষ গ্রহণ করিবেন না, মার্জনী ধরিবেন না, মার্জনা করিবেন।

২. ভারতের জন্য ইংলন্ড কি করিয়াছেন?

ইহা অতি অন্যায় প্রশ্ন। হন্টার্ সাহেব পছন্দ করিয়া প্রসঙ্গের এরূপ নামকরণ করায় তাঁহার রাজভক্তির অভাব অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি যদি সাহেব না হইতেন, উপরন্তু যদি ভারতবর্ষীয় গভর্নমেন্টের নিমক না খাইয়া থাকিতেন, এবং আরও নিমকের প্রত্যাশা না রাখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেও অপরাধ হইত না, তাঁহার প্লীহা ফাটাইয়া দিলেও বিধিমতে কেহ দণ্ডার্হ হইত না। কারণ এরূপ প্রশ্নের ভঙ্গিতে ইংলন্ড যেন ভারতের কিছু করিতে বাকি রাখিয়াছেন, এমন সংশয় স্বভাবতই হইতে পারে। বস্তুত ইংলন্ড কি না করিয়াছেন, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া লুণের গুণ দেখানো হণ্টার সাহেবের উচিত ছিল। ভরসা যে, তাঁহার উদ্দেশ্য তাহাই ছিল, ভাষার বাঁধুনিটা কম বলিয়াই একটা বেফাঁস কথা তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন।

ভারতের জন্য ইংলন্ড না করিয়াছেন কি? কৃতঘ্ন ভারতবাসী ভিন্ন এমন প্রাণী কে আছে যে, ইংলন্ডের কীর্তিকলাপ দেখিয়াও ইংলন্ডের ভারত-কীর্তির প্রমাণ চাহিতে সাহস পায়? ধরিয়া যাও, গণনায় তোমার অঙ্গুলি ফুরাইযা যাইবে; তথাপি ইংলন্ডের কীর্তি সংখ্যায় কিছুই হইবে না। তথাপি ইংলন্ডের আত্মত্যাগ, ইংলন্ডের উপচিকীর্ষা; ইংলন্ডের ভালোবাসা, ইংলন্ডের ধর্মজ্ঞানের ভারতে যে পরিচয় আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ করিব। নতুবা পাপিষ্ঠ ভারতবাসীর চৈতন্যসঞ্চার, জ্ঞানোদয় কিছুতেই হইতেছে না।

ইংলন্ডের জন্য ইংলন্ডে বসিয়া ইংলন্ড কি করিয়াছেন, কিছু করিয়াছেন কি না, ভগবান

জানেন; যে সমুদ্র ডিঙ্গাইতে পারে, সে-ই সে কথা বলিতে পারে; কিন্তু আমি পৈতাধারী ব্রাহ্মণতনয়, বাস্তুভিটার চৌহদ্দির ভিতরে থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিব; আর নিজে যাহা দেখি নাই, তাহার বিষয় বলিতে হইলে, ইংলন্ডের নিজমুখে যে কথা শুনি নাই, তাহা বলিব না; পাছে সত্যের অপলাপ হয়, সেই জন্য বলিব না। যাহারা মনে করে সুখ্যাতির কথা আরোপ করিয়া বলিলে দোষ নাই, তাহারা চাটুকার, তাহারা ভ্রান্ত, তাহারা উচ্ছন্নে যাউক।

তবে দেখ, ভারতের জন্য ইংলন্ড কি করিয়াছেন, কি সহিয়াছেন? সুসভ্য শাস্ত্র-বিশারদ, ধর্মষণ্ড, ইংলন্ড ভারতের উপকার করিবেন বলিয়া সেই উপকার করিবার উপায়বিধান উদ্দেশে আত্মাবমাননা স্বীকার করিয়া বেণের পুঁটুলি লইয়া, বৈদ্যের থলিবড়ি লইয়া ভারতের সহিত প্রথম পরিচয় করেন। উপকার করিবেন বলিয়া কত—কত— কতবড় বিস্তীর্ণ সাগরপারে আসিতে কিছুমাত্র সংকোচ করেন নাই। বলো তো, কৃতঘ্ন পামর, এ কলিকালে কয়জন ইহা করিয়া থাকে? হনুমান সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিল, সত্য; হনুমান বিশল্যকরণী প্রয়োগ করিয়াছিল, সত্য; হনুমান মৃত্যুশর আনয়নার্থ, দৈবজ্ঞ সাজিয়াছিল, সত্য; কিন্তু যদি বুদ্ধি থাকে, তুলনা করিয়া দেখো, ইংলন্ডরূপ হনুমানের সমীপে তোমার হনুমান কলিকাও পাইতে পারিবে না। তথাপি, তোমার হনুমানের স্বার্থ ছিল, দৈববল ছিল, তদ্‌ভিন্ন সে ত্রেতাযুগের লোক, তখন অধার্মিকের সংখ্যা এত অধিক ছিল না—অহংকারের সহিত বলিতেছি—যাহার সাধ্য থাকে আমার দস্তানা তুলুক—আমার হনুমানের তুলনায় তোমাদের হনুমান মাছি হইতে ক্ষুদ্র, মশা হইতে দুর্বল, তেলেপোকা হইতে নির্বোধ, কেন্নো হইতে ঘৃণ্য। যদি লজ্জা থাকে, ও তুলনা আর তুলিও না।

আবার দেখো, ক্লাইভ অসমসাহসী, রণপণ্ডিত, অমিততেজা, খ্রিস্টধর্মে-নাকানিচুবানি-ইংলন্ডের সন্তান। শুদ্ধ তোমাদের উপকার, ভারতের হিত, বঙ্গের উন্নতির জন্য ইহকালকে ভ্রূকুটি করিয়া পরকালের প্রতি অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আত্মাকে শয়তানের জিম্মায় রাখিয়া জাল, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা— কি না করিলেন, মানুষ হইয়া মানুষের জন্য কয়জন এতদূর আত্ম-বিসর্জন দেখাইতে পারে?

ইংলন্ড জানেন যে, জালসাজী বড় পাপের কর্ম, ইংলন্ড জানেন যে, পাপীর দণ্ড বিধান না করিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ইংলন্ড জানেন যে, ভারতের উপকার করিতে হইলে ভারতের ভ্রান্ত সন্তানকে সৎপথ দেখাইতে হইবে। জানেন বলিয়া ভারতবর্ষকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া গ্লানি স্বীকার করিতে হইলেও, নন্দকুমারকে ইংলন্ড ফাঁসি দিতে ইতস্তত করিলেন না। দুর্বৃত্ত নন্দকুমারের দুর্গতিতে পাপীর হৃদয় কম্পিত হইল, ধর্মান্ধ ভারতবর্ষ ইংলন্ডের কৃপায় শিখিয়া লইল। এত ত্যাগ স্বীকার, এত ধর্মোপদেশ দিতে আগ্রহ যাহার আছে, কোন্ লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাক যে, এ হেন ইংলন্ড ভারতের জন্য কি করিয়াছেন?

তুমি বলিতে পারো—এ সকল গৌরবের কথা বটে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু বড় প্রাচীন কথা; এ কথার বলে সম্প্রতি সুখ্যাতির দাবি করা চলে না, দাবিতে তামাদি দোষ ঘটিয়াছে। মঞ্জুর! আর পুরাতন কথা বলিব না, হালের ব্যবস্থা, দেখাইয়াই তোমার চক্ষে জলধারা প্রবাহিত করিতে পারি কি না, তাহা দেখো! ভক্তি তোমার অন্তরে আছে, তাহা জানি। আমি বক্তৃতা করিলে, সত্যের আবৃত্তি করিলে, তোমার প্রেমাশ্রু পড়িবেই পড়িবে।—

"বাহিরায় নদী যবে পর্বত উদ্দেশে,
কার সাধ্য রোধে তার গতি?"—

ভারতবর্ষ পূর্ব পূর্বকালে নিতান্ত অসভ্য ছিল, এ কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে ইংরেজি ইতিহাস পড়ে নাই— ইংলন্ড তাহাকে সভ্য করিয়াছেন, ইহাও নিঃসংশয়। এমন স্বতঃসিদ্ধ কথার সবিস্তার উল্লেখ অনাবশ্যক হইলেও আমাকে উল্লেখ করতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, ইংলন্ড কি করিয়াছেন।

এই যে জ্যৈষ্ঠ মাসের আম-কাঁঠাল-পাকানে গরমে তোমরা কাহাকেও আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত না দেখিলে অসভ্য বলিয়া থাক, সে কাহার প্রসাদাৎ? এই যে কোচ, কেদারা, কাচের বাসন, আরশি ফেরেমের অভাব হইলে তোমার ঘরের শোভা হয় না বলিয়া দুঃখ করিয়া থাক, এ-শিক্ষা কাহার নিকট পাইয়াছ? এই যে তোমার ভাষা তোমার দেশের চাষায় বুঝিতে পারে না, তুমি যে গুণে দেশের সাড়ে পনেরো আনা লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে পার না, তাহাদের সংসর্গ ঘৃণাজনক মনে কর, এ গুণ কোথায় পাইলে? এই যে, পিতৃপুরুষের ধর্ম কি তাহা না জানিয়াও তুমি বিসর্জন করিতে পারিয়াছ, মুষ্টিভিক্ষা উঠাইয়া দিয়া পশুশালায় চাঁদা দিতে অভ্যাস করিয়াছ, এই যে কোলাকুলি তুলিয়া দিয়া হাত ধরাধরি করিয়া সম্ভাষণের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে শিখিয়াছ— এ বিদ্যা কে তোমাকে দান করিয়াছে? একটু ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, ইংলন্ড তোমাদের জন্য কি করিয়াছেন?

ভারতবর্ষকে ইংলন্ড ধনশালী করিয়াছেন। আসান্টিতে যুদ্ধ হয়, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; পারস্যের রাজা চীন দেশে বেড়াইতে যান, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; বিলাতের লোক বিলাতে বসিয়া চাকরি করে, ভারতবর্ষ তাহাদের মাহিনার টাকা দেয়; ইংলন্ড ভারতের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না—সে কৃতজ্ঞতায় খ্রিস্টধর্মের পাদরিদিগকে ভারতবর্ষ টাকা দেয়; ভারতরক্ষার জন্য ইংলন্ডে সৈন্য থাকে, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; লাঙ্কাসিয়ারে দুর্ভিক্ষ হয়, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; অধিক কি, এই যে প্রায় বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হইতেছে, তাহার প্রতিকারের জন্যও ভারতবর্ষ অগ্রিম টাকা দিয়া রাখে; ভারতবর্ষের মতো কোন্ দেশ ধনশালী? টাকা অনেকেই দিতে পারে, অথচ তাহারা কষ্ট পাইয়া দেয়; তাহা হইলে তাহাদিগকে ধনবন্ত বলা যায় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সে কথাও বলিবার যো নাই। দোতালার গাঁথনি হইতেছে, নীচের তলা ফাটিতে আরম্ভ করিল, এতই টাকা যে, ভারতের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ইন্দ্রালয় সদৃশ নূতন অট্টালিকা হইল, ঘর বড় সোঁতা; আচ্ছা ভঙিয়া ফেলো; ভারত টাকায় কাতর নহে; ঘর বড় গরম; উত্তম কথা, নূতন ঘর কর, টাকার কমি নাই। কলিকাতায় অনেক বড় লোকের বাস, অনেক গোলমাল, রাজকার্য এখানে সুচারুরূপে নির্বাহ করা কষ্টকর, বেশ, সবলবাহনে সিমলা যাও, পথখরচ, খাইখরচ, খোসখরচ কিছুরই অভাব নাই, টাকা দিতে ভারতের মুখ ম্লান হয় না; এমন ধনবান্ করিয়া দেওয়া সহজ কাজ নয়; তোমরা কি বলো, ইংলন্ড এ কীর্তি করেন নাই?

পূর্বে ভারতবর্ষ অরাজক ছিল; ভারত রাজ জানিত না, রাজ্য জানিত না; ভারতবাসী জন্মিত, খাইত, ঘুমাইত, আর বংশ রাখিয়া মরিত। এখন সে দুর্দশা নাই; ভাবতবাসী রাজনীতি জানে, সমাজনীতি বোঝে, ধর্মনীতির বিচার করে, অথচ রাজ্যের চিন্তা তাহাকে

করিতে হয় না, ইংলন্ড স্বয়ং ভারতের হইয়া সেটা করিয়া লন; সমাজের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, ভগবান্ এক প্রকার চালাইয়া লন, আর ধর্মের ভার লইতে হয় না, খোলা হাওয়ায়, খোলা প্রাণে দুইটা উচ্চ-বাচ্য কর উত্তম, না কর, নাই। এ সুখের কর্তা— ইংলন্ড।

অশান্ত অসভ্য ভারতবর্ষে পূর্বে শান্তি ছিল না, কেবল উপদ্রব ছিল; সেই জন্য বাণিজ্য ছিল না, সেই জন্য বাদশা স্বয়ং তাজমহল গাঁথিলেন, আর বেগম রেজার কাজ করিতেন। এখন ছড়ি হাতে বেড়াইতে যাও, শ্রীঘর না দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে পাইবে না। বাণিজ্যের এমনই প্রখর স্রোত যে, তাঁতিকুল একেবারে ভাসিয়া গেল। শিল্পের এমনই উন্নতি যে, সুদৃশ্য হর্ম্যে পাছে কেহ শঙ্কাক্রমে প্রবেশ না করে, এই আশঙ্কায় হর্ম্যগণ স্বীয় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, বাহির হইতে অভ্যন্তর দেখাইয়া থাকে। ইংলন্ডে এরূপ উন্নতি হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য ইংলন্ড ইহা করিয়াছেন।

অনন্ত কথা বলিতে গেলে অনন্ত কালও ফুরাইয়া যাইবে; সুতরাং আর কত বলিব? তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবাসী রাজভক্তিহীন। স্বয়ং রাজপুরুষ ইংরেজ মহাপুরুষ একথা যখন-তখন বলিয়া থাকেন, সুতরাং কথাটা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। তোমরা ইংলন্ডের আধিপত্যের চিরস্থায়িত্ব কামনা করিয়া থাক, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া তোমাদের এই বিশ্বাসের পর নিশ্বাস কে সহ্য করিতে পারে? ইংলন্ডকে তোমরা ভালোবাস, ভক্তি কর; তাহাতে সকল মহাপুরুষের তো কুলায় না। হুগলির জজ্‌গ্রান্ট সাহেব মুসলমান পোযাদাকে দিয়া সাক্ষীর শ্রেণীতে দণ্ডায়মানা ব্রাহ্মণকন্যার ঘোমটা জোর করিয়া খোলাইয়া দিয়া অত্যাচার করিয়াছেন; মাদ্রাজে মালটবি সাহেব একজন মুনসেফকে গুলি করিয়া ক্ষ্যাপা সাজিয়াছেন—এ সব কথা তোমরা কেন বলো? অমুক আইনে অনিষ্ট হইবে—অমুক ট্যাকস বসিলে উৎপীড়ন হইবে— এ উৎপাতে তোমাদের কাজ কি? রাজার ঘরে গেল, তাহার পর লুণের কড়ি তেলে খরচ হইল, কি হিন্দুস্থানিকে বাঁচাইবার টাকা (১) দিয়া আফগানস্থানির (২) মুণ্ডপাত করা হইল—তাহাতে তোমাদের বলিবার অধিকার কি? ইংলন্ড যদি চায়, তবে কটা কুকুরে কামড়াইলেও তোমরা কাঁদিতে পাইবে না— ইহা রাজনীতির ভক্তি অধ্যায়ের প্রথম পাঠ, অবোধ শিশু তোমরা এ কথা কবে শিখিবে?

সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষাদানে ইংলন্ড এত অকাতব যে, রাজভক্তি শিখাইবার ব্যবস্থাও করিতে ত্রুটি করেন নাই, সে ব্যবস্থার নাম মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা ওরফে ন-আইন।

পঞ্চানন্দ শপথ করিতেছেন, তিনি রাজভক্তির, মধুখ অর্থাৎ মোম; মধু নাই সে কপালের দোষ।

খাও পরো টেক্‌স দাও,
গৌর প্রেমে মত্ত হও,
রাজনীতি, রাজনতি, গৌররূপে কর মতি,
গৌর করিবেন গতি, চরণে শরণ নাও—

পঞ্চানন্দ এই মন্ত্রের উপাসক।

☐ *ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী* ১৩৩২, পৃ. ২০৫-১২

মারাঠি ও বাংলা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকাল ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের ভাষা শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন—ইহা একটি শুভ-চিহ্ন বলিতে হইবে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা স্থাপিত হইবার পক্ষে যতগুলি বাধা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ভাষার বাধাও বড় একটা কম নহে। সচরাচর, ভারতবর্ষকে একটি দেশ বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে একটি মহাদেশ অথবা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপখণ্ডের মধ্যে যেরূপ ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ভাষা— ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সেইরূপ বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি বিবিধ ভাষা প্রচলিত। আজকাল, রেলপথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বের বাধা ক্রমশই অপসারিত হইতেছে এবং আমাদিগের রাষ্ট্রীয়-সভার অধিবেশন-উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে ভাষার বন্ধন ও একতা না থাকা প্রযুক্ত তেমন আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। ভাষায় একরূপ কাজ চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু এই নিতান্ত পরকীয় ভাষার অবলম্বনে আমরা পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারি না। ভাষা-সম্বন্ধে আমাদের নিকট একজন ইংরাজও যেরূপ, একজন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুও সেইরূপ। উভয়েরই সহিত ইংরেজি ভাষায় আমাদিগের কথাবার্তা চালাইতে হয়। ইহা কম অসুবিধার কথা নহে। এই ভাষার বাধা একেবারে অপসারিত হইবারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। গণনা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের প্রাদেশিক ভাষার সংখ্যা, বোধ করি, দ্বাদশেরও অধিক হইবে। এক বোম্বাই অঞ্চলের মধ্যেই তো কতকগুলি ভাষা। এই সমস্ত ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকের এক একটি "সার উইলিয়ম জোন্‌স্" না হইলে চলে না। তবে, এই পর্যন্ত করা যাইতে পারে—যাহার যতটুকু সাধ্য, আপনার ভাষা ছাড়া, আরও দুই একট প্রাদেশিক ভাষা লিখিবার চেষ্টা করা;—তাহা হইলেও কতকটা কাজ হয়। বিশেষত, যে উপভাষাগুলির মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ বর্তমান—প্রাকৃত হইতে যাহাদিগের উৎপত্তি—সেই সকল ভাষার অনুশীলনে, আর কিছু না হউক, অন্তত নিজ নিজ ভাষার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ হইতে পারে। মারাঠি ও বাংলার মধ্যে এইরূপ নিকট সম্বন্ধ বর্তমান—উভয়ই এক জননী হইতে প্রসূত। সুতরাং মারাঠি ভাষার আলোচনায়, বাংলা ভাষারও কতকটা উপকার হইতে পারে। গত পৌষ মাসের "সাধনায়" "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা" এই নামে যে

একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লেখক মহাশয় মারাঠি ভাষার উৎপত্তি এবং বাংলা ও মারাঠি শব্দের ঐক্যানৈক্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ বিবৃত করিয়াছেন। তাহারই অনুবৃত্তি স্বরূপ, দুই চারটি কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মারাঠি ও বাংলা ভাষার গঠনে দুই একটি মূলগত প্রভেদ লক্ষিত হয়। মারাঠি ভাষায় তিন লিঙ্গ— পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গভেদ প্রকরণ সকল সময়ে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হয় না। "দউত" (দোয়াৎ) শব্দ, "বাট" (পথ) শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; 'বাস' (গন্ধ) শব্দ পুংলিঙ্গ; 'মাঞ্জর' (মার্জার—বিড়াল) শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; 'কুত্রা' (কুকুর) শব্দ পুংলিঙ্গ; 'মনুষ্য' শব্দ কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও ক্লীবলিঙ্গ। 'বাট' শব্দ কেন স্ত্রীলিঙ্গ, এবং 'মাঞ্জর' শব্দ কেন ক্লীবলিঙ্গ হইল, ইহার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দেশ করা যায় না। চিরপ্রচলিত ব্যবহারই ইহার একমাত্র কারণ। নাম ও সর্বনামের লিঙ্গ অনুসারে, স্থলবিশেষে, ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে রূপান্তর উপস্থিত হয়। বক্তা স্ত্রীলোক হইলে, 'মী করিত্যে' (আমি করি) পুরুষ হইলে 'মী করিতো' এইরূপ প্রয়োগ হয়। এ গেল, কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ। আবার কর্মবাচ্যের প্রয়োগের সময়, কর্তা যে লিঙ্গেরই হউক না কেন, তাহার লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত না হইয়া, কর্মপদের লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়াপদের রূপান্তর হয়। যথা 'মী কাম কেলে' (আমি কাজ করিতেছি— অথবা আমা কর্তৃক কাজ কৃত হয়েছে) 'মী বাট পাহিলী' (আমি পথ দেখেছি— অথবা আমা কর্তৃক পথ দেখা হইয়াছে) এই দুই বাক্যের মধ্যে 'কাম' ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া 'কেলে' এই ক্রিয়াপদ একারান্ত হইল এবং 'বাট' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া 'পাহিলী' এই ক্রিয়াপদ ঈকারান্ত হইল। ইহা কতকটা হিন্দি ভাষার অনুরূপ। আর এক প্রভেদ; বাংলায় বহুবচনে ক্রিয়ার বিভক্তিতে কোনো রূপান্তর হয় না, কিন্তু মারাঠি ভাষায় তাহা হইয়া থাকে। যথা—'সে করে,' 'তাহারা করে'; এই দুই বাক্যগত ক্রিয়াপদের রূপ একই; কিন্তু মারাঠি ভাষায় এই স্থলে 'তো করিতো' 'তে করিতাত' এইরূপ হইয়া থাকে। আরও কিছু কিছু প্রভেদ আছে। তাহা এখানে বলা অনাবশ্যক।

এই সকল কারণে,—বিশেষত লিঙ্গভেদের কোনো নিয়ম না থাকায়, কোনো বৈদেশিকের পক্ষে মারাঠি ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা কহা বড়ই কঠিন। পদে পদে তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। বাংলার লিঙ্গভেদের কোনো কড়াক্কড় নিয়ম নাই—একপ্রকার ভালোই হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা ভাষার সৌন্দর্য ও উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, স্থলবিশেষ কখনও বা 'সুন্দরী ললনা' কখনও বা 'সুন্দর মেয়েটি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি। এ বিষয়ে মারাঠি ভাষায় আবার একটু স্বতন্ত্র নিয়ম। যে বিশেষ্য শব্দগুলি খাস মারাঠি, বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে সেই সকল বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে—কিন্তু যে সকল বিশেষণ পদ খাস সংস্কৃত তাহার কোনো পরিবর্তন হয় না। মারাঠি 'চাঙ্গলা' (ভালো-সুন্দর) শব্দ যখন স্ত্রী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন 'চাঙ্গলী' এইরূপ প্রয়োগ হয়—কিন্তু 'সুন্দরী' এই শব্দ কোনো স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্যপদের পূর্বে বসে না। 'চাঙ্গলা বায়কো' (ভালো স্ত্রী) ও 'সুন্দর স্ত্রী' এইরূপ প্রয়োগ হয়— কিন্তু 'চাঙ্গলী বায়কো' (সুন্দরী স্ত্রী) এইরূপ প্রয়োগ কখনই হয় না। বাংলায় এই বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ

স্বাধীনতা আছে। আমার বোধ হয়, কোনো ভাষার মধ্যে কৃত্রিম নিয়মের যতই বাঁধাবাঁধি ও আঁটাআঁটি, ভাবস্ফূর্তির পক্ষে ততই ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু মারাঠি ভাষায় এরূপ কৃত্রিম বাধা সত্ত্বেও, মারাঠি কবি মোরোপন্ত কর্তৃক ১০৮ প্রকারের পদ্য-রামায়ণ রচিত হইয়াছে। ইহা সামান্য বাহাদুরী নহে। মোরোপন্ত রচিত একটি রামায়ণের নাম '*পরন্তু রামায়ণ*'— অর্থাৎ, ইহার প্রত্যেক শ্লোকে 'পরন্তু' এই শব্দটি কোনো প্রকারে ঘটানো হইয়াছে। এই শব্দ-মল্ল কবিদিগের রচনায়, ভাব অপেক্ষা কথার কৌশলই অধিক। ফরাসি ভাষার মধ্যে এইরূপ লিঙ্গভেদের কৃত্রিমতা লক্ষিত হয়। কতকটা এই কারণে হয়তো ইংরেজি কবিতা ফরাসি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে। কবিতাতে কতকটা বন্ধন আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিবন্ধনও দোষাবহ। এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সে যা হোক, ভাষার লিঙ্গভেদ রাখা যে একেবারেই দোষের, আমি এ কথা বলি না। তবে মারাঠি ও ফরাসি ভাষার ন্যায় অতটা কৃত্রিম বাড়াবাড়ি ভালো নহে। লিঙ্গ ভেদে ভাষার কতকটা সুবিধাও আছে। সর্বনামের মধ্যে লিঙ্গভেদ থাকায়, অনেক সময়, ভাষার অস্ফুটতা নিবারণ করা হয় এবং বারংবার নামের পুনরুক্তি করিতে হয় না। বাংলা ভাষায় এইরূপ লিঙ্গভেদ না থাকায়, সর্বনাম ব্যবহার না করিয়া আসল নামই, অনেক সময়, পুনরাবৃত্তি করিতে আমরা বাধ্য হই। ভাষার জোরও কতকটা কমিয়া যায়।

বাংলা ভাষা অপেক্ষা, মারাঠি ভাষায় নাম ও সর্বনামের বহুবচন অতি শোভন ও সহজভাবে নিষ্পন্ন হয়। বাংলায় 'তোমার' এই পদের বহুবচনে 'তোমাদের' বলিতে হইবে। সেই স্থলে মারাঠিতে 'তুমচা'-র বহুবচনে 'তুমচে' এইরূপ প্রয়োগ হয়। তা ছাড়া, বাংলা ভাষায় বস্তুবাচক নাম কিংবা সর্বনামের বহুবচন নিষ্পন্ন করিতে হইলে 'সকল', 'সমূহ' প্রভৃতি কথা জুড়িয়া দিতে হয়। 'হেঁ'র বহুবচনে যেখানে 'হী' বলিলেই চলে, বাংলায় সেই স্থলে 'এই'-র বহুবচনে 'এইসকল' বলিতে হয়। ফল কথা, ব্যাকরণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, বাংলা অপেক্ষা মারাঠি ভাষার গঠন যে অধিকতর পরিস্ফুট তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর এক কথা, বাংলা অপেক্ষা মারাঠি জোরালো। তাহার প্রধান কারণ, বাংলা অপেক্ষা মারাঠি ভাষায় রূঢ়িক ক্রিয়াপদ অধিক আছে। বাংলা ভাষায়, বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সহিত 'কৃ' ও 'ভূ'-ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ যোগ করিয়া অধিকাংশ ক্রিয়াপদ সংগঠিত। এইরূপ যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগে ভাষার জোর কমিয়া যায়। আমাদের কবিবর মাইকেল মধুসূদন, কবিতার ভাষায় বলবিধান করিবার জন্যই অনেক রূঢ়িক ক্রিয়াপদ রচনা করিয়া স্বীয় কবিতা মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকল অভিনব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ, সেই সময়ে, অনেকেরই অসহ্য মনে হইয়াছিল। পদ্যেই যখন এইরূপ—গদ্যের তো কথাই নাই। ফল কথা, এই প্রকার অধিক পরিমাণে আমাদের ভাষায় চলে না—ইহা বাংলার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা বাংলা গদ্যে 'রুষিছে' কিংবা 'লাজিছে'— এইরূপ বাক্য, কখনই প্রয়োগ করিতে পারি না। কিন্তু মারাঠি ভাষায় এইরূপ রূঢ়িক ক্রিয়াপদের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা অপেক্ষা মারাঠি যে জোরালো, তাহা এই উভয় ভাষার উচ্চারণেই কতকটা

প্রকাশ পায়। মারাঠির উচ্চারণ অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ। যদিও মারাঠি অপেক্ষা বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ অধিক, তথাপি কোনো মারাঠির সম্মুখে বাংলা ভাষায় কথা কহিলে, তাহার মধ্যে যে, কোনো সংস্কৃত শব্দ আছে, এরূপ তাঁহার অনুভবই হয় না। আমাদের বিকৃত উচ্চারণই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যতই বিদ্‌গ্ধ পণ্ডিত হউন না কেন, এই উচ্চারণের দোষে তাঁহারা অন্য প্রদেশীয় লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। সংস্কৃত, হিন্দি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় উচ্চারণের মুখ্য গতি যেরূপ খোলা আকারের দিকে, বাংলা ভাষার উচ্চারণ প্রবণতা সেইরূপ বোজা ও-কারের দিকে। আমার বোধ হয়, শারীরিক দুর্বলতাই ইহার মূল কারণ। বাঙালি অপেক্ষা মারাঠিদিগকে দেখিতে যেরূপ মজবুত, উহাদের ভাষাতেও সেইরূপ অধিক বলের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেহ যেরূপ ক্ষীণ ও সুকুমার, আমাদের ভাষাও সেইরূপ।

পক্ষান্তরে বাংলা ভাষা মারাঠি অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুললিত ও পরিমার্জিত। মারাঠি ভাষার জোর যেন একটু রূঢ়তার সীমায় গিয়ায় উপনীত হইয়াছে। 'ড়', 'ঢ়', 'ণ', এই সকল কাঠখোট্টা কঠিন বর্ণ সকল মারাঠি ভাষায় বারংবার শুনিতে পাওয়া যায়। মারাঠি ভাষা প্রথম শুনিলে মনে হয় যেন উহা উড়িয়া ও হিন্দি এই দুই ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মারাঠি ভাষার উচ্চারণে 'ড়', 'ঢ়', প্রভৃতি যেরূপ ক্রমাগত আমাদের কানে আইসে, বাংলা ভাষার উচ্চারণে সেইরূপ 'চ', 'ছ' অক্ষর মারাঠিদিগের কানে বারংবার উপস্থিত হয়। মারাঠি ভাষায় দুই চারিটি বর্ণের উচ্চারণেও একটু বিশেষত্ব আছে—উহা সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। মারাঠিতে 'ল' এই অক্ষরের উচ্চারণ দুই প্রকার;—এক, সাদাসিধা ল-য়ের মতো; আর এক, কতকটা আমাদের 'ড়'-এর মতো। মারাঠিদিগের 'ড়' উচ্চারণ অনেকটা 'ড' ঘেঁষিয়া। উহাদের মধ্যে চ, ছ, ঝ—এই অক্ষরগুলিরও দুই প্রকার উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। এক উচ্চারণ, আমাদের ন্যায়; আর এক উচ্চারণ, কতকটা আমাদের পূর্ববঙ্গীয়দিগের ন্যায়। এই সকল বিভিন্ন উচ্চারণের স্বতন্ত্র লিপিচিহ্ন-পদ্ধতি আমাদের মধ্যে প্রবর্তিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষত, ইংরেজি শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিবার সময় এই সম্বন্ধে অসুবিধা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। মহারাষ্ট্রীয়েরা তবু, এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা একটু অগ্রসর। ইংরেজি স্বরবর্ণেরও বিভিন্ন উচ্চারণ প্রকাশক দুই-একটি চিহ্ন তাঁহারা পুস্তকাদি ছাপাইবার সময় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 'ইটালিকস্'-এর স্থলে একটু বড় ও মোটা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইংরাজি V অক্ষর মারাঠিতে লিখিবার সময় 'হ্ব' এই যুক্তাক্ষর তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'গভর্নমেণ্ট' না লিখিয়া তাঁহারা 'গহ্বর্নমেণ্ট' লিখেন। এইরূপ লিখিলে, ইংরেজি V অক্ষরের অনেকটা কাছাকাছি শুনায়।

বাংলা ভাষায় যদি একটি ভালো অভিধান প্রস্তুত করিতে হয়—যদি প্রচলিত দেশজ শব্দগুলির বুৎপত্তি নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে মারাঠি প্রভৃতি প্রাকৃতের অপভ্রংশ ভাষাগুলির অনুশীলন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত—যথা—আমাদের 'আনাড়ি' শব্দ;—এই শব্দের বুৎপত্তি কি? মারাঠি ভাষাতে আড়ানী বলিয়া একটি শব্দ আছে উহার প্রায় একই অর্থ। হইতে পারে 'আড়ানী' এই শব্দটি উল্টাইয়া 'আনাড়ি' শব্দে

পরিণত হইয়াছে। মারাঠি পণ্ডিতগণ বলেন, 'অজ্ঞানী' হইতে "আড়ানী" শব্দ উৎপন্ন।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অনুশীলনে আর একটি উপকার আছে। আজকাল আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও সাহিত্যের সংস্রবে নতুন কথা ও নতুন ভাব অর্জন করিতেছি। এই সকল ভাব আমাদের দেশ-ভাষায় প্রকাশ করা আবশ্যক হওয়ায়, কি মারহাটি, কি বাঙালি আমরা উভয়েই এই সকল কথা ও ভাবের অনুরূপ শব্দ রচনা ও সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের উভয়েরই সাধারণ শব্দ ভাণ্ডার—সংস্কৃত ভাষা। অতএব আমাদের উভয়ের রচিত ও সংগৃহীত প্রতিশব্দগুলি যদি পরস্পর মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব সেগুলি যথাযথ হইতেছে কি না। যদি তাহাদিগের মধ্যে অমিল দেখি, তাহা হইলে আমাদিগের মনে স্বভাবতই সংশয় উপস্থিত হয়, এবং তখন, কোন্ প্রতিশব্দটি ঠিক, তাহা আর একবার আমরা বিচার করিয়া দেখিতে পারি। দৃষ্টান্ত যথা, দুটি ইংরেজি শব্দ 'nerve' ও 'muscle'। ইহাদের প্রতিশব্দ কি? আমরা 'nerve'-কে স্নায়ু বলি। মারাঠিতে 'muscle'-কে স্নায়ু বলে ও 'nerve'-কে মজ্জাতন্তু বলে। চরক প্রভৃতি পুরাতন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে স্নায়ুর যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা অতি অস্পষ্ট, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন। ইংরেজি 'sinwes' শব্দের সহিত 'স্নায়ু' শব্দের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এই জন্য মনে হয়, স্নায়ু 'muscle' শব্দের প্রতিশব্দ হইলেও হইতে পারে।

'মহারাষ্ট্রীয় ভাষা'য় লেখক মহাশয় ইতিপূর্বে মারাঠি ও বাংলা প্রতিশব্দের তুলনা করিয়া কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। আমিও আর কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রাষ্ট্রীয় সভা (National Congress) রাষ্ট্রীয় স্তোত্র (National Anthem) সংস্থা (Institution) অনুক্রম পত্র (Programme) আবৃত্তি (Edition) পদবীদান-সমারম্ভ (Convocation) স্থানিক স্বরাজ্য (Local Self-government) ব্যবস্থাপক মণ্ডলী অথবা অন্তরঙ্গ সভা (Executive Committee) অধ্যক্ষ (President) উপাধ্যক্ষ (Vice-president) প্রমুখ (Chairman) মন্ত্রী (Secretary) দেশ-বান্ধব (Fellow-Countryman) স্বাগত-সভা (Reception Committee) মৃত্যু-পত্র (Will) আরোপী (Accused) প্রেক্ষক (Visitor) সাংস্থান (Native States) ভূত-দয়া (Humanity)।

উপরোক্ত শব্দগুলি বাংলা প্রতিশব্দের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, উহার মধ্যে কোনো কোনো শব্দ, বাংলা অপেক্ষা সুরচিত বলিয়া মনে হয়। 'জাতীয় সভা' অপেক্ষা 'রাষ্ট্রীয় সভা' আখ্যাটি অধিকতর উপযুক্ত; কেননা, যে সভার অন্তর্ভূত হিন্দু, মুসলমান, পারসি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক, তাহাকে 'জাতীয় সভা' না বলিয়া 'রাষ্ট্রীয় সভা' বলাই সঙ্গত। 'দেশ বান্ধব' কথাটি মন্দ নয়। Institution শব্দের বাংলা কোনো প্রতিশব্দ আছে কি না বলিতে পারি না; কখনও কখনও অনুষ্ঠান-শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহা ঠিক্ নহে। বরং 'প্রতিষ্ঠান' এই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মারাঠি 'সংস্থা' শব্দ কি বাংলায় গ্রহণ করা যায় না? Edition এই শব্দের মারাঠি প্রতিশব্দ 'আবৃত্তি' ও বাংলা প্রতিশব্দ 'সংস্করণ'; এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক? অনুক্রম-পত্র (Programme) ইহার স্থলে 'অনুক্রমণিকা' বলিলে কি চলে না? 'রাষ্ট্রীয় স্তোত্র'— National anthem-এর সুন্দর প্রতিশব্দ।

আর কতকগুলি ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের মারাঠি প্রতিশব্দ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

উত্তর ধ্রুব (North Pole) গুরুত্ব-মধ্য (Centre of gravity) বর্গ (Class) 'চতুর্থ ইয়ত্তা' (Fourth Standard) বাতাবরণ (Atmosphere) ভূশির (Cape) দ্বীপকল্প (Peninsula) দীর্ঘ-বর্তুল (Ellipse) উপপদ (Article) সিদ্ধ বা অবুৎপন্ন শব্দ (Primitive word) সাধিত বা বুৎপন্ন (Derivative word) উভয়ান্বয়ী (Conjunction) শব্দযোগী (Post-position) কেবল-প্রয়োগী অথবা উদগারবাচী (Interjection) দর্শক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun) স্বল্প-বিরাম চিহ্ন (Comma) অর্দ্ধ-বিরাম চিহ্ন (Semi-colon) অপূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (Colon) পূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (Full Stop) করণ রূপ (Positive form) অকরণ রূপ (Negetive form) আখ্যাতরূপ (Conjugation) উদগার-চিহ্ন (Sign of admiration) শক্যার্থ (Potential mood) স্বার্থ (Indicative mood) সংকেতার্থ (Conditional mood) প্রযোজক ক্রিয়াপদ (Causal verb) পক্ষান্তরবাচক (Alternative) স্নায়ুবন্ধন (Tendon) মজ্জাতন্তু (Nerve) কর্ণিকা (Auricle) মধ্যপর্দা (Diaphragn) পরশু (Rib) কূর্চাস্থি (Cartilage) জীবনেন্দ্রিয় শাস্ত্র (Physiology) দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র (Duodemum) দ্বিশির স্নায়ু (Biceps) অস্থিবন্ধন (Ligament) মনঃপ্রেরণা (Mental transmission) রক্তাভিসরণ (Circulation of blood) রক্ত-পিণ্ড (Corpuscle) রক্ত সঙ্কলন (Congestion) রক্তদ্রব (Serum) অন্তর্মিশ্রণ (Assimilation) আর্দ্রত্বচ (Mucus membrane) দুগ্ধ বাহিনী (Lactile) পরাবর্তন (Reflection) বক্রীভবন (Refraction) ব্যাপক-ব্যাপ্য অনুমান অথবা ব্যাপকানুমান (Induction) ব্যাপক-ব্যাপ্য অনুমান অথবা ব্যাপ্যানুমান (Deduction) সন্ধায়ক (Copule) ত্র্যবয়ব-অনুমান-বাক্য (Sylogism) ব্যাপ্যানুমান বিষয়ী ন্যায় (Deductive Logic) জাতিবর্গ (Genus) অন্তর্জাতি (Species) কাদাচিৎক (Incidental) বিধায়ক বাক্য (Positive proposition) নিষেধক বাক্য (Negetive Proposition) কাট কোণ (Right angle) বিশাল কোণ (Obtuse angle) লঘু কোণ (Acute angle) বায়ুভার-মাপক (Barometre) উষ্ণতামাপক (Thermometre) বর্গীকরণ (Classification) সমুদায়ী-করণ (Generalization) কার্যানুক্রম (Process) নিরোধ (Resistance)।

উল্লিখিত পারিভাষিক শব্দের মধ্যে দুই চারিটি কথা আমরা বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে কতকগুলি শব্দ আমাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। Induction ও Deduction ইহাদের প্রতিশব্দ বাংলায় আছে কি না জানি না। যদি না থাকে, তবে আমরা 'ব্যাপকানুমান' ও 'ব্যাপ্যানুমান' এই দুইটি শব্দ বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। বাংলা 'অন্তরীপ' অপেক্ষা 'ভূশির' আমার বোধ হয়, Cape এর ঠিক প্রতিশব্দ। কেননা 'অন্তরীপ' অর্থে দ্বীপ বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। আমাদিগের 'উপদ্বীপ' অপেক্ষা মারাঠি 'দ্বীপকল্প' শব্দটি Peninsula-র ঠিক প্রতিশব্দ। কেননা, উপদ্বীপ শব্দে ক্ষুদ্র দ্বীপও বুঝাইতে পারে। বিদ্যালয়ের 'ক্লাস'কে আমরা 'শ্রেণী' বলিয়া থাকি, তদপেক্ষা 'বর্গ' শব্দটি উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়ের Standard শব্দের কোনো প্রতিশব্দ বাংলায় আছে

কি না জানি না। মারাঠি 'ইয়ত্তা' শব্দটি কি গ্রহণ করা যাইতে পারে না? Sine of admiration-এর মারাঠি প্রতিশব্দ 'উদগার-চিহ্ন'। বাংলায় ইহার কোনো কথা আছে কি না জানি না। কিন্তু এই অর্থে 'উদগার' শব্দ বাংলায় অচল। কেননা, ইহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। এইরূপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে 'মহারাঠী ভাষা'র লেখক অনেকগুলি দিয়াছেন। আমিও আর কতকগুলি দিতেছি—

(প্রথমে মারাঠি—তাহার পর বাংলা) অনুভব—অভিজ্ঞতা। অনুভবী—অভিজ্ঞ। প্রামাণিকপণা—খাঁটি ব্যবহার (honesty) শিক্ষা—দণ্ড। শিক্ষণ-শিক্ষা। অপবাদ—নিয়মের ব্যতিক্রম (exception) প্রান্ত—প্রদেশ। পারদর্শক—স্বচ্ছ (Transparent), স্বচ্ছ-পরিষ্কৃত। ভব্য—উন্নতকায়, মহৎ (noble, grand) সূচনা—প্রস্তাব। প্রয়োগ—পরীক্ষা। বন্ধু—সহোদর ভ্রাতা ইত্যাদি।

বাংলায় এক কথায় honestyর ঠিক কোনো প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। অর্থ-সম্বন্ধীয় honesty-কে সংস্কৃতভাষায় অর্থ-শৌচ বলে; honest-কে অর্থ-শুচি বলে। বাংলায় আমরা 'examination' ও 'experiment' এই উভয় অর্থেই 'পরীক্ষা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু experiment-এর একটি স্বতন্ত্র প্রতিশব্দ থাকা আবশ্যক। আমার বোধ হয় 'experiment'-কে 'প্রয়োগ-পরীক্ষা' বলিলে মন্দ হয় না।

বাংলা অপেক্ষা মারাঠি ভাষায় অনেকগুলি যাবনিক শব্দ পাওয়া যায়। 'মহারাষ্ট্র ভাষা'র লেখক মহাশয় তাহার কারণও দেখাইয়াছেন। যবন-সংসর্গই তাহার কারণ। দেড় শতাব্দী পূর্বে পেশোয়ার দফতরখানার লেখা-পড়ার কাজ সমস্তই পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইত। উক্ত লেখক মহাশয়ের মতে, এই সকল যাবনিক শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়া মহারাষ্ট্র-ভাষা যেন একটু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের অনভ্যস্ত কানে সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি, এই সকল যাবনিক শব্দ খারাপ শুনায় বটে; কিন্তু আমার বোধ হয় সে কেবল অভ্যাসের কথা। বাংলা ভাষায় যে সকল যাবনিক শব্দ মিশিয়া গিয়াছে, তাহা তো আমাদের কানে খারাপ লাগে না। বরং স্থলবিশেষে তাহা সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক। যথা, 'জোর' এই যাবনিক শব্দ আর 'বল' এই সংস্কৃত শব্দ। যেখানে 'জোর' শব্দ বসে সেখানে 'বল' শব্দ কিছুতেই প্রয়োগ করা যায় না। যেমন, 'কথার উপরে জোর দেওয়া'। যে সকল চলিত বৈদেশিক কথা ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে নতুন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই কারণেই শিবাজি মহারাষ্ট্রীদিগের উপর অসীম আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার পণ্ডিতগণের রচিত শব্দগুলি মহারাষ্ট্র-ভাষার মধ্যে প্রচলিত করিতে সম্যকরূপে সমর্থ হয়েন নাই। চলিত কথার মধ্যে এইরূপ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যদি এখন আমরা 'চাদর'-এর স্থলে 'প্রাবরণী', 'গোলাপের' স্থলে 'মকরন্দ', 'কারখানার' স্থলে 'সম্ভারগৃহ'—'ফতুয়ার' স্থলে 'পাদু-কঞ্চুক' এবং 'চৌকির' স্থলে 'আসন্দিকা' ব্যবহার করি, তাহা হইলে কিরূপ শুনিতে হয়?

আর এক কথা, সংস্কৃত আমাদের গৃহ ভাণ্ডার—উহার দ্বার আমাদিগের নিকট সততই উন্মুক্ত। যখন ইচ্ছা, আমরা সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করিতে পারি। কিন্তু বৈদেশিক শব্দ, কোনো ভাষার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে

কাল ও ঘটনার অপেক্ষা করে। যদি সৌভাগ্যক্রমে, ঘটনাচক্রে কতকগুলি বৈদেশিক শব্দ ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়া থাকে, সে তো আমাদিগের 'উপরি লাভ'। তাহার জন্য অপেক্ষা কেন? এখন আবার মহারাষ্ট্র-ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিতেছে। প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত মৃত মহাত্মা বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লোঙ্কার, তাঁহার লেখায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রথম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন— ইঁনিই বলিতে গেলে, মহারাষ্ট্র গদ্য সাহিত্যের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। ইনি মহারাষ্ট্র দেশে, মহারাষ্ট্রীয় 'মেকলে' বলিয়া প্রখ্যাত। ইহার প্রণীত 'নিবন্ধ-মলো' মহারাষ্ট্র গদ্যের আদর্শস্থল। আধুনিক লেখকেরা এখন ইঁহারই পদানুসরণ করিতেছেন; সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের দিকে ইঁহাদিগের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। তাছাড়া, আজকাল প্রসিদ্ধ ইংরেজি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থ সকল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে—সুতরাং অনেক শব্দ সংস্কৃত হইতে সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া উত্তরোত্তর ভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছে।

তবে, এ কথা বলিতে হয়, মহারাষ্ট্র-সাহিত্য, বাংলার তুলনায় এখনও অনেকটা পশ্চাদ্বর্তী। এখনও উহার মধ্যে নবোদ্ভাবিনী প্রতিভার অভ্যুদয় হয় নাই। মারাঠি ভাষার অধিকাংশ আধুনিক গদ্য-উপন্যাস '*কাদম্বরীর*' ন্যায় প্রাচীনকালের আদর্শে বিরচিত। এই জন্য, মারাঠি ভাষায়, গদ্য-উপন্যাস মাত্রেরই নাম্ "কাদম্বরী"। সম্প্রতি একটি উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেকটা আধুনিক ধরনের।[১] একটি স্ত্রীলোক তাঁহার বাল্যাবস্থার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন—ইহার গ্রন্থের বিষয়। বেশ স্বাভাবিক সহজ ভাষায়, ঘরের লোকদিগের কথা, ঘরকন্নার কথা, এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

বাংলার ন্যায় বোম্বাই অঞ্চলেও নাট্যাভিনয়ের খুব ধুম। কোনো মহারাষ্ট্র নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া মুণ্ডিতমস্তক, শিখা-বিলম্বিত তিলক-চর্চিত-ললাট, প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী মহারাষ্ট্র-শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও যখন 'এন্‌কোর', 'এনকোর' ধ্বনি ও হাততালির চট্‌চটা শব্দ প্রথম শুনিলাম, তখন নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছিলাম। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকাংশ নাটকই পুরাতন সংস্কৃত নাটক ও ইংরাজি শেকস্‌পিয়ারের নাটক অবলম্বনে রচিত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে অনেকগুলি কবিও হইয়া গিয়াছেন। 'জ্ঞানেশ্বরী', একনাথকৃত রামায়ণ, মুক্তেশ্বর কৃত চার পর্ব মহাভারত, তুকারাম, নামদেব, প্রভৃতির অভঙ্গ নামক ছন্দের পদাবলী, মোরোপন্তকৃত মহাভারত, ভাগবত ও রামায়ণ— এই সকল কবিতা-গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে অল্পই কবিদিগের স্বকল্পিত রচনা, অধিকাংশই রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষান্তর। এই সকল মারাঠি কবিতার মধ্যে বৈরাগ্য ও পারমার্থিক রসেরই প্রাদুর্ভাব। রসের বৈচিত্র্য কিছুমাত্র নাই। তুকারাম, রামদাস, ইঁহারা কবি ও সাধু পুরুষ। তুকারামের অভঙ্গের ন্যায় ভক্তহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এক বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ন্যায্যরূপে অহঙ্কার করিতে পারেন—তাঁহাদের মধ্যে 'বখর' নামক স্বদেশীয় ইতিবৃত্ত আছে। আমরা

১. এই গ্রন্থের নাম '*পণ কোণ লক্ষাতে ঘেতো*' অর্থাৎ—'কিন্তু কে লক্ষ্য করে'— একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কর্তৃক প্রণীত।

ইতিহাসের কোনো ধার ধারি না—আমাদের যাহা কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে, তাহার উপকরণ ইংরেজি গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত।

আজকাল সংবাদপত্রাদির পরিচালনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভূত উদ্যম ও তৎপরতা দেখা যায়; কৃতবিদ্যমণ্ডলীর শক্তি-সামর্থ্য, বলিতে গেলে, উহাতেই পর্যবসিত। দুই চারিটি মাসিক প্রবন্ধপত্রও যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার মধ্যে একটির নাম '*ভাষান্তর*'—উহাতে প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থাদি ক্রমশ অনুবাদিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে, মারাঠি ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রের কৃতবিদ্যমণ্ডলী আর একটি বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ওয়েবস্টার-কৃত সমগ্র ইংরেজি অভিধান ইহারা মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে মারাঠি ভাষার বাস্তবিক উন্নতি হইবে কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যাহা হউক, ইহাতেও কতকটা উপকার হইতে পারে।

আমরা যেরূপ আজকাল মারাঠি ভাষার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি, মহারাষ্ট্রদেশের কৃতবিদ্য লোকেরাও সেইরূপ বাংলা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রার্থনা-সমাজের অন্তর্ভূত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ '*ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ*' ও '*ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান*', মূল হইতে পড়িবার উদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন, এবং কেহ বা, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িবার জন্য, কেহ বা বাংলা সংবাদ-পত্র ও সাহিত্যাদির গ্রন্থ পড়িবার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক। 'বধূ-দর্পণ' নামক একটি মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মেঝ বৌ' এবং অন্যান্য বাঙালি লেখকদিগের প্রবন্ধ অনুবাদিত হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্যগত ভাবের আদান-প্রদানে আমাদের মধ্যে যে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইউরোপে যেমন, ফরাসি জার্মান প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা, কৃতবিদ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ হিন্দি, বাংলা, মারাঠি গুজরাটি, প্রভৃতির মধ্যে দুই একটি ভাষা আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা কর্তব্য।. . .যখন দেখিব, আমাদের সাময়িক সাহিত্যপত্রাদিতে, মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দি প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ সকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিব আমবা কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি, এবং যখন দেখিব, এক সময়ে সমস্ত ইউরোপে যেরূপ ফরাসি ভাষায় আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, বাংলার সাহিত্য-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, বাংলা ভাষা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত শিক্ষা করিতেছে, তখনই জানিব, বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে গৌরব-রবির উদয় হইয়াছে।

❑ *সাধনা,* ১৮৯৫

সমাজের পরিবর্ত কয়রূপ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আজকাল সমাজসংস্কারের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সমাজসংস্কার কর; বলিয়া কত লোক যে উচ্চৈঃস্বরে গলাবাজি করত ছাপায় নাম তুলিয়া লইল তাহার ঠিকানা নাই। কেহ বিবাহসংস্কার, কেহ ধর্মসংস্কার, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ ভারতসংস্কার, কেহ লেখনসংস্কার লইয়া দিন কত গোলযোগ করত শেষ, বড় লোক গট হইয়া ঘরে বসিয়া গল্প মারিতে লাগিলেন। অনেকেই আপন কাজ, অর্থাৎ কিছু পয়সা মারিয়া লইলেন। বিবাহ, ধর্ম, সমাজ, ভারত, লেখন যেমন তেমনি রহিল, তাহাদের আর সংস্কার হইল না। লোকে প্রথম গোলযোগ, নাম সই দরখাস্ত লেখালেখি, বকাবকি তুমুলকাণ্ড দেখিয়া ভাবে, এইবার বুঝি কিছু হবে, শেষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে কী হল!!! বহু-কাল ধরিয়া লোকে বলিয়া আসিতেছে কী হল!!! অথচ কিছুই হয় না। কেন? কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথম কারণ কেহই বলিয়া উঠিতে পারে না। আমরা বলি সংস্কার জিনিসটা কী একবার তত্ত্ব লওয়া যাউক না কেন? সংস্কারের লক্ষণ কী? প্রকৃতি কিরূপ? কোথায় সংস্কার দরকার হয়? সংস্কার ভিন্ন আর-কোনো সমাজ-পরিবর্তন আছে কিনা? যদি থাকে তো সে কিরূপ? অদ্য আমরা তাহাই দেখিতে বসিব। আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব সংস্কার ও বিপ্লব।

সংস্কার ও বিপ্লব, দুইটি কথার অর্থ কী? সংস্কার শব্দে মেরামত, কোনো জায়গা ভাঙিয়া গেলে তাহা সারিয়া লওয়ার নাম সংস্কার। যেমন আমরা বাটির সংস্কার বা মেরামত করিয়া থাকি। বিপ্লব শব্দে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেওয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া দেওয়া; কেহ কেহ বলেন ভাঙিয়া চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব; আমরা এ প্রস্তাবে সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিব না। কেন? পরে জানা যাইবে। এই দুই প্রকার উপায়ই সময়ে সময়ে দরকারি হয়। যখন কোনো নূতন সমাজ কোনো কারণবশত বিপথগামী হয় তাহার পরিবর্ত আবশ্যক হয়, সেই পরিবর্তের নাম সংস্কার। যেমন আথেন্সে ও রোমে ঋণ সংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত। যাহারা ঋণ দিত তাহারা খাতকদিগকে দাস করিত, প্রহার করিত, চুনের গারোদে পুরিয়া রাখিত, তাহাদের সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া লইত ইত্যাদি, এ অবস্থায় দেশের সমস্ত লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাতে যে বন্দোবস্ত দ্বারা ঋণ সংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত হইল সে আইন দ্বারা সমাজসংস্কার হইল। ইংলন্ডের বন্দোবস্ত দেশের লোকে দেশ শাসন করিবে। ১৮৩২ সালে দুঃখী প্রজারা খেপিয়া

উঠিল যে যদি দেশের লোকেই দেশ শাসন করিবে তবে আমাদের লোক কেন মহাসভায় না যায়। তখন রিফরম বিল (reform bill) পাস হইল। রিফরম বিল সমাজসংস্কার করিল। আবার যখন ফ্রান্সের রাজা, ওমরাহবর্গ ও ধর্মযাজকগণ সকলেই অত্যাচার করিতে লাগিলেন, যখন রাজার বাবুগিরির খরচে, রাজার বেশ্যাদিগের পেন্‌শন দিতে রাজকোষ শূন্য হইয়া উঠিতে লাগিত, যখন প্যাক্‌টিডি ফেমিন (দুর্ভিক্ষ সমাজ) দেশের সমস্ত শস্য ক্রয় করিয়া গোলাজাত করত দেশে রোজ রোজ দুর্ভিক্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইতে লাগিলেন, তখন যে-কয়েকজন সামান্য লোকের সর্বশক্তিমতী লেখনীপ্রভাবে ফ্রান্সের লোকের চক্ষু উন্মীলিত হইল—যে উন্মীলনে রাজা, ওম্‌রাহ, ধর্মযাজক, বাস্টাইল অত্যাচার কোথায় উড়িয়া গেল তাহারই নাম বিপ্লব। ঐ যে আবার ইতালি ও জার্মান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা যথেষ্টাচার শাসনপ্রণালী ও নানাবিধ অত্যাচার কাটাইয়া একত্র হইতেছে ইহাও বিপ্লব। ১৬৪৪ খ্রি. অব্দে ইংরেজেরা যে জেমস্‌কে তাড়াইয়া উইলিয়ম্‌কে রাজা করিয়া বিপ্লব বিপ্লব বলেন সে বাস্তবিক বিপ্লব নহে, সে রাজপরিবর্ত মাত্র। সে সংস্কারও নহে, সে বিপ্লবও নহে। আর ইতিহাসের শ্রাদ্ধ না করিয়া মোটা কথায় একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিই। একটা নূতন বাটির যদি কোথায় একটু চিড় খায় তাহার মেরামতের নাম সংস্কার। মনে কর বাড়ির দুইখান কড়ি বদলাইতে হইল, ছাদে দাগরাজি করিতে হইল—সে সকলই সংস্কার; কিন্তু যদি বাড়িটি চৌচাপটে বসিয়া যায়, কিংবা একদিক বসিয়া গিয়া মাঝখানে ফাঁক হইয়া পড়ে, কি অতি প্রাচীন লোনাধরা জরাজীর্ণ হয়, তবে তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিতে হয়, সেই ভাঙিয়া ফেলার নাম বিপ্লব। ফল কথা এই খানিক বদলাইতে হইলেই সংস্কার, আর বুনিয়াদ সুদ্ধ বদলাইতে হইলেই বিপ্লব।

সমাজসংস্কার বলিলে বুঝায় যে, সমাজটি যেমন আছে আদত তেমনটিই থাকিবে। আসলে যেন কোনো বিঘ্ন না হয়। বিপ্লবে বুঝায় আসলই বদলাইতে হইবে। সমাজ যেমনটি ছিল তেমনটি আর না থাকে। সংস্কার করিতে গেলে দেখায় যে কোন্‌টুকুতে অনিষ্ট হইতেছে কোন্‌টুকু বদলাইতে হইবে। বিপ্লবে সেটুকু ঠিক করিবার জো নাই। বিপ্লবে ভালো মন্দ এই দুই অনিষ্ট হইতেছে বোধহয়। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ ঠিক করিবার উপায় থাকে না। সংস্কারে উদ্দেশ্য ঠিক করিতে পারা যায়, যখন জানা যায় যে, এইটুকু মন্দ, তখন এইটুকু এই উপায়ে বদলাইলেই ভালো হয় তাহাও জানা যায়। কিন্তু বিপ্লবে উদ্দেশ্য ঠিক হয় না, কতটুকু বদলাইতে হইবে, তাহার নিশানা হয় না। এইজন্যই দেখা যায়, সংস্কারস্থলে লোকে বলে আমরা এই চাহি। বিপ্লবস্থলে বলে আমরা এসব আর চাহি না। রিফরম বিল লইয়া গোলযোগের সময় লোকে বলিল, আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ দিতে হইবে। ফ্রেঞ্চ বিপ্লবে লোকে বলিল আমরা রাজা চাহি না ওমরাহ চাহি না। এইরূপ উদ্দেশ্য স্থির থাকে বলিয়াই দেখা যায় যে সংস্কারস্থলে রফা-রফিয়াৎ চলে। অর্থাৎ প্রথমে অনেক চাহিয়া বসিলেও শেষ কতক দিয়া ঠাণ্ডা করা যায়। যেমন রিফরম বিলের সময় লোকে সমস্ত লোকের মত লইয়া মেম্বার পাঠাইতে

হইবে চাহিয়া বসিল, শেষ রফা হইল, যাহারা বৎসর ১০ পাউন্ড খাজনা দেয় তাহারাই পারিবে, আর-কেহ পারিবে না; কিন্তু বিপ্লবস্থলে প্রথম অল্প পরিবর্তের জন্য আরম্ভ হয়, শেষ সব না বদলাইয়া তৃপ্তি হয় না। ফরাসিরা শাসনপ্রণালী বদলাইবার জন্য আরম্ভ করিয়া শেষ না বদলাইয়াছে এমন জিনিসই নাই। তাপমান যন্ত্রের মাপ করিবার পারা পর্যন্ত বদলাইয়াছে। যত রকম ওজন, মাপ ছিল, সব দশমিক অঙ্কে আনিয়া ফেলিয়াছে। এইজন্যই বলিয়াছিলাম—বিপ্লবে উদ্দেশ্য ঠিক করা যায় না বলিয়াই বলিয়াছিলাম যে ভাঙিয়া চুরিয়া গড়ার নাম বিপ্লব নহে, ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলার নাম বিপ্লব। গড়িতে গেলে উদ্দেশ্যটা ভাঙার আগে হইতেই ঠিক থাকা চাহি; বিপ্লবে তাহা একেবারে থাকে না। বিপ্লবে যদি কোনো উদ্দেশ্য গোড়াগোড়ি স্থির থাকে তবে সে এই—

বর্তমান সমাজের দ্বারা আমাদের কাজ চলিতেছে না, ইহাকে ভাঙিয়া মনুষ্যকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন কর, তাহার পর দেখা যাইবে, যদি মনুষ্যসমাজ ভিন্ন থাকিতে না পারে, তখন উপস্থিত মতো বিচার করা যাইবে। গড়ার কথা পরে হবে, আগে ভাঙো, আগে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হও।

উপরে সংস্কার ও বিপ্লবের যেরূপ বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে আর একটি মতও দূষিত হইল। অনেকে যে বলেন, 'ভাঙবি তো আগে গড়তে শেখ্', আমরা বলি গড়িতে শেখার দরকার নাই। ভাঙিতে পারিলেই হইল। তবে এক কথা এই, সংস্কার সকলে বুঝিতে পারেন এইটুকু মন্দ আছে, বাপু ভালো করিয়া লও। বুদ্ধি যতই মোটা হউক না এটা সবাই বুঝিতে পারে! কিন্তু বিপ্লব বুঝা কিছু কঠিন। বর্তমান যা আছে সব বদলাইব, কী হইবে জানিতে পারিব না, ইহা বুঝিয়া এরূপ কার্যে সাহসী হইয়া হস্তক্ষেপ করা, সকল মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আগে তো কেহই বুঝিত না; অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিলজফারদিগের কল্যাণে এখন তবু কেহ কেহ বুঝিতেছে। পৃথিবীর সমাজ-সকল যেরূপ গঠিত তাহাতে লোকের 'যা আছে বেশ এর আর বদল কাজ নাই'—এই ভাবই জন্মে। বদলাইতে তো ইচ্ছা করেই না, তবে একটু-আধটু বদলাইলে যদি ভালো হয় ক্ষতি নাই। 'একেবারে সব বদল, বাপুরে, সে যে বড় ভয়ানক, যা আছে এর কিছু থাকবে না; না তা তো পারব না' এই ভাবই বেশি, সুতরাং বিপ্লব কেমন করিয়া হইবে। তবে যে দুই-একটি বিপ্লব মাঝে মাঝে হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সমূল পরিবর্তও হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ এই—তখন লোকে মনে করিয়াছে যে বর্তমান পাপের ভরা, বর্তমান অত্যাচাররাশি আর সহিতে পারি না, এর চেয়ে মরণ ভালো। এ অবস্থা বদলাইলে সুখ হউক আর নাই হউক অত্যাচার কমিবে, অন্তত উহার রূপান্তরও হইবে। এই বলিয়া জীবনাশায় বিসর্জন দিয়া উন্মত্ত হইয়া লাগিয়াছে, একটা প্রলয় হইয়া গিয়াছে। যে-সকল বিপ্লব হইয়া গিয়াছে অধিকাংশ পূর্বোক্তরূপ নৈরাশ্যভাব হইতেই হইয়াছে। আর যত বিপ্লব হইয়াছে অধিকাংশ রাজপরিবর্ত, রাষ্ট্রবিপ্লব, অথবা শাসনপ্রণালী-পরিবর্ত! সমাজপরিবর্ত এক ফ্রান্সে হইয়াছে আর কোথায় হইতেছে বা? আমরা যে বিপ্লবের কথা কহি—এও সমাজবিপ্লব। সমাজের আদ্যন্ত পরীক্ষা করিয়া

সমাজসংস্কার আবশ্যক বা বিপ্লব আবশ্যক এরূপ বিচার কোথায় হইয়াছে বলিতে পারি না। সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া বহুদিন আগে এ সমাজ এভাবে চলিবে কিনা বলিয়া দেওয়া সামান্য সমাজতত্ত্ববিদের কার্য নহে; কিন্তু ইউরোপে অনেকে ৪০/৫০ বৎসর আগে যে-সকল ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেক সিদ্ধ হইয়াছে এবং বোধ হয় চেষ্টা করিলে আরো স্পষ্ট রূপে বলা যাইতে পারে। যাহারা বহুদিন পদ্মায় মাঝিগিরি করিতেছে তাহারা মেঘের আকার, বায়ুর গতি দেখিয়া ৪/৫ ঘণ্টা আগে ঝড় হইবে টের পায়, যদি উদ্ধারের উপায় থাকে করে, আর যদি না থাকে সেই ৪/৫ ঘণ্টা আগেই বলিয়া দেয়, 'যে যার চেষ্টা কর, রক্ষা হবার নয়।' বিপ্লবের পূর্বেও ঠিক সেইরূপ বলা চাহি। তবে সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, সমাজনৌকা সময়স্রোতে বেশ চলিয়া আসিতেছে, ঐ পাহাড়ে, ঐ চড়ায় তাহার বানচাল হইবে, এই উপায়ে অন্য পথে চালাইতে পারিলে উদ্ধার নচেৎ সর্বনাশ। অথবা 'এ সমাজগৃহ অত্যন্ত জরাজীর্ণ, সামান্য বাতাসেই ভূমিসাৎ হইবে, বাতাসে পড়িলে অনেক লোক মারা পড়িবে, কাজ নাই এই বেলা বাতাস না উঠিতে ইহার বিনাশ সম্পাদন করো।' এই সকল অর্থ যখন বলিতে পারিবে তখন সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের দ্বারা জগতের উপকার হইল বলিয়া স্বীকার করিব।

সমাজের সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার কোথায় কী দোষ বা বিপ্লব প্রয়োজন বলা সহজ নহে এবং সংস্কার যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিপ্লব হইলে এবং বিপ্লব স্থলে সংস্কার হইলে জগতে ভয়ানক অনাসৃষ্টি হয়। এবং এ পর্যন্ত কত দেশ না এই দোষে উৎসন্ন গিয়াছে তাহা বলা যায় না। ফরাসিদেশে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে যে ভয়ংকর প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয় তাহাতে সে একপ্রকার নূতন সমাজের নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। সে নূতন সমাজে বিপ্লব আর প্রয়োজন করে না, বোধ হয় কোনো বিষয়েই বদল দরকার হয় না, কিন্তু এই ৮৯ বৎসরের মধ্যে সেখানে ৪/৫ টি বিপ্লব হইয়া গেল। নূতন সমাজে বিপ্লব হইলে সমাজের শক্তি হ্রাস হয়, তাহা গত প্রুসিয়ার যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেখানে সংস্কারস্থানে বিপ্লব করা হয়, সেখানে তো এইরূপ, আবার যেখানে বিপ্লবস্থানে সংস্কার হয়, সম্পূর্ণ বদল না করিয়া কিছু পরিবর্তে শান্ত থাকা যায় সেখানে দুর্গতিব পবিসীমা থাকে না। সাক্ষী রোম, রোমের ইতিহাসে আদ্যন্ত এই মহৎ সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রোমের সমাজ একটি নগরের সমাজ, এক নগরের শাসন; স্বাচ্ছন্দ্য, সুখসমৃদ্ধির জন্য যা-কিছু দরকার রোমে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ক্রমে সেই এক নগরীর অদৃষ্টে সমস্ত জগতের আধিপত্য ঘটিল। তখন আর পুরানো নগর-শাসনপ্রণালীতে চলিবে কেন? তখন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত স্বতই প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু সেটি কেহ বুঝিতে পারিল না। যে সেনেট খ্রিস্টাব্দের ৪০০ বৎসর পূর্বে সুচারুরূপে রোম শাসন করিয়াছে, সেই সেনেট খ্রি. পূ. ১৫০ ইউফ্রেটিস হইতে আটলান্টিক পর্যন্ত শাসন করিতে পারিবে কেন? রোমের পক্ষে ভয়ংকর দিন সুতরাং উপস্থিত হইল। একশত বৎসর ধরিয়া ভয়ংকর যুদ্ধ, পৃথিবী রক্তস্রোতে প্লাবিত, খুন মারামারি কাটাকাটি অত্যাচার লোমহর্ষণ

উৎপীড়ন, নগরদাহ প্রভৃতি পাঠ করিলে শরীর কন্টকিত হয়। পৃথিবীর অমন দিন যেন আর না হয়। এই সময় একজন লোক কেবল সম্পূর্ণ বিপ্লব করিতে চেষ্টা করেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন এভাবে আর চলিবে না। সেই লোক কয়াস্ গ্রেকাস। তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য গণনা, একশত বৎসরের রক্তস্রোতের পর শেষ তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই দাঁড়াইল। অগস্টস্ যাহা করিলেন গ্রেকাসও ঠিক তাহাই করিতে চাহিয়াছিলেন। রোমের স্বাধীনতা বিলোপ ও যথেষ্টাচার নামক শাসনপ্রণালী প্রচলন, এই বিপ্লবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিপ্লব হইল বটে, বিপ্লবে উপকারও হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় তিন বৎসর বিশাল রোমান সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল, অন্তত ভয়ানক অন্তর্বিদ্রোহ হয় নাই। কিন্তু যথেষ্টাচারে সমস্ত লোকের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, শেষ সেই বিশাল সভ্য সাম্রাজ্য অসভ্য লোকের উৎপীড়নে লণ্ডভণ্ড হইয়া আবার কতশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীসুদ্ধ রক্তস্রোতে আর্দ্র করিতে লাগিল। পরিণামে যাহাই হউক যখন অগস্টসের সময় বিপ্লব সমাধা হয় তখন সকলেই বলিয়াছিল 'আঃ বাঁচিলাম, একশত বৎসরের অরাজক তো শেষ হইল, এখন নিশ্বাস ফেলিবার সময় হইল।' ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তে বুঝিতে একটু দেরি হয়, আবাব সেই ভাঙা বাড়ির দৃষ্টান্তে দেখাই, যদি যখন বাড়িটির একটু দাগরাজি হইলেই চলে, সে সময় তাহাকে ভাঙিয়া ফেল, তাহাতে গৃহস্থের অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নাই। আবার যখন বাড়িটি সম্পূর্ণরূপে জরাজীর্ণ হইয়াছে, যখন একটু বাতাস হইলেই বুনিয়াদ সুদ্ধ নড়ে, যখন লোনা লাগিয়া সব ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অশ্বত্থ গাছের শিকড় যখন তেতালা হইতে নামিয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে বাড়িটি ভাঙিয়া ফেলাই ভালো নয় কি? তাহার যতই মেরামত কর, নিশ্চিন্ত হইয়া সে বাড়িতে কাহারো বাস করিবার জো নাই। বরং যে গৃহস্থ ভাঙা মন্দিরে নিত্য খোয়া দিতে থাকে, তাহার টাকার বাড় বাঁধে না, হাজার সারাও কখন পড়িবে কখন পড়িবে ভয় সর্বদাই করিবে। শেষ একদিন হয় তো পড়িয়া গিয়া সহস্র সহস্র লোকের গোর হইয়া চিরকাল প্রতিবেশীদিগকে ভূতের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। এরূপ বাড়ির সংস্কার করিলে হয় তো দু-পাঁচটা ঘর বাসযোগ্য হইতে পারে, অথবা এখনি পড়িত, না হয় দু বৎসরের জন্য তাহা রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই দু বৎসরও সর্বদা সশঙ্কিত। আমার মতে তেমন বাড়ি ভাঙিয়া ফেলাই ভালো। এই ভাঙা বাড়ির দৃষ্টান্তটি আমাদের হিন্দুসমাজে বেশ খাটে, হিন্দুসমাজ কতকেলে সমাজ যে তাহার ঠিকানা হয় না। ইহার বুনিয়াদ অতি সংকীর্ণ। মনুর সংহিতায় দেখিতে পাই ভারতবর্ষ যখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন তাহারই কোথাও কোথাও প্রকৃত হিন্দুসমাজ ছিল। যখন এলাহাবাদের এদিকে আর্যদিগের নাম ছিল না, যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বৈ জাতি ছিল না, তখন এই সমাজ ছিল। তাহার পর কত ধর্ম কত বিপ্লব গিয়াছে কত নূতন শাসনপ্রণালী হইয়া গিয়াছে এখন ২০০০ জাতি হইয়াছে! ভারতের অর্ধেক মুসলমান হইয়াছে। ইংরেজরা সর্বোপরি সর্বশক্তিময়ী ডানা বিস্তার করিয়া সকলকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে, হিন্দুসমাজের ঝাঁকটুকু ছাড়া আর কী আছে? এখন কিনা আমরা হিন্দুসমাজকে

ভারতসমাজের (Indian Nation) সঙ্গে এক করিয়া ধরি। কী ভুল! এমন হিন্দুসমাজের যত শীঘ্র অস্তিত্ব বিলোপ হয় ততই ভালো।

সমাজ মনুষ্যের জন্য, মানুষ সমাজের জন্য নহে। মানুষ আপনাদের সুখ সমৃদ্ধি স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সমাজ বলিয়া একটি নূতন সৃষ্টি করে। উচিত যে, যেমন মানুষের মনের, শরীরের ও সংসারের অবস্থা পরিবর্তন হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সমাজেরও পরিবর্তন হয়। তাহা হইলেই সমাজের উদ্দেশ্য স্থির থাকে। আরনোল্ড বলেন সমাজেরও বাল্য, শৈশব ও যৌবন আছে, বৃদ্ধাবস্থাও আছে, মৃত্যুও আছে। সমাজের ক্রমে পরিবর্তন স্বতই হয়; সেই পরিবর্তনটি সমাজস্থ লোকের আয়ত্ত মতো করিয়া লওয়া বড়ো দরকার। আপনি পরিবর্তন হইলে এই মতো হইবে, এই মতো হইলে এই দোষ হইবে, অতএব একে এই দিকে ফিরাও, ওরূপ দোষ ঘটিলে দেশের অনিষ্ট হইবে। এই-সকল বিবেচনায় সমাজ চালানো পাকা ড্রাইবরের কাজ। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে মনুষ্য সমাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সমাজ বজায় রাখাই মানুষের কাজ, যে অসুরের অবতার সেই সমাজের পরিবর্তন চাহে। এরূপ ভাবিলে ও তদনুসারে কার্য করিলে সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বরং বিস্তর অপকার হয়। এইকথা কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে। প্রথম উদাহরণ রোমান জগৎ। রোমসমাজ এক সময় সমস্ত জগৎ জয় করিয়া সমস্ত জগৎকে রোমান করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু উত্তরদেশীয় অসভ্যদিগের দৌরাত্ম্যে সেই রোমান সমাজ লণ্ড-ভণ্ড হইয়া গেল। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে রোমের নাম লোপ হইল। যথেষ্টাচার শাসনপ্রণালীর প্রভাবে ও উৎপীড়নে রোমের যেরূপ নির্জীবাবস্থা হইয়াছিল তাহাতে রোমসমাজ-বিনাশ জগতের ভাবী উন্নতির সূত্রপাত মাত্র। রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল, রোমনগর ভস্মসাৎ হইল। রোমসাম্রাজ্য মধ্যে ১০/১২ টি প্রবল পরাক্রম স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল। নূতন আইন কানুন চলিতে লাগিল কিন্তু লোকে তখন বলিত আমরা রোমান সাম্রাজ্যের লোক। ভস্মবিশিষ্ট রোমপুরী তখন তাহাদের মনে মনে রাজধানী রহিল। শেষ রোমক সাম্রাজ্য পুনরুদ্দীপন করা রাজাদিগের একটা উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল।. কত কাটাকাটি মারামারির পর ৩ বৎসর পরে সারলেমেন আবার হোলি রোমান এমপারার উপাধি লইলেন। নামে রোম হইল, কাজে যে অসভ্য শাসন তাই রহিল, সারলেমেন মরিলে আবার Emperor এই উপাধির জন্য ২০০ বৎসর লড়াই ঝগড়া চলিতে লাগিল। শেষ দশম শতাব্দীতে ওথো আপন দেশে Emperor নাম বদ্ধমূল করিয়া গেলেন। ওথোর পরও এই Emperor হবার জন্য কত লোকে কত মারামারি করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ও জার্মানিতে যে-সকল যুদ্ধ হয় তাহারও কারণ এই উপাধি। শেষ উপাধি পড়িল ডিউক অব অস্ট্রিয়ার ঘাড়ে। অস্ট্রিয়ার রাজ্য ছোটো, নাম বড়ো। ডিউক এম্‌পেরর তৃতীয় ফর্দিনান্দের দারিদ্র ইউরোপে আজিও হাসির জিনিস হইয়া রহিয়াছে। শুদ্ধ নাম লইয়া হইলে না-হয় হাসির জিনিস, একটু হাসিয়াই ছাড়িয়া দিতাম। এই মৃত সাম্রাজ্যের জ্বালায় জার্মানি ও ইটালি কখনো একত্রিত হইতে পারে নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অমন সুখভূমি ইটালি শত শত

বৎসর ধরিয়া শ্মশানভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালে রোমসাম্রাজ্যের নাম তুলিয়া দিলেন। তাহার ফল দেখো, ইটালি বাঁচিল, জার্মানি বাঁচিল, এই দুইটি দেশ এই ৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর প্রধান দেশমধ্যে গণ্য হইয়াছে।

যদি রোম নামের মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া ইটালি ও জার্মানি যখন উহাদের সুদিন ছিল, তখন হইতে আপন আপন নামে রাজ্য করিত, যদি একাদশ শতাব্দী হইতে মিলান প্রভৃতি নগরগুলি ও জার্মানি রহান্ধবা নগরসমবায়সকল স্বাধীন ভাবে উন্নতি লাভ করিত তবে কি আর জার্মানি ইটালির দুর্দিন হইত। না ফ্রান্স এত দৌরাত্ম্য করিতে পারিত। সত্য বটে, ভালো জিনিস যত্ন করে বেশি দিন রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। রোমসাম্রাজ্যও একটি ভালো জিনিস। কিন্তু যখন সেই রোম ভালো জিনিস, যখন রোমধ্বংস হইবে নিশ্চয়, জন কত antiquarian লাগাইয়া দাও রোমের যা-কিছু ভালো ছিল তাহার একটি রেজিস্টর হইয়া থাকুক, ভবিষ্যতে লোকে পড়িয়া শিখিতে পারিবে। তাহা না করিয়া যখন সেই ভালো জিনিস রক্ষা হইবার নহে তখন তাহা রক্ষার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া অগণ্য প্রাণীসংহার, যখন ধ্বংস হইয়া গেল তখন আবার সেই মৃত বস্তুর ভূত উদ্ধারের বৃথা চেষ্টায় পৃথিবী শোণিতাক্ত করা, ভূত উদ্ধার হইলে সেই ভূত আশ্রিত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে ১২শত বৎসর ধরিয়া নানারূপ কষ্ট দেওয়া কি উচিত, না বিবেচনার কাজ? ভালো জিনিস ভালো, ভালো জিনিসের স্মৃতি ভালো। ভালো জিনিস মন্দ হইলে ভালো নয়। ভালো জিনিস কচলাইয়া তিত করিলে ভালো নয়, ভালো জিনিস পচাইয়া দুর্গন্ধ করিলেও ভালো নয়। রোম ভালো ছিল কিন্তু রোমের যে ছায়া ৮০৬ সাল পর্যন্ত ইউরোপের মস্তক আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ভালো ছিল না।

বঙ্গীয় পাঠক ইউরোপীয়দিগের আহাম্মকি দেখিয়া হাসিও না। তোমাদের সমাজও ঐরূপ ছায়াবৃত, ঐরূপ ভূতাবেশ বৈ আর-কিছু নয়। তোমাদের যে হিন্দুসমাজ, বল দেখি তার কী আছে? হিন্দুসমাজ ছিল যখন বুদ্ধদেব জন্মান নাই। বুদ্ধ-ধর্ম প্রবল হইল হিন্দুর আর কী রহিল? কিন্তু তোমরা এই ২৫০০ বৎসর কেবল ভূতের বোঝা টানিয়া বেড়াইতেছ বৈ নয়। বৌদ্ধদের সঙ্গে যত দিন সমান জোরে লড়িয়াছ, তত দিন তোমাদের জীবন ছিল সন্দেহ নাই। তাহার পর যেদিন হইতে মগধসাম্রাজ্য স্থাপন হইল সেইদিন হইতে কি তোমাদের পাততাড়ি গুড়ানো উচিত ছিল না? তাহা না করিয়া বলবানের সহিত দুর্বলের বিবাদ হইলে দুর্বলের যত দোষ ঘটে সব তোমাদের ঘটিল, তোমরা ভীরুতা দুষ্টামি ফেরাবি শিখিতে লাগিলে। বৌদ্ধেরা ক্রমে ক্ষীণতেজ হইয়া আসিলে তোমরা আবার প্রবল হইলে। তখন তোমাদের ঘটে যে বিষয়বুদ্ধি ছিল সেটুকুর লোপ হইয়া গিয়াছে। তোমরা নূতন সমাজ সৃষ্টি না করিয়া সেই সেকেলে বেদ উদ্ধার করিতে গেলে, পৌত্তলিক ও বৈদিক বিবাদ আরম্ভ হইল। এই বিবাদে তোমাদের সমাজ ক্রমে অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়িল; যেখানে ঐক্যের দরকার সেইখানে ঘরে ঘরে অনৈক্য হইল। শেষ বেদ, স্মৃতি, বুদ্ধ, জৈন, পুতুল, ব্রহ্ম—সব দুরন্ত মুসলমানের হাতে পড়িল। তাহাতেই তোমাদের লজ্জা হইল কই? চৈতন্য হইল

কই? সমাজপরিবর্তনের কটা চেষ্টা করিয়াছ? বলিলে কিনা অদৃষ্টের ফল! রোমানেরাও সেকালে বলিয়াছিল অদৃষ্টের ফল। বড় সুবিধা। দুবার বলিলে অদৃষ্টের ফল, দুটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলে—সব—সব দুঃখ ঘুচিয়া গেল, আপনাদের দোষ যে তাহা একবারও তো ভাবিলে না।

যাহা হউক, আমাদের সমাজে সংস্কার কি বিপ্লব আবশ্যক সেকথা তুলিয়া কাজ নাই। আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব এই যে, সমাজের কত প্রকার পরিবর্তন হয়। দেখা গেল যে সে দুই প্রকার, সংস্কার ও বিপ্লব। দুইয়েরই সময় আছে কিন্তু সংস্কারের সময় বিপ্লব বা বিপ্লবের সময় সংস্কার হইলে হিতে বিপরীত হয়। তাহার ফল অতি ভয়ানক।

☐ *বঙ্গদর্শন*, আষাঢ় ১২৮৫

চিত্রাঙ্গদা

প্রিয়নাথ সেন

বর্তমান কালের বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যসেবী এবং প্রথম শ্রেণীর সমালোচক-আচার্য জর্জ সেন্টস্‌বেরি আজ কয়েক বৎসর হইল, *Revised Impressions* (পুনরালোচিত বা সংশোধিত ধারণা) নামে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাশালী লেখকদিগের সম্বন্ধে তাঁহার নিজের প্রথম ধারণা এবং পূর্বতন মতসমূহের আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যসেবিমাত্রই জানেন, কোনো কোনো গ্রন্থ প্রথম পাঠকালেই একেবারে চিত্তকে জয় করিয়া ফেলে, কিন্তু পরে তাহাদের প্রভাব ক্রমশই মন্দীভূত হইয়া আসে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থ প্রথম পরিচয়ে রসহীন বলিয়া বোধ হইলেও, উত্তরোত্তর পাঠে তাহাদের সৌন্দর্য অনুভূত হইতে থাকে, এবং ক্রমশ তাহারা চিত্তের উপর স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন করে।

Byron-এর প্রথম 'চটক' ইংরেজি-সাহিত্যে প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এদিকে Wordsworth-এর সহিত আলাপ যতই বাড়িতে থাকে, ততই তাঁহার কবিতাসমূহের গভীর এবং মর্মগত সৌন্দর্য উপলব্ধ হয়।

এইরূপে দেখা যায়, অনেক গ্রন্থ সম্বন্ধেই আমাদের প্রথম ধারণা স্থায়ী হয় না। সম্প্রতি রবিবাবুর রচিত *চিত্রাঙ্গদা* নামক কাব্য সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ধারণার পুনরালোচনা করিতে হইয়াছে। প্রকাশ হইবার কালেই আমরা *চিত্রাঙ্গদা* পাঠ করি। সেই প্রথম পাঠে এবং তাহার পরও কয়েকবার পাঠকালে ইহা আমাদের একখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর প্রথমশ্রেণীর খণ্ডকাব্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রচনার উৎকর্ষে, ভাষাভঙ্গির মৌলিকতায়, শব্দরচনার নৈপুণ্যে, ছন্দের লীলাময়ী গতিতে, মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতায়, নাট্যগুণে এবং সর্বশেষে নিছক-কবিত্ব-রসে সাহিত্য-সংসারে ইহাকে অনন্যসাধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত একটি দুর্লভ রত্ন বলিয়াই জানিয়াছিলাম। কিন্তু গত জ্যৈষ্ঠমাসের *সাহিত্য* পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের লিখিত 'কাব্যে নীতি' নামক প্রবন্ধে *চিত্রাঙ্গদা* সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের উক্ত ধারণার পুনর্বিচার আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহার মতে, এই কাব্য 'দুর্নীতিমূলক' এবং 'অস্বাভাবিক'। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিক বিস্মিত হইয়াছি; আমাদের পূর্ব ধারণা আকস্মিক তীব্র আঘাত পাইয়াছে, এবং আমাদিগকে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে—যে 'দুর্নীতি' এবং 'অস্বাভাবিকতা' দ্বিজেন্দ্রবাবু এই কাব্যে এমন সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই কেন? সম্ভবত প্রথম পাঠকালে

আমাদের নীতিজ্ঞান তত জাগ্রত ছিল না, এবং কবির রচনার মোহমন্ত্রে আমাদের বিচার-শক্তি অভিভূত বা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং *সাহিত্য*-এর পাঠকবর্গের সহিত আমরা *চিত্রাঙ্গদা* কাব্য পুনর্বার পাঠ করিব, এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের পূর্বধারণার এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতের আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।

চিত্রাঙ্গদার কথা, কথার ভাণ্ডার মহাভারতে আছে। কথাটি অতি ক্ষুদ্র। মূল মহাভারতে ১৩টি মাত্র শ্লোকে আদ্যন্ত বর্ণিত। ইহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য নাই—অভিনব পাত্র-পাত্রীর সৃষ্টি নাই, মানব-প্রকৃতির বা হৃদয়ের কোনো তথ্য বা রহস্য ইহাতে দর্শিত হয় নাই। বাস্তব ঘটনা যেমন ইতিহাসে সাদাসিধাভাবে সচরাচর বর্ণিত হইয়া থাকে, কথাটি সেইরূপেই লিখিত। *রাজতরঙ্গিণী*-এর কোনো অধ্যায়ের ভিতর ইহা সন্নিবেশিত দেখিলে আমরা আশ্চর্য হইতাম না।

কিন্তু রবিবাবুর উদ্ভাবনী অথচ সঙ্গত কল্পনা, আখ্যান-বস্তুটিকে বিচিত্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। মহাভারতে যাহা কেবলমাত্র রেখা বা আভাস, তাহা তিনি ছন্দে এবং বর্ণে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

মহাভারতের গল্পটি এই :

> অর্জুন যখন মণিপুরে গমন করেন, তখন তথাকার রাজা ছিলেন চিত্রবাহন; চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার একটিমাত্র কন্যা ছিল। রাজার কোনো অপুত্রক পূর্বপুরুষ পুত্র-লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিলে, মহাদেব প্রীত হইয়া এই বর দেন যে, তাঁহার বংশে পুরুষানুক্রমে একটি করিয়া পুত্র জন্মিবে। কিন্তু চিত্রবাহনের পুত্র না হইয়া কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যাই বংশ-রক্ষা করিবে এই ভাবিয়া চিত্রবাহন তাহাকে পুত্রিকা গ্রহণ করেন, এবং পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। চিত্রাঙ্গদা একদিন নগর-মধ্যে ইচ্ছামতো ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় অর্জুন তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন, এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রাজার নিকট প্রস্তাব করিলেন। রাজা অর্জুনের পরিচয় পাইয়া অর্জুনকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন যে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জুনের ঔরস-জাত পুত্র চিত্রবাহনের বংশধর হইবে। অর্জুন তথায় তিন বৎসর কাল বাস করেন, এবং পুত্র জন্মিলে মণিপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

এই সামান্য আখ্যান অবলম্বনে রবিবাবু তাঁহার *চিত্রাঙ্গদা* কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যমধ্যে আমরা দুইটি প্রধান পাত্র-পাত্রী দেখিতে পাই—এক অর্জুন অপর চিত্রাঙ্গদা—অর্জুন মহাভারতকারের অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার উপর রং ফলাইতে পারেন, এমন কবি বিরল। অর্জুন-চরিত্রকে যদি কোনো পরবর্তী কবি স্পর্শ করিতে সাহস পান, তাহা হইলে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, সে চরিত্র কবি-সৃষ্টির তুঙ্গ-শৃঙ্গে অবস্থিত, তিনি যেন সেই উজ্জ্বল চরিত্রকে কোনোরূপে মলিন না করেন। সুতরাং অর্জুন-চরিত্র-অঙ্কনে বেদব্যাসের উপর কিছু নূতনত্ব আনিতে হইলে তাহা অতি সন্তর্পণে করিতে হইবে—ইহাতে বলা হইল না অর্জুন-চরিত্র নির্দোষ বা আদর্শ মানব-চরিত্র, অথবা বেদ-ব্যাস অর্জুনকে আদর্শ মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, অর্জুনের প্রকৃতি এমন বিচিত্র এবং বহুমুখী—তাঁহার হৃদয়ের প্রবৃত্তি সকল এমন সবল ও জাগ্রত—

তাঁহার চরিত্র এমন সংকীর্ণতার সংস্পর্শশূন্য—ভাঁড়ামি ও ভীরুতা হইতে মুক্ত যে, তাঁহার পরিচয় পাইবামাত্র পাঠক তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিয়া, না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারে না। এই কাব্যে রবিবাবু অর্জুনকে সৌন্দর্য-মুগ্ধ প্রেমিক করিয়া সাজাইয়াছেন, অথচ বেদব্যাস-সৃষ্ট অর্জুনের মনুষ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

চিত্রাঙ্গদা সর্বতোভাবে রবিবাবুর নূতন সৃষ্টি। মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার কোনো সুস্পষ্টমূর্তি নাই। কোথাও কোনো বিষয়ে তাহার কর্তৃত্ব বা বিশেষত্ব দেখি না, এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যেও যখন পুনর্বার তাহার সাক্ষাৎ পাই, তখনও তাহার এইরূপই নির্বিশেষত্ব। মহাভারতকার যেন একতাল মাটির উপর 'চিত্রাঙ্গদা' এই কয়টি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। রবিবাবু সেই মাটি লইয়া একটি জীবন্ত অপূর্ব রমণী-মূর্তি সৃষ্টি করিযাছেন।

A perfect woman nobly planned

রবিবাবুর *চিত্রাঙ্গদা* কাব্য বুঝিতে হইলে, নায়িকার চরিত্রটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এ চরিত্রে কিন্তু জটিল কিছুই নাই—ইহা অত্যন্ত সরল এবং সহজে বোধগম্য। কিন্তু ইহার বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি থাকা চাই। সেই জন্য রবিবাবুর কাব্যের গল্প অনুসরণ করিবার পূর্বে আমরা তাঁহার চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের কল্পনা পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি।

একা চ মম কন্যেয়ং কুলস্যোৎপাদনী ভৃশম্।
পুত্রো মমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষর্ষভ॥

চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে মূল মহাভারতের এই সামান্য ইঙ্গিত হইতে, এবং বোধ হয় কাশীরামদাসের 'পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন' এই কয়টি কথার ছায়া অবলম্বন করিয়া, ববিবাবু একটি জীবন্ত, বাস্তব, অথচ অপূর্ব পাত্রীর সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিক সাহিত্যজগতে রবিবাবুর চিত্রাঙ্গদা-চবিত্র একটি বিস্ময়কর অথচ সঙ্গত সুন্দর সৃষ্টি; মহাভারতে পুত্রবৎ পালিতা কন্যা রবিবাবুর কাব্যে একেবারে প্রকৃত যুবরাজ; যুবরাজের ন্যায় তাহার শিক্ষা—যুবরাজেরই ন্যায় তাহার কর্মের পরিসর—যুবরাজেরই ন্যায় তাহার স্কন্ধে রাজ্যের কর্তব্যভার। ফলত চিত্রাঙ্গদা নারী হইলেও শিক্ষা এবং ব্যবহারে পুরুষ—কবি চিত্রাঙ্গদার মুখেই এই কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাসচাতুরী; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।'

মণিপুরের বনচরদিগের মুখেও কবি অর্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদা যে যুবরাজ—রাজ্যরক্ষক এবং শত্রুজিৎ এই পরিচয় দিয়াছেন। ভীত বনচরদিগের আর্তনাদ শুনিয়া অর্জুন তাহাদের

ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন—

'উত্তর পর্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্বত্য বন্যার
মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই?

বনচর। রাজকন্যা
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়,
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থপর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।

অর্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী?

বনচর। এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।'

এবং রাজ্যরক্ষা-প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদা আত্মগোপন করিয়া নিজ মুখে যে আত্মপরিচয় দিয়াছে, তাহাতেও ঐ কথা,—

'চিত্রাঙ্গদা। কোনো ভয় নাই প্রভু!
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।'

উপরের লিখিত বর্ণনা হইতে আমরা জানিলাম, রবিবাবুর *চিত্রাঙ্গদা* শিক্ষায় এবং কার্যে একেবারে পুরুষ; সে যে কেবল অন্তঃপুরবাসিনী নয়, এমন নহে। অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া যে শিক্ষাগুণে স্ত্রীলোক লজ্জা এবং সংকোচ অর্জন করে, সে শিক্ষা তাহার একেবারে নাই—তাহার জীবনে বা চরিত্রে সে শিক্ষার ছায়াপাতও কখনও ঘটে নাই; সুতরাং তাহার পক্ষে অন্তঃপুরবাসিনীর লজ্জা-সংকোচ অসম্ভব। স্ত্রীজনোচিত সামাজিক এবং পারিবারিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা এমন পাত্রী আমরা অপরাপর কবির সৃষ্টির মধ্যে ক্বচিৎ দেখিতে পাই। বঙ্কিমবাবুর *কপালকুণ্ডলা* এবং Shakespeare রচিত *Tempest* নামক নাটকে Miranda (মিরেন্ডা) চরিত্র পাঠকের মনে পড়িতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রবন্ধের স্থানান্তরে যথাসময়ে করা যাইবে।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা যে কেবল স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা, তাহা নয়, তাহার বিরুদ্ধ শিক্ষাই পাইয়াছিল—পুরুষের শিক্ষা পাইয়াছিল, এবং তাহাও যে-সে পুরুষের নয়—রাজা বা রাজপুরুষের শিক্ষা পাইয়াছিল। তাহাকে শিখিতে হইয়াছিল লোকশাসন করিতে—সমাজ এবং সাম্রাজ্যে নিজের বলবিক্রম প্রকাশ করিতে, দেশরক্ষা করিতে এবং যুদ্ধ করিতে। প্রকৃতি তাহাকে নারী করিয়া গড়িয়াছিল—শিক্ষা তাহাকে পুরুষ করিয়া তুলিয়াছিল।

কাব্যের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, এই চিত্রাঙ্গদা অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া বনপথে একটি জাগ্রত-পৌরুষ-দীপ্ত পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিল; এই সাক্ষাতেই তাহার জীবনে আমূল বিপ্লব সংঘটিত হইল, এবং কাব্যে নাটকত্বেরও সূত্রপাত হইল। কবি ইহার যে অতুলনীয় সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কবিরই সম্ভবপর; তাহা যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর কবিরই যশঃপ্রভা উজ্জ্বল করিতে পারে।

এই উচ্চ প্রশংসার প্রমাণস্বরূপ এবং কাব্যের আখ্যান গোড়া হইতেই আনুপূর্বিক বিবৃত করিবার নিমিত্ত আমরা নিম্নে কাব্যের সেই অংশ বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম—

'চিত্রাঙ্গদা। এক দিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে, একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণা-নদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য-অন্ধকার
লতাগুল্মে গহন গম্ভীর মহারণ্যে
কিছু দূর অগ্রসরি দেখিনু সহসা,
রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে যেতে,—নড়িল না, চাহিল না ফিরে।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না—সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,—ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে,—রোষদৃষ্টি
মিলাল পলকে; নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা
বুঝি সে বালক-মূর্তি হেরিয়া আমার।
শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি,'
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

এ পুরুষ কে?

সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু, 'কে তুমি?' শুনিনু উত্তর, 'আমি
পার্থ, কুরুবংশধর'।

কিন্তু পার্থ হইলেও চিত্রাঙ্গদার তাহাতে কি? চিত্রাঙ্গদা কি পার্থের কোনো সংবাদ রাখে? পার্থ চিত্রাঙ্গদার অশেষ ভক্তির পাত্র—মানসদেবতা। স্বপ্নেও যাহার দর্শন পাইবার আশা তাহার মনে একদিনও জাগে নাই, তাহাকে হঠাৎ চক্ষুর সম্মুখে পাইয়া চিত্রাঙ্গদা স্তম্ভিত— নির্বাক!

রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ! আজন্মের বিস্ময় আমার!
শুনেছিনু বটে, সত্যপালনের তরে
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন। এই সেই পার্থবীর!
বাল্যদুরাশায় কত দিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হা রে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্যবীর্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে!'—

তাহার পর ঘটিল কি?

কী ভাবিতেছিনু, মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি গেলা
বীর, বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার! ছি ছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমা ভিক্ষা, বর্বরের মতো
রহিলি দাঁড়ায়ে—হেলা করি চলি গেলা
বীর! বাঁচিতাম, সে মুহূর্তে মরিতাম
যদি।

উপরে উদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে কবি অতি বিশদ এবং সুন্দর ভাষায় বুঝাইয়াছেন যে, যে স্বভাববিরুদ্ধ—আরোপিত মিথ্যাজীবন চিত্রাঙ্গদার নৈসর্গিক প্রকৃত জীবনকে চাপিয়া রাখিয়াছিল—জন্মলব্ধ জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি এবং বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাকে অস্বাভাবিক পথে চালিত করিয়াছিল—প্রেতের ন্যায় যে জীবন তাহাকে এতকাল পাইয়াছিল—আজ তাহা হইতে সে মুক্ত! আজ সে খাঁটি পুরুষকে সম্মুখে পাইয়া বুঝিল, সে নিজে ভেজাল—বুঝিল সে পুরুষ নয়—পুরুষ হইতেও পারে না। আজ সে নিজেকে জানিতে পারিল—জানিল সে নারী।

তার পর যে পুরুষ-দর্শনে তাহার আত্মজ্ঞান মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি যে-সে পুরুষ নন। তিনি অর্জুন—চিত্রাঙ্গদার 'আজন্মের বিস্ময়'—কল্পনারাজ্যের অধীশ্বর। এমন অবস্থায় অর্থাৎ যখন অর্জুনের সাক্ষাৎলাভে চিত্রাঙ্গদা একাধারে প্রকৃতপুরুষ এবং আদর্শ পুরুষকে দেখিতে পাইল, তখন যে তাহার সহসা-জাগ্রত চিত্রবৃত্তি সকল দুর্দমনীয় এবং অপ্রতিহত বেগে অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইবে, ইহা আশ্চর্য নয়। স্বভাবের অমোঘ নিয়মেই ইহা ঘটিয়াছিল—পুরুষ হইলেও ঘটিত। কে তাহার কল্পনার বস্তুকে—স্বপ্নের ধনকে নিকটে পাইয়া উদাসীন থাকিতে পারে? এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া চিত্রাঙ্গদা পরদিন তাহার কপটপুরুষ-জীবনের ছলা-কলা পরিহার করিয়া, মিথ্যা হইতে আপনাকে সর্বতোভাবে মুক্ত করিয়া, নারীবেশে আপনাকে নারী বলিয়া ব্যক্ত করিয়া অরণ্যের শিবালয়ে অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইল, এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। মন্দিরের মধ্যে পরস্পরে কি কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কাব্যে লিখিত হয় নাই।

চিত্রাঙ্গদা। মনে নাই ভালো,
তার পরে কি কহিনু আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না ভগবন্!
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্ররূপে,
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর!
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে'
দুঃস্বপ্নবিহ্বল সম! শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
'ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'

অর্থাৎ, চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল, অর্জুন তাহাতে সম্মত হইলেন না। অর্জুন কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া চিত্রাঙ্গদা পার্বতীর ন্যায় নিজের রূপেব নিন্দা করিল, এবং অন্তত একদিনের তরে অমানুষ রূপ পাইবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল—যাহাতে তপোলব্ধ রূপের প্রভাবে অর্জুনের হৃদয় হরণ করিতে পারে। দেবতারা—মদন ও বসন্ত তপে তুষ্ট হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে একদিনের জন্য নয়

বৎসরকালস্থায়ী মানব-দুর্লভ রূপ প্রদান করিলেন। বসন্তদেব বলিলেন—

'শুধু একদিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা একবর্ষ ধরি'
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকাশ।'

তাহাই হইল; এবং পরদিন চিত্রাঙ্গদা যখন নিজ অঙ্গে কুসুমবৎ সন্নদ্ধ সেই দেবদত্ত অপরূপ রূপের প্রথম বিকাশ, বনস্থিত সরসীর স্বচ্ছ জলে সুন্দর এবং স্বাভাবিক কৌতূহলের সহিত দেখিতেছিল—তাহার যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই স্বাভাবিক। প্রতিভাশালী কবির চতুর কল্পনা তাহাতে আবার অপূর্ব নাটকত্ব আনিয়া দিয়াছে—সেই মুহূর্তে তাহার সেই রূপ—সেই বিস্মিত কুতূহলী দৃষ্টি দেখিতেছিল, আর একজন —অর্জুন। এই নাটকত্ব চিত্রের মাধুর্যে চন্দ্রকরে কুসুমসৌরভের ন্যায়, নাতিতীক্ষ্ণ উন্মাদনা মিলিত করিয়াছে।

ইংরেজ কবি Milton রচিত *Paradise Lost* নামক মহাকাব্যের ৪র্থ সর্গে এইরূপ একটি চিত্র পাঠকের মনে পড়ে কি? সদ্যঃসৃষ্ট খ্রিস্টীয় আদিমাতা ঈভ জলমধ্যে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে, শিশুর ন্যায় সরল-হৃদয়ে তাহাকে আর এক জন ভাবিয়া উত্তরোত্তর বর্ধিত আনন্দ-কৌতূহলের সহিত জলের নিকট আসিয়া একবার আনতদেহে সেই ছায়া-মূর্তি দেখিতেছেন আবার পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছেন।

'As I bent down to look, just opposite
A shape within the watery gleam appeared
Bending to look on me. I started back,
It started back; but pleased I soon returned
Pleased it returned as soon with
answering looks
Of sympathy and love'

এ চিত্রের সরলতা এবং মাধুর্য স্বর্গীয়। এরূপ আর একটি চিত্র পাঠক *তিলোত্তমা-সম্ভব* কাব্যে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু বিবিধ-পার্থিব-জ্ঞান-বিশিষ্টা তিলোত্তমায় স্বভাব-সরলতার আরোপে সে চিত্র নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পীড়িত কল্পনা তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

কিন্তু রবিবাবুর এ চিত্রে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছুই নাই। এ দেশে যদি এক জনও পটু চিত্রকর থাকিত, তাহা হইলে এতদিন কবির এই ছন্দোময়ী কল্পনা পটে ভাষান্তরিত হইয়া কবি, চিত্রকর এবং বঙ্গদেশকে কলা-জগতে চিরধন্য করিয়া রাখিত। পাঠককে মূলগ্রন্থে সেই অমৃতময়ী রচনার পরিচয় লইতে অনুরোধ করি,—নিম্নে আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

অর্জুন। নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী;—
... সেথা তরু-অন্তরালে

অপরাহ্নবেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম
আশৈশবজীবনের কথা; ..
হেনকালে ঘনতরু-অন্ধকার হ'তে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল,
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে
কী অপূর্ব রূপ। কোমল চরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদু হাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ, মুক্ত কেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা।
নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস; সরোবরে
পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা। বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি,—যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণপরে,
কী জানি কী দুখে, হাসি মিলাইল মুখে,

ম্লান হল দুটি আঁখি, বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ: অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি;
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল;
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদুপদে।

উপরের উদধৃত অংশ হইতে পাঠক দেখিলেন চিত্রাঙ্গদা এই অপূর্ব রূপ লাভ করিয়া আনন্দিত নয় বরং দুঃখিত কিন্তু কিসের জন্য এত দুঃখ? ম্লান আঁখি কেন? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরে আমরা চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের রহস্য বুঝিতে পারিব।

পাঠক দেখিয়াছেন, অর্জুনের প্রতি আশৈশব চিত্রাঙ্গদার কি সরল, কি প্রগাঢ়, কি উদার ভক্তি ও অনুরাগ। এ হেন ভক্তির পাত্রকে আয়ত্ত কর নিজের গুণে। তোমার ভক্তি তাহার স্নেহ আনিয়া দিক। তোমার প্রেম তাহার প্রেমকে জাগাইয়া তুলুক, এবং পরস্পরের হৃদয়াভিমুখী বৃত্তি সকল পরস্পরকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধুক। তাহা হইলেই তোমার সেই অমূল্য পবিত্র ভক্তি এবং অনুরাগ সার্থক হইবে।

কিন্তু নিজ-হৃদয়ের পরিচয় দিবার অবসর চিত্রাঙ্গদার কোথায়? অশেষ গুণশালিনী হইয়াও অবসরের অভাবে চিত্রাঙ্গদা নিজের গুণের দ্বারা অর্জুনকে আয়ত্ত করিতে পারিল না, নিজের রূপের দ্বারাও নয়, তাই তাহাকে দেবতার নিকট রূপ ধার করিয়া ছলনা পূর্বক অর্জুনের হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই ছলনা-অবলম্বনই চিত্রাঙ্গদার জীবনের আলোকে নির্বাপিত করিয়া তাহাকে গভীর দুঃখে নিমগ্ন করিল। উদার এবং মহৎ চরিত্রের পক্ষে কপটতাই সকল দুঃখের উপর দুঃখ—সকল লজ্জার উপর লজ্জা এবং এ কপটতা আবার কাহার নিকট— যাহার নিকট কায়-মনঃ-প্রাণ-সর্বস্ব অকপটে সমর্পণ করিতে প্রাণ চায়—সমর্পণ করাতেই পরিপূর্ণ সুখ। এ সম্বন্ধে কাব্যের নায়িকার উক্তির মধ্যে আমরা একাধারে মানবহৃদয়, বিজ্ঞান, উচ্চনীতি এবং প্রকৃত কবিত্ব দেখিতে পাই—

সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত-পরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,

ভাবিতেন মনে মনে 'এ কোন্ বালক,
পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মতো।'
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;
যে নারী নির্বাক্ ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্মবিধবা, আমি সে রমণী নহি;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল!
নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি,
নিশ্চয় সে দিবে ধরা!...
কিন্তু হায়...
আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্যে
বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তের ব্রত।

চিত্রাঙ্গদার এই দৈব-প্রসাদ-লব্ধ অলোক-সামান্য রূপ দেখিয়া অর্জুন মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত। এবং অবিলম্বে অরণ্যের সেই শিব-মন্দিরে চিত্রাঙ্গদার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার প্রেমপ্রার্থী হইলেন। তথায় তাঁহাদের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা পাঠে পাঠকের *কুমারসম্ভবের* পঞ্চম সর্গ মনে পড়িবে;—

অর্জুন। হায়, কারে করিছে কামনা!
জগতের কামনার ধন! সুদর্শনে,
উদয়শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সপ্তদ্বীপমাঝে
যেখানে যা-কিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চোখে;
কী চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা। ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি, আমি যারে চাহি।

অর্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়। কার যশোরাশি

অমরকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে
কবিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন।
কহো নাম তার, শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর—

অর্জুন। মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায়; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা ক'রে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ দুর্লভ
সৌন্দর্যসম্পদে। কহো শুনি সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে!

চিত্রাঙ্গদা। পরকীর্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসী?
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবনমাঝে
রাজবংশচূড়া?

অর্জুন। কুরুবংশ!

চিত্রাঙ্গদা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী—
নাম শুনিয়াছ?

অর্জুন। বলো শুনি তব মুখে।

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারী হৃদয় পূর্ণ করি।—ব্রহ্মচারী,
কেন এ অধৈর্য তব?...

অর্জুন। অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জুন. সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান্।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্যবীর্য তার,
মিথ্যা হোক্, সত্য হোক্, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থানদান, সেথা হতে
আব তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্য সম।

কিন্তু এবার চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে ফিরাইয়া দিল। ইহার অর্থ কি? এই প্রত্যাখ্যান বাস্তব, না কেবলমাত্র ভান? প্রশ্নের উত্তর পাঠক চিত্রাঙ্গদার মুখে শুনিবেন—

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পার্থ?

... ... ধিক্ পার্থ, ধিক্!

কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত! মুহূর্তেকে সত্যভঙ্গ
করি, অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল প'ড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার!

... যাও যাও ফিরে

যাও, ফিরে যাও বীর! মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে! যাও, ফিরে যাও।

পাঠক কি ইহার অর্থ বুঝিলেন? যে অর্জুনকে পাইবার নিমিত্ত এত দেবপূজা প্রভৃতির আয়োজন, এত কঠোর তপস্যা, সে যখন পদপ্রান্তে, তখন তাহাকে এরূপে প্রত্যাখ্যান করার কি কোনো উদ্দেশ্য আছে? ইহা কি নারী-জাতির প্রবাদগত অব্যবস্থিতচিত্ততা? বা মুগ্ধ প্রেমিককে আরও দৃঢ়তর রূপে পাশবদ্ধ করিবার নিমিত্ত হৃদয়-হীনার নিষ্ঠুর ছলাকলা? যদি কোনো পাঠক এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র কিছুই বুঝিলেন না। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, ইহা একটি মহৎ চরিত্রের অবস্থাবিশেষে স্বাভাবিক বিকাশ। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, দেবতার নিকট প্রার্থিত রূপ পাইয়া আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, চিত্রাঙ্গদা কাঁদিয়াছিল। সে কি কখনও সেই রূপের ছলনার দ্বারা আয়ত্ত অর্জুনের প্রেম সহসা গ্রহণ করিতে পারে? তাহার মহীয়সী প্রকৃতি কি এই দৈন্যে, এই হীনতায় এই ছলনার কার্যে হঠাৎ সম্মতি দিতে পারে? উপায়ের অনার্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহার মহৎ হৃদয় নিজেই যে ঠিক সেই কার্যসিদ্ধির মুখেই নিজের উদ্দেশ্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা অনেক সময় প্রলুব্ধ হইয়া হীন উপায় অবলম্বনে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার আয়োজন করি। কিন্তু আমাদের প্রকৃতিতে কিঞ্চিন্মাত্র মহত্ত্ব থাকিলে যে মুহূর্তে সেই উপায়-প্রয়োগের দ্বারা কার্যসিদ্ধির উপক্রম হয়, সেই

মুহূর্তে আমাদের হৃদয় স্বতঃ—instinctively—সে সাফল্য সে সিদ্ধির বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের মনও চায় না, হাতও উঠে না। নিজের প্রকৃতিগত ঔদার্যের প্ররোচনায় চিত্রাঙ্গদার প্রথমে তাহাই ঘটিয়াছিল। সে আরও জানিত, তাহার সে রূপ নিজের জন্মলব্ধ রূপ নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।—তাই সে যখন দেখিল, এই মিথ্যার পদে অর্জুন আপনার শৌর্য, বীর্য—মহত্ত্ব উৎসর্গ করিতেছে, তখন সে নিজের হৃদয় দিয়া অর্জুনের হৃদয়কে বিচার করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত হইয়াছিল। সেই কারণেই এই প্রত্যাখ্যান। এবং চিত্রাঙ্গদার এই অকৃত্রিম সরলতা এবং মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য কবি এই দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু অর্জুন যখন পুনর্বার তাহার নিকট আসিয়া তাহার প্রেম যাচ্ঞা করিলেন, তখন অর্জুনগতহৃদয়াকে পরাজিত হইতে হইল, এবং দুই জনে পরস্পরের প্রেম-বন্ধনে মিলিত হইলেন।

কিন্তু মিলিত হইয়াও মিলন পরিপূর্ণ হইল না। যতদিন তাহার সে দৈবরূপ বর্তমান ছিল, ততদিন চিত্রাঙ্গদা তাহার নিজের প্রকৃত পরিচয় অর্জুনকে দেয় নাই। অর্জুনের নিকট সে কেবল পরিপূর্ণ রূপ—এবং সৌন্দর্য—

সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

তাই অর্জুনের প্রেমপিপাসা মিটে নাই, এবং তাঁহার ক্ষুব্ধ হৃদয় অপরিতৃপ্তির আকুল আর্তনাদে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—

অর্জুন। তাহারে যে ভালোবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে।

সুতরাং অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে পাইয়াও পান নাই। তাঁহার হৃদয়ে চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে চির ঔৎসুক্য জাগ্রত রহিল। বিশেষত পরস্পরের নিত্য সঙ্গ-লাভে চিত্রাঙ্গদার অশেষ গুণ, চরিত্রগৌরব এবং মানসিক সৌন্দর্য তাঁহার চক্ষে নিত্য নববেশে উন্মেষিত হইতে লাগিল। রূপজ আকর্ষণের উপর শ্রদ্ধা প্রীতি এবং মহৎ হৃদয়ের প্রতি মহৎ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত মর্যাদা, অর্জুনের প্রেমকে নিবিড় হইতে নিবিড়তর করিয়া তুলিল, তাঁহার অপরিতৃপ্ত হৃদয় চিরদিনই চিত্রাঙ্গদার প্রেম-পিপাসার মধুর অথচ তীব্র পীড়নে আকুল, সে হৃদয়ে প্রেমের মৌলিক রহস্য অক্ষুণ্ণভাবে নিত্য বর্তমান।

অর্জুন। কোনো গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়-পরিজন?
নিত্য স্নেহসেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন করে, যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া

অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা। প্রশ্ন কেন? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে?
যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই-যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়?
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জুন। কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে? এক
বিন্দু স্বর্ণ শুধু ভূমিতলে ভুলে পড়ে
গেছে?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জুন। তাই সদা হারাই-হারাই
করে প্রাণ; তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এসো।
নামধামগোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে!
চারি পার্শ্ব হতে ঘেরি পরশি তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস। নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দিরমাঝে? গোত্র নাই? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?

... .

অর্জুন। বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি,
তবু যেন পাই নি সন্ধান! তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরাল থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বনরত্ন, আলিঙ্গনসুধা;

নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে। তেজস্বিনী পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত
শিল্পযবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি। নিত্যদীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে
ছলছল করে ওঠে, মুহূর্তের মাঝে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি।
সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি'; তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীনরূপে
আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে!
আমার যে সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের।

কবি এখানে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয়স্বরূপ একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, যে সময় কণ্ঠলগ্না অথচ অসম্পূর্ণ-পরিচিত এক প্রণয়িনীর জন্য অর্জুনের হৃদয়ের অপরিতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা দিনে দিনে বাড়িতেছিল, সেই সময়েই-সেই সুদূরবাসিনী জনশ্রুতি মাত্রলব্ধসত্ত্বা রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদার অদ্ভুত বার্তা এবং বিস্ময়কর চরিত্র অর্জুনের কর্ণগোচর করাইলেন, এবং তৎসম্বন্ধে অর্জুনের হৃদয়ে এক অশান্ত কুতূহল জাগাইয়া তুলিলেন। তাহার গুণগ্রামে, তাহার বীরোচিত কার্যকলাপে তাহার প্রজাবাৎসল্যে অর্জুনের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ জাগিয়া উঠিল। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের হৃদগতভাব নাট্যনিপুণ কবি কি সুন্দর কৌশলেই ব্যক্ত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার কথা অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং চিত্রাঙ্গদার মুখেই শুনিতেছেন। এই প্রশ্নোত্তরের অতর্কিত ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়ের হৃদয় এবং প্রকৃতি অজানিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।—

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ?
অর্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।

প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী!

চিত্রাঙ্গদা। কুৎসিত কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার—এমন নিবিড়-কৃষ্ণ-তারা
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে।

অর্জুন। কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী বীর্যে সে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, সেই
তার মন্দভাগ্য। নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা—শুধু সুমধুর ছলে,
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা,
তবে তার সার্থক জনম! কী হইবে
কর্মকীর্তি বীর্যবল শিক্ষাদীক্ষা তার!
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে
ওই দেবালয়মাঝে— হেসে চলে যেতে।
... ... এসো, নাথ, বসো। কেন আজি
এত অন্যমন? কার কথা ভাবিতেছ?

অর্জুন। ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত? কী অভাব তার?

চিত্রাঙ্গদা। কী অভাব তার? কী ছিল সে অভাগীর?
বীর্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করি
রুদ্যমান রমণীহৃদয়। রমণী তো
সহজেই অন্তরবাসিনী; সঙ্গোপনে
থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি! কি অভাব তার!
অরুণলাবণ্যলেখাচিরনির্বাপিত
উষার মতন, যে-রমণী আপনার

শতস্তর তিমিরের তলে বসে থাকে
বীর্যশৈলশৃঙ্গ -'পরে নিত্য-একাকিনী—
কী অভাব তার! থাক, থাক তার কথা।
পুরুষের শ্রুতিসুমধুর নহে, তার
ইতিহাস।

অর্জুন। বলো বলো। শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরজনীতে।
নদীগিরিবনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জন; প্রভাতপ্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে। বলো বলো শুনি তার কথা।

চিত্রাঙ্গদা। কী আর শুনিবে?

অর্জুন। দেখিতে পেতেছি তারে—
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে;
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মতো, আর্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের
সংকীর্ণ দুয়ারে রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি সেথা, করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহিনীর মতো, চারি দিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী,
বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া!

উপরে উদ্ধৃত অংশ পাঠে পাঠক দেখিবেন, এই উভয় চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের তদানীন্তন হৃদয় প্রেমের চৌম্বকাকর্ষণে কেমন কম্পিত—উদ্বেলিত। এবং ঠিক এই সময়েই কবি বর্ষ শেষ করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে তাহার দেবদত্ত রূপের মিথ্যা আবরণ হইতে মুক্ত করিলেন। অর্জুনও ঠিক সেই সময়ে জানিতে পারিলেন যে, যেমন সন্ধ্যা-তারা এবং

প্রভাত-তারা দুটি পৃথক জ্যোতিষ্ক নয়, বস্তুত এক—সেইরূপ তাঁহার অঙ্কগতা প্রণয়িনী এবং সুদূরবর্তিনী কল্পনার বিষয়ীভূতা অথচ-হৃদয়-সন্নিহিতা হৃদয়মথনকারিণী মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা—একই নারী।

অর্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদার নিজের প্রকৃত পরিচয়দানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। তাহা যে অনির্বচনীয় মাধুর্যে এবং গম্ভীর ও করুণ সৌন্দর্যে পরিপ্লুত, তাহার বর্ণনা আমাদের রূঢ় ভাষায় সম্ভবপর নয়, এবং তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে পাঠকের উপর অন্যায় আচরণ করা হয় এই আশঙ্কায় আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম —

চিত্রাঙ্গদা। প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল সকলি কি
করিয়াছ পান! আর-কিছু বাকি আছে?
আর-কিছু চাও? আমার যা-কিছু ছিল
সব হয়ে গেছে শেষ? হয় নাই প্রভু!
ভালো হোক, মন্দ হোক্, আরো কিছু বাকি
আছে, সে আজিকে দিব!

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর!
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে; কত দৈন্য আছে; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা! সংসারপথের
পান্থ, ধূলিলিপ্তবাস, বিক্ষতচরণ;
কোথা পাব কুসুমলাবণ্য, দু দণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা! কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়!

. . . .

হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন,
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আবরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।
কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।

ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।
আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অর্জুন। প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

অর্জুনের শেষ কয়টি সামান্য কথা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, এই মুহূর্ত হইতে চিত্রাঙ্গদার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় গভীর প্রেম আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। যখন তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা দুইটি হৃদয়প্লাবিনী ধারায় দুই দিকে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন সহসা তাহাদের দুই মুখ এক হইয়া একই দিকে দ্বিগুণতর বেগে ধাবিত হইল।

এমন অনেক লোক আছেন, কথায় কথায় যাঁহাদের চোখেব পাতা অশ্রুজলে আর্দ্র হয়; কিন্তু এমনও লোক আছেন, যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও চোখে অশ্রু সহসা দেখা যায় না। জানি না অর্জুনের শেষকথাগুলিতে এমন কি রহস্য আছে যে, তাহা পাঠে শেষোক্ত প্রকৃতির লোকও অশ্রুজল সংববণ করিতে পারেন না। ইহাতে নির্দোষের প্রতি অন্যায় অত্যাচার নাই—বিরহ নাই—মৃত্যু নাই, কিন্তু তবু কথা কয়টি পাঠে হৃদয় অভিভূত হয়, কণ্ঠস্বরে অস্ফুট ক্রন্দনের বেগ আসিয়া পড়ে। আনন্দ-বিষাদ-মিশ্রিত সে

ক্রন্দন! বিষাদ—চিত্রাঙ্গদার বৎসরকালব্যাপী আত্মগোপনজনিত লজ্জা এবং ক্ষোভে; আনন্দ—সে মিথ্যা হইতে লজ্জা হইতে আজ তাহার মুক্তিতে।

আমরা চিত্রাঙ্গদা কাব্য পাঠকের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর মন্তব্যসমূহের আলোচনা করা যাক্। তৎপূর্বে কিন্তু তিনি কিভাবে রবিবাবুর কাব্যের গল্পাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, দেখিতে হইবে।—তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে গল্পটি এই ভাবে বর্ণিত—

> বনমধ্যে অর্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে আত্মসমর্পন করেন। অর্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে রূপ ধার করেন। অর্জুন তখন সম্মত হ'ন, এবং সেই অনূঢ়া কন্যাকে বর্ষকাল ভোগ করেন।

এই আখ্যানের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া, দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রথম অভিযোগ, কবি অর্জুনকে 'জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।' 'আর চিত্রাঙ্গদা! 'বেচারি মা আমার! * * * * এক জন যে সে হিন্দুকুলবধূ 'যে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্তু ধর্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে!'

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দ্বিজেন্দ্রবাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলন বিনা-বিবাহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ ধরিয়া লইবার কোনো কারণ কাব্যমধ্যে আছে কি? আমরা দেখাইব যে, কাব্য-পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়, এবং বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। অর্জুন যখন চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহার তখনকার শেষ কথাগুলি স্মরণ করুন,—

> ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
> নহি বরাঙ্গনে।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জুন সে সময় ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কারণ নির্দেশ করিয়া বিবাহে সম্মত হন নাই।

পরে যখন অর্জুন চিত্রাঙ্গদার দেবলব্ধ রূপে মুগ্ধ হইলেন, তখন তাহাকে পাইবার জন্য তিনি হৃদগতভাব এবং অভিলাষ কিরূপে ব্যক্ত করিলেন, দেখা যাক্।

> অর্জুন। পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
> তুমি—এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
> মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
> বিশ্রামরূপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ
> তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
> কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
> অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টিশতদল
> দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
> এক মুহূর্তের মাঝে! আর সকলেরে

পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে; তোমা পানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে,
তবু পাই নাই শেষ।—কৈলাসশিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত, তৃষিত, তাপিত,
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুরসরসীর সলিলের পানে
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত-অতল।
স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণমৃণাল-সাথে মিশি নেমে গেছে
অগাধ অসীমে; কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে লক্ষকোটি অগ্নিময়ী
নাগিনীর মতো। মনে হল ভগবান
সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া
দি'ছেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্মক্লান্ত
মর্ত্য জনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখিছি তোমার মাঝে। চারি দিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক-আলোক মাঝে
কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্বাপণ।

ইহাতে কি কামান্ধ রূপোন্মত্ত প্রেমিকের ইন্দ্রিয়বিকার বা উপভোগলালসা ব্যক্ত হইয়াছে? না, একনিষ্ঠ প্রেমের মধুর, পবিত্র এবং পাবন উন্মাদনা বীণাঝঙ্কারে ধ্বনিত হইতেছে? এই কয়েকটি ছত্রে প্রেমের যে উচ্চ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্যে দুর্লভ। ইহার তুল্যদরের কবিতা Shelley-তেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাঁহার রচিত *Epipsychidion* প্রমুখ অতুলনীয় কবিতাসমূহের মধ্যেই এইরূপ আত্মবিলোপী প্রেম এবং প্রেম-সর্বস্ব জীবন গীত হইয়াছে।

বিবাহ যে হইয়াছিল, তাহা পাত্র এবং পাত্রীর চরিত্র-গৌরবও আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে।

তাহা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব বিবাহই প্রশস্ত ছিল। সে বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি আসক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপকরণের প্রয়োজন ছিল না। যখন

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা পরস্পরের প্রতি এইরূপ প্রবলভাবে আকৃষ্ট, তখন তাঁহারা বিবাহের এমন শাস্ত্রসম্মত, সহজ ও সমীচীন উপায় থাকিতে তাহা হইতে আপনাদিগকে স্বেচ্ছাক্রমে বঞ্চিত করিলেন, এ কল্পনা উৎকট—অসঙ্গত—অস্বাভাবিক। স্বীকার করি, কাব্যের কোথাও স্পষ্টাক্ষরে গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ নাই; কিন্তু কাল, পাত্রপাত্রী, উভয়ের চরিত্রগৌরব, কুলশীল, এবং শাস্ত্রবিধান, সমস্তই কি অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করিতেছে না যে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা পরস্পরে গান্ধর্ব বিবাহে মিলিত হইয়াছিলেন? মহাভারতে এই চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যানের অব্যবহিত পূর্বে 'উলূপ্যর্জ্জুনসমাগমঃ' নামক অধ্যায় আছে। সে অধ্যায়ে অর্জুন এবং উলূপীর যৌন-মিলন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোথাও গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ নাই; অথচ ঐ অধ্যায়েই উলূপী সাধ্বী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং মহাভারতের পরবর্তী অংশে উলূপী অর্জুনের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত। ইহাতে আমরা কি বুঝিব? আমরা কি বুঝিব না যে, অর্জুন ও উলূপীর গান্ধর্ব বিবাহ হইয়াছিল? তাহা যদি হয়, কি কারণে এই *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যে আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার গান্ধর্ব বিবাহ হয় নাই? এ সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের ক্ষীণ ছায়াও কখনও পড়ে নাই। আমরা বরাবরই বুঝিয়াছি, এবং উপযুক্ত পাঠকমাত্রকেই বুঝিতে হইবে যে, চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের মিলন বিবাহ-নিষ্পন্ন দাম্পত্য-মিলন। তাহা যদি হইল, তবে অর্জুন এক জন কুমারীর ধর্ম নষ্ট করিয়া এক বৎসরকাল তাহাকে পশুবৎ সম্ভোগ করিলেন, দ্বিজেন্দ্রবাবুর এ অভিযোগ দাঁড়ায় কোথায়?

দ্বিজেন্দ্রবাবুর আর এক অভিযোগ চিত্রাঙ্গদা উপযাচিকা হইয়া অর্জুনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। প্রবন্ধের পূর্বাংশে যে অবস্থায় এবং যে কারণপরম্পরার সংযোগে চিত্রাঙ্গদা এইরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, আমরা তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, চিত্রাঙ্গদার এবংবিধ আচরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। অন্তঃপুরবাসিনীর লজ্জা-সংকোচ-শিক্ষা চিত্রাঙ্গদা কখনও পায় নাই—বরং তাহার চরিত্র পুরুষের ন্যায়ই গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার সে চরিত্রে রবিবাবু যদি শুদ্ধান্তচারিণীর লজ্জা-সংকোচের আরোপ করিতেন, তাহা হইলে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও অসত্য হইত। Shakespeare কল্পিত অন্তঃপুর-শিক্ষা-বঞ্চিতা Miranda চরিত্রে আমরা এইরূপ লজ্জা সংকোচের অভাব দেখিতে পাই। Ferdinand-এর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই Miranda পিতৃসন্নিধানে অসংকোচে বলিয়া উঠিল,—

> This
> is the third man that e'er I saw; the first
> that e'er I Sighed for :

এবং পরে সেই অপরিচিত পুরুষের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া এই বলিয়া আত্মসমর্পণ করিল,—

> I am your wife, if you will marry me;
> If not, I'll die your maid: to be your fellow
> You may deny me; but I'll be your servant

Whether you will or no.

এ দিকে আবার দেখুন, যখন নারদ উমার সমক্ষে হিমালয়ের নিকট উমার বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন কালিদাস উমার তদানীন্তন ভাব কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস দেখাইয়াছেন, উমা তখন ভান করিতেছেন, যেন বিবাহের কথা উমার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই, তিনি যেন অন্য চিন্তায় নিমগ্না,—

'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী।'

Shakespeare যদি বনবিহঙ্গিনী Miranda-কে লোকালয়বাসিনী, সামাজিক-শিক্ষাপ্রাপ্তা উমার ন্যায় ছলনা-পরা করিতেন, তাহা হইলে তাহা একেবারে অসঙ্গত হইত। আমাদের হৃদয়ও তাহা কোনো মতে গ্রহণ করিতে পারিত না, এবং উমার মুখে Miranda-র স্বাভাবিক সরল লজ্জাহীন হৃদয়াভিব্যক্তি নিতান্ত অস্বাভাবিক শুনাইত।

এই উপযাচিকার ভাব, যাহা দ্বিজেন্দ্রবাবুর নৈতিক সত্তাকে এত বিচলিত করিয়াছে, তাহা তো মহাভারতের বর্ণিত যুগের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বড়ই প্রবল ছিল। মনোগত ভাব প্রকাশে তাহাদের কোনোরূপই সংযম দেখা যায় না। কোনো পুরুষের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইলে তাহা তাহারা স্পষ্ট প্রকাশ করিত—রাখিয়া ঢাকিয়া বলিত না। তাহা তো হইবেই। যখন যৌন মিলনের গান্ধর্ব-বিবাহ-পদ্ধতি রূপ এমন প্রশস্ত রাজপথ পড়িয়াছিল, তখন রাখা-ঢাকার প্রয়োজন কোথা? রাখিলে ঢাকিলে যে গান্ধর্ব বিবাহই ঘটে না।

দ্বিজেন্দ্রবাবু ভক্তি-শ্রদ্ধা-গদ-গদ-কণ্ঠে বলিয়াছেন, 'লজ্জা সংকোচ, সম্ভ্রম সব দেশেই নারীজাতির সম্পত্তি।'—সকল দেশের হউক না হউক সকল কালের তো নয়-ই। এই মহাভারতের কালের নয়। 'দৃষ্টান্ত চাই?' উলূপীর আখ্যান দেখুন না! অথবা নাগকন্যা উলূপীকে ছাড়িয়া দিন। দময়ন্তী তো আদর্শ নারী—সেই দময়ন্তী বিবাহের পূর্বে নল রাজার সাক্ষাৎ পাইয়া—অথচ তাঁহাকে তখন নলরাজা বলিয়া না জানিয়া—সেই অপরিচিত পুরুষকে কি বলিয়া প্রথম সম্বোধন করিলেন?

কস্ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ মম হৃচ্ছয়-বর্দ্ধন।

হে সুন্দর! আমার কাম প্রবৃত্তির উত্তেজক, কে তুমি? হায়! 'নারী জাতির সম্পত্তি—লজ্জা, সংকোচ, সম্ভ্রম'! হায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর নাবীনিষ্ঠা! ভাগ্যে রবিবাবু 'ব্যাসদেবের ধাপে নামেন নাই।'

দ্বিজেন্দ্রবাবুর আর এক অভিযোগ এই যে, যতদিন চিত্রাঙ্গদার দেবলব্ধ রূপ বর্তমান ছিল, ততদিন অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদা পরস্পরের সম্ভোগে অন্ধ—উন্মত্ত। 'দ্বিধা নাই—সংকোচ নাই—ধর্ম নাই—কেবল নিত্য ভোগ—ভোগ।' কিন্তু যদি স্বীকার কর, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলে এই অভিযোগের সারবত্তা কোথায়? দ্বিতীয়ত, আমরা তো কাব্যের কোথাও দ্বিজেন্দ্রবাবুর কথিত এই নির্লজ্জ উপভোগ বা তাহার অধিকতর নির্লজ্জ বর্ণনা দেখিলাম না। বাস্তবিক, এই অভিযোগে আমরা যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের বোধ হয়, দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন তাঁহার এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাব্যখানি তাঁহার সম্মুখে ছিল না। তিনি বহু পূর্বকালের পাঠের স্মৃতি বা বিস্মৃতির

উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন। কাব্যপাঠে এই এক বৎসর কাল ধরিয়া আমরা চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ে নিত্যবর্ধনশীল শোকেরই পরিচয় পাই। আমরা দেখিতে পাই, তাহার হৃদয়রুদ্ধ নির্বাক বিষাদ সমস্ত জীবনকে তিক্ত করিয়া তুলিতেছে। চিত্রাঙ্গদার দুঃখ নহে যে, 'হায়! আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম।' দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন সমস্ত কাব্যখানি ভুল বুঝিয়াছেন, তখন যে তিনি উহাই চিত্রাঙ্গদার দুঃখ বলিয়া নির্দেশ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

চিত্রাঙ্গদার দুঃখ এই,—অর্জুনের যে অপরিসীম প্রেম সে লাভ করিয়াছে, এবং উচ্ছল, উদ্বেলিত, সাগরতরঙ্গের ন্যায় যে প্রেমের অমৃতময় উচ্ছ্বাস প্রতিদিন তাহার হৃদয়ে আসিয়া পড়িতেছে, সে প্রেম তাহার নিজের রূপ-জন্যও নয়, গুণ-জন্যও নয়। অর্জুন তাহাকে ভালোবাসিতেছেন কিসের জন্য? যে সৌন্দর্য, যে রূপ তাহার নিজের নয়, যাহা তাহার ছদ্মবেশমাত্র, সেই জন্য। এই ছলনার দুর্বিষহ লজ্জা 'তিরশ্চীন-মলাত-শল্যবৎ'—জ্বলন্ত অঙ্গারনির্মিত বক্র শেলের ন্যায় চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ে আমূল প্রোথিত থাকিলেও, অম্লানবদনে তাহাকে বহিতে এবং সহিতে হইয়াছিল; এবং যে সৌন্দর্যে অর্জুন মুগ্ধ, সেই সৌন্দর্য তাহার দেহে অধিষ্ঠিত বলিয়া সে দেহও তাহার বিদ্বেষের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য অর্জুনের সহস্র আদর, প্রথম মিলনের উন্মাদনী স্মৃতি—সকলই চিত্রাঙ্গদার নিকট বিষাক্ত। সে সমুদায় মূলে তাহার এই দেহস্থিত মায়ালাবণ্য-সঞ্জাত বলিয়া চিত্রাঙ্গদা তাহাদিগকে নিজের সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই জন্য কাব্যের যেখানেই চিত্রাঙ্গদা এ মায়া-লাবণ্যের এবং তজ্জনিত অর্জুনের প্রেমের উল্লেখ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার কথাগুলি শ্লেষ এবং বক্রোক্তির মিশ্রণে তিক্ত-মধুর; এবং তাহাতে চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের তদানীন্তন অবস্থা কেমন সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে!

অন্তরের এই নিষ্ঠুর দাবদগ্ধ স্মৃতি—হৃদয়ের এই বিষদিগ্ধ ক্রূর অনুভূতি কিরূপ প্রখর এবং গভীর, পাঠককে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য কবি সৃষ্টিকারিণী কল্পনা-বলে চিত্রাঙ্গদার সেই মায়া-লাবণ্যকে অমানুষিক-বিদ্বেষ-দুষ্ট সত্তা দিয়া রাক্ষসীর ন্যায় তাহাকে অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার মাঝখানে দাঁড় করাইয়াছেন।

. . . . মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাত! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান! সেই প্রেমদৃষ্টিপাত—
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে-অঙ্গেতে পড়ে,
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা,—সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম চিররাত্রিতাপসিনী—

কুমারী-হৃদয়পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহাবে লইল ভুলায়ে॥

বিদ্যুৎবেদনা সহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
আব তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষা-তীর্থ
বাসরশয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর!

এই অসহ্য লজ্জা এবং দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য চিত্রাঙ্গদা কন্দর্পকে তাহার প্রদত্ত রূপ ফিরাইয়া লইতে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিল, এবং সে সৌন্দর্য হারাইবার ফলস্বরূপ অর্জুনেরও প্রেম হারাইবার বিপৎপাতকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল।

চিত্রাঙ্গদা। সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে! সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি— আমি রব!
সেও ভালো, ইন্দ্রসখা!

কাব্যের ঠিক মর্মস্থানে চিত্রাঙ্গদার এই মর্মান্তিক দুঃখস্রোত গভীর আবর্তে পরিণত হইয়াছে। নাটকের এই অংশে তাহার মহান্ হৃদয়ের গভীর বিষাদ Tragedy of a soul-এ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া কেহ কি দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতের অনুমোদনে বলিতে পারেন যে, রবিবাবু চিত্রাঙ্গদাকে নির্লজ্জা কুলটা এবং অর্জুনকে জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন? দ্বিজেন্দ্রবাবু যদি এইরূপ একটি বাস্তব চিত্র দেখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। পূজাস্পদ কাশীরাম দাসের কৃত মহাভারতে, সুভদ্রাহরণের পূর্বে, অর্জুন এবং সুভদ্রার যে আলাপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইতে আমরা দ্বিজেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করি। সেই বর্ণনায় তিনি দেখিতে পাইবেন, যে অর্জুন—যিনি 'রাজপুত্র, পঞ্চ-পাণ্ডবের একজন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করিবেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে উর্বশীরও প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন,' সেই অর্জুন জঘন্য পশু নয়

তো কি? 'বঙ্গের' উক্ত 'কবিবরে'র হাতে পড়িয়া কামান্ধ অর্জুন বলপূর্বক কুমারীর ধর্মনাশে উদ্যত! আর সুভদ্রা, অনূঢ়া হইয়াও অর্ধরাত্রে উক্ত 'কবিবরে'র কল্যাণে সুপ্ত অর্জুনের শয়নগৃহে অভিসার করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের পাঠ্য এই *সাহিত্য* পত্রে আমরা পূজ্যপাদ কাশীরাম দাসের বিরচিত মহাভারতের সে অংশ উদ্ধৃত করিবার সাহস পাইলাম না।

দ্বিজেন্দ্রবাবু Courtship-এর উপর একেবারে খড়গহস্ত। সমালোচ্য কাব্যে রবিবাবু Courtship-এর অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন, এবং ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'Courtship না হইলে প্রেম হয়?' ইহার উত্তরে আমরা মুক্তকণ্ঠে অসংকোচে বলি,—না—Courtship না হইলে প্রেম হয় না—প্রেম অসম্ভব। পাঠক আমাদিগকে ভুল বুঝিবেন না—আমরা এমন বলিতেছি না যে, Courtship না হইলে বিবাহ হয় না—বিবাহ Courtship ভিন্নও হয়, প্রেম ভিন্নও হয়। কিন্তু Courtship ভিন্ন প্রেম জন্মিতে পারে না।

আমরা বাঙালি—আমাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। সে বিবাহের পূর্বে Courtship ঘটে না। কিন্তু বাল্যবিবাহেও দাম্পত্য প্রেম জন্মিবার আগে Courtship আবশ্যক, এবং হইয়া থাকে— তবে তাহা বিবাহের পূর্বে নয়।

Courtship কথাটা ইংরিজি হইলেও পদার্থটি আর কিছুই নয়—আমরা যাহাকে পূর্বরাগ বলি। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইবার পূর্বে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার জন্য আলাপ এবং সঙ্গলাভকে স্থূলত Courtship বলা যাইতে পারে।

আমাদের মধ্যে বিবাহকালে বর কন্যাকে বলিয়া থাকে,—

যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

কিন্তু ইহাও মন্ত্রবলে হইবার নহে, ইহারও আয়োজন চাই। কে এমন অন্ধ দুর্ভাগ্য আছে যে, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রেমের ভূমিকার সুন্দর এবং কবিত্বপূর্ণ আয়োজন দেখে নাই? দ্বিজেন্দ্রবাবু নীতির দোহাই দিয়া রবিবাবুর যে সকল নির্দোষ ও পবিত্র গানের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এই পূর্বরাগের মাধুরীতে পূর্ণ।

আমাদের গুরুজনভূয়িষ্ঠ একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের মধ্যে অপর সকলের অজানিতভাবে নববধূর স্বামীর নিকট লাজসংকুচিত ধীরপদক্ষেপে গমন—দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অভিসারই নয় বলিলাম—নববিবাহিত পাত্র পাত্রীর পরস্পরকে 'চুরি করিয়া' বা অপাঙ্গে দর্শন, পূর্বরাগের এ-সমস্ত মধুময় লক্ষণ রবিবাবুর সেই সকল অতুলনীয় গীতগুলির মধ্যে 'পঞ্চম রাগিণী'তে নিত্য গুঞ্জরিত।

আমাদের এমন আশা আছে যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও এই নির্দোষ এবং মনোমুগ্ধকর Courtship শীঘ্র সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে না, এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিন্দা সত্ত্বেও রবিবাবুর এই গানগুলি যতদিন বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতি থাকিবে, ততদিন তাহারা আদরের সহিত গীত হইবে। তা'ছাড়া গানের উপর দ্বিজেন্দ্রবাবুর এত চটিলে

চলিবে কেন? দ্বিজেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়াছেন, 'কানু বিনা গীত নাই'—আর সে গীত—

উপসংহারে জিজ্ঞাসা করি, তর্কের অনুরোধে যদিও আমরা ধরিয়া লই, Courtship আমাদের সমাজে অপ্রচলিত, তাই বলিয়া উহা অস্বাভাবিক কেন? Give a dog a bad name and hang it, নীতিকুশলী দ্বিজেন্দ্রবাবু এই উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন কি?

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে কিন্তু এই Courtship-চিত্র বিরল নয়। রবিবাবুর বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যে এই Courtship-এর যে মধুর চিত্র চিরকালের জন্য আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। জর্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তাহার সৌন্দর্যে, 'চাপলায় প্রণোদিতঃ' হইয়া যে অনুপম চতুষ্পদী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য-সাহিত্যাভিজ্ঞ শকুন্তলার পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু বোধ হয়, কালিদাসের সমসাময়িক পণ্ডিত দিঙ্নাগাচার্য মহাশয় এই Courtship-এর অবতারণা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি এবং নিন্দা করিয়াছিলেন।

শকুন্তলার এই Courtship-চিত্রে দ্বিজেন্দ্রবাবুর আপত্তিকর আর একটি বিষয় দেখিতে পাই। চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে যে উপযাচিকার ভাব দ্বিজেন্দ্রবাবুর রোষের কারণ হইয়াছে, ঋষিপালিতা আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার চরিত্রে তাহারও যেন কিছু কিছু ছায়া দেখা যায়। দুষ্মন্ত-দর্শনে মদনতাপপীড়িতা শকুন্তলা যখন তন্নিবন্ধন অসুস্থদেহা হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার সখীদ্বয় তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য (প্রেম এমনই সান্নিপাতিক ব্যাপার!) রাজার সহিত তাহার আশু সম্মিলনের উপায়স্বরূপ শকুন্তলাকে রাজার নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন, এবং রাজাকে একখানি মদনলেখ লিখিতে বলেন। পাঠককে কি বলিতে হইবে, শকুন্তলা সে হৃদয়গ্রাহী পরামর্শ সহর্ষচিত্তে এবং আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন? তখনও কিন্তু রাজা তাঁহার মনোভাব মুখে বা পত্রে ঘুণাক্ষরে ব্যক্ত করেন নাই। তবে শকুন্তলার ন্যায় তাঁহারও আকার ইঙ্গিতে আধিব্যাধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল—অন্তত অভিজ্ঞ এবং ভুক্তভোগী ব্যক্তিদিগের চোখে। শকুন্তলা রাজাকে যে প্রেমপত্র লিখিলেন, তাহা এই,—

'তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি।
ণিগ্‌ঘিণ তবই বলীঅং তুহ হুত্তমণোরহাইং অঙ্গাইং।'

'নিষ্ঠুর! তোমার হৃদয় কিরূপ জানি না, কিন্তু তোমার সহিত সঙ্গমোৎসুক আমার এই দেহকে কন্দর্প দিবারাত্রি সন্তপ্ত করিতেছে।' এখানে দেখিতেছি, 'লজ্জা, সংকোচ, সম্ভ্রম নারীজাতির সম্পত্তি' নয়, পুরুষেরই সম্পত্তি। না জানি আমাদের পূর্বকথিত দিঙ্নাগাচার্য মহাশয় ইহার কতই নিন্দা করিয়াছিলেন।

☐ *প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি*, (১৯৩৪) পৃ. ৪৮-৯৭

কবিতা ও কবি

স্বর্ণকুমারী দেবী

জীবের যেমন প্রাণ কবিতার তেমনি ভাব, ভাবময় কবিতাই কবিতা—এ কথা বোধ করি কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই যে সর্ববাদীসম্মত কবিতার প্রাণ স্বরূপ ভাব, ইহা জিনিসটা কি? সংসারে এমন কি বস্তু আছে বা কথা আছে যাহা দেখিলে বা শুনিলে আমাদের মনে কোনো না কোনোরূপ ভাবের উদয় না হয়? যখন একটা কুকুর আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে, তাহাতেও কি একটা ভাব নাই? কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে তো আর কবিতা বলা যায় না। ঈশ্বর গুপ্তের 'পাঁটা' পড়িয়া কেহ তাহার ভোটকাগন্ধে মুগ্ধ হইবেন—কেহ বা নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কিন্তু তাহা কি কবিতা? না এই ভোটকা গন্ধই কবিতার ভাব?

না তাহা নহে। যে ভাব মধুর, সুন্দর, আদর্শ স্বরূপ, যে ভাব দ্বারা প্রকৃতির প্রাণের সহিত আমাদের প্রাণের, সসীমের সহিত অসীমের মিলন লাভ ঘটে, অন্তত সেই মিলন পথে আমাদের লইয়া যাইতে যে ভাবের চেষ্টা—তাহাই কবিতার ভাব। যে কবিতায় এই রূপ ভাবের যত আধিক্য সেই কবিতাই তত শ্রেষ্ঠ।

বায়রন অসামান্য প্রতিভাশালী ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার অন্তরদৃষ্টির তীক্ষ্ণতার অভাব নাই, তথাপি তিনি শেলি হইতে নিম্নদরের কবি—কেননা তাঁহার কবিতা প্রাণময়—শেলির আত্মাময়।

বায়রন সুনিপুণ চিত্রকর, সংসারে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই জ্বলন্ত ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন; বায়রন সংসারের কঠোর সমালোচক। সমালোচনার দৃষ্টিতে তিনি সংসার খুঁটিনাটি করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সংসারের প্রাণ ভেদ হইয়াছে, তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেখানে তিনি রত্ন দেখিবার আশা করিয়াছিলেন সেইস্থান জঞ্জালপূর্ণ দেখিয়াছেন, সংসারে পুণ্যের নামে পাপ, প্রেমের নামে লালসা, মঙ্গলের নামে অমঙ্গলের ছড়াছড়ি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, তিনি সংসারের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু সত্য—যাহা কিছু মঙ্গল, তাহার প্রতিও বিশ্বাস হারাইয়াছেন—সংসারকে কেবল ঘৃণার ভ্রূকুটিতে দেখিয়াছেন।

এমন কি সংসারের চপলতার মধ্যে তিনি যখন প্রেমের অপার্থিব ভাব কল্পনাও করিয়াছেন,—কল্পনা করিতে করিতেই তিনি চমকিয়া উঠিয়াছেন—সে কল্পনা যে তাঁহার কল্পনা মাত্র তাহা বুঝিয়া পরক্ষণেই বলিতেছেন—'তাহা এখানে কোথা।'

Yes, love indeed is light from heaven
A spark of that immortal fire,
With angels shared by Allah given
To lift from earth our low desire.
Devotion wafts the mind above
But heaven itself descends in love.
A feeling from the Godhead caught,
To wear from self each sordid thought,
A ray of Him who formed the whole,
A glory circling round the soul!
I grant my love imperfect, all
That mortals by the name miscall.

প্রেম কত উচ্চ বস্তু তাহা তিনি জানেন—কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এ-পৃথিবীতে তাহা পাওয়া যায় না।

কিন্তু শেলির দৃষ্টি আর একরূপ। তিনি সংসারের অতীত হইয়া সংসার দেখিয়াছেন, অসীমতার মধ্য দিয়া সীমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তিনি সংসারের অত্যাচারে, পাপে তাপে মর্মে মর্মে প্রপীড়িত, অথচ তাহাতে নিরাশ হইয়া পড়েন নাই, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস কিছু মাত্র টলে নাই, কেননা তিনি তাঁহার দিব্য চক্ষে, মিথ্যার মধ্যে সত্য, স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম, প্রাণের মধ্যে আত্মা সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন। মনুষ্য মাত্রেতেই পূর্ণ আত্মার প্রসাদ ব্যাপ্ত, কালে ইহা হইতে মনুষ্য পূর্ণতা লাভ করিবে—এই দৃঢ় পবিত্র বিশ্বাসে তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ হইয়াছে।

বায়রনের দৃষ্টি জগতের সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে—এবং এই জগদতীত রাজ্যের সহিত জগতের যে সূক্ষ্ম বন্ধন তাহা তিনি দেখিয়াছেন। সুতরাং বায়রনের কবিতা এই স্থূল জগতের, শেলির সূক্ষ্ম জগতের; বায়রন ভাবকেও শরীর দিয়া মর করিয়াছেন—শেলি শরীরকেও ভাব দিয়া অমর করিয়াছেন। দুজনেরই ক্ষমতা অসীম, অথচ দুজনের কবিতায় আকাশ পাতাল প্রভেদ।

বায়রন কোথাও এরূপ ভাবের কথা বলিতে পারেন নাই—

Sprit of Nature! thou
Life of interminable multitudes:
Soul of those mighty spheres;
Whose changeless paths through heaven's deep silence lie;
Soul of that smallest being
The dwelling of whose life
Is one faint April sun-gleam;—

Man, like these passive things,
Thy will unconsciously fulfilleth :
Like theirs, his age of endless peace,
Which time is fast maturing,
Will swiftly, surely, come;
And the unbounded frame which then pervadest
Will be without a flaw
Marring its perfect symmetry.

কবির হৃদয় নিহিত এই যে ভাব ইহা আলোকের ন্যায় নিজেও উজ্জ্বল রূপে বিরাজ করে—এবং নিজের সংসর্গে যাহাদের পায় তাহাদেরও উজ্জ্বল করিয়া তোলে। আলোক যেমন ইথারের আন্দোলন, জগতের সহিত অন্তরের মিলন-জনিত কবি হৃদয়ের যে আন্দোলন তাহাই তাঁহার কবিতার ভাব। ইথারের আন্দোলন যে স্থলে যতই ঘন ঘন, আলোকও যেমন সেই স্থলে ততই বহুদূরব্যাপী এবং উজ্জ্বল—সেইরূপ বিশ্বসংসারের সহিত নিজের যেখানে যতই ঘনিষ্ঠ মিলন সেইখানেই এই ভাবের তত গভীরতা। সুতরাং ছন্দেবন্ধে কথা সাজাইতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, কবিতা একটি অতীন্দ্রিয় শক্তি,—যাঁহার এই শক্তি যত অধিক তিনিই তত উচ্চ কবি, তিনিই তত অধিক পরিমাণে জগতের অন্তর নিহিত ভাব চয়ন করিয়া—জগতের স্থায়ী উপকার করিতে সক্ষম। এই জন্যই মহাকাব্য কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই হোমর হইতে বাল্মীকি বহু উচ্চে দণ্ডায়মান, এই জন্যই বায়রন শেলির নিকট দাঁড়াইতে অক্ষম—আর এই জন্যই আজকাল বাংলায় কবিতার ছড়াছড়িতেও কবি এবং কবিতা উভয়ই বিরল।

☐ *ভারতী ও বালক*, ভাদ্র ১২৯৫, পৃ. ২৫৫-৫৭

ধর্ম ও আর্ট

বিপিনচন্দ্র পাল

সজীব আর্টের ভিত্তি সহজ মানব-প্রকৃতি

সজীব সাহিত্য মাত্রেই গতানুগতিক ধর্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, সহজ মানবপ্রকৃতির উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনের কথা লোকে ভুলিয়া যায়; নতুবা যে রামায়ণ মহাভারতের উপরে আমাদের আধুনিক সনাতন আদর্শের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, তাহার মধ্যেই কি এই গতানুগতিক ধর্মের ঐকান্তিক আনুগত্য দেখিতে পাই? মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মে কোন্ বর্ণাশ্রমধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে? মহাবীর কর্ণের জন্মকাহিনীই বা কোন্ সনাতনী নীতির প্রচার করিয়াছে? অথচ কুন্তীর নাম না লইয়া প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিলে সে দিনটা ভালো যায় না। অতিপ্রাকৃতের আবরণ দিয়া এগুলিকে যতই ঢাকিয়া রাখিতে চাই না কেন, সমুদায় শ্রুতি স্মৃতি রচিত ধর্মাধর্মের বিচারকে অতিক্রম করিয়া, এই সকল পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর হইতে সর্বজনীন ও সহজ মানবধর্মটি ফুটিয়া বাহির হয়।

এই সহজ বস্তুটি আমরা হারাইয়াছি। পুঞ্জীকৃত শাস্ত্রবিধির চাপে পড়িয়া আমাদের সহজ মানবপ্রকৃতিটি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। পরাশরে বা কুন্তীতে ইহা হয় নাই। এই জন্যই তাঁহাদের যাহাতে অধর্ম হয় নাই, আমাদের তাহাতে পাপ স্পর্শ করিতে পারে। পরাশরের যে অধিকার ছিল, আমাদের তাহা নাই। তাঁহাদের বৃহত্তর মনুষ্যত্বের ওজনে আমাদের ক্ষুদ্রতর জীবনের ধর্মাধর্মের বিচার হয় না। এ সকল কথা বুঝা যায়। এ সকল কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। তাঁহাদের জীবন সহজ, স্বাভাবিক ছিল। আমরা শত কৃত্রিমতার জালে আমাদের জীবনকে জড়াইয়াছি। এই কৃত্রিমতাও বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই। জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন আত্মরক্ষার প্রেরণা বলবতী হইয়া উঠে, তখন সে ঐ অবস্থার সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিতে যাইয়া, বহুবিধ ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপেই জীবের ক্রমবিকাশ-ধারায়, তার জীবনের জটিলতা ও এই জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে তার কৃত্রিমতাও বাড়িয়া যায়। সমাজ জীবনেও ইহা ঘটিয়া থাকে। সমাজ আত্মরক্ষার জন্য বহুবিধ কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। সভ্য সমাজের বহুবিধ রীতিনীতি, আচার বিচার, বিধি নিষেধ এইভাবেই, এই প্রয়োজনেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজজীবনে প্রচুর কৃত্রিমতা আছে। এ সকল কৃত্রিমতা সমাজ বিকাশের অঙ্গ। এ সকল বিধি বন্ধন যতই কৃত্রিম হউক না কেন, তাদের কোনো প্রয়োজন বা

উপকারিতা নাই, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু জীবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাহা গড়িয়া উঠে, সেই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহা আপনি—আপনার প্রয়োজন সাধন করিয়া—ক্রমে ঝরিয়াও পড়ে। না পড়িলে নূতন জীবনের নূতন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এককালে যাহা গতির সহায় ছিল, তাহাই ক্রমে গতির ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্য এসকল কৃত্রিম বিধিবন্ধনের হাতে চিরদিনের জন্য জীবনের নিয়তি বা সমাজের গতির ভার অর্পণ করা যায় না।

এইরূপ কৃত্রিমতার দ্বারা সত্য ধর্মও গড়ে না, সজীব আর্টও ফুটিয়া উঠে না। এই কৃত্রিমতার হাত হইতে ধর্মজীবন ও ধর্মসাধনকে রক্ষা করিবার জন্যই যুগে যুগে যুগধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই জন্য যুগে যুগে সেই যুগের যুগসাহিত্য পুরাতনের বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া, সহজ মানব-প্রকৃতি ও অকৃত্রিম মানব-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া, নূতন নূতন রসমূর্তির সৃষ্টি করিয়া, সমাজ-বিকাশের গতিবেগে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে সামাজিক বিধি-নিষেধও ছিল, বহুবিধ আচার-বিচারও ছিল, এসকলের আশ্রয়ে একটা বৈধ-ধর্মও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু যাহাকে সনাতন ধর্মরূপে বরণ করিয়াছিল, এসকল বিধি-নিষেধের উপরে একান্ত ভাবে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

লৌকিক ধর্ম ও সনাতন ধর্ম

এসকল বিধিনিষেধ নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত ছিল। জীবকে তার সত্যকার স্বভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করাই এসকল শাসনসংযমের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। আপনার স্বভাবকে যতক্ষণ মানুষ সত্যভাবে পরিপূর্ণ রূপে না পাইয়াছে, ততক্ষণ তার সত্য ধর্ম হয় না; হিন্দু সাধনা ইহা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিল। লৌকিক ধর্ম এই সত্য ধর্মের পূর্ববৃত্ত সাধন-রূপেই গৃহীত হইয়াছিল। এই লৌকিক ধর্মাধর্মের বিচার ধর্ম জীবনের গোড়ার কথা, শেষের কথা নহে। বালিকারা যেমন পুতুল দিয়া আপনার কল্পিত সংসার পাতিয়া খেলা করে, অথচ এই খেলার ভিতর দিয়াই পরজীবনের সত্যকার সংসার ধর্ম সাধন করিবার সংকেত ও অভ্যাস শিক্ষা করে; এই লৌকিক, বেদ স্মৃতি সদাচার সম্মত ধর্মের সাধন করিয়াও হিন্দু সেইরূপ তার নিত্য সনাতন ধর্মের বাহিরের সংকেত লাভ করে। লৌকিক ধর্ম তন্ত্রমন্ত্রের ধর্ম, বেদ স্মৃতির ধর্ম। কিন্তু হিন্দুর সত্য ধর্মবস্তু তন্ত্রেও ছিল না, বেদেও ছিল না, পুরাণেও ছিল না; সে ধর্ম ছিল সহজ, সতেজ, সরল মানব প্রকৃতির মূলে।

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

—ইহাই সনাতন ধর্মের কথা। ইহাকেই গীতায় স্বধর্ম বলিয়াছেন। এই ধর্মকে পাইয়াই শ্রুতি নিজ হাতে আপনার সকল প্রামাণ্য মর্যাদার তিলাঞ্জলি দিয়া, ষড়ঙ্গ ঋগ্বেদাদিকে অপরা বিদ্যা এবং যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে পাওয়া যায়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বা পরা বিদ্যা

বলিয়াছেন। এই অক্ষর পুরুষ শ্রুতি স্মৃতিতে, ক্রিয়া-কলাপে, আচারে বিচারে নাই। আছেন কেবল জীবের প্রকৃতির মধ্যে। এই গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ, পুরাণ পুরুষকে জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া, আপনার আত্মার মধ্যেই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সনাতন ধর্মতত্ত্ব জন্য বস্তু নহে, যাগযজ্ঞাদি কোনো ক্রিয়ার দ্বারা ইহাকে উৎপাদন করা যায় না। কোনো সংযম সাধনের দ্বারাও এ-বস্তুর সৃষ্টি হয় না। এই ধর্মবস্তু নিত্যসিদ্ধ। অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন নিত্যসিদ্ধ—যেখানে আগুন আপনার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইখানেই এই দাহিকাশক্তি বিদ্যমান থাকে; জলের তারল্য ও শৈত্য যেমন নিত্যসিদ্ধ; বায়ুর গতি যেমন নিত্যসিদ্ধ জীবের ধর্মও সেইরূপই নিত্যসিদ্ধ। মহাভারতে এই ধর্মকেই জীবের একমাত্র সুহৃৎ বলিয়াছেন—নিধনেও ইহা জীবের অনুগমন করে। এই ধর্মই সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। এই স্ব-ধর্মে জীবের মৃত্যুও শ্রেয়; কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। সকল শ্রুতি-স্মৃতি যাঁহাকে ধর্মাবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সকল জীবের প্রকৃতির মূলে, ঐ প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া তার নিয়তি ও গতি রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইজন্য জীবের প্রকৃতির মধ্যেই সকল শাস্ত্রের চাবি রহিয়াছে। ঐ প্রকৃতির অভিধানের দ্বারাই সকল শাস্ত্রসাহিত্যের অর্থ করিতে হয়। এই জন্য হিন্দু যতই শাস্ত্র অনুগত হউক না কেন, মানুষ সর্বদাই যে শাস্ত্র অপেক্ষা বড় হইয়া আছে একথা কখনও ভুলে নাই। শাস্ত্র অপেক্ষা গুরু বড়। আর শাস্ত্র-গুরু অপেক্ষা স্বানুভূতি হীন নহে। স্বানুভূতির সঙ্গে যতক্ষণ না মিলিয়াছে, ততক্ষণ শাস্ত্রোপদেশ বা গুরুবাক্য কিছুই প্রামাণ্য হয় না।

প্রকৃতির প্রতিকূলে বৈরাগ্যাদি অভ্যাস

ধর্মের তত্ত্ব জীবের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে বলিয়াই, হিন্দু সাধুসন্তেরা জীবের পাপ দেখিয়া কারুণ্যে গলিয়া যান বটে, কিন্তু পাপ দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়েন না। এইজন্য হিন্দুধর্ম কোনো দিন নরকের আগুন জ্বালাইয়া বিধর্মীকে বা অধর্মীকে পুড়াইয়া মারে নাই। শিশু হাঁটিতে যাইয়া পদে পদে পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, অভিজ্ঞ পিতামাতা যেমন ভীত হন না; এইরূপে পড়িতে পড়িতেই ক্রমে সে দাঁড়াইতে শিখিবে, হাঁটিতে পারিবে, ইহা জানিয়া তাঁহারা স্থির ও নিশ্চিন্ত হইয়া রহেন: আত্মদর্শী মহাজনেরা জীবের পাপাচরণে সেইরূপ স্থির ও নিশ্চিন্ত রহেন। এই গর্বেই, বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, জীব ক্রমে সজ্ঞানে আপনার শুদ্ধতত্ত্ব প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, ইহা জানিয়া তাঁহারা কদাপি জীবের এই প্রকৃতিকে অযথা নিগ্রহ করেন না।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?

বলিয়া, তাঁহারা সর্ববিধ পাপ ও অহিতাচারকে উদার চক্ষে দর্শন করেন। বরঞ্চ ভিতরে, প্রকৃতির মধ্যে যার পিপাসা আছে, বাহিরে তার সংযম-সাধনকে মিথ্যাচার বলিয়া বর্জন করিতেই বলেন। এমন কি প্রকৃতির প্রতিকূলে বৈরাগ্যাদি অভ্যাসকে তাঁহারা অধর্ম বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন। এরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে অজ্ঞ লোকে কেবল নিজেরাই খামাকা ক্লেশ পায় যে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ পরম পুরুষকে ক্লিষ্ট করিয়া

থাকে বলিয়া, এ সকলের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই সত্য সনাতন ধর্মের হাতে জীবনের সকল কর্মের শাসনভার স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দিতে পারা যায়। কারণ রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য—বিশাল ও জটিল মানব জীবনের সকল বিভাগের সকল ধর্ম ও সকল কর্মকে পূর্ণ করিয়াই এই বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম আপনার সিদ্ধিলাভ করে। রাষ্ট্রকর্মাদি এই ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। অঙ্গের পূর্ণতা সাধন করিয়াই অঙ্গী সর্বথা আপনার সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক অঙ্গকে আপনার অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন করিয়াই অঙ্গী যুগপৎ তাহাদিগকেও সার্থক করে, আপনিও তাহাদের সাহায্যে সার্থকতা লাভ করে। অঙ্গকে পঙ্গু করিলে, অঙ্গী আপনি পঙ্গু হয়। অঙ্গকে পুষ্ট করিলে, অঙ্গী আপনি পুষ্টিলাভ করে। এই সনাতন ধর্মও সেইরূপ জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে আপন আপন অধিকারে স্বাধীন ও স্বরাট করিয়া, আপনি আপনাকে পূর্ণ ও সার্থক করে। সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে পূর্ণ করাই এই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। আর্ট ও মানবপ্রকৃতিকে সার্থক করিয়া ইহা আপনার সার্থকতা লাভ করে। এই ধর্ম আর্ট অপেক্ষা বড়। আর্ট জীবনের একাংশকে মাত্র পূর্ণ করে, এই ধর্ম সমগ্র জীবনকে পূর্ণ করে। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের পরস্পরের বিরোধ ঘটিলে, এই ধর্মই কেবল তার মীমাংসা করিতে পারে। লৌকিক ধর্মের সঙ্গে আর্টের বিবাদ বাধিলে, এই সনাতন ধর্মকেই সালিশি করিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দিতে হয়। এই ধর্ম আর্ট অপেক্ষা বড়, লোকে যাহাকে সচরাচর ধর্ম বলে, তাহা অপেক্ষাও বড়। এই ধর্মের হাতে আর্টের শাসন সংরক্ষণের ভার অর্পণ করিতে কেহ আপত্তি করিবে না।

লৌকিক ধর্ম এবং সাহিত্য ও আর্ট

লৌকিক ধর্মের বা নীতির সঙ্গে সময়ে সময়ে সাহিত্যের ও আর্টের বিরোধ ঘটিতে পারে; কিন্তু এই সনাতন ধর্মের সঙ্গে তার কখনও বিরোধ সম্ভবে না। কারণ যে মানব প্রকৃতিকে এই ধর্ম সার্থক ও পূর্ণ করে, সেই মানব প্রকৃতির অন্তঃপ্রয়োজনেই সাহিত্যের এবং আর্টের সৃষ্টি হয়। যেখানে সাহিত্য এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যেখানে ইহা বর্তমান অনুভূতিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল পুরাতন শ্রুতিস্মৃতিকে আশ্রয় করিতে চাহে, সেইখানে ইহা কৃত্রিম, অলীক, অসার বস্তুতন্ত্রতাহীন ও শূন্যগর্ভ শব্দাড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠে।

আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহার বহুল প্রমাণ পড়িয়া আছে। প্রতি বৎসর বাংলা মুদ্রাযন্ত্র হইতে রাশি রাশি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের *ব্যাখ্যান*, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও উপদেশাদি, পরমহংস রামকৃষ্ণের *কথামৃত* এবং আচার্য বিজয়কৃষ্ণের *ব্রহ্মাপূজা, যোগসাধন, আত্মজীবন-চরিত, আশাবতীর উপাখ্যান* এবং *বক্তৃতা ও উপদেশ*—ছাড়া সত্য ও জীবন্ত ধর্ম-কথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বেশি আছে কি না সন্দেহ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধ্যে 'এক বঙ্কিমচন্দ্রের *ধর্মতত্ত্ব*ই বোধ হয়, সমগ্র মানবপ্রকৃতির উপরে ধর্মের আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ধর্মকথা প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে ফুটিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্বও' এক প্রকারের অনুভূতি-প্রসূত। তবে সাধকের অনুভূতি ও মনীষীর অনুভূতির মধ্যে তারতম্য আছে, সন্দেহ নাই। ধর্মজীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা হইতে সাধকের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। ঐ অভিজ্ঞতার বহির্লক্ষণের আশ্রয়ে, বৈজ্ঞানিক কল্পনাবলে মনীষীর অনুভূতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইংরেজিতে সাধকের অনুভূতি religious experience-এর ফল, আর মনীষীর অনুভূতিকে scientific imagination-এর ফল বলিতে পারা যায়; ইহাদের মধ্যে এই প্রভেদ আছে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ধর্মকথা আর বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব, এই প্রভেদ সত্ত্বেও, তাঁহাদের নিজস্ব বস্তু। এই জন্য এ সকল গ্রন্থে শব্দ সত্যকে, ভাষা ভাবকে, কল্পনা বস্তুকে ছাড়াইয়া যায় নাই। এ সকল পুস্তকে শ্রুতিস্মৃতির প্রামাণ্য লেখকদিগের নিদারুণ দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই। এসকলে অপূর্ণতা থাকিতে পারে, কিন্তু অসত্য নাই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

আধুনিক বাংলা কাব্যেও যেখানে কবিকল্পনা প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে গড়িয়াছে, সেইখানে যুগপৎ সত্য ও সৌন্দর্য ফুটিয়াছে, সেখানে শব্দ অর্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। শব্দ ও অর্থ মিলিয়া সত্য জীবন্ত রসমূর্তি সকল গড়িয়া তুলিয়াছে। আর যেখানে কবিকল্পনা শ্রুতিস্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া অপ্রত্যক্ষের সন্ধানে গিয়াছে, সেইখানে শব্দ অর্থকে, ভাষা ভাবকে, ঝঙ্কার রসকে অভিভূত করিয়া একটা অলীক সৃষ্টি রচনা করিয়াছে। মাইকেলের *মেঘনাদবধে* একটা সত্য অনুভূতির প্রমাণ পাই। উপাখ্যানভাগ মাত্র কবি রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে-সকল চিত্র ও রস ফুটাইয়াছেন, তাহা তাঁর নিজের, রামায়ণের নহে। এই মহাকাব্যে শব্দের ঝংকারে কবিকল্পনার সত্যকে আচ্ছন্ন করে নাই। কিন্তু *মেঘনাদবধে* যে বস্তুতন্ত্রতা আছে, *ব্রজাঙ্গনা*-য় তাহা নাই। এই জন্য *ব্রজাঙ্গনা* শব্দের লালিত্য ও ছন্দের মাধুর্য দিয়া অনুভূতির দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। হেমচন্দ্রের *কবিতাবলী*-তে এবং নবীনচন্দ্রের *অবকাশরঞ্জিনী*-তে কোনো গভীর বা জটিল রস না ফুটিলেও, যতটুকু রস আছে, তাহা সত্য ও বস্তুতন্ত্র, কবিগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ। এইজন্য এই দুইখানি গীতি-কাব্যে শব্দে ও অর্থে, সত্যে ও কল্পনাতে একটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে। রঙ্গলালের *পদ্মিনীর উপাখ্যানে* এবং নীবনচন্দ্রের *পলাশীর যুদ্ধে*-ও একটা সত্য সজীব সতেজ রস ফুটিয়াছে। আধুনিক কালের শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি সে সময়ে মর্মে মর্মে যে বেদনা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় জীবনে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণের ভিতরে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই প্রেরণায় রঙ্গলালের *পদ্মিনীর উপাখ্যান* এবং নবীনচন্দ্রের *পলাশীর যুদ্ধ* রচিত হয়। এই দুইখানি কাব্যের মধ্যে একটা সতেজ অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। এইজন্য ইহাদের ভাষা ও ভাবের, শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটা সঙ্গতি রহিয়াছে, কোথাও বিশেষ সত্যাভাষ বা রসাভাস নাই। কিন্তু নবীনচন্দ্রের *কুরুক্ষেত্র* ও *রৈবতক* একটা সাময়িক, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ামুখে রচিত হয়। মূলে রাষ্ট্রীয় জীবনের হীনতা-বোধই এই প্রতিক্রিয়াতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। ইংরেজের স্পর্ধা বাঙালির আত্মসম্মান-বোধ

পদে পদে আঘাত করিতেছিল। ইউরোপের সভ্যতাভিমান বাঙালির জাত্যভিমানকে চাগাইয়া তুলিতেছিল। ইউরোপের প্রতিপক্ষে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, বাঙালি তখন পুরাতনের স্মৃতির দ্বারা বর্তমানের দুর্গতিকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মূলত এইভাবেই পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেকার তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানের সূচনা হয়। ইহাতে তখনও নবীনে-প্রাচীনে সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস জাগে নাই। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই তখন এই সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তার চেষ্টা করিতেছিলেন। অপরে একটা কৃত্রিম ও কল্পিত 'সনাতনীর' প্রতিষ্ঠা করিয়া, বর্তমানের সহজ ও অনিবার্য বিকাশ-গতির একান্ত প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কৃত্রিম ও কল্পিত 'সনাতনীর' প্রেরণাতেই নবীনচন্দ্রের *কুরুক্ষেত্র* ও *রৈবতকের* জন্ম হয়। এই জন্যই এ দুখানি কাব্য তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কৃত্রিম কল্পিত ধর্মের চাপে পড়িয়া আর্ট পঙ্গু হইয়াছে। এই জন্য নীবনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন, উভয়ই অমন অলীক হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনের প্রতিকৃতিও ফুটে নাই, নূতনের অনুভূতিও জাগে নাই। ইহারা কোনো গভীর রস বা সর্বজনীন আদর্শ ফুটাইয়া সাহিত্যে অচ্যুত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে* উপন্যাসের অভাব নাই। বৎসর বৎসর বোধ হয় শতাধিক ছোটবড় উপন্যাস বাংলা মুদ্রাযন্ত্র হইতে নির্গত হইতেছে। কিন্তু বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা উপন্যাসের মধ্যে এক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ছাড়া, *স্বর্ণলতা* ব্যতীত আর একখানিও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। আর বর্তমানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়েই, অসাধারণ কবিকল্পনা-প্রসূত না হইয়াও, *স্বর্ণলতা* অমন অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অন্যদিকে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*, *দেবীচৌধুরাণী* ও *সীতারামের* আর গুণাগুণ যাহাই থাকুক না কেন, রসের বিচারে, কাব্যের হিসাবে, ইহারা লেখকের অলোকসামান্য প্রতিভার গৌরব রক্ষা করে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-ব্যাখ্যা

কিন্তু এই অপূর্ণতা সত্ত্বেও *আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী*-তে কিংবা *সীতারামে* যে ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে প্রাচীনের প্রতিধ্বনি হইলেও, কোনো দিকেই নিতান্ত কৃত্রিম নহে। এই গ্রন্থ তিনখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গীতা ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গীতাভাষ্য মায়াবাদী বৈদান্তিকের বা ভাববাদী বৈষ্ণবের গীতাব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি নহে। গীতাকেই কেবল তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, গীতাধর্মের প্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। ফলত বঙ্কিমচন্দ্র গীতার উপদেশকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান ইউরোপীয় সাধনার অনুশীলন ধর্মই প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতের গতানুগতিক সনাতনীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই, আধুনিক ইউরোপের অন্ধ অনুকরণও করিতে যান নাই। কিন্তু আধুনিক সাধনার শ্রেষ্ঠতম ভাব ও আদর্শের সঙ্গে,

* প্রবন্ধ রচনার কাল ১৩৩২ সাল

ভারতের প্রাচীন সাধনার নিগূঢ়তম প্রেরণার সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিয়া, আমাদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া বর্তমান হিন্দুসাধনা ও হিন্দু চরিত্রকে বিশ্ব-সাধনার ও বিশ্ব-মানবের অঙ্গীভূত করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁর *কৃষ্ণচরিত্রে, গীতাভাষ্যে* এবং *অনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী* ও *সীতারাম* এই তিনখানি উপন্যাসে তিনি এই সমন্বয় সূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য তাঁর নিষ্কাম কর্ম প্রাচীনেরা গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মকে যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিষ্কাম কর্ম ইউরোপের নিরীশ্বর হিতবাদ বা হিউম্যানিটি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাকে ভগবদভক্তি প্রেরিত লোক-সেবা বা লোকশ্রেয় বলা যাইতে পারে। এই সমন্বয় করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তিনি কেবল পুরাতন পৌরাণিকী কিংবদন্তীর অবতার নহেন, কিন্তু আধুনিক আকাঙ্ক্ষার সুপারম্যান্ (superman) বা নরোত্তম। ঊনবিংশ খ্রিস্টশতাব্দীর উদার মতবাদ 'Ecco Homo' বলিয়া যে খ্রিস্টাবতারকে দেখাইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই উদার মতবাদের আশ্রয়েই আমাদিগের নিকটে কৃষ্ণাবতারকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র এই প্রেরণা প্রাপ্ত হন নাই। *অবকাশরঞ্জিনী*তে ও *পলাশীর যুদ্ধে* তিনি আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। *কুরুক্ষেত্রে* ও *রৈবতকে* পরধর্মের অনুধাবন করিয়াছেন। এইজন্য তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিক অবতার নহেন, আধুনিক সুপারম্যানও নহেন, কিন্তু হিন্দু অবতারের শঙ্খচক্র গদাপদ্ম রঞ্জিত ইউরোপের প্রিন্স বিস্‌মার্ক বা কার্ডিন্যাল রিশেলু মাত্র।

প্রাচীনে ও আধুনিকে বিরোধ

আমাদের বহুতর আধুনিক সৃষ্টিই এইরূপ কৃত্রিম কল্পিত, না হিন্দু না ইউরোপীয় হইয়াছে। কেবল সাহিত্যে বা আর্টে নয়, জীবনের প্রায় সকল বিভাগেই, এই প্রাচীনের প্রেতাত্মা আমাদের উপরে চাপিয়া আমাদিগকে পথহারা করিয়া তুলিতেছে। প্রাচীনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে এই গতানুগতিকতায় অতটা অনিষ্ট করিতে পারিত না। আমরা এখন যাহাকে প্রাচীন বলি আমাদের পিতৃপিতামহেরা তাহাকেই একান্তভাবে অবলম্বন করিয়া চলিতেন। সেই প্রাচীন তাঁহাদের নিকটে সত্য ছিল। সেই প্রাচীনের সঙ্গে তাঁহাদের একটা সত্য ও সহজ প্রাণগত যোগ ছিল। এই সহজ যোগ ও প্রাণগত সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই তাঁরা নিঃসঙ্কোচে প্রাচীনকে নিজেদের মনোমতো করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহারা জাত মানিতেন। একটা পুরাগত সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া জাতিধর্ম বিচারকে তাঁহারা বিনা প্রশ্নে ও বিনা বিচারে মানিয়া চলিতেন। মানুষ যেমন কেহ লম্বা হয় কেহ বা খাটো হয়; কেহ গৌর হয় কেহ বা শ্যামবর্ণ বা কালো হয়; ব্রাহ্মণ শূদ্রাদিও সেইরূপ একটা স্বাভাবিক জন্মগত ভেদ, এই ভাবেই তাঁহারা জাতিভেদকে দেখিতেন। এইজন্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ বলিয়া একটা বিশেষ অভিমান ছিল না শূদ্রের শূদ্র বলিয়া একটা বিশেষ ক্ষোভও হইত না। তাঁহারা জাত মানিতেন বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে সমাজদ্রোহী জাত্যভিমান ছিল না; আমরা জাত মানি না বলিয়াই আমাদের জাতের অভিমানটা বেজায় বাড়িয়া উঠিতেছে। এইরূপে আমাদের জীবনের প্রত্যেক

বিভাগে একটা সাংঘাতিক কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের ধর্ম গতানুগতিক, আচার মৌখিক, নীতিও অস্বাভাবিক কর্ম কাপট্যাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাব বস্তুকে আমরা হারাইয়াছি। এই কৃত্রিম কল্পিত অস্বাভাবিকতাকেই ধর্মের সিংহাসনে বসাইতেছি। ধর্মের নামে এই কৃত্রিমতা ও কল্পনার হাতে সাহিত্যের বা আর্টের শাসনভার অর্পণ করা যায় কি?

কালিদাসের রস সৃষ্টি

মানবপ্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য ও আর্ট সর্বদা আপনার অমর সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে। সহজ মানব ধর্মের মুক্ত স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়াই সাহিত্য সংসারকে অপূর্ব রূপরসে সাজাইয়া তোলে। সনাতনীর রুদ্ধজলে বদ্ধ হইয়া, কোনো সাহিত্য বা আর্ট আপনার সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। মহাকবি কালিদাস তো আমাদের মতন সমাজদ্রোহী ছিলেন না। কিন্তু শকুন্তলার অলোকসামান্য চিত্রটি তিনি কি সনাতন সমাজ-ধর্মের মুখ চাহিয়া আঁকিয়াছেন, না সহজ ও সর্বজনীন মানব-ধর্মের অনুসরণ করিয়া আঁকিয়াছেন? কালিদাসের সমসাময়িক হিন্দুসমাজে গান্ধর্ব বিবাহ ছিল না। গান্ধর্ব বিবাহ গোপন বিবাহ। ধর্মের প্রয়োজনে নহে, কামের প্রেরণাতেই গান্ধর্ব বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, শাস্ত্রে একথা বলে। ধর্মের প্রয়োজনে যে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, প্রজাসৃষ্টি তার লক্ষ্য, সমাজ তার সাক্ষী থাকে। কাম প্রণোদিত গান্ধর্ব বিবাহ সমাজের অতি শৈশবের কথা। সমাজের অতি শৈশবে গান্ধর্ব ও আসুর বিবাহ দুই প্রচলিত ছিল। তখন না ছিল শ্রুতি, না ছিল স্মৃতি; না ছিল বর্ণ, না ছিল আশ্রয়; ছিল কেবল সহজ, সতেজ, সরল মানব প্রকৃতি। তখন বিবাহ মাত্রেই হয় গান্ধর্ব না হয় আসুর বিবাহ ছিল। কালিদাসের বহু বহু যুগযুগান্ত পূর্বে আমাদের সমাজ সে শৈশবাবস্থা ছাড়াইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মানুষ আপনার প্রকৃতিকে ছাড়ায় নাই। এই প্রকৃতির প্রেরণাতেই দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন হইল। সমাজ এই মিলনের সাক্ষী রহিল না। শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের কন্যা বলিয়াই জানিয়াছিলেন। কণ্ব ব্রাহ্মণ, তিনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ বর্ণাশ্রমধর্ম-বিরুদ্ধ। সমাজ এ বিবাহকে বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। কিন্তু মানব প্রকৃতি ও মানব হৃদয় তো এই মানব কল্পিত সমাজ-ধর্মের বশ নহে। দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহজ প্রকৃতি আপনাদের অন্তঃপ্রেরণায় এই কল্পিত কৃত্রিম সমাজ-ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া, নিজেদের চরিতার্থতা সাধন করিল। দুষ্মন্ত গোপনে কণ্বের পালিতা কন্যাকে বিবাহ করিয়া সমাজদ্রোহী হইলেন। শকুন্তলাকে ক্ষত্রিয় কন্যা করিয়াও কবি দুষ্মন্তের সমাজদ্রোহিতার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। তাহাতে কেবল কণ্বের সমাজ-ধর্ম রক্ষার একটা পথ বাহির করিয়াছেন মাত্র। শকুন্তলা সমাজ-ধর্ম ভুলিয়াই দুষ্মন্তকে গোপনে আত্মদান করিলেন; সমাজ-ধর্ম ভুলিয়া তিনি আতিথ্য সৎকারও ভুলিয়া গেলেন। এই জন্য সমাজ-ধর্মের রক্ষক ব্রাহ্মণ দুর্বাসার রূপ ধারণ করিয়া ইহাকে অভিসম্পাত করিলেন। এই অভিসম্পাতেই দুষ্মন্তের স্মৃতিলোপ, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান ও উভয়ের বিরহ ঘটাইল। পরিণামে কবি অপূর্ব কৌশলে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুত্রের আশ্রয়ে, মানব-ধর্মের ও সমাজ-ধর্মের এই বিরোধ

ভঞ্জন করিলেন। কারণ, সমাজ-স্থিতি রক্ষাই সমাজ-ধর্মের মূল কথা। প্রজোৎপত্তির দ্বারা সমাজ স্থিতি ভঙ্গ নিবারিত হয়। সতেজ, শক্তিমান পুত্রোৎপাদন করিয়া সকল সমাজদ্রোহী দাম্পত্য বন্ধন ঐ দ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। শকুন্তলাতে আদিতে সহজ মানব ধর্মের মাহাত্ম্য, মধ্যে সমাজ ধর্মের প্রভুত্ব, আর পরিণামে ঐ সহজ মানব-ধর্মের ফলের এবং তাহারই উপরে, সমাজ ধর্মের ও মানব ধর্মের মিলন, সন্ধি ও সামঞ্জস্য দেখি। শকুন্তলা পড়িয়া মনে হয় যে আমাদের মধ্যে যেমন, কালিদাসের সমসাময়িক হিন্দু সমাজেও সেইরূপ, গতানুগতিক সনাতনীর প্রভাব সহজ মানবের প্রকৃতিগত ধর্মকে চাপিয়া মারিতেছিল। কালিদাস এই আত্মঘাতী সমাজ ধর্মের হাত হইতে সহজ মানব প্রকৃতিকে তাহার স্বধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই, দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহজ প্রেমের সরল অভিনয়ের সূত্রপাত করিলেন। মানব ধর্ম সার্থক হইল। পরে সমাজের শাসন দণ্ডের দ্বারা ইহার নির্যাতন করিলেন। কিন্তু পরিণামে ঐ সহজ ও স্বাভাবিক মানব ধর্মেরই জয় হইল। সমাজ রস বুঝে না, কিন্তু আপনার স্বার্থটি খুবই বুঝে। প্রজোৎপাদনে এই স্বার্থ সাধিত হইল। এইরূপ শ্রেষ্ঠতম ও মুখ্যতম সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক মানব-ধর্মের মিলন ঘটাইয়া, কালিদাস এই চিরন্তন সমাজ সমস্যার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিলেন। সমসাময়িক সনাতন প্রথার একান্ত আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিলে, কালিদাস কোনো দিন এই অপূর্ব রসচিত্রের সৃষ্টি করিতে পারিতেন না।

রস বস্তু অন্তরের বস্তু

ফলত এই রস বস্তু, অন্তরের বস্তু; আর সচরাচর আমরা যাহাকে ধর্ম বলিয়া থাকি, তাহা একটা বাহিরের বস্তু। কতকগুলি প্রচলিত মত, কতকগুলি অভ্যস্ত ও পুরাগত ক্রিয়াকলাপ, কতকগুলি গতানুগতিক আচার-বিচার লইয়াই এই ধর্ম গঠিত। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীনেরাও এই বেদ স্মৃতি সদাচারগত ধর্মের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পর্যন্ত এই ধর্মের সনাতনত্বের দাবি কেবলমাত্র লোকরঞ্জনের নিমিত্তই প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই ধর্ম সনাতন নহে, সনাতন হইতে পারে না; কারণ যুগে যুগে এ ধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। লোকে যাহাকে সদাচার বলে, ইউরোপীয়েরা যাহাকে মর‍্যালিটি (morality) বলেন, আধুনিক বাংলায় যাহাকে আমরা নীতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা নিত্য বস্তু নহে। এক যুগে যাহা সদাচার, অপর যুগে তাহা অনাচার। এক দেশে যাহা মর‍্যালিটি অপর দেশে তাহা দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত হয়। বৈদিক সমাজে বিধবার 'নিয়োগের' বিধান ছিল; এখন বেদের দোহাই দিয়াও এই সনাতন প্রথার প্রবর্তন বা সমর্থন করা যায় না। মনুর ক্ষেত্রজ সন্তানেরা এখন জারজ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে পর্যন্ত এ দেশের সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে দাসী পুত্রেরা পরিবারের অঙ্গীভূত ছিল, এখন ইহা বিগর্হিত হইয়াছে। অন্যদিকে এমন অনেক বিষয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যাহা এখন শনৈঃ শনৈঃ সমাজের শিষ্টজনেরা পর্যন্ত অকুণ্ঠাভরে অবলম্বন বা আচরণ করিতেছেন। যাঁহারা শাস্ত্রবিধির দোহাই দিয়া এখনও এ সকল অনিবার্য পরিবর্তনের প্রতিরোধ করিতে

বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের আন্তরিক ধর্মবুদ্ধিও এগুলিকে আর এখন পাপ চক্ষে দর্শন করে না। দেশভেদে, কালভেদে, সর্বত্র লৌকিক ধর্মের ও সামাজিক সদাচার বা সুনীতির এইরূপ পরিবর্তন নিয়ত ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় এই চঞ্চল ধর্মের বা নীতির হস্তে জীবনের অপরাপর বিভাগের নেতৃত্ব ভার একান্ত ভাবে অর্পণ করা যায় কি? এই নীতির দ্বারা রস সৃষ্টির বা আর্টের স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে চাপিয়া রাখাই কি সঙ্গত হয়?

ফলত এই রস স্ফূর্তি বা আর্ট যুগে যুগে লৌকিক ধর্মের ও নীতির বা মর‍্যালিটির আদর্শের পরিবর্তনে সর্বত্র বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। মানুষের চারিদিকে নৈসর্গিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মের ও নীতির আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। যেখানে মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া একই প্রকারের নৈসর্গিক ব্যবস্থানের মধ্যে বাস করে, কিংবা বহুদিন পর্যন্ত কোনো ভিন্ন পরিবেশে তাহার পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা না জন্মায়, সেখানেও কবি-প্রতিভা নিয়ত ঐ সকল পুরাতন দৃশ্য এবং সম্বন্ধের মধ্যে নব নব রূপ ও রস প্রত্যক্ষ করিয়া, নূতন নূতন রস মূর্তির প্রতিষ্ঠা করে এবং এই সকল রসমূর্তির সাহায্যে জনসাধারণের অনুভূতি ও কল্পনাকে নিত্য নব ভাবে জাগাইয়া, তাহাদের অন্তরে নব নব আদর্শ ফুটাইয়া তোলে। এই সকল ভাব ও আদর্শের প্রেরণায় সমাজের লোকের মতামত ও মতিগতি অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইয়া, সমাজের ধর্ম ও নীতি নব আকার ধারণ করে। দার্শনিকেরা বিচার করিয়া, তার্কিকেরা তর্কযুক্তির দ্বারা, রাজশক্তি আপনার প্রতাপের প্রভাবে ও সমাজপতি এবং পুরোহিতগণ ধর্ম ভয় জাগাইয়া বা সমাজের শাসনদণ্ড তুলিয়া যাহা করিতে পারেন না, কবি অলক্ষিতে তাহা সাধন করেন। কবির সৃষ্টি লোককে আনন্দ দান করে। রস রাজ্যে লোক এই আনন্দই খোঁজে। তাহারা কবি কল্পনা প্রসূত নব নব রসমূর্তি সকলকে অন্তরে সম্ভোগ করে, ইহাদের তত্ত্ববিচারে বা ধর্ম মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয় না।

কবিপ্রতিভা ও সমাজগতি

রসসৃষ্টির বা আর্টের সঙ্গে সমসাময়িক ধর্মের বা নীতির কোনো সম্বন্ধ যে থাকে না, তাহা নহে। বরঞ্চ সর্বত্র এই ধর্মের ও নীতির দ্বারা আর্টের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, ধার্মিকেরা আপনাদের আচরিত ধর্মে, অথবা নীতিবাদীরা আপনাদের বিধিনিষেধাদিতে যে বস্তু প্রত্যক্ষ করেন না, কবিপ্রতিভা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। ধার্মিক যখন মতবাদে আবদ্ধ, কবি তখন তত্ত্বসাক্ষাৎকারে কৃতার্থ হইয়া, এই মতবাদের মধ্যে প্রাণ ও রস সঞ্চার করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও আনন্দময় করিয়া তোলেন। মত বস্তু চঞ্চল, নিয়ত পরিবর্তনশীল। মত মাত্রেই স্বল্পবিস্তর অনুমানপ্রতিষ্ঠ। তত্ত্ব বস্তু নিত্য, প্রত্যক্ষ-প্রতিষ্ঠিত। এই নিত্য তত্ত্ব-বস্তুকে ঐ চঞ্চল মতবাদ দেশকালের পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। তত্ত্ব বস্তু জ্ঞান-বস্তু এবং আনন্দ-বস্তু। তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে নূতন সত্যের আলোকে পুরাতন ও পুরাগত মিথ্যা কল্পনা নষ্ট হয়। আর তত্ত্বের আনন্দের প্রেরণায় এই নূতন সত্যকে সমগ্র জীবন দিয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। কবি এই আনন্দময়ী রস মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, লোকের

চিত্তকে প্রথমে মুগ্ধ করেন। এই লোভেই তাহাদের অন্তরে এই রস-মূর্তিকে নিজেদের জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা জাগিয়া উঠে। কবির সৃষ্টিতে প্রথমে লোকে কেবল আনন্দই পায়। ইহার মধ্যে কেবল আনন্দই খোঁজে। এই আনন্দ পাইয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হয়। তখন এ-সকলের আশ্রয়ে অন্য কোনো জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। যখন সে জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তখন কবির কাজ অনেকটা ফুরাইয়াছে। তখন তাঁর প্রেরিত রস বস্তু সমাজ-প্রাণের শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। তখন সমাজগতি আপনার অন্তঃপ্রেরণায় এই রসের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরিবর্তনের হাওয়া তখন ছুটিয়াছে। নূতন আদর্শের বান তখন ডাকিয়াছে। সেই ডাকে রস-সৃষ্টির সহজ স্ফূর্তিকে কার্পণ্যোপহত স্থবির সামাজিকেরা সমাজস্থিতিভঙ্গ-নিবারণের জন্য 'সনাতনীর' নামে চাপিয়া রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ রস যে তাঁহাদের অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে এতাবৎকাল গোকুলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, এ জ্ঞান তাঁহাদের হয় নাই। যখন তাহাকে গলা টিপিয়া মারিতে পারিতেন, তখন তাঁহারা ঘুমাইয়াছিলেন। তখন তাহার কোমল মুখ দেখিয়া ইহারা নিজেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন তাহাকে কেবল সুখ-কল্পনা মাত্র বলিয়া সম্ভোগ করিয়াছিলেন। এ-বস্তু যে মিছরির ছুরি এ বোধ তখন ইহাদের জন্মে নাই। এখন সে বাড়িয়া উঠিয়াছে, আপনি আপনার রাজ্য অধিকার করিয়াছে, লোকের মতিগতি ফিরাইয়াছে, এখন ইহার গতিরোধ করে কে? এই নিষ্ফল প্রয়াসে কেবল বিকাশের গতি রুদ্ধ করিয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করে মাত্র।

হিন্দু সমাজে পরিবর্তন

আশ্চর্যের বিষয় এই যে হিন্দুর ধর্মে ও হিন্দুর সমাজে যে সকল ঘোরতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এমন আর কোনো ধর্মে ও কোনো সমাজে ঘটে নাই। অথচ আমাদের ইতিহাসে কোনো সাংঘাতিক বিপ্লবের কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপনিষদ বেদের দেববাদ ও যাগযজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দিলেন, অথচ যাজ্ঞিক ও ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে একটা মারামারি কাটাকাটি হইল না। হিন্দু প্রাচীন বেদোক্ত ধর্মের মধ্যে দুইটি শাখা গড়িয়া, একটির মধ্যে যাজ্ঞিকদিগের এবং অপরটির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীদের স্থান করিয়া দিল। ধর্মের দুই কাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইল; এক কর্মকাণ্ড, অপর জ্ঞানকাণ্ড। যাজ্ঞিকেরা যে দেবতার নামে যজ্ঞ করিতে হয়, তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করিলেন। ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিলেন। ব্রহ্মাকে আমলেই আনিলেন না। অথচ তাঁহাদের আর্যত্ব বা হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণত্ব বা ঋষিত্ব পর্যন্ত কেউ অস্বীকার করিল না। ব্রহ্মজ্ঞানীরা যজ্ঞ ও দেবতা সকলই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কেহ কেহ বা সত্য বলিয়া মানিয়াও ইহাদিগকে মুক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বর্জন করিলেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে জ্ঞান-দৃষ্টিতে ও সত্যের চক্ষে গোরু, হাতি, চণ্ডাল এবং কুক্কুরের সমান বলিয়া প্রচার করিলেন। অথচ কেহ ইহাদের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করিল না। সমাজ নিঃশব্দে, অলক্ষিতে কর্মকাণ্ডীদিগকে বুকে করিয়া ও জ্ঞানকাণ্ডীদিগকে মাথায় করিয়া লইল।

আধুনিক ইউরোপে যেমন বিবাহের পূর্বে যুবতীগণ বহু প্রণয়ী ও প্রণয়পিপাসুর সঙ্গে

বিবিধ প্রকারের প্রীতি ও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, প্রাচীন ভারতে, সনাতন বৈদিক যুগেও সেরূপ হইত; শ্রৌতসূত্রের ও গৃহ্যসূত্রের বহুবিধ মন্ত্রে তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাহ করিয়া নববধূকে ঘরে লইয়া যাইবার সময়, তাহার উপপতিকে বিনাশ করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইত। এখন এসকল মন্ত্রের কোনো সার্থকতা নাই। কিন্তু একদিন যে এগুলির একটা সত্য অর্থ ছিল, তাহার কি আবার সন্দেহ আছে? তারপর, রামায়ণ মহাভারতে কত ঘোরতর সামাজিক পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতাপ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত অথবা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, দ্রোণ ও কৃপ মহারথী হইতে পারিতেন না। সূর্যের সার্টিফিকেট লইয়াও কবিকল্পনা রাধেয়কে ক্ষত্রিয় করিতে পারিত না। মহাভারতে কত ভাঙাগড়ার প্রমাণ পাই, অথচ কোনো সাংঘাতিক সামাজিক বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। জীব যেমন আপনার জীবনের প্রয়োজনে, নূতন নূতন অবস্থায় পড়িয়া, আপনাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে, হিন্দুসমাজ যুগে যুগে তাহা করিয়াছে। জীবের গঠন-বিকাশে কোথায় পুরাতনের শেষ আর কোথায় নূতনের সূচনা, ইহা যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; হিন্দুর সমাজ-বিকাশেও তেমন কবে কোন্ সূত্রে কোন্ পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করা অসাধ্য। পরিবর্তন যে ঘটিয়াছে, পূর্বাপর পর্যবেক্ষণ করিয়া কেবল ইহাই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। হিন্দু চিরদিনই, নিঃশব্দে ও নিঃসংকোচে প্রাচীনকে বদলাইয়া প্রয়োজন সাধনের উপযোগী কবিয়া লইয়াছে।

রঘুনন্দনের নব্য স্মৃতি

মহাভারত ও রামায়ণের অতি পুরাতন কথা ছাড়িয়া, এই চারি পাঁচ শত বৎসরকাল মধ্যে আমাদের অপেক্ষাকৃত অধুনাতন বাঙালি হিন্দুসমাজে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে আমাদের সমাজে রঘুনন্দন কর্তৃক নব্যস্মৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রঘুনন্দন প্রাচীন শ্রুতিস্মৃতিকে এমনি ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন যে, রঘুনন্দনের পুত্র পিতৃব্যবস্থানুযায়ী উপনয়নসংস্কার লাভ করিলে পরে রঘুনাথ শিরোমণি নাকি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই নব্য স্মৃতির উপরেই আধুনিক বাঙালির 'সনাতনী' প্রতিষ্ঠিত। আমাদের স্থবির সামাজিকগণ যে 'সনাতনীর' দোহাই দিয়া মানবের সমাজ, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও ধর্মাধর্মবোধকে চাপিয়া রাখিতে চাহেন, তাহার সনাতনত্ব সাড়ে চারিশত বৎসরের অধিক বয়ক্রম দাবি করিতে পারে না। আর রঘুনন্দনের পরে, এই চারি-পাঁচশত বৎসরের মধ্যেই বাংলার হিন্দুসমাজে কত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই কালের মধ্যে কত ব্রাহ্মণ কত শূদ্র গুরুর নিকটে মন্ত্রদীক্ষা লইয়াছেন। কত তথাকথিত হীনজাতির লোকে কত নূতন নূতন সাধন ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া, কত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদিকে আশ্রয় দিয়াছেন। 'লোকের মধ্যে লোকাচার' মানিয়া চলিয়া, কত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-শূদ্র সদ্‌গুরুর সমাজে 'সদাচার' অবলম্বনে কত অন্ত্যজ জাতির অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ' দুইশ' বৎসরের মধ্যে বাঙালি হিন্দুসমাজে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যত অনাচারকে সমাজ নিঃশব্দে ও নিঃসংকোচে হজম করিয়া লইয়াছে, তার সন্ধান করিলে আমাদের 'সনাতনীর' প্রাচীনত্বের

মর্যাদা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য হয়।

আপনার পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও ব্যবস্থার সঙ্গে সন্ধি ও সঙ্গতি করিবার শক্তি ও নিপুণতাতেই জীবের জীবনী-শক্তির প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তি ও নিপুণতা যার আছে, সেই জীবই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে। ইহাতে সমাজের জীবনী শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। যে সমাজের এই শক্তি ও নিপুণতা নাই, তাহা ক্রমশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ এবং আমেরিকার ইন্ডিয়ান সমাজ ইহার অভাবে লোপ পাইতেছে। এই শক্তি ও নিপুণতা আছে বলিয়া হিন্দু শত সহস্র বৎসরের অশেষ প্রকারের ঘটনাবিপর্যয়ের মধ্যে আপনার বৈশিষ্ট্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, 'সনাতনীকে' প্রাণপণে রক্ষা করিয়া যে হিন্দু আজও বাঁচিয়া আছে, একথার সাক্ষী হিন্দুর ইতিহাস কোথাও দেয় না। যুগে যুগে হিন্দু আপনাকে যুগ-প্রয়োজন সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাঁচিয়া আছে, ইহাই সত্য।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষ

কি করিয়া প্রাচীনকে নূতনের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়, ইউরোপ এখনও ভালো করিয়া তার সংকেতটি শিক্ষা করে নাই। এই জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাইতে যাইয়া, ইউরোপ সর্বদা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। ইউরোপ দেহটাকে সর্বদা আত্মা অপেক্ষা বড় বলিয়া ভাবিয়াছে। তার পরকাল পর্যন্ত দেহাশ্রিত। দেহাত্মধ্যাস ভালো করিয়া নষ্ট হয় নাই বলিয়া ইউরোপ সমাজ জীবনের ও ধর্ম জীবনের বাহিরের ঠাট্‌টাকে লইয়া এত মারামারি কাটাকাটি করিয়াছে। পুরাতন ঠাট্‌টা গেলে পরিচিত প্রাণটাও গেল, রক্ষণশীলেরা এই ভয়ে সেই ঠাট্‌টাকে প্রাণপণে বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন। নূতন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত না হইলে, নূতন ভাব আদর্শ কিছুতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না, উন্নতিশীলেরা ইহা ভাবিয়া নূতন কাঠামোর স্থান করিবার জন্য সকলের আগে পুরাতন ঠাট্‌টাকে নিঃশেষে ভাঙিতে গিয়াছেন। এইরূপে ইউরোপে ভূয়ঃ ভূয়ঃ বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। হিন্দু দেহের প্রতি যত লক্ষ্য করিয়াছে, প্রাণের প্রতি ততোধিক লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, উপায় ও উপলক্ষকে উপেক্ষা করিতে হিন্দু ভীত হয় নাই। এইজন্য হিন্দুর সমাজে, হিন্দুর ধর্মে, হিন্দুর জীবনে ও হিন্দুর সাধনায়, যুগে যুগে অশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু সাংঘাতিক বিপ্লব প্রায় ঘটে নাই।

যতদিন হিন্দুর দৃষ্টি অন্তর্মুখী ছিল, আত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধা ছিল, অদ্বৈত-বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন হয় নাই, ততদিন হিন্দুর ধর্ম বা সমাজনীতি তার আর্ট বা রসসৃষ্টিকে চাপিয়া রাখিতে চাহে নাই। হিন্দু ব্রহ্মচর্যেরও মহিমা কীর্তন করিয়াছে, আবার আপনার সাধনাসৃষ্ট স্বর্গে বা ইন্দ্রলোকে মেনকা, উর্বশী প্রভৃতিকেও স্থান দিয়াছে। আর ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ পর্যন্ত সহজ শারীর ধর্ম বা মানব ধর্মকে নির্মূল বা অতিক্রম করেন নাই। ততদিন হিন্দুর ধর্মে এবং আর্টে কোনো বিরোধ বাধে নাই। ততদিন হিন্দুর ধর্মেও আর্ট ছিল, আর্টেও ধর্ম ছিল। কিন্তু ধর্মের আর্ট ধর্মকে মানিয়া চলিয়াছে, আর্টের ধর্ম আর্টকেই মানিয়া চলিয়াছে। কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে যায় নাই। হিন্দু জানিত যে ধর্মের যেমন একটা নিজস্ব ধর্ম আছে, একটা

বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য ধর্ম উপযোগী বিধি নিষেধাদি গড়িয়াছে; এই সকল বিশেষ বিধি-নিষেধ ও সংযম-সাধনাদিই সমাজ ধর্মের ও সাধন ধর্মের অঙ্গ। সেইরূপ আর্টের বা রসরাজ্যেরও একটা নিজস্ব ধর্ম আছে, একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে; সেই লক্ষ্য সাধনোপযোগী শাস্ত্রবিধি আর্ট আত্মপ্রয়োজনেই গড়িয়া তোলে। তাহাকে এ-সকল শাস্ত্রবিধির আনুগত্য অবলম্বন করিয়াই, আপনার সার্থকতালাভ করিতে হয়। এইরূপে জীবনের বিভিন্ন বিভাগের এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দু যুগপৎ সাধন ধর্মের শুদ্ধতা ও আচার বিচার এবং সংসার ধর্মের ভোগবিলাস, নীতির শাসন এবং আর্টের স্বাধীনতা উভয়ই রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। আর্টের সহজ, স্বাভাবিক রস স্ফূর্তি বা রসবিকাশে আমাদের খ্রিস্টীয় নীতিবাদ-সমাচ্ছন্ন কৃত্রিম ধর্মবুদ্ধি পদে পদে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহেরা সংস্কৃত বা বাংলা কাব্যের রসোদগার পাঠে কখনও ভ্রূকুঞ্চিত করিতেন না। এসকলে তাঁহাদের ধর্মে বা নীতিতে আঘাত করিত না। আর যতদিন না আমরা ইউরোপের আমদানি এই খ্রিস্টীয়ান্ নীতিবাদের বাহিরের সভ্যতা ভব্যতার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি, ততদিন আমাদের ধর্ম বা নীতি, স্বভাব ও রস সৃষ্টি, কিছুই সত্যোপেত ও সজীব হইবে না।

☐ *নারায়ণ*, ১৩২২

বিজ্ঞানে সাহিত্য

জগদীশচন্দ্র বসু

জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড় অনিয়মিত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিংবা কাঁদিতেছে। মৃদুস্পর্শ ও মৃদু আঘাত; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্লভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সংকোচ। আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ—সুখের পরিবর্তে দুঃখ—হাসির পরিবর্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবলমাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাস, কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। এইরূপ বহুবিধ ভিতর বাহিরের আঘাত-আবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তিবলে বহু বৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি।

জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞান সেবকের স্থান আছে? এই সাহিত্য-সম্মিলন বাঙালির মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্বত্র গভীরভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙালির যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোনো ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, বরং মনে হয় আমরা উহাকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সংকল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোনো সুন্দর অলংকার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া

ঈশ্বর বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদে প্রকাশিত আছে।

সদ্যোবধূরা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয়, পারলৌকিক উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রকার শিক্ষিত কতিপয় আধ্যাত্মিক সদ্যোবধূর সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

উচ্চ সদ্যোবধূ

দেবহূতি

শ্রীমদ্ভাগবতে কর্দম মুনির স্ত্রী দেবহূতি স্বামীর বনে গমন সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, 'আপনি প্রব্রজ্যার্থে গমন করিতেছেন। আমি কাহার নিকট জ্ঞান লাভ করিব? আমার জ্ঞানোপদেশ নিমিত্তে কাহাকেও রাখিতে আজ্ঞা হউক।

পরে দেবহূতির গর্ভে কপিলের জন্ম হয়। কপিল তপোবল দ্বারা 'নিরহংকার অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিশূন্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা' ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন। দেবহূতি পুত্রের নিকট আসিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করেন। কপিল বলেন, 'আমার মতে আত্মনিষ্ঠ যোগ পুরুষের নিঃশ্রেয়সের কারণ, কেননা তাহাতেই সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উপরতি হয়। চিত্তই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণ, চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন ও পরমেশ্বরে সংলগ্ন হইলে তাহার মুক্তি হয়। কপিলের উপদেশ জ্ঞানপ্রদ। তৃতীয় স্কন্ধে এই উপদেশ বাহুল্য রূপে লিখিত আছে।

শান্তা

শান্তার বিবাহ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত হয়। অন্তরউচ্চতা ও সৌন্দর্যে তিনি অতুল্য ছিলেন।

কেশনী

কেশনী সাগরকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও সত্যানুরাগে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

সতী

সতী শৈশবকালাবধি যোগাভ্যাস ও তপস্যা করিতেন। পতিনিন্দা শুনিয়া যোগবলে আপন দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অনসূয়া

অত্রিমুনির বনিতা অনসূয়া অনেক শাস্ত্র জানিতেন ও অন্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সীতার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, তাহা আরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত আছে।

কৌশল্যা

কৌশল্যা দশরথের দ্বারা রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত। 'সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার

তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিকের দেখা, একথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না! এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনসুরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনো মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি দাবি করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোনো অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে দিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া

যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্ত্যনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।

অদৃশ্য আলোক

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণ স্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙে রঞ্জিত আলোক-সমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটি রং তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই দৃশ্য-আলোকের সীমা পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্ত্যনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্মানির অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-ঊর্মিসঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোকের দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন, বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল। যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা এক দিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচবর্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎবর্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহুদূরে প্রেরিত হয়। ফলত দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষাও অধিক।

আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তকমাত্র আমাদের দৃশ্যেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডিটিই আমাদের দৃশ্য-রাজ্য। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই; সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে; তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রেকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেইজন্য রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদ-রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ-জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোনো সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেন্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাতে দৃশ্যভাবে কিংবা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ-শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন। আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোনো সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদ-জীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোনো কল এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানত এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোনো অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোনো কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয় তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় তাহা কোনো প্রকারে ধরিতে ও মাপিতে পারা।

জীব যখন কোনো বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে। যদি কণ্ঠ থাকে তবে চিৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিংবা 'নাড়ার' উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোনো প্ররোচনায় কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাতত অসম্ভব কার্যে কোনো উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার যে একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এক-লিপি সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এই

সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মতো—অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য।

সে যাহা হউক, মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক—প্রথমত গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করানো, দ্বিতীয়ত গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞাপালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি। এইজন্য বিচিত্র প্রকারের চিম্‌টি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং অ্যাসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে, এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায় তাহার কোনো মূল্য নাই। ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

যদি গাছ লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই কথা তো দিবা-স্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র।• ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্মে পরিণত করিতে চাই তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আব্দার এবং ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছে না; কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতাসঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধ দ্বার ভাঙিয়া যায় তখনই প্রকৃতিদেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা

সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইতে তাহা হইলে অন্য দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সে-ই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে

ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তর্দৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোনো কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।

গাছের লেখা

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে; তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেন্ডের সহস্র ভাগের একভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদের কারিকর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এই দেশীয়।

এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে কোনো প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম 'বৃক্ষজীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া'। কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয়, সেটা যৌবনসুলভ অতি সাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

উপসংহার

আমি সম্মিলন-সভায় কি দেখিলাম, উপসংহার কালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্ধ অন্ধকারে বিশ্বকর্মার মূর্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর

তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানাপ্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি; কখনও শিল্পকলায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্মা বাঙালি চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের দেশের চিরকালের সংস্কার। দৈবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষ সৃজন করিতেও পারে এবং সংহার করিতেও পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা যে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাংলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোনো বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষদ সাধকদের সম্মুখে দেব-মন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাংলা দেশের মর্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপ দেবচরণে দিবেদন করিতে পারি!

☐ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতিব অভিভাষণ। (১৯১১)

গল্প

যোগেশচন্দ্র রায়

আমরা শৈশবে 'শোলোক' শুনতাম। শোলোক বলবার জন্যে পিসি জেঠাই আয়ীকে ধরতাম, মিনতি করতাম। অনেকে জানতেন, কিন্তু বলতে জানতেন না। প্রবীণা প্রাচীনারা বলতে পারতেন। দুধ খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে মাকেও শোলোকের লোভ দেখাতে হত, কিন্তু সে শোলোক আসল নয়; বাজে, মন-গড়া। শোলোক নাম হবার কারণ তাতে শ্লোক থাকত। শ্লোকই শোলোকের প্রাণ। একটার একটু মানে আছে। সেটা 'কন্‌কাবতী'র,

> কন্‌কাবতী মাগো ঘরকে এস না।
> ভাত হল কড়-কড়্যে বেন্নন হল বাসি
> আমরা কন্‌কাবতী মায়ের তরে তিনদিন উপবাসী॥

শেষ চরণটা ঠিক মনে পড়ছে না। আমি শৈশবে শুনেছি, পরে আর শুনি নি। কিন্তু আশ্চর্য, আজিও শ্লোকটি মনে আছে। এইরূপ শ্লোক শিশুর কানে কি মধু ঢেলে দেয়, তা সে বলতে পারে না, কিন্তু শুনতে শুনতে সে তার 'আখটি' ভুলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে। শিশু শ্লোকটি মনে রাখতে চায়, পারে না; 'কথা'র অল্প পারে বেশির ভাগ পারে না। এই কারণে একই শোলোক বার-বার শুনতে তার বিরক্তি আসে না। আর, যে শোলোক মনে না রইল, সে শোলোকই নয়। আমার বোধ হয়, কোনো অঞ্চলে তিন-চারিটার বেশি শোলোক চলিত্ নাই। কন্‌কাবতী, রাজপুত্র ও কোটালপুত্র, সুয়ো রানি ও দুয়ো রানি , ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমি, আমাদের অঞ্চলে এই কটি শুনতে পেতাম।

শোলোক শুনিবার বয়স আছে। শিশুর সাত আট বছর পর্যন্ত। তারপর উপকথা শুনবার বয়স। শোলোকে সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের বিচার নাই, এদেশ সে-দেশের ব্যবধান নাই, কালেরও নাই। উপকথায় কার্য-কারণের যৎকিঞ্চিৎ যোগ আছে, কিন্তু স্থায়িভাব এখানেও বিস্ময়। দেশভেদে উপকথাকে 'রূপ-কথা' বলে। সে দেশে 'আশু' নামের মানুষটি 'রাশু' হয়। কেহ কেহ মধুর বাল্য-স্মৃতিবশে 'রূপকথা' নামই রুচির মনে করেন, কেহবা এই নামের সার্থকতাও দেখতে পান। আমার ভাগ্যে আমাদের অঞ্চলের প্রচলিত উপকথা শোনা ঘটে নি। তখন দেশের দুর্দিন, ম্যালেরিয়ার আকস্মিক ভীষণ আবির্ভাবে লোকের আর্তনাদে শোকের কথাই শুনতে পেতাম। রঞ্জাবতীর কথা, নীলাবতীর কথা, বেহুলার কথা, দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু শুনতে পাই নি। মনে পড়ে, নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ

নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি। বছর পাঁচ ছয় পরে রামায়ণ কথা প্রথম শুনি। সে কি আনন্দ! কথকঠাকুরের বাক্যচ্ছটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তা-তে কিছুই এসে যেত না, খেই হারাত না।

তখন ইস্কুলে পড়ি। তখনকার দিনে *বিজয় বসন্ত* নামে এক গল্পের বই ছিল। বইখানা সুবোধ্য ছিল না, এখন বিন্দুমাত্র মনে নাই। *আরব্যোপন্যাস*-ও ছাপা হয়েছিল। ইস্কুলের ছুটির সময় গ্রামে এসে গল্প শুনতে পেতাম। এক গোমস্তা ছিলেন, বিদ্যা পাঠশালা পর্যন্ত, কিন্তু এত গল্প জানতেন ও বলতে পারতেন যে লোকে তাঁকে গল্পের 'ধুকড়ি' বলত। পরে দেখেছি, তাঁর লোম-হর্ষণ গল্পের কোনোটা *দশকুমার চরিতে*-র, কোনোটা *বেতাল পঞ্চবিংশতি*-র, কোনোটা *বত্রিশ সিংহাসনে*-র। ভোজ ও ভানুমতীর ইন্দ্রজাল বিদ্যার কাহিনী কোথায় পেয়েছিলেন, জানি না। তিনি মুখে মুখে শিখেছিলেন। নায়ক-নায়িকার নামে ভুল হয়েছিল, কিন্তু কাহিনীর বস্তু প্রায় একই। স-সে-মি-রা কাহিনীতে শুনেছিলাম বিক্রমাদিত্যের মহিষী তিলোত্তমার উরুতে তিল ছিল; রাজমন্ত্রীর বধূবেশে কবি কালিদাস রাজপুত্রকে চারি শ্লোক শুনিয়ে উন্মাদ রোগ হতে মুক্ত করেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, সে চারি শ্লোক গোমস্তার মুখস্থ ছিল, ভাষায় কিছু কিছু ভুল ছিল, কিন্তু অর্থ বুঝতে বিঘ্ন হত না। বিক্রমাদিত্যের সাহস ও বীরত্ব, একবার শুনলে মনে গাঁথা রয়ে যায়। সে সব কথা আরব্যের নয়, পারস্যের নয়। এ দেশেরই ধর্মবীর, দয়াবীর, বুদ্ধবীর, দানবীরের কথা। শুনলে উৎসাহ হয়, চিত্তের প্রসার হয়, জড়তা দূর হয়। হাসির গল্পও ছিল। গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা, নাপিতের ধূর্ততা, তাঁতির মূর্খতা, চোরের বুদ্ধিমত্তা, ইত্যাদি অনেক গ্রামে প্রচলিত ছিল। একটা গল্পও নূতন গড়া নয়, কোন্ অতীতকাল হতে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে দেশবাসীর নিকটে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামায়ণ ও ভারত পাঠ, রামায়ণ মহাভারত ও চণ্ডীর গান, কৃষ্ণযাত্রা ও শ্যামাযাত্রা-গান। বৈষ্টমের কীর্তন, বাউলের গান, আর এই সকল কাহিনী গ্রামবাসীকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিত। সে-সব দিন কোথায় গেল, আর আসবে না। এখন বই পড়ে গল্প শিখতে হচ্ছে।

কিন্তু গল্পের গুণ যদি চারি আনা, কথকের গুণ বারো আনা। দেবদত্ত শক্তি না থাকলে কথক হতে পারা যায় না। সাত আট বছর পূর্বে একবার কলিকাতায় কয়েক মাস ছিলাম, বৈকালে গোলদিঘিতে বেড়াতে যেতাম। দেখতাম দিঘির দক্ষিণ পাড়ের মণ্ডপে একটি লোক কি বলত, বিশ-পঁচিশ জন এক মনে শুনত। কথক কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স। গা খোলা, উড়ানি কখনও কোলে কখনও ভূমিতে পড়ত। দক্ষিণ বাহু কখনও প্রসারিত, কখনও বক্ষঃলগ্ন; স্বর কখনও উদাত্ত, কখনও অনুদাত্ত হত। লোকটির দেবদত্ত শক্তি নিশ্চয়ই ছিল, নইলে এতগুলি লোক প্রত্যহ শুনতে আসত না। আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় দ্বারা কথা জীবন্ত হয়ে উঠত। গল্প-লেখকের সে সুবিধা নাই। লেখককে ভাষার দ্বারা কথক হতে হয়।

গল্প শব্দটি বেশি দিনের নয়। দুই-এক শত বছরের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। শব্দটির দুই অর্থ আছে। আমরা গল্প 'করি,' গল্প 'বলি'। বন্ধু পেলে গল্প 'করি,' গল্পে-সল্পে দু-দণ্ড কাটাই। এই গ-ল্প,—জল্প, জল্পন; দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে অসম্বন্ধ কথন। গ-ল্প-স-ল্প শব্দের

স-ল্প, বোধ হয় সু-ল্প। লপ ধাতুর অর্থ লেপন, ভাষণ। পূর্ববঙ্গে বলে, গা-ল—গ-ল্প। গা-ল, বোধ হয় স° গল্‌ভ, প্রগল্‌ভতা। যে গল্লিয়া, গল্প্যে, গপ্প্যে সে প্রগল্‌ভ, বাচাল। যখন কেহ গল্প 'বলেন', আমরা শুনি, তখন সে গ-ল্প, স° কল্প। ক্যল্প,—কল্পনা, মানসিক রচনা, নির্মাণ। এই গ-ল্পের জুড়ি, ট-ল্প; যেমন গল্প-টল্প।

পূর্বকালে ছিল, 'কথা'। অমরকোষে, কথা প্রবন্ধ-কল্পনা; প্রবন্ধের কল্পনা, মানসিক রচনা। তখনকার 'কথা'য় নায়ক-নায়িকার নাম সত্য থাকত, হয়তো বৃত্তেরও কিছু সত্য থাকত। এই হেতু কেহ কেহ 'কথা'র লক্ষণে বলতেন, কথা-রচনায় অল্প সত্য, বহু অসত্য থাকে। কথার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পদ্যে রামায়ণ, গদ্যে কাদম্বরী। 'কথা' ছোট হলে 'কথানক'। ক-থা-ন-ক বাংলা অপভ্রংশে কা-হি-নী। 'কথায়' কিছু সত্য থাকে, 'উপকথা'য় কিছুই থাকে না। 'কথা' বিস্তারিত হলে 'পরিকথা'। কথা, উপকথা, পরিকথা গদ্যে লেখা হত। এই লক্ষণ ছেড়ে দিলে রামায়ণকে পরিকথা বলতে পারা যায়। যাঁরা রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সত্য মনে করেন, তাঁরা রামের চরিতকে 'আখ্যায়িকা' বলতেন। দৃষ্ট বিষয় অবশ্য সত্য, দৃষ্টবিষয়-বর্ণন 'আখ্যায়িকা', বা 'আখ্যান'। পৌরাণিকদের বিবেচনায় দ্বৈপায়ন ব্যাস ভারত 'আখ্যান' লিখেছেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় *আখ্যান-মঞ্জরী* লিখেছিলেন, তিনি কয়েকজনের চরিত্রবর্ণন করেছেন। বহুশ্রুত বিষয়ের বর্ণন, 'উপাখ্যান'। নলচরিত বহুশ্রুত কিন্তু দৃষ্ট নয়। এই চরিতের কত সত্য, কত অসত্য, তা কেহ জানত না। মহাভারতে অসংখ্য 'উপাখ্যান' আছে, রামোপাখ্যানও আছে। সে সব, উপকথা নয়, কথা নয়, উপাখ্যান। উপাখ্যানের মধ্যে 'কথা' থাকতে পারে। যেমন *দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা*-য় ভোজরাজ-কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত সিংহাসন প্রাপ্তি, এক উপাখ্যান; এবং এক এক পুত্তলিকা-কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য বর্ণন, এক এক 'কথা'।

বাংলায় কে 'উপন্যাস' নামটি প্রচলিত করেছেন, জানি না। যিনিই করুন, তিনি উ-প-ন্যা-স শব্দের অর্থচিন্তা করেন নাই। ন্যা-স, স্থাপন, রাখা। টাকা ন্যাস, ন্যস্ত করা, টাকা জমা, গচ্ছিত রাখা। অঙ্ক কষিবার সময় রাশিগুলি যথাস্থানে ন্যাস করতে হয়, বাংলায় বলি 'পাতন'। অঙ্গ ন্যাসে এক এক অঙ্গ এক এক দেবতার আশ্রয়ে রাখা হয়। উ-প-ন্যা-স, সমীপে স্থাপন। বাক্যের ও প্রবন্ধের 'উপন্যাস', উপক্রম, আরম্ভ। উ-প-ন্যা-স ইংরেজি suggestion-ও বটে। এই ইংরেজি শব্দের বাংলা শব্দ পাই না। কেহ কেহ 'ইঙ্গিত' লেখেন, কিন্তু 'আকার-ইঙ্গিত' যে একেবারে ভিন্ন। বাংলা উপন্যাস, বৃত্ত-কল্পনা। দ্রাবিড় ভাষায় ও মারাঠিতে novel-কে বলে কাদম্বরী, হিন্দি ও ওড়িয়াতে বলে কহানী। বাংলায় 'নব-ন্যাস', 'রম-ন্যাস' নামও দেখেছি। 'রম-ন্যাস' ইংরেজি romance অর্থে বলিবার যুক্তি 'রম' টুকু ছাড়া কিছু পাই না। সে দিন দেখছিলাম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর romance-কে 'কাহিনী' বলেছেন। বর্ণনীয় বিষয় ও ভাব চিন্তা করলে এই নাম ঠিক। কিন্তু এই নামে লেখকের মন উঠবে না, 'কাহিনী' নামে নবীনতা কই?

এখন দেখি, 'ছোট গল্প,' 'বড় গল্প,' 'উপন্যাস', এই তিন নামে গল্প চলেছে। সংস্কৃত নাম বলতে হলে, কথা, অতিকথা, পরিকথা। কিন্তু এই তিনের লক্ষণ কি? লক্ষণ না করলে সংজ্ঞা চলে না। বাংলা ভাষায় ক-থা শব্দের নানা অর্থ আছে। শব্দটি না থাকলে

'কথা কহা' অসম্ভব হত। বিদ্যাসাগর-মহাশয় *কথামালা* লিখেছেন। বাঘ ভালুকে কথা কয়, এ যে বিষম কথা। এখানে কথা, কল্পিত কথা, সব অসত্য। সংস্কৃতে রূপকে *হিতোপদেশ*। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী *যজ্ঞকথা* লিখেছেন। তিনি কথক হয়ে যজ্ঞ ব্যাখ্যান করেছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের গল্প, কালিদাসের গল্প, পাখির গল্প, আকাশের গল্প, ইত্যাদি গল্প বই কথা নাই। কালিদাস-সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত ছিল, তিনি যৌবনেও জড়বুদ্ধি মূর্খ ছিলেন, 'উষ্ট্র' উচ্চারণ করতে পারতেন না। তাঁর গল্প সত্যানৃত-মিশ্রিত প্রবন্ধ। কিন্তু 'পাখির গল্প,' বোধ করি, পাখির স্বভাব বর্ণন। আজকাল বালকেরা বলে, আকবরের 'গল্প,' অর্থাৎ আকবরের চরিত।

'শিশু-সাহিত্য' নামে কতকগুলি বই হয়েছে। একবার বছর সাতেক পূর্বে এক শিশুর নিমিত্তে একখানা বই খুঁজতে হয়েছিল। শিশুর বয়স ৭।৮ বৎসর, বাংলা পড়তে পারত, কিন্তু থমকে' থমকে' পড়ত, যা পড়ত তা গুছিয়ে বলতে পারত না। তার এক বিশেষ দোষ ছিল, শব্দের আদ্য ও অন্ত্য অক্ষর পড়ত, মাঝের অক্ষর ছেড়ে যেত। বালকটির পিতা না মাতা হাসি-খুসি দ্বারা বাল-শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। এরই ফলে এই দোষ ঘটেছিল। এখানে (বাঁকুড়ায়) বই-এর দোকানে বারো-তেরো খানা বই পেলাম। পদ্য বাদ দিতে হল; কারণ, পদ্যের ছন্দের গতিকে বর্ণ-পরিচয় রসাতলে যায়। বিশেষত, পদ্যগুলি নানা রঙে ছাপা; সাদা কাগজে কালির অক্ষর পরিস্ফুট হয়, অন্য রঙের হয় না। রাক্ষস-বক্ষস, ভূত-প্রেতের বই বাদ দিতে হল; কারণ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারি না, ভূত-ভীত করে চিরকাল ভীরু করতে পারি না। শেষে একখানি *শিয়াল পণ্ডিত* ও হরিশচন্দ্র কবিরত্নকৃত *চাণক্য-শ্লোক* কিনে আনি।

শিয়াল-পণ্ডিতে-র দোষ আছে। 'পণ্ডিতি' দীর্ঘ হয়েছে, স্থল-বিশেষে শিশুর অবোধ্যও হয়েছে, *চাণক্য-শ্লোক* পঞ্চাশটি বেছে দিয়েছিলাম। সংস্কৃত শ্লোক, প্রত্যেক অক্ষর শুদ্ধভাবে পড়তে হত, বর্ণ-(উচ্চারণ-)জ্ঞান হত। বাজে পদ্যের বদলে শ্লোক মুখস্থ করলে চিরজীবন ধর্মের ন্যায় সুহৃদ হয়ে থাকে। বাল্যকালে পাঠশালায় আমাকে চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করতে হয়েছিল। সে বিদ্যা এখনও কাজে লাগছে।

'শিশু সাহিত্যে'র পর 'বাল-সাহিত্য'। দশ হতে যোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকার নিমিত্ত বাল-সাহিত্য। এদের নিমিত্তে অনেক বই হয়েছে। বিদ্যালয়-পাঠ্য অসংখ্য, গৃহপাঠ্যও অনেক। বিদ্যালয়-পাঠ্য বই ফরমাইসি বই, প্রায়ই মাধুর্যহীন। এই হেতু বালক-বালিকারা পড়তে চায় না। গৃহপাঠ্য বইতেও সে দোষ নাই, এমন নয়। তথাপি গ্রন্থবিস্তার হেতু সে দোষ কতকটা কেটে যায়। ইদানীং দেশের পুরাতন উপাখ্যানের প্রতি গ্রন্থকর্তাদের দৃষ্টি পড়েছে। এটি বাল-শিক্ষার পক্ষে শুভ। কারণ প্রথমে স্বদেশি, আর, প্রত্যেক উপাখ্যানেই হিতোপদেশ আছে। বাজে গল্প থাকে না। মহৎ লোকের চরিতও লেখা হয়েছে। অনেকে 'চরিত' বলতে চান না; বলেন, 'জীবনচরিত'। অনাবশ্যক 'জীবন' জুড়বার কারণ, ইংরেজীতে bio-graphy, যার bio মানে জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা 'চরিতে'র আগে 'জীবন' জুড়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র *শ্রীকৃষ্ণচরিত* লিখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর *চরিতকথা* শুনিয়েছিলেন। এঁরা নূতন

কিছু করেন নি। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ *চৈতন্য-চরিত-অমৃত* লিখেছিলেন। সংস্কৃতের তো কথাই নাই। ইদানীং 'জীবনী' নামও দেখতে পাই। কারণ ইংরেজি life শব্দের একটা অর্থ 'চরিত' আছে। কিন্তু 'জীবন' ও 'জীবনী' একই। এক জীবন-সংগ্রামেই আমাদের জীবনান্ত হচ্ছে, তদুপরি দাম্পত্য জীবন, বিবাহিত জীবন, পারিবারিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, জাতীয় জীবন, জুটলে কতদিন সামলানো যাবে। শব্দের অর্থপ্রসারণে দোষ নাই, যদি তদ্দ্বারা ভাষা সংকুচিত না হয়।

'বাল-সাহিত্যে'র পর 'তরুণ সাহিত্য'। তরুণ-সাহিত্যে গল্পের আসন প্রথম। গল্প-নামে উপন্যাসও ধরছি। বাজারে যে কত গল্প বেরিয়েছে, তা বলতে পারি না। আমার গল্প-পড়ার বাতিক ছিল না, খবরও রাখি না। তা ছাড়া, ইচ্ছা হলে গল্প বেছে পড়তে পারি। কিন্তু মাসিকপত্র পাঠককে বাছতে দেয় না, গল্প না চাইলেও ঘরে এসে হাজির হয়। তখন গৃহস্থকে চোখ বুলিয়ে দেখতে হয়, কি জানি সুন্দর প্রচ্ছদপটের ভিতরে কি আছে। কখনও কখনও সাপ লুকিয়ে থাকে। গুণিন মন্ত্র জানেন, ভয় নাই; কিন্তু গৃহস্থ ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

'মাসিক পত্র,'—পত্র না গ্রন্থ? এ বিচারে না গিয়ে 'মাসিকী' বলি। মাসিকীর দুই ভাগ করতে পারি। কতকগুলি এক এক সমাজ বা সংঘের কর্ম প্রচার ও উদ্দেশ্য সাধন করে। এগুলিকে 'সংঘ মাসিকী' বলতে পারি। অপরগুলি সাধারণ পাঠকের জ্ঞান ও আনন্দপিপাসা তৃপ্ত করে। এগুলিকে 'বার মাসিকী' বলা যেতে পারে। (বার, অবসর ও সমূহ।) *ব্রাহ্মণ সমাজ* নামে এক 'মাসিকী' আছে, নামেই প্রকাশ এখানি সংঘ-মাসিকী। এতে গল্প ও পদ্য থাকে না, থাকবার কথাও নয়। কারণ, গল্প ও পদ্য দ্বারা ব্রাহ্মণ সমাজের কি হিত হবে? ব্রাহ্মণেই রচবেন,পড়বেন তাও তো নয়। সংঘ-মাসিকীর কর্তা, সংঘ। কিন্তু বার-মাসিকী মণিহারী দোকান। ক্রেতা যেমন , দোকানের দ্রব্যও তেমন রাখতে হয়, নইলে দোকান চলে না। চিত্র, পদ্য, গল্প না থাকলে ক্রেতা জুটে না, দোকানও ভরে না। দোকান ছোটো করতেও মন সরে না। বার-মাসিকীর বাহুল্য-হেতু সম্পাদককে পাঠকের মন জুগিয়ে চলতে হয়। আর, সচিত্র তিন শত পৃষ্ঠার একখানা বই আট আনায় বেচাও সোজা নয়।

কিন্তু গল্প-রচনা ভারি কঠিন। বাংলা ভাষা, সালংকারা ভাষা লিখতে পারলেই গল্প রচতে পারা যায় না। পদ্য রচনা ঢের সোজা, মাসখানেক অভ্যাস করলে, পদ্য লিখতে পারা যায়। অবশ্য সে পদ্য, কাব্য নয়। কবি দুর্লভ, ক্ষণ-জন্মা। দৈবী-শক্তি না পেলে কবি হতে পারা যায় না। যে-সে পদ্যকে কবিতা বললে কবিকে খাটো করা হয়। কবির ভাব, কবিতা; কবিতাই কবির প্রমাণ। ছন্দোবিশিষ্ট বাক্য, পদ্য। পদ্য-কার ছান্দসিক। কবি পদ্যে ও গদ্যে, বাক্যের দ্বিবিধ রূপেই তাঁর কবিতা প্রকাশ করতে পারেন। অতএব কাব্যও দ্বিবিধ, পদ্য-কাব্য ও গদ্য-কাব্য। উত্তম গল্প, কাব্য। গল্প পদ্যে ও গদ্যে দুই রূপেই লিখতে পারা যায়।[১] যে গল্পে কবিতা নাই, সেটা গল্প নয়, বাজে বকা।

১. এখন পদ্য-গল্পের নাম 'গাথা' দেখতে পাই। নামটি ঠিক কি? সংস্কৃতে 'গাথা' একটি কি দুটি শ্লোক, যা লোকে গাইত, স্মরণার্থে কীর্তন করত। সংস্কৃতপ্রাকৃত ভাষায় 'গাথা সপ্তশতী'; এখানেও একটি

নানা মাসিকীতে মাসে মাসে কত গল্প প্রকাশিত হচ্ছে, কেহ গণেছেন কি না জানি না। শতাবধি হবে। সাপ্তাহিক বার্তাপত্রেও গল্প থাকে। বোধ হয় গল্প-লেখক, বা গল্পক এক সহস্র হবেন। পদ্যরচনার নিয়ম আছে। ইংরেজিতে গল্প লিখবার ধারা-পাত আছে। কেনই বা না থাকবে? কোন্ কর্মের নাই? বাংলাতে পত্র লিখবার ধারা-পাত আছে। কিন্তু তা দিয়ে পত্রের আরম্ভ ও শেষ শিখতে পারা যায়, পত্রের বস্তুর বর্ণন শিখতে পারা যায় না। সে কর্ম পত্র-লেখকদের।

গল্প ও উপন্যাসে তফাৎ কি? বাংলায় কিছুই দেখতে পাই না। প্রয়োগে দেখি, গল্প ছোট, উপন্যাস বড়। যখন দেখি, এটি 'ছোট গল্প', ওটি 'বড় গল্প', তখনই বুঝি এই ভাগ বাহ্যিক। উপন্যাসেরও দৈর্ঘ্যের সীমা নাই; কোনোটা এক-শ পৃষ্ঠা, কোনোটা পাঁচ-শ পৃষ্ঠা। ক্রেতা পেলে হাজার পৃষ্ঠাও হতে পারত। যদি ইংরেজি story ও novel, বাংলার গল্প ও উপন্যাস মনে করি, তা হলে গল্পের 'বন্ধ' (plan) ঋজু, উপন্যাসের সংকুল (complicated)। সংকুল বটে, কিন্তু দৈবাৎ নয়, লেখকের ইচ্ছাকৃত কূটবন্ধ (plot)। রস-হিসাবে উপন্যাস নানা রকম। বীর ও অদ্ভুত রস থাকলে ইংরেজি romance, রোমাঞ্চন। পৌরাণিক-প্রবর লোমহর্ষণ অদ্ভুত কথা শোনাতেন। ইংরেজি মতের গল্প ও উপন্যাসের প্রকৃতি ঐ রকম হলেও সংসারে বিকৃতি-ই বহু। তাতে দুঃখই বা কি? রাগিণী বেহাগ মিষ্ট, কিন্তু বেহাগ-ড়া তো কম নয়। কলার হানি হলে কোনোটাই মিঠে নয়। গল্পে কলাই প্রধান। বস্তু ও বন্ধ অবশ্য চাই, কিন্তু 'তাজমহল' পাথরের পাঁজা নয়, নির্মাণের গুণে অপূর্ব আনন্দ উদ্রেক করে। সে গুণের নাম কলা (art)। পূর্বকালের চৌষট্টি কলার মধ্যে 'কাব্যক্রিয়া' একটা কলা ছিল। কাব্যকলা, চিত্রকলা শব্দের প্রয়োগ আছে। কলা, চাতুরী, ছল (fraud)। লোকে বলে, 'লোকের ছলা-কলা', 'লোকটার কলা (গ্রাম্য, 'কল্লা') দেখে বাঁচি না।' কলা কৃত্রিমকে অকৃত্রিম দেখায়, মিথ্যাকে সত্যভ্রম করায়। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পটে। কোথায় গাছ, কোথায় বা পাহাড়; আমরা পটে গাছপাথর দেখি। চিত্রকর রং দিয়ে ইন্দ্রজাল রচনা করেন, কবি ভাষার শব্দ দিয়ে করেন। কবির ইন্দ্রজাল, কবিতা। এটি তাঁর স্বভাবজ। কখন-কখন অন্যেও কবিতা অনুভব করেন, প্রকাশও করতে পারেন। কিন্তু সেটা ঔপাধিক, অবস্থা-বিশেষে স্ফুরিত হয়।

ইংরেজির মাপ-কাঠিতে চলতে হবে, কিংবা গল্প ও উপন্যাসের বন্ধ শুদ্ধ রাখতে হবে, এমন কথা কি আছে। পাঠক চান আনন্দ; রসই আনন্দের হেতু। কার্যকারণ এক হয়ে আনন্দ ও রস সমার্থ। প্রাচীন কাব্যরসিক খুঁজে খুঁজে রস পেয়েছিলেন, একটি

একটি শ্লোক, যদিও সংস্কৃতে নয়। পালি ভাষায় *থেরীগাথা* বৌদ্ধ স্থবিরার বৃত্ত, কিন্তু গেয়। বাংলাতেও গাথা ছিল, যেমন পশ্চিম দক্ষিণ রাঢ়ের 'নীলাবতী' বা 'লীলাবতী', মধ্যরাঢ়ের রাজা রণজিৎ রায়ের 'গাথা,' রণজিৎ রায়ের বৃত্ত। এ সকল পদ্য গাওয়া হত। গাথক = গায়ক। সর্পবৈদ্যেরা লখিন্দরের কথা গায়। সেটি গাথা। গোপিচাঁদের গীত, গাথা। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গের কয়েকটি গাথা সংগ্রহ করেছেন। গাথা সত্যমূলক। গাথাকে 'পল্লীগীতি' বলা ঠিক নয়। পল্লী, গ্রাম, নগর, নামভেদে গাথা হয় না। আর, বাউলের গান গীতি বটে, কিন্তু গাথা নয়।

বাড়াবার কমাবার নাই।[২]

নয়টা রসের একটা-না-একটা না থাকলে কাব্য হবে না, এমন নয়। এর দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের *ইন্দিরা* । এটি গল্প না উপন্যাস? এতে উপন্যাসের ফন্দি বিলক্ষণ আছে। কালাদিঘির ডাকাতেরা বেহারা ও ভোজপুরী দারোয়ানকে ঠেঙিয়ে ইন্দিরার অলংকার কেড়ে নিতে পারত, ইন্দিরা বি-গাঁয়ে হারিয়ে যেত না। *ইন্দিরা*-য় স্থায়িভাবে কিছুই নাই। ইহার আরম্ভ বিস্ময়ে; পরিণতি, কৌতুক বা হাস্যভাবে। *রাধারাণী*তেও কোনো স্থায়িভাব নাই। রচনার মাধুর্যগুণে গল্পটি মনোহারী হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি রোমাঞ্চন। আমরা বীর ও অদ্ভুত রসে সহজে মুগ্ধ হই। মহাভারতে বিরাটপর্ব এই ভাবে বিরাটই বটে। বোধ হয়, এই কারণে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় বিরাট-পাঠের বিধি হয়েছে।

যাঁর কবিতা স্বভাবজ নয়, তিনি গল্প লিখলে দুই একটি পারেন, বেশি পারেন না। ঔপাধিক গুণপ্রকাশের ক্ষেত্র অল্প। তথাপি কেহ কেহ একটি গান, একটি পদ্য-কাব্য, একটি উপন্যাস, একটি গল্প লিখে যশস্বী হয়েছেন। একটিতেই তাঁদের অনুভূতির উৎস নিঃশেষ হয়েছে। এমন একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। সন ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসের *সাহিত্যে* শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 'আগন্তুক' নামে এক গল্প লিখেছিলেন। আমার মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে। গল্পের বস্তু যৎসামান্য। এক গ্রামের চক্রবর্তীর এক জামাই বিবাহ পরে বিদেশে চাকরি করতে গেছলেন। কয়েক বৎসর পরে ছুটি পেয়ে শ্বশুরমশায়কে না জানিয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত। সেদিন দৈবাৎ চক্রবর্তী গ্রামান্তরে গেছলেন, বাড়িতে পুরুষ কেহ ছিল না, শাশুড়ি ও বনিতা, কমল, মাত্র ছিলেন। চাকুরে যুবা; বেশে অবশ্য ভদ্রলোক। বাড়ির এক কৃষাণ ধান ঝাড়ছিল। কলিকায় তামাক সেজে ভদ্রলোককে তামাক ইচ্ছা করতে দিলে। লোকটি তামাক খায় না, চক্রবর্তী বাড়িতে নাই শুনেও উঠল না! চক্রবর্তীনীর এমন বিপদ কখনও ঘটে নি। স্নানের বেলা হলে আগন্তুক এমন কাণ্ড করলেন যে চক্রবর্তীনী স্তম্ভিত। কমল ঘড়া ও তেলের বাটি পুকুর ঘাটে রেখে সইকে ডাকতে গেছে, ভদ্রবেশী যুবকটি সে বাটির তেল নিয়ে মেখে স্বচ্ছন্দে স্নান করলেন। এমন আস্পর্ধা সইবার নয়; এ যে দিনে ডাকাতি! আগন্তুক সব শুনতে পেলেন। মধ্যাহ্ন হল, লোকটাকে অভুক্ত রেখে গৃহস্থ খেতে পারে না। অগত্যা চক্রবর্তীনী

২. আশ্চর্য বিশ্লেষণ-শক্তি। আরও আশ্চয নয়টা রসের আদি, প্রধান, একটি। সেটির নাম আদিরস। অপর আটটি,—বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস, শান্ত। শান্তরসে কর্মের অভাব। দৃশ্যকাব্যে এ রসের স্থানও নাই। কেহ কেহ বাৎসল্য নামে আর এক রস স্বীকার করেন, কিন্তু ভক্তি সখ্য প্রভৃতিকে রস না বলে 'ভাব' বলেন। ভাবের সংখ্যা নাই। অনুরাগ ও বিরাগ, এই দুই ভাব, সকল ভাবের ও বসেব মূল। প্রাচীন রস-বেত্তারা আদিবসকে নায়ক-নায়িকার প্রেমে বদ্ধ রেখে অনুরাগের ক্ষেত্র খর্ব করেছেন। নইলে এই রসকে মধুর রস বলেও বাৎসল্য, সখ্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দাস্য প্রভৃতিকে মধুর রসের অবান্তব ভাবতে পাবতেন। পাত্র ভেদে মধুর রস নানাবিধ; বিরাগও নানাবিধ। অনুরাগ-বিরাগের অন্তর্ধানে শান্তরস। সেটি নবম। অন্যদিকে ষড় বিপুর আদি রিপুও কাম। কাম হতে লোভ। কাম্যের লাভে মদ, অ-লাভে ক্রোধ। ক্রোধ হতে মোহ ও মাৎসর্য। কবি যে পথেই যান, এই ছয় পথে ঘুবতে থাকেন। এই ঘূর্ণি-পাকে নব-রসের উৎপত্তি। বাংলা গল্পে কোন্ রিপুর প্রাবল্য, কিংবা রস থাকলে কোন্ রস অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তা বিবেচনার বিষয়।

ঘোমটা টেনে ভাতের থালা রেখে গেলেন। আহারান্তে পাড়ার গিন্নিবান্নির সভা বসল, ডাকাতকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবার পরামর্শ হল। কিন্তু মারে কে? সন্ধ্যার সময় চক্রবর্তী বাড়ি এসে জামাই দেখে খুশি। ভিতরে গিয়ে গিন্নিকে বলতেই তাঁর যে কি দশা হল, তিনিই জানেন। লজ্জা, বিস্ময়, ক্রোধ, ব্যস্ততা, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাবের সমাবেশে হাস্যরস ঘনীভূত হয়েছে। গল্প-কার পরে *প্রবাসী*-তে দুই তিনটা গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু একটাও ভালো হয় নাই।

গল্পের ক্ষেত্র ছোট, উপন্যাসের বড়। কিন্তু গল্পের ক্ষেত্র অসংখ্য, উপন্যাসের অল্প। অধিকাংশ উপন্যাসে নিয়তির জয় ঘোষিত হয়। সংসারে তাহাই বটে। কথাই আছে, মানুষের ভাগ্য দেবতাও জানেন না। সোনার মৃগ হয় না, হতে পারে না, জেনেও রামচন্দ্র সে মৃগ অনুসরণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির এত জ্ঞানী;তবু কপটদ্যূতে আসক্ত হলেন; নীতিজ্ঞ হয়েও দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন। মহাভারতে অদৃষ্টের ফল পুরুষকারকে হারিয়ে দিয়েছে। অদৃষ্ট পূর্বজন্মার্জিত ফল; পুরুষকার এ জন্মের। বহু প্রাচীন কাল হতে এ দুই নিয়ে বহু বিচার হয়ে গেছে। কেহ কেহ 'কাল', আর এক কারণ বলেছেন। কাল অনুকূল না হলে মানুষের যত্ন সফল হয় না। এ তো প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছি। সেইরূপ দৈব অনুকূল না-হলে কাল ও যত্ন কিছুই করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষে* তিনই দেখতে পাই। নগেন্দ্রনাথ নৌকায় যেতে যেতে ঝড়ে পড়বেন। অনাথা কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয় দিবেন, এ তো দৈবের ঘটনা। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর *অভিশপ্ত সাধনা* উপন্যাসে দৈববল ও কর্মবলের পরীক্ষা করেছেন। কুন্দনন্দিনী স্বপ্নে জেনেছিল, কে তার বিপদের কারণ হবে, তথাপি সে বিপদেই পড়েছিল। *অভিশপ্ত সাধনায়* কর্-রেখা ও জন্ম-কোষ্ঠী দ্বারা নায়িকাও তার দয়িতকে প্রাণসংহারক জানতে পেরেছিল, তথাপি তার হাতেই পড়েছিল। মনে হতে পারে, এ সব কল্পনা। কিন্তু কে না জানে প্রতিদিন নিয়তির খেলা চলছে। চলছে বলেই লোকে ফল-জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। গান্ধীজি মহাত্মা হলেন; কই আর কেহ হতে পারলেন না। তিনি তপস্যাই বা কেন করতে গেলেন? এই প্রবৃত্তি কোথা হতে এল? উপন্যাসের বন্ধ, নিয়তির বন্ধ। আমরা অ-প্রত্যাশিত ফল দেখে মুগ্ধ হই, বিমূঢ় হই। কোথা হতে কি যে হয়, বিশ্বকর্ত্রীই জানেন।

এক গল্প-কীট বলতেন, 'গল্প চারি প্রকার। যথা, কোনোটা দৈবাৎ ঘন আবর্তিত দুগ্ধ; খেলে বুঝতে পারি, হাঁ, কিছু খেয়েছি, অনেকদিন মনে থাকে। কোনোটা জলো দুধ, পানসে' ঠেকে, এ-বেলা খেলে ওবেলাকে মনে থাকে না। কোনোটা পিটালির গোলা, দুধের গন্ধও নাই, কেবল দেখতে সাদা। কোনোটা পচা ছেনার জল, গন্ধেই বমি উঠে।' গল্পের সমালোচনা হলে গল্প-কার দোষ-গুণ বুঝতে পারতেন। *সাহিত্যে* অল্প-স্বল্প সমালোচনা থাকত, লেখক ও পাঠকের উপকার হত। সমালোচক, বিচারক। অর্থী লেখক; প্রত্যর্থী পাঠক। স্বীয় রচনার প্রতি সকলের মমতা হয়, বন্ধুজনের প্রতি বিচারকেরও মমতা হয়। কিন্তু উভয়েই মমতা ত্যাগ করতে না পারলে পাঠকের প্রতি অবিচার হয়। আমি গল্প কদাচিৎ পড়ি। গল্পের আরম্ভ ভালো লাগলে পড়ি, নইলে সেখানেই ছাড়ি। এত অল্প জ্ঞান নিয়ে সমালোচনা সাজে না। দু-একটা দোষ চোখে ঠেকেছে, লিখি। দেখি,

কোনোটার আরম্ভ বেশ, বন্ধও বেশ, কিন্তু শেষে হত-ইতি গজঃ। মনে হয় যেন লেখক পাতা গণছিলেন, হঠাৎ দেখলেন পাতা বেড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি সমাপ্তি করে ফেলেন। এর ফলে ভাব-ভঙ্গ ঘটে। দ্বিতীয় দোষ, গল্পের অনাবশ্যক বাহুল্য। স্বগতোক্তি অল্প হলেই ফলোৎপাদক হয়। মনের বিতর্ক দীর্ঘ হলে পাঠকের ধৈর্য লোপ হয়। পদ্যকাব্যে অলংকার-বাহুল্য ঘটে, গদ্য-কাব্যেও ঘটে। তখন প্রতিমার রূপ দেখতে পাই না, কিঙ্কিণীর ঠুন্-ঠুন্ ধ্বনি-মাত্র কর্ণগোচর হয়। তৃতীয় দোষ, অশিষ্টেরা বলে 'বিদ্যা ফলানা'। বিদ্যার পরিপাক না হলে, উদ্গার ওঠে। পাঠক এ-দোষ সইতে পারেন না। দৃষ্টান্ত ও উপমার নিমিত্ত বাঙালি পাঠককে বিলাতে যেতে হলে তিনি পর্যাকুল হয়ে পড়েন। চতুর্থ দোষ, 'ধান ভান্তে শিবের গীত,' প্রসঙ্গ-বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র *ইন্দিরা*-র শেষে এই দোষ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এ পরিচ্ছেদটি না লিখলেও লিখতে পারতাম।' তাঁকে বরের 'বাসর ঘরের একটি চিত্র দিবার বাসনা' ভ্রান্ত করেছিল। তিনি এ-বাসনা অন্যস্থলে মিটাতে পারতেন।

তিনি রসিক ছিলেন, কিন্তু কুত্রাপি অশ্লীলতা করেন নাই। যে বাক্যে শ্রী শোভা লক্ষ্মী নাই, সেটা অশ্রীল, অশ্লীল। যে বাক্য শুনলে লজ্জা ও ঘৃণা হয়, সেটা সমাজের অমঙ্গলজনক। 'সাহিত্য' শব্দের অর্থেই প্রকাশ এতে অ-সামাজিকতা থাকবে না, পরন্তু সমাজের হিতেচ্ছা থাকবে।[৩] প্রত্যেক সমাজেই ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সুপ্রবৃত্তি-কুপ্রবৃত্তির ভেদ আছে। গল্পে সে ভেদ না মানলে গল্পটা সমাজ-বিদ্বেষ্টা হয়; পাঠকের অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হয়। গল্প পড়ে জুগুপ্সার উদয় হলে গল্প নিষ্ফল। সে গল্পে রচনাশক্তি থাকলে পাঠক ভাবতে থাকেন, লেখকটি কে, তাঁর চরিত্রই বা কিরূপ। পদ্যকাব্যে ও গদ্যকাব্যে এমন কি তুচ্ছ গল্পেও লেখক স্বচিত্তই প্রকাশ করেন, তাঁকে চিনতে কষ্ট হয় না। কলার জন্যে কলা-চর্চা,—এটা আত্ম-বঞ্চনা।

প্রবাসী-সম্পাদক ১৩৩৬ সালে *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত গল্পের ভালো তিনটি বাছতে

৩. সাহিত্যের লক্ষণ নিয়ে কলহ হয়। এর কারণ কেহ সাহিত্য শব্দের সংস্কৃত অর্থ ধবেন, কেহ *সাহিত্য দর্পণ* অনুসবেণ, কেহ ইংরেজি literature শব্দের এক বিশেষ অর্থ স্মবণ কবেন, কোন্ পথে চলেছেন বললে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে না। আমি সাহিত্য শব্দের মূলার্থ ভাবছি, কারণ সে অর্থ ধরলে বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 'সহিতে'র ভাব, সাহিত্য। 'সহিত' শব্দেব দুই অর্থ আছে। (১) সমভিব্যাহৃত, (company, association)। পূর্বে বলা হত, 'লোকের সমভিব্যাহারে,' (গ্রাম্য) 'সমিভ্যাবে'। আমবা এখন বলি, 'লোকের সহিত'। 'সহিতে,' সঙ্গে; পূর্ববঙ্গে বলে সাথে। 'সহিত' সঙ্গী, সেথো। *শূন্যপুরাণে* 'সহিতর দানপতি' সেথোব কর্তা। অর্থাৎ সহিত, সমাজ, গোষ্ঠী। সাহিত্য, মাঠে গোঠে জন্মে না। কতকগুলি সমধর্মী লোকের গোষ্ঠী নিমিত্ত সাহিত্য। এরা অবশ্য নিজের হিতেচ্ছায় 'সহিত' সংযুক্ত হয়। সে হিত যে কি, তারাই জানে, কেহ মিছামিছি দল বাঁধে না। দৈবাৎ 'সহিত' শব্দ হতে এ অর্থও আসে। সহিত, সহ-হিত্য হিতযুক্ত। অতএব বলতে পাবি, জ্ঞানীর জ্ঞান-সাহিত্য, রসিকের রস-সাহিত্য ধার্মিকের ধর্ম-সাহিত্য, তরুণের তরুণ-সাহিত্য, গাণিতিকের গণিত-সাহিত্য ইত্যাদি। সাহিত্য শব্দের বিশেষ অর্থে কাব্য-সাহিত্য। কিন্তু কবি না হলেও সাহিত্যিক আখ্যা লাভ হতে পারে। সমাজে যাঁর রচনা আদৃত, তিনি সাহিত্যিক। কবি-সমাজে যিনি সাহিত্যিক, তিনি অন্য সমাজে অ-সাহিত্যিক হতে পারেন।

গ্রাহকগণকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, পাঠকেরা কি প্রকার গল্প ভালোবাসেন। তাঁর কামনা সফল হয় নাই, মাত্র সাতাত্তর জন নিজের নিজের মত জানিয়েছিলেন (১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠের *প্রবাসী*)। এই ঔদাসীন্যের নানা কারণ থাকতে পারে। হয়তো অল্প গ্রাহক গল্প পড়েন। হয়তো যাঁরা ভালো-মন্দ বিচার করতে পারেন, তাঁরা পড়েন না। হয়তো বা কোনো গল্প তাঁদের ভালো লাগে নি। কারণ যাই হোক, ঐ সালের তিনটি গল্প আমার মনে আছে। তন্মধ্যে দু-টি পুরস্কৃত হয়েছে। একটি পরশুরামের 'গল্পিকা,' অন্যটি 'রাণুর প্রথম ভাগ'। পুরস্কৃত তৃতীয় গল্প, 'চাপা আগুন'। এটি পড়ি নাই। এখন পড়ে দেখলাম। বোধ হয় এর প্রথম 'পেরা' পড়েই ছেড়েছিলাম। এ যে ভাবের মাথায় লাঠি মারা। রচনা স্বাভাবিক নয়, আগা-গোড়া কৃত্রিম, কলা-হীন। এই দোষে 'আগুন' খুজে পাওয়া যায় না। যে তৃতীয় গল্প আমার মনে আছে, সেটির নাম 'সন্ধ্যামণি' (দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯০ পৃষ্ঠা)। গল্পটি 'সত্যাকৃত'(realistic), আদিরসেরও বটে। কিন্তু লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ধর্মাধর্ম-বিবেককে পরাভূত করে নাই। এই কারণে করুণরসে পাঠকের চিত্ত দ্রব হয়।

এত যে গল্প লেখা হচ্ছে, পড়ে কে? বৃদ্ধ বৃদ্ধা পড়েন না, প্রৌঢ় প্রৌঢ়াও পড়েন না। তাঁরা সংসারে অনেক সত্য গল্প দেখেছেন, ভুগেছেন, মিথ্যা গল্পের প্রয়োজন পান না। পড়ে যুবা বয়সের নরনারী।

এর কারণ আছে। গল্পে মানব-চিত্তচাতুর্য বর্ণিত হয়। দক্ষতা, নিপুণতা চাতুর্য বটে, চারুতা রমণীয়তাও চাতুর্য। যৌবনের ধর্মে মানুষ পরচিত্ত-চকোর হয়, সুপের রস অন্বেষণ করে। সংসার-জ্ঞান নাই, গল্প পড়ে জ্ঞান-পিপাসাও তৃপ্ত করে। ভুক্তান্ন-রস সবদেহে চরলেও হৃদয়ে তার স্থান। চিত্ত-রসের স্থানও হৃদয়। তরুণের হৃদয় আছে; কাব্য সহৃদয় পাঠকের নিমিত্ত রচিত হয়। তরুণ অপেক্ষা তরুণী কাব্যরসে অধিক আকৃষ্ট হয়। কারণ, তার জ্ঞান-বৃত্ত হ্রস্ব, বাইরের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে পায় না। এদের নিমিত্ত গল্প লিখতে হলে সবিশেষ ভাবতে হয়। যে গল্প পড়লে চিত্তের প্রসাদ ও প্রসার হয়; ক্ষনিক উদ্দীপনা নয়, পবিত্রভাব স্থায়ী হয়; অবসাদ নয়, উৎসাহ হয়; সে গল্পের অনেক ক্ষেত্র আছে।

বৎসর গণে তারুণ্য নিরূপিত হয় না। কারও অল্প বয়সে তারুণ্য আরম্ভ হয়, কারও পঞ্চাশ বৎসরেও শেষ হয় না। না হলেও যৌবনকাল পঁচিশ ত্রিশ বৎসর। কবির কবিতার বয়সেরও এই সীমা। আমাদের দেশে এ সীমা কদাচিৎ অতিক্রান্ত হয়। কালিদাস কত বয়সে *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* লিখেছিলেন? আমরা সে বয়স জানি না বটে কিন্তু বলতে পারি পঞ্চাশের অনেক আগে, ত্রিশের সময়ে। পঞ্চাশের পরে যদি তিনি কোনো কাব্য লিখে থাকেন, সেটা অভ্যাসের গুণে, হৃদয়ের রস-প্রভাবে নয়।

.

☐ *প্রবাসী,* পৌষ ১৩৩৮

শিবপূজা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত, যিনি বাক্যমনের অগোচর, আর্যেরা প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহাকে শিবস্বরূপ—মঙ্গলময় বলিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন। আর্য ঋষিগণ রক্ষা এবং আশ্রয়ের জন্য রুদ্রস্বরূপ পরমেশ্বরের দক্ষিণমুখ ধ্যান করিতেন। কিন্তু রজত গিরিনিভ ত্রিনেত্র শূলপাণি কোন্ সময় হইতে শিব, মহাদেব বা রুদ্ররূপে পূজ্য হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বেদত্রয়ের রুদ্র, ব্রাহ্মণের রুদ্র এবং ঈশান অথবা অথর্ববেদের ভব এবং শর্ব, পৌরাণিক মহাদেবের অনুরূপ নহেন; অথচ এই সকল দেবতা মিলিয়া, এবং বহুপরিমাণে অন্যগুণাদি লইয়া, পৌরাণিক মহাদেব। *শতপথব্রাহ্মণে* অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী, পুরাণে তিনি রুদ্রের পত্নী। পুরাণের মহাদেব রুদ্রও বটেন, ঈশানও বটেন; কিন্তু রূপে, গুণে, কর্মে এবং প্রভুতায়, তিনি বৈদিক রুদ্র ও ঈশান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন্ সময়ে কি অবস্থায় এই মহাদেবের উৎপত্তি হইল, তাহাই অনুসন্ধান করিব।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, এইপ্রকার দেবমিশ্রণ হিন্দুজাতির চিরপ্রচলিত দেবপূজার অনুরূপ; এবং কাজেই স্বাভাবিক। তাহা স্বীকার করি। বেদে ইহার দৃষ্টান্তও আছে যে, যিনি ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি এবং তিনিই বরুণ। বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কোনো নূতন দেবতার নামে ঋক্ আরম্ভ হইল, তখন অন্যান্য দেবতা যেন তাঁহার প্রভায় মলিন হইয়া পড়িলেন। সকল দেবতার স্বরূপ লইয়া, নূতন দেবতার মহিমা কীর্তিত হইল; এবং তাঁহাকেই সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর বলা হইল। অনেকে ইহাকে দেববিরোধ বলিয়া মনে করিতেন। এখন কিন্তু ইউরোপীয়েরা ইহার একপ্রকার মীমাংসা করিয়াছেন যে, হিন্দুজাতি মূলত সর্বেশ্বরবাদী বলিয়া, এবং সকল দেবতা একই দেবসত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া, বেদ হইতে পুরাণ পর্যন্ত, সর্বত্রই এইপ্রকার বর্ণনা দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে, এই কারণেই এক সময়ের এক দেবতার পত্নী অন্য সময়ে অন্য দেবতার সহচরী; এবং এক সময়ের ভগিনী ও দুহিতা অন্য সময়ে পত্নী বলিয়া বর্ণিত। হইতে পারে, এই মীমাংসাই যথার্থ মীমাংসা। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, পৌরাণিক কল্পনা—বৈদিক পদ্ধতি এবং দেশীয় সংস্কারের বিরোধী ছিল না বলিয়াই, উহা দূষিত বলিয়া ত্যক্ত হয় না, বরং গৃহীতই হইয়াছে। কিন্তু কোন্ কাঠামোর উপর, প্রাচীন উপাদান দিয়া, নূতন শিব গড়িতে গিয়া মহাদেব হইয়া পড়িল; এবং কোন্ সময়েই বা উহার আবির্ভাব হইল; এখানে সেই তত্ত্বের অনুসন্ধান করিব।

পৌরাণিক মহাদেবের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয় মহাভারত এবং রামায়ণে। তৎপূর্ববর্তী কোনো সাহিত্য বা প্রস্তরলিপিতে পার্বতীপতির অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্ভবত যে সময়ে সৌতিবিবৃত নব মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব হইতেই এই মহাদেবের অভ্যুদয় হয়; কিন্তু কোনো সাহিত্যে কিছু উল্লেখ নাই।

মহাভারতের আখ্যানবস্তু কৌরবযুদ্ধ যত প্রাচীনই হউক না কেন, সৌতিবিবৃত মহাভারত যে অনেক আধুনিক, তাহা নিঃসন্দেহ। যে কেহ মহাভারত পড়িয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন যে, এই গ্রন্থ,—ষড়্দর্শন, ধর্মসূত্র প্রভৃতি রচিত হইবার অনেক পরবর্তী। অপিচ, মগধাধিপতির রাজগৃহনগরের কথা, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চৈত্যদান, মগধরাজ্যের পর্বতে চৈত্য এবং বিহারের অবস্থিতি, সৌগতধর্মের নিন্দাকীর্তন প্রভৃতি হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, এই মহাভারত বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পরে রচিত। খ্রিস্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ সময় ভিন্ন, কাম্বোজজাতিকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া বর্ণনা করা, অথবা তাহাদের কোনো রাজার নাম চন্দ্রবর্মা বলিয়া কল্পনা করা, কোনোপ্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে না। বিস্তৃতভাবে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গেলে, উদ্দিষ্ট বিষয়টির অবতারণায় বড়ই বিলম্ব হইবে। এখানে এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট যে পূর্বে মহাভারত-কথা-সংবলিত অন্যান্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া থাকিলেও, আমাদের পরিচিত প্রচলিত মহাভারত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক; হয়তো তৃতীয় শতাব্দীর।

এই মহাভারতে পার্বতীপতির যে প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখ করিতেছি। সৌতির সময়ে বৈদিক রুদ্রের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে দেখিতে পাই; তবুও তিনি এবং মহাদেব সম্পূর্ণ এক ব্যক্তি নহেন। উদ্যোগপর্বের ১১৬তম অধ্যায়ে আছে যে, যেমন ইন্দ্রের পত্নী শচী, নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মী, তেমনি বরুণের পত্নী গৌরী, সাগরের পত্নী জাহ্নবী, এবং রুদ্রের পত্নী রুদ্রাণী। আবার যেখানে খাঁটি একালের মহাদেবের কথা পাই, সেখানে তাঁহার পত্নী পার্বতী বা উমা। তখনও রুদ্রাণী, গৌরী কিংবা অম্বিকা, উমার সহিত একাত্মতা লাভ করেন নাই। শান্তিপর্বের ২৮২তম অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা আছে। ঐ যজ্ঞে সকল দেবতাই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। শৈলরাজদুহিতা পার্বতী ক্ষুণ্ণা হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেশ্বর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, পূর্বকাল হইতে দেবতারা যে বিধান করিয়াছেন, তাহাতে কোনো যজ্ঞেই তাঁহার ভাগ কল্পিত হয় নাই। স্বামীর এত প্রভুতা সত্ত্বেও তিনি দেবগণের মধ্যে নগণ্য, ইহা দেবীর সহ্য হইল না। মহাদেব তখন আত্মমাহাত্ম্যপ্রতিষ্ঠার জন্য, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। যজ্ঞনাশের পর ব্রহ্মা মহাদেবকে স্তুতি করিয়া বলিলেন, 'হে মহাদেব কেহই তোমার ক্রোধে শান্তিলাভ করিতে পারে না; অতএব দেবতারা সকলেই তোমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিবেন।' মহাদেব প্রীত হইয়া দক্ষকে যজ্ঞফল দান করিয়া চলিয়া গেলেন। ২৮৩তম এবং ২৮৪তম অধ্যায়ে এই কথাটির একটু পরিবর্তিত ভাবে অযথা পুনরাবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া, ঐ দুইটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। তাহা মনে না করিলেও, মহাভারতে দক্ষযজ্ঞের এক বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে জানিতে পারা যায়

যে—(১) দক্ষযজ্ঞসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ পৌরাণিক উপাখ্যান সে সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। এখানে যজ্ঞ-বধ আছে, কিন্তু দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ নাই; পার্বতী আছেন, কিন্তু তিনি দক্ষরাজদুহিতাও নহেন এবং যজ্ঞে তাঁহার দেহত্যাগও হয় নাই। (২) তিনি বৈদিককালে যজ্ঞভাগী ছিলেন; কিন্তু মহাদেবকে যজ্ঞভাগের জন্য স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হইল।

মহাদেব মহাভারত রচনার সময়ে চতুর্মুখ পিনাকপাণি, ত্রিনেত্র এবং নীলকণ্ঠ। কিন্তু তাঁহার এই সকল অবয়ববৃদ্ধিও যে ধীরে হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। অনুশাসনপর্বের ১৪০তম এবং ১৪১তম অধ্যায়ে আছে যে, একদিন শৈলজা উমা পরিহাসচ্ছলে পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে আসিয়া মহাদেবের চক্ষু-দুইটি আবরণ করিয়া ধরিলেন। ফল এই হইল যে, সমগ্র সৃষ্টি অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইল; প্রলয়কাল আসিল ভাবিয়া, চরাচর ত্রাসযুক্ত হইল। মহাদেব তখন ললাটদেশে তৃতীয় নয়ন প্রকাশ করিলেন; এবং সেই নয়নের দীপ্তি বা তেজে পর্বত, অরণ্য প্রভৃতি দগ্ধ হইতে লাগিল। দেবী তখন মহাদেবের চক্ষু-দুইটি হইতে ক্রীড়াবিন্যস্ত কর অপসারণ করিলেন। মদনভস্মের গল্প মহাভারতে নাই; কিন্তু এই উপাদানই উহার মূল। তিলোত্তমার অনুসন্ধানে চারিদিকে মুখ ফিরাইতে গিয়া চতুর্মুখ হইয়াছিলেন, লিখিত হইয়াছে; এখনও পর্যন্ত ব্রহ্মাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া পঞ্চবক্ত্র হন নাই। অন্যত্র দেখিতে পাই যে, মন্বন্তর সময়ে কৃষ্ণবর্ণ নারায়ণ উঁহার শুভ্র কণ্ঠে হাত দিয়াছিলেন বলিয়া, মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারা গেল যে, এই ইতিহাস সাগরমন্থনের পৌরাণিক গল্পের পূর্বে। এক দিকে ব্রহ্মা যেমন স্তব-স্তুতি করিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন, সেইরূপ পিনাকধারী শর্বের মহিমাও অন্যপ্রকার ইতিহাস দিয়া মহাদেবে আরোপিত হইল। এই বর্ণনায় শর্বদেব একা নহেন, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাণি বুদ্ধও মহাদেবের নব ব্রহ্মাত্বে নির্বাণলাভ করিলেন। বুদ্ধমূর্তির সহিত একতার কথা পরে লিখিতেছি। ধীরে ধীরে নূতন নূতন ব্যাখ্যা দিয়া যে, নবদেবতার সৃষ্টি হইল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

যদি কেহ বলেন যে, মহাভারতের এই অধ্যায়গুলি সর্বৈব প্রক্ষিপ্ত; তাহাতেও মহাদেবের নূতনত্ব দূরীভূত হয় না। এই কথাগুলি যখন রামায়ণে এবং পুবাণে অধিক পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন যে উহা রামায়ণ এবং পুরাণগুলির পূর্ববর্তী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অধ্যায়গুলিকে প্রক্ষিপ্ত করিতে গেলে, মহাভারতের সময়েও মহাদেবের নববিগ্রহ প্রকাশ পায় নাই, এই কথা স্বীকার করিতে হয়। প্রক্ষিপ্তের তর্কটা হয়তো উঠিবে না।

গুপ্তরাজাদের চতুর্থশতাব্দীর প্রারম্ভের প্রস্তরলিপিতে নূতন মহাদেবের তত প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই না। কিন্তু উঁহাদের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর লিপিতে মহাদেবের প্রভাব সুবিস্তৃত। ৪০১ খ্রিস্টাব্দের পরে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, শম্ভুর জন্য, পর্বতের গুহায় আয়তন নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পর স্কন্দগুপ্তের সময় সম্পূর্ণ পৌরাণিকবর্ণনাযুক্ত মহাদেব পাই। যশোধর্মার ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের মাণ্ডাসোরের প্রস্তরলিপির আরম্ভেই দেখিতে পাই, 'স জয়তি জগতাং পতিঃ পিনাকী'। এই প্রস্তরলিপিতে আছে—

স্বয়ম্ভুর্ভূতানাং স্থিতিলয়সমুৎপত্তিবিধিষু

প্রযুক্তো যেনাজ্ঞাং বহতি ভুবনানাং বিধৃতয়ে॥
পিতৃত্বঞ্চানীতো জগতি গরিমাণং গময়তা
স শম্ভুর্ভূয়াংসি প্রতিদিশতু ভদ্রাণি ভবতাম্॥

এখানে ব্রহ্মা একেবারে মহাদেবের আজ্ঞাবাহক; ব্রহ্মার গৌরব, প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই প্রস্তরলিপিতে একটা পরবর্তী শ্লোকে মহাদেবকে নাগবেষ্টিত বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে; এই স্বরূপটির উৎপত্তির কথা পরে বলিতেছি। তর্ক উঠিতে পারে যে, শত শত প্রস্তরলিপির মধ্যে হয়তো অল্প কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে, তখন ইহা হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া কি সঙ্গত? উত্তরে এই কথা বলিতে পারি যে, একদিকে তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বের সাহিত্যে যখন নূতন দেবতার পরিষ্কার নিদর্শন পাওয়া যায় না, এবং অন্যদিকে ষষ্ঠ শতাব্দীর কাব্যাদিতে যখন তাঁহার সম্পূর্ণ রাজত্ব, তখন মধ্যবর্তী সময়ে যে উঁহার পূজা ধীরে ধীরে প্রবলতা লাভ করিয়াছিল, এই অনুমানই সঙ্গত। প্রস্তরলিপি হইতেও সেই কথাই সমর্থিত হয়। হইতে পারে যে, আরও প্রস্তরলিপি পাইলে, অনেক নূতন কথা পাওয়া যাইত; কিন্তু যাহা পাওয়া যায়, তাহা যখন অন্যদিকের কথার অননুরূপ নহে, তখন দৃষ্টান্তগুলি গ্রহণ করা চলে। অপর পক্ষে আবার, ঠিক বিরোধী কথার প্রস্তরলিপিগুলিই পাওয়া গেল না, এটাও আশ্চর্য।

পৌরাণিক যুগের উৎপত্তির ইতিহাসের একটু আভাস না পাইলে, যে অবস্থায় নবদেবকল্পনা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে না বলিয়া, সংক্ষেপত সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় হইতে অশোকের সময় পর্যন্ত ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, গোড়ায় বৌদ্ধ ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের বড় বিবাদ ছিল না। ব্রাহ্মণেরা বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব যাহা বলিবেন, লোকে তাহাই গ্রহণ করিবে, এবং শূদ্রাদি জাতি সেই ধর্মে অধিকারী নহেন, এইটিই ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিশেষ লক্ষণ ছিল। বুদ্ধদেব এই বিশেষত্বের এবং যজ্ঞাদির বিরোধী ছিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু বুদ্ধদেব যেমন যজ্ঞাদি অসার বলিয়া নূতন পন্থা বাহির করিয়াছিলেন, হিন্দুরাও তেমনি উপনিষদাদিতে যজ্ঞাদির অসারত্বের কথা বলিতেছিলেন, বেদকেও অপরা বিদ্যার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইজন্যই, বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সহিত সদ্ভাব না থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্ম নির্বিবাদে পাশাপাশি বর্ধিত হইতেছিল। পৌরাণিক যুগ আরম্ভ পর্যন্তও, হিন্দুরা বৌদ্ধদের চৈত্যাদিতে এবং বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগকে, দানাদি করিয়া তুষ্ট করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু আরও অন্যান্য কারণে, এবং বিশেষত একটি রাজনৈতিক কারণে, বৌদ্ধ বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজনৈতিক কারণটি এই যে, মৌর্যরাজগণ ভারতবর্ষের বাহিরে বহু দেশে ভারতগৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বের অবসানে নানাশ্রেণীর যবনেরা বৌদ্ধধর্মের দোহাই দিয়া বহুদিন ধরিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া, যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজত্বস্থাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধবিদ্বেষ স্বাভাবিক; তখন বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইবার চেষ্টাও, দেশরক্ষার জন্য স্বাভাবিক। একটু মিলাইয়া না লইয়া চলে না বলিয়া, মিলনের উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছিল। সামাজিক অবস্থাও ইহাদের মিলনের অনুকূল

ছিল। এই অবস্থা হইতেই নূতন পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি। সেই কথাটাই এখানে বলিব।

ধর্মের তত্ত্ব অবগত হইবার পক্ষে, এবং মুক্তিলাভ করিতে, সকলের অধিকার আছে বলিয়া, দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক বৌদ্ধ হইয়াছিল। এই ধর্মবিপ্লবে অনেক শূদ্রের শূদ্রত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল; এবং আর্য অনার্য-মিশ্রণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতকার, শান্তিপর্বের ৬৯তম অধ্যায়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, কালে কালে ব্রাহ্মণেরা দাস হইয়া গিয়াছেন, এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। দেশে আর খাঁটি আর্যজাতি নাই, আর্য ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই শূদ্র ; এই কথা আবার সভাপর্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। আক্ষেপের কথা যাহাই হউক, শূদ্রেরা যে মহাভারত রচনার যুগে বিলক্ষণ গণ্যমান্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা শান্তিপর্বের ৮৫তম অধ্যায়ে রাজাদের মন্ত্রিসভার গঠননীতিতে দেখিতে পাই। লিখিত হইয়াছে যে, মন্ত্রিসভায় অন্যূন ৫০ বর্ষবয়স্ক ৪ জন ব্রাহ্মণ, ৮ জন ক্ষত্রিয়, ২১ জন বৈশ্য এবং ৩ জন শূদ্র থাকিবেন। নানাশ্রেণীর লোকেরা যখন দলে দলে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তখন তাহারা অনেক বিষয়ে আপনাদের কুলরীতি পরিত্যাগ করে নাই। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরতত্ত্বাদির কথা কখনো মীমাংসিত হইতে পারে না ; এজন্য, ঐ সকল কথার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, কেবল ব্যবহার ও আচারনীতির সুশিক্ষা এবং সাধনা দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিয়া দুঃখাতীত নির্বাণ লাভ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বংশগত সংস্কার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয় নাই বলিয়াই, অনেক লোক অতিশীঘ্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধদের দলপুষ্টি করিয়াছিল। যে যাহার যে কুলদেবতা অথবা ভূতপ্রেতজীবজন্তুর পূজা করিত, সেগুলি বজায় রাখিয়াই সে বৌদ্ধ হইয়াছিল। অন্যদিকে আবার, যখন মৌর্যগৌরবের অবসানে বৌদ্ধধর্মের জ্বলন্তভাব নিবিয়া আসিতেছিল, তখন নিরীশ্বরতা এবং সংসারবৈরাগ্য বড় কঠোর হইয়া উঠিল। কেহ আর পূর্বের আদর্শ বজায় রাখিতে পারিল না। শূন্যবাদ লইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া, বুদ্ধদেবের মূর্তিকেই উপাস্য করিয়া, স্বাভাবিক পূজা করিবার প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনের বন্দোবস্ত হইল। মৌর্যরাজত্বের অবসানে খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে এইপ্রকার অনুষ্ঠানের আরম্ভ, তাহা বৌদ্ধ ইতিহাসেই পাই। বুদ্ধদেবের মূর্তির সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিয়া, পুষ্পাদি উপহার দিয়া, পূজা আরম্ভ হইল। একন কি, ধর্মচক্র এবং বোধিদ্রুমেবও পূজা চলিল। কিছুদিন পরেই আবার বৌদ্ধ সাধুগণের মূর্তিও পূজিত হইল; এবং পরে আবার তাঁহাদের মূর্তিগুলি রথে স্থাপন করিয়া, রথ টানিয়া উৎসব চলিতে লাগিল। এই সময়ে বুদ্ধদেবের নামে পুরাণাদি রচিত হইয়া তাঁহাকেই ঈশ্বর করিয়া তোলা হইল। যেমন করিয়া হউক, শূন্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অবশ্য হিন্দুদের দেবতাগণ চিরদিনই এমন ভাবে বর্ণিত যে, তাঁহাদের একটা ছবি পাওয়া যাইত। কিন্তু যজ্ঞবেদিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আহুতিদ্বারাই পূজার ব্যবস্থা ছিল; কোনো মূর্তি, রচিত বা স্থাপিত হইত না। প্রায় খ্রি. পূ. ১৩০ অব্দে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা দেবতাদের ছোট ছোট মূর্তি গড়িয়া, লোকের গৃহে লইয়া বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা এই অভিনব কার্যের জন্য 'দেবল'নাম পাইয়াছিলেন। নূতন প্রথাটা বৌদ্ধদের

অনুকরণ বলিয়া, পরবর্তী সময়ের মনুসংহিতায়ও দেবল ব্রাহ্মণেরা অতি নীচ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। প্রথাটা যে উল্লিখিত সময়ে নূতন প্রবর্তিত, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি তাহার সাক্ষী। কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি যে ঐ সময়ে প্রাদুর্ভূত, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থে গ্রীক্ যবন এবং শকদের তৎসাময়িক যুদ্ধাদির কথার উল্লেখে প্রমাণিত। কিন্তু দেবলেরা তখনও প্রতিমাপূজা প্রবর্তিত করাইতে পারেন নাই। প্রমাণ মহাভারত। ঐ গ্রন্থে ধর্মের অনুশাসনে সকলপ্রকার যাগযজ্ঞের কথা আছে, কিন্তু কোথাও দৃষ্টান্তচ্ছলেও, প্রতিমা বা মন্দির গড়িবার কথা নাই। প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা না থাকিলেও, কালোচিত কল্পনায়, নূতন পুরাণ এবং নূতন দেবতা সৃষ্ট হইতেছিলেন।

বৌদ্ধবিপ্লবেই হউক, অথবা কালমাহাত্ম্যেই হউক, বৈদিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবলমাত্র বৈদিক যজ্ঞে আর কুলাইল না বলিয়া, এবং সাধারণের মন বৌদ্ধ পুরাণে এবং অনুষ্ঠানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল বলিয়া, বৈদিক ভিত্তিটা উপলক্ষমাত্র করিয়া নূতন পৌরাণিক আখ্যায়িকা রচিত হইতে লাগিল। এইজন্যই রামায়ণাদি শূদ্রাদি সর্বজাতির পাঠ্য করিয়া রচিত; এইজন্যই দেখিতে পাই যে, বেদের সহিত মহাভারতের কোনো প্রকৃত সংস্রব না থাকিলেও, এবং মহাভারতে নূতন আখ্যায়িকা এবং আদর্শের সৃষ্টি হইলেও, মহাভারত পঞ্চম বেদ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, তুলাদণ্ডে বেদচতুষ্টয়ের সহিত ওজনে, মহাভারত অধিক ভারী হইয়াছিল।

রাজনৈতিক কারণে যে মিলন প্রার্থনীয় হইয়াছিল, তাহার সুবিধা এবং অবকাশ হইল। মিলন স্থাপন করিতে হইলে, পরের সামগ্রী কিছু লইতে হয়; তাই বুদ্ধমূর্তিই হিন্দু শিব হইয়াছিলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্বে, যখন বুদ্ধশিষ্যেরা মহাশূন্যের ব্যাখ্যা করিতেন, তখনও ধ্যানবলে অমানুষিক এবং অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা লাভ হয় বলিয়া উঁহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নিরবলম্ব ধ্যান এবং সাধনা হইতে বড়-কিছু পাওয়া গেল না দেখিয়া, বৌদ্ধেরা ভাবিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেব অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন। সেই ক্ষমতার লোভে ইঁহারা যোগ ধরিলেন, এবং বুদ্ধদেবকে যোগস্থ ঈশ্বর করিলেন। হিন্দুরাও সেই সময়ে কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহারাও যোগে অতিপ্রাকৃত শক্তি কলুষিত হয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের যোগশাস্ত্রের উপর যে বৌদ্ধ বিশ্বাসের প্রভাব ছিল, তাহা ঐ গ্রন্থের সূত্রেই পাওয়া যায়। প্রয়োজন বোধ করিলে পাঠকেরা ডা. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সোসাইটির ছাপা যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িতে পারেন। যোগবলের অনেক ক্ষমতার মধ্যে বৌদ্ধেরা এ কথা বিশ্বাস করিতেন যে, যোগসাধনা করিলে কোনো হিংস্রজন্তু অনিষ্ট করিতে পারে না; এমন কি, বিষাক্ত সর্পের দংশনেও ক্ষতি হয় না। নির্বাণ ধ্যান করিলে বাসনার দংশন হইতে মুক্তিলাভ করা যাইত। এখন তাহার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ শারীরিক ফলে বিশ্বাস জন্মিল। প্রতিযোগিতাতেই হউক অথবা মিলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই হউক হিন্দুগণ, যোগীশ্বররূপে মহাদেবের নাগবেষ্টিত ধ্যানস্থ মূর্তি স্থাপন করিলেন। যাঁহারা এই যুগের বুদ্ধ এবং শিবের প্রস্তরমূর্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তটি সত্য বলিবেন। পরেও বহুকাল পর্যন্ত এই শিব—মহাদেব কি বুদ্ধ, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল;

তাই ভক্তিশতকে দেখিতে পাই—

> জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং যচো
> যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
> যস্যাহেতুরনন্তনিত্যসুখদানস্বা কৃপামাধুরী
> বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে॥

কেবল যে বুদ্ধদেবের মূর্তিটিকে বৈদিক আভরণে শিব সাজানো হইয়াছিল, তাহাই নয়; বিষ্ণু এবং শিবের মন্ত্রে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ সাধুদিগের প্রতিমূর্তির পূজারও ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে অনেক বৌদ্ধ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। মহারাজ গুপ্ত হইতে ১ম চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত সকলেই মনুর বিধান অনুসারে যজ্ঞাদির পুনঃস্থাপনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এ কথা তাঁহাদের প্রস্তরলিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যে, বৌদ্ধচৈত্যাদির অনুরূপ হিন্দুচৈত্য নির্মাণ করিয়া দেবতাস্থাপন করিতেছিলেন। তাহার পর সমুদ্র গুপ্ত, ২য় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত যখন নূতনভাবে দেবমন্দির এবং প্রতিমাদি প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে অর্হত মহাবীর, স্বামী মহাসেন প্রভৃতি বৌদ্ধসাধুগণের জন্যেও আয়তন স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়টা খ্রিস্টোত্তর ৩৫০ হইতে ৪৬৮ পর্যন্ত। অল্পদিনের মধ্যেই এই মহাবীর এবং মহাসেন প্রভৃতি মহাদেব বলিয়া পূজ্য হইয়া উঠিলেন।

এ পর্যন্ত যাহা বলা গেল, তাহাতে বৌদ্ধ উপাদান দিয়া যে শিব গঠিত হইয়াছিল, তাহা যথাসাধ্য দেখাইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার আর-একটি অনুমান আছে, তাহাও বলি। তুরাণীয় শকেরা খ্রিস্টোত্তর ১ম শতাব্দীতে কাশ্মীর অধিকার করিয়া ভারতবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন, সকলেই জানেন। ইঁহাদের এই প্রথম শতাব্দীর মুদ্রাতেই বৌদ্ধচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে শৈবচিহ্ন দেখা যায়। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই কিছু ইঁহারা হিন্দুদিগের শৈবধর্ম গ্রহণ করেন নাই; বিশেষত ইঁহারা বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলে কুলধর্ম ত্যাগ করিতে হইত না, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এইজন্য মনে হয় যে, এই শিব তাঁহাদের কূলদেবতা ছিলেন। ক্ষমতাশালী রাজারা সকলেই ক্ষত্রিয় হইতেন, ইঁহারাও পরে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়দের কুলদেবতারা যে নূতন দেবতা হইয়া গিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ আছে। শিবের গোড়াপত্তনটা এই শকদিগের শিব হইতে নহে তো? রজতগিরিনিভ মহাদেব উত্তর-দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, কৈলাসপর্বতে তাঁহার আবাস, এবং কেবল বৈবাহিক সম্বন্ধে হিমালয়ের সহিত সংযুক্ত, একথায় যেন অনুমানটা বড় অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে না। কণিষ্ক বড় ক্ষমতাশালী ছিলেন; ইঁহার শকাব্দ পর্যন্ত হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিলনস্থাপন করিতে হইলে প্রতিপক্ষীয়ের বড় একটা রাজার জিনিস লইয়াই মিলন সম্ভব।

এখনও পর্যন্ত নূতন মহাদেবের সকল স্বরূপ পাওয়া যায় নাই। নিম্নস্তরের বৌদ্ধ এবং দেশব্যাপী অনার্যজাতির প্রভাবে, যে সকল দেবতাস্বরূপ, মহাদেব প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহার উল্লেখ বারান্তরে করিব।

☐ *বঙ্গদর্শন*, ২য় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১২৮০

সমাজ-তত্ত্ব : হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

'হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্ব চরাচরে,
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য! সে বাক্য উদার
এই ভাবতেরি। যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয় সরল প্রাণ বন্ধনবিহীন,
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্যজ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্বত পাষাণ
তাঁরা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে,
কোনোখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ!'

করতল-চট্‌চটাধ্বনি-মুখরিত সভাগৃহে হিন্দুজাতির মহিমা, সময়ে অসময়ে, পরিকীর্তিত হইয়া থাকে। চাটুবাদলোলুপ বাগ্মিগণ 'আমরা হিন্দু', 'আমরা আর্য', 'আমরা শ্রেষ্ঠ' এবঞ্জাতীয়ক গৌরববচনমধু শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আর্যদিগের গৌরব কোন্ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোন্ মন্ত্রে পরিরক্ষিত, তাহা হইলে কেবল একটা বাঙ্‌নিষ্পত্তিবিহীন মস্তক কণ্ডূয়ন সূচনা দৃষ্ট হয় মাত্র।

কোনো বিষয় বলিতে গেলে, দুই প্রকারে বলা যায়। 'নেতি' 'নেতি' ইহা নয়, উহা নয়, তাহা নয়, ইহাকে বলে বস্তুর নঞ্‌সংজ্ঞক পরিচয়। পাবার বস্তুটি এইরূপ, ইহাকে বলে স্বরূপ পরিচয়।

হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা অগ্রেই বলা যাউক! হিন্দুর হিন্দুত্ব কোনো ধর্ম্মমতের অপেক্ষা করে না। সাংখ্যদর্শন বেদান্তের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তত্রাচ সাংখ্য-প্রণেতা একজন পূজনীয় হিন্দু ঋষি।

বৈষ্ণবচূড়ামণি রামানুজ বেদান্তের অদ্বৈতবাদী আচার্যদিগকে মায়াবাদী ও প্রছন্ন-বৌদ্ধ বা নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখনও দাক্ষিণাত্যে কোনো বৈষ্ণব শিবমন্দিরের ছায়াস্পর্শ এবং শৈবদিগের সহিত আহারাদি করেন না। মাধবাচার্য আবার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চমকার সাধক ছাগমহিষহননকারী শাক্তের সহিত নিরামিষাশী জৈনের এত প্রভেদ যে বর্ণনায় কুলাইয়া উঠে না। কিন্তু শৈব ও হিন্দু, বৈষ্ণব ও হিন্দু এবং জৈনকেও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। যদি মতামত লইয়া হিন্দুত্ব গঠিত হইত তাহা হইলে হিন্দুসংজ্ঞা অনেক দিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

হিন্দুর হিন্দুত্ব আহারপান বিচারের উপরেও নির্ভর করে না। এক মহামাংস ভক্ষণ ব্যতীত খাদ্যাখাদ্যের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। শিখেরা শূকর মাংস ভক্ষণ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পাঞ্জাবের অধিবাসীরা কুক্কুটমাংস ভোজন করে। শিখেরা তাম্রকূট সেবন করে না কিন্তু মদিরা পান করে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা মৎস্যাশী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলকে পতিত ও ভ্রষ্ট মনে করে। এমন কি পুরাতন সংহিতাকারগণ মহামাংস ভোজনের বিধি দিয়াছিলেন। এখন কাহাকে হিন্দু বলিব এবং কাহাকে হিন্দুত্ব হইতে অপসারিত করিব? মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বা শিখদিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দুজাতি যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে সে বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। যদি হিন্দুত্ব ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধিসাম্যের উপর নির্ভর না করে তবে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা কোথায়? কোন্ আলম্বে হিন্দু জাতীয়তা আলম্বিত আছে?

হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার, বর্ণাশ্রমধর্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা। এই প্রবন্ধে হিন্দুর একনিষ্ঠা সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু কিরূপে সেই একমুখীন আর্যবুদ্ধি বর্ণাশ্রমবিভাগে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে বার বার রক্ষা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে তাহা যথাসময়ে পর্যালোচিত হইবে।

দর্শনশাস্ত্রে বলে, মানুষ নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে চিন্তা করে। সেই সকল অপরিবর্তনীয় বিধি অতিক্রম করিলেই ভ্রম প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচ্যই হউক আর প্রতীচ্যই হউক দর্শনচিন্তাবিধি একই। এই নির্ধারণ একান্ত শিরোধার্য। তথাপি হিন্দুচিন্তাপ্রণালীর বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উপরে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে বিধিগত পার্থক্য নাই বটে কিন্তু প্রণালীগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

দুইটি পক্ষী এক নীড়ে বাস করিত। একটি পক্ষপুট বিস্তার করিয়া ঊর্ধ্বে অনন্তের দিকে উঠিল, মোঘাকাশ ছাড়াইয়া গ্রহতারকামণ্ডিত নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া ছায়া পথে পৌঁছিল। এই দিগ্বিহীন শূন্যে আনন্দের গভীরতায় ডুবিয়া বলিল, অনন্তপরমব্যোমে ভূমানন্দ, অসঙ্গানন্দ প্রতিষ্ঠিত। আর একটি পক্ষী উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিগ্‌দিগন্তর পরিক্রম করিল, অনন্তের আবাস অনুসন্ধানে। কত সৌন্দর্য, কত সম্বন্ধ, কত কার্যকারণঘটিত সুষমা দেখিল। প্রকৃতির মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্থির করিল— অনন্তের অখণ্ডত্ব সমন্বয়ে, সংশ্লেষে, সঙ্গমে নিহিত আছে। প্রথমটি আর্য ঋষি, দ্বিতীয়টি যুনানি বা গ্রিক দ্রষ্টা।

দুইটি মৎস্য জলধির স্বরূপ নির্ণয়োদ্দেশে তীর্থযাত্রা করিল। একটি ডুবিল, গভীরতা হইতে গভীরতায় প্রবেশ করিল। শেষে অতল-তলদেশে আগত এবং তূষ্ণীভূত। অপরটি পারদৃশ্বজ্ঞানালাভবাসনায় ক্রমবন্ধন করিল। প্রখর স্রোত প্রতিরোধী বলের সহিত উত্তাল তরঙ্গাঘাতকে তুচ্ছ করিয়া সন্তরণ করিতে করিতে অকূল পাথারে হারাইয়া গেল। হতবুদ্ধি হইয়া অনন্তের বিস্তারহীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। প্রথমটি প্রাচ্য হিন্দু, দ্বিতীয়টি প্রতীচ্য জার্মান।

কোনো একটি বস্তুর অবলম্বনে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা হিন্দুর বিশেষত্ব। আর একের সহিত অপরের সম্বন্ধ জানা এবং সম্বন্ধের ভিতর দিয়া একতা দর্শন করা ইউরোপীয় দর্শনের বিশেষত্ব। প্রথমের লক্ষণ একনিষ্ঠতা বা অন্তর্ধান, দ্বিতীয়ের বহুনিষ্ঠতা বা সমাধান। হিন্দু, সূর্যের স্বর্ণকবাট উদঘাটন করিয়া সূর্যের সারভূত নিষ্কল বিরজ হিরণ্ময় পুরুষকে দেখেন। আর ইউরোপীয়েরা সূর্যের সহিত গ্রহের উপগ্রহের সম্বন্ধ দর্শন করিয়া বহুত্বনিহিত সুষমা অবলোকন করেন।

অনেকে হিন্দু-চিন্তার সহিত হিন্দু-ধর্মমতসমূহ মিশাইয়া ফেলেন। তদ্রূপ ইউরোপীয় চিন্তা বলিতে ইউরোপে প্রচলিত ধর্মমত বোঝেন। এইরূপ অন্যান্য ধর্মারোপ ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইউরোপীয় চিন্তা-প্রণালীর প্রভবস্থান পুরাতন গ্রিকদেশ। কিন্তু বর্তমান ইউরোপীয় ও প্রাচীন গ্রিক ধর্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, চিন্তাপ্রণালী ধর্মমত হইতে পৃথক। হিন্দুস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে—

বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাশৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং—

কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, একই চিন্তাস্রোত, সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠচিন্তার গতি নির্ধারণ করা যাউক।

বৈদিক কালে যখন যজ্ঞশালায় কালীকরালীমনোজবা প্রভৃতি সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন আহুতি ভোজন করিত তখন সেই জ্যোতির্ময় প্রকাশের মধ্যস্থিত জাতবেদা পুরোধা অগ্নিদেবকে 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা ঋষিরা পূজা করিতেন। যখন মহাবিক্রমশালী প্রভঞ্জন ধরিত্রীকে আলোড়িত করিত তখন পবনদেবকে 'শংনো বায়ু' বায়ু আমাদের মঙ্গল করুন—এবংপ্রকারে স্তুতি করিতেন। গভীর নির্ঘোষী ওজস্বান্ সিন্ধুনদের বীচিবিক্ষোভে বরুণদেবের ক্রীড়া দেখিতেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, বালক যেরূপ চলনশীল জড়বস্তুতে জীবন আরোপ করে সেইরূপ ঋষিরা জড়শক্তি ও চৈতন্যের ভেদ বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চভূতকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। আর্য ঋষিদের আধ্যাত্মিকদর্শনে একনিষ্ঠতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা কার্যকারণ পরম্পরার সুদীর্ঘ সূত্র ধরিয়া আদিকারণে উপনীত হইতেন না। কোনো শক্তিশালী বা জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিলে সেই প্রকাশের অন্তরে

প্রকাশ-কর্তাকে দেখিতে পাইতেন। ঘোরকৃষ্ণজলদজালের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে যদি বলা যায় যে, তপনতপ্ত জলকণার সমবায়ে এই পয়োবাহের জন্ম হইয়াছে তাহা হইলে মীমাংসার কোনো ব্যবস্থা হয় না। প্রশ্নের তাৎপর্য এই যাহা ছিল না তাহা কিরূপে হইল। মেঘ ছিল না মেঘ হইয়াছে, মেঘের উৎপাদক পূর্ববর্তী জড় প্রক্রিয়া ছিল না, হইয়াছিল; এইরূপে যতই আমরা পশ্চাদ্ভাগে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া যাই না কেন অসতের হাত হইতে এড়াইতে পারিব না। যদি কোটি যোজনে ভ্রমণ করি বা কোটি যুগকে অতিক্রম করি তথাপি নাস্তির রাজ্য অনুল্লঙ্ঘনীয়। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সে-ই বলে আমি ছিলাম না হইয়াছি, আমি আদিতে অসৎ অন্তেতে অসৎ কেবল মধ্যেতে সদ্রূপে প্রতিভাত। কার্যকারণশৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া চলিলে এক মহতী অব্যবস্থার মধ্যে হারাইয়া যাইতে হয়। অন্ধকে চলিতে দেখিলে চক্ষুষ্মান্ চালকের অনুসন্ধান করিতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অন্ধের সমষ্টিতে চক্ষুষ্মতার উৎপত্তি হয় না। অসৎ, জঙ্গম, অস্থাবর, নামরূপসমন্বিত প্রপঞ্চের অন্তরেই সৎ, স্থির, স্থাবর, অনাম, অরূপ, সারতত্ত্ব বাস করে। ঋষিরা ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের অপেক্ষা না করিয়া দৃশ্য বস্তুর গর্ভে একেবারেই অদৃশ্য হিরণ্যগর্ভকে দেখিতেন। এই দৃষ্টিকে একনিষ্ঠতা বলে। আর্য-একনিষ্ঠতার আর একটি গভীরতর লক্ষণ আছে।

অগ্নির দেবতা অগ্নিনামে কেন অভিহিত হইল? বায়ু বরুণ তপনাদিদেবতা কর্তা হইয়াও কার্যের নামে সংজ্ঞিত কেন হইল? কার্যেরও যে নাম কর্তারও সেই নাম। এই সমনামতা দেখিয়া অনেকে মনে করেন আর্য ঋষিরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতিপূজক ছিলেন না, প্রকৃতি ও পুরুষের অভিন্নতার দ্রষ্টা ছিলেন। তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে ঋষি (দৃশি) বলা হইত। কর্তা কোন্ অপূর্ব মায়াশক্তি বলে কার্যরূপে প্রতিভাত হয়, কার্যকারণে ব্যবহারত ভেদ থাকিলেও পরমার্থত তাহারা অভিন্ন—এই অভেদতত্ত্ব সমগ্র বেদ গাথায় গীত হইয়াছে। কর্তা এবং কার্যের অভেদভাব বিশ্বরূপী স্রষ্টার প্রতিবিম্বরূপী সৃষ্টিতে প্রতিভাতি অদ্বিতীয়ের মায়িক বহুত্ব, বৈদিক ঋষিদিগের একমুখীন অন্তর্দৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই একনিষ্ঠ দর্শন ক্রমে ক্রমে স্ফূর্তি লাভ করিয়া বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সাংখ্যদর্শনে দেখা যায় যে সমস্ত ভূতত্ত্ব এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। হিন্দু চিন্তা অগ্রসর হইতে হইতে এই প্রকৃতিবাদের একত্ব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষিরা যে অভেদ দেখিয়াছিলেন তাহা সাংখ্যে পূর্ণতা লাভ করে নাই। সাংখ্যের একত্ব দ্বৈতান্ধকারাবৃত। প্রকৃতি এক পুরুষাতিরিক্ত বস্তু, আপনাতে আপনি অবস্থিত, অস্তিত্বের জন্য সদ্রূপী পুরুষের অপেক্ষা করে না। সমগ্র ভূতপ্রপঞ্চকে সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতিতে একীভূত করা একনিষ্ঠার ফল বটে, কিন্তু দ্বৈতাপত্তি ইহাতে মেটে না। পুরুষ ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, এই বহুত্ব হিন্দুজাতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আজ হিন্দুস্থানে সাংখ্যমতের পোষক একেবারেই নাই বলিলে হয়।

প্রকৃতিবাদের একত্ব অপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের একত্ব গভীরতর। ব্রহ্ম একমাত্র জগতের কারণ। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনো বস্তু নাই। ব্রহ্মের একতার মধ্যেই অনেকতা নিহিত।

যেমন বৃক্ষ এক, কিন্তু মূল ও শাখা প্রভেদে বহু; সমুদ্র এক, কিন্তু লহরীলীলা বহুত্বময়; মৃত্তিকা এক, কিন্তু ঘট শরাবদৃষ্টে বহু; সেইরূপ ব্রহ্ম এক, অথচ বহু। রামানুজের এই সিদ্ধান্ত সাংখ্যের একত্ব হইতে উচ্চতর সন্দেহ নাই, তথাপি আর্য একনিষ্ঠার উচ্চতম বিকাশ নহে। ব্রহ্মের স্বরূপে যদি বহুত্ব অন্তর্নিহিত থাকে তাহা হইলে একত্বের কেবলতা বা শুদ্ধতা থাকে না। ব্রহ্মের সত্ত্বায় যদি বহুতার অপেক্ষা থাকে, অনেকতার আকাঙ্ক্ষা থাকে, সম্বন্ধের প্রয়োজন থাকে; যদি ভূমানন্দে কামনা থাকে, তবে সেই অপেক্ষার সিদ্ধি, আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, কামনার পরিতৃপ্তি কে করিবে? আবার যদি বহুত্বের বীজ পূর্ণব্রহ্মে পারমার্থিকভাবে নিহিত থাকে তাহা হইলে সেই বীজের ক্রমবিকাশ হইলে সদ্বস্তুর পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। পরিণামী ব্রহ্ম ইহা এক অসঙ্গত কথা। ব্রহ্ম যদি পরিণামী হন, তাহা হইলে সেই পরিণামের কারণ কোথায়? ব্রহ্মের বাহিরে তো কোনো বস্তু নাই। ব্রহ্মই আপনার পরিণামের আপনি কারণ। কিন্তু কারণের যোজনা হইলে ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে ব্রহ্মপরিণাম যতদুর হইবার সম্ভাবনা ততদূরই হওয়া ন্যায্য। ক্রমান্বয়ের স্থান থাকিতে পারে না। অধিকন্তু পরিণামের চূড়ান্ততাই পূর্ণতা বা অপরিণামিতা। তবেই সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম যদি নিজের স্থিতির নিজে কারণ হন তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বহুত্ব পরিণামের সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈত একনিষ্ঠতা আছে কিন্তু ঋষিপ্রণোদিত হিন্দুর একমুখীন বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। হিন্দুস্থানে শতকরা দশজনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দুষ্প্রাপ্য।

শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে হিন্দুর একনিষ্ঠতার চরমতৃপ্তি হইয়াছে। বস্তু একভিন্ন পরমার্থত দুই হইতে পারে না। এবং সেই বস্তুর মধ্যে বহুত্বের বীজ অসম্ভব। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, অখণ্ড, অপরিণামী আপ্তকাম; সম্বন্ধনিরপেক্ষ, আত্মরত, অসঙ্গ, শুদ্ধ, কৈবল্যময়। তিনি জগতের কারণ বটেন কিন্তু সেই কারণবীজ তাঁহার সত্তাতে পাওয়া যায় না। তাঁহার জগৎকারণত্ব বা স্রষ্টৃত্ব স্বরূপগত নহে। তাঁহার স্বরূপ কেবল সচ্চিদানন্দময়। তিনি চিদ্বিহীন হইলে অস্তিত্ববিহীন হইয়া যান, কারণ চিৎ এবং অস্তিত্বে কোনো ভেদ নাই। কিন্তু তাঁহার স্রষ্টৃত্ব বা কারণত্ব একটা বাহুল্য বা ঐশ্বর্য মাত্র, তাঁহার স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্রষ্টৃত্বকে অপসারিত করিলে তাঁহার সত্ত্বার উপচয় বা অপচয় হয় না। বাস্তবিকই বেদান্ত একত্বের উচ্চতম আকাশে আরোহণ করিয়াছে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, যতদিন ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব জ্ঞানদৃষ্টিতে অপগত না হয় ততদিন মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই জগৎ মায়াময়, অনৃত, অলীক, সদ্রূপে প্রতিবিম্বিত মাত্র। ইহার অস্তিত্বের ভিত্তি কোথাও দেখা যায় না। বিবর্তনশীল ভূতগ্রাম নিজেতে তো অবস্থিত নহেই আর ব্রহ্মসত্ত্বা মধ্যেও ইহার অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ইহা গান্ধর্বনগরের ন্যায় এক অঘটঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। সেই মায়াশক্তির ব্রহ্মতে অবস্থিত কিন্তু স্বরূপত নহে, বাহুল্যভাবে ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া আছে। একই বহু হইয়াছে, কিন্তু কেবল ব্যবহারত। একের পরিবর্তন হয় না, পরিণাম হয় না, অথচ বহুরূপে প্রতিভাত হয়। ঋষিরা যে অগ্নিদেবতাকে অগ্নি বলিতেন, কার্যের নামে কারণকে অভিহিত করিতেন, সেই একত্বের পরাকাষ্ঠা বৈদান্তিক মায়াবাদেই দৃষ্ট হয়।

একনিষ্ঠ চিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুত্বদর্শন, কর্তা এবং কার্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, বহুত্বের মায়িকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে ইহার পরিণতি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রমধর্মে প্রকটিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্যে। যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠ চিন্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল, যে দিন হইতে বর্ণাশ্রমধর্মের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল, সেইদিন হইতে ভারতের অধঃপতন। আজ কোথায় সেই একনিষ্ঠতা! পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্য সন্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ঋষিদিগের অভেদদৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম পুনরাবির্ভূত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব। অনুকরণে যতদূর উৎকর্ষ হইতে পারে হইবে, কিন্তু অস্থিমজ্জাগত উন্নতি হইবে না।

একনিষ্ঠায় অভ্যুদয়চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা যেন ইউরোপীয় বহুনিষ্ঠার বিরোধী না হই। এই বহুনিষ্ঠা আমাদের জাতীয়তাকে পোষণ করিবে। যেমন আমাদের দেশে বৃক্ষ সকল ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রভাবে পরম শ্রীসম্পন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের চিন্তাপ্রণালী প্রতীচ্য চিন্তা সংস্পর্শে বলীয়সী হইবে। কিন্তু ভূমি ছাড়িলে জীবন ও তেজ শুষ্ক হইয়া যাইবে। অশ্বত্থকে ইংলন্ডে রোপণ করিলে বিজ্ঞানের সহায়তা তাহার কোনো কাজে আসে না। হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং ইউরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রমধর্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ইউরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহাদের ইহ পরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অ-প্রতিষ্ঠ হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও। তবেই হিন্দুর হিন্দুত্ব পরিরক্ষিত হইবে, সংবর্ধিত হইবে, এবং সুফলসম্পন্ন হইবে।

তিন শত্রু

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

কথায় বলে, 'তিন শত্রু দিতে নাই।' কিন্তু এমনি আমাদের পোড়াকপাল যে, ভারতের ভাগ্যদেবতা জীবজ্জাগ্রৎ তিন তিন জন বৈরী আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকোপে আমাদের জাতীয়-জীবনলীলার শেষপালা সমাসন্নপ্রায়। যেমন ত্র্যহস্পর্শের তিথিগুলি একে একে ভালো, কিন্তু সংস্পর্শবশত গড়ে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি তাঁহারা দেশ-কালভেদে নিজে নিজে ভালো হইলেও সম্মিলন-সংঘর্ষহেতু মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কারা?

প্রথম।—বৃথাভিমানী 'হিন্দু'-হিন্দু রব-নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল। তাঁহাদের নিকটে সনাতন ও নূতনে, আর্যে ও অনার্যে, ভগবদগীতায় ও মনসা-ঘেঁটুর গীতে কোনো প্রভেদ নাই। অনুষ্টুপ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হইলেই, তাহাতে যাহাই থাকুক না কেন—আচার, অনাচার, বামাচার—তাহা বেদ। বেদগাথা যদিও ইহাদের কর্ণকুহরে কখনও প্রবেশ করে নাই, তথাপি ইহারা শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বেদে বাষ্পযান ও ব্যোমযানের কথা উল্লিখিত আছে—নহিলে রেলগাড়ি চড়িয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতেন না। একজন মহাদেবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল,—'কোনো গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।'

ভোলানাথ মহেশ ধুতুরার ঘোরে এ নিন্দাবাদকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কোন গুণ নাই' অর্থাৎ বেদান্তবেদ নির্গুণ ব্রহ্ম, আর 'কপালে আগুন' তো বিশেষ বৈভব। গোঁড়া মহোদয়েরা তেমনি স্বদেশগৌরবের নেশায় আমার নিন্দাকে স্তুতি বলিয়া গ্রহণ করিলে, আমাকে ধন্য মনে করিব। তাঁহারা এক কথা জানেন, আর কিছুই জানেন না, শোনেন না। 'হিন্দু' 'হিন্দু' এই তাঁহাদের বুলি। দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-বাণিজ্যে হিন্দুজাতি উৎকর্ষের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। ইউরোপীয়েরা তলদেশে বসিয়া গায়ের জোরে কেবল আস্ফালন করে। হিন্দুর সবই ভালো। শাঁসও ভালো, খোসাও ভালো তণ্ডুলও ভালো, তুষও ভালো। আহা! গোঁড়ামির এই তো প্রকৃত লক্ষণ।

> 'সকণ্টক কইমাছ করয়ে ভক্ষণ।
> গোঁড়ামির এই তুমি জানিও লক্ষণ॥'

এখন ইহাদের গলায় কাঁটা বিঁধিয়া কোন্ দিন না প্রাণটা যায়। এই গোঁড়ারাই দেশের গোঁড়ার শত্রু।

দ্বিতীয়। ইংরাজিনবিশ হিন্দুনামধারী রামপক্ষীভক্ষীর দল। ইহাদের যে পাঠ পড়াও, সেই পাঠই পড়েন। 'রাধাকৃষ্ণ' বলাও, তা-ও বলেন, 'কালীকল্পতরু' ভজাও, তা-ও ভজেন। ইংরেজি সভ্যতার প্রথমাবেগে শ্বেতাঙ্গ গুরুদেবেরা শিখাইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা চিরকালই ইষ্টক কাষ্ঠ পূজা করিয়া আসিতেছে—ঈশ্বর বলিয়া কোনো বস্তু তাহারা জানিতও না, জানেও না। অমনি তথাস্তু বলিয়া হ্যাট্‌কোট্‌রূপ চূড়াধড়া পরিধান করিয়া কাঁটাচামচ বাজাইয়া সাহেবি পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আজ সেই শ্বেতাঙ্গ দেবেরা শিখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা অধ্যাত্মদর্শনের অত্যুচ্চশিখরে উঠিয়াছিলেন. কিন্তু ব্যবহারবিদ্যায় তাঁহারা বড় একটা মন দিতেন না। ধর্মমতে হিন্দু হওয়া চাই, কিন্তু যেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ব্যাপার, সেখানে ইউরোপীয় হওয়াই উচিত। ইউরোপীয়েরা অধ্যাত্মদর্শনের বড় একটা ধার ধারে না। কিন্তু বিজ্ঞান-বাণিজ্য-বিদ্যায় তাহারা জগদ্‌গুরু। হিন্দুরা 'জগৎ মিথ্যা' এই পরমার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছিল, তাই পার্থিব ব্যাপারে তারা বড় উদাসীন ইহার প্রমাণ কি? দেখ আমরা এমনি আধ্যাত্মিক যে লড়াই করি না এবং করিতে আমাদের প্রবৃত্তিও হয় না। আমরা কেমন শান্ত সমাহিত, স্থির, ধীর, অলসগতি। আর ইউরোপীয়েরা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়—এক মাসের পথকে একদিনের করে, সমুদ্রলঙ্ঘন করে, অভেদ্য গিরিকে ভেদ করে—কেবল উদ্যমশীলতা ও ব্যস্ততা। ভীরুতা ও আলস্য কি আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক নহে? যেমনি প্রতীচ্য বুধগণ এই কথা প্রচার করিলেন, অমনি ইংরেজিনবিশ সংস্কারকেরা তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'সত্য বচন!' 'সত্য বচন!!' আমরা ধর্মে হিন্দু—অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ে কোনো মতামত রাখি না—কিন্তু পার্থিব বিষয়ে আমরা ইউরোপকে আদর্শ করিব। এই ইংরেজি শিক্ষিত সভ্যদলটি যথেচ্ছাচারী—না স্থলচর, না জলচর। উভচর কি?

তৃতীয়।—সমন্বয়বাদীর দল। এঁরা জোড়াতাড়া দিয়া একভূত করেন। আমাদেরও কিছু আছে, ওদেরও কিছু আছে, সকলেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে। এই বিকির্ণ কিঞ্চিৎগুলা জড়ো করিয়া একটা স্তূপ বাঁধিলে পূর্ণাবয়ব সর্বাঙ্গীণ সত্য লাভ করা যায়। হিন্দুরা বলে, জগৎ অলীক, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। আর হার্বার্ট স্পেন্‌সর বলেন, জগৎই একমাত্র সত্য ব্রহ্ম বলিয়া কোনো পদার্থ আছে কিনা জানা যায় না। এস, দর্শন ও বিজ্ঞানকে মিলাইয়া দাও এবং পূর্ণসত্য গ্রহণ কর। ব্রহ্ম সৎপদার্থ বটে. কিন্তু একাকী নহে। পাঁচটা ভূত ও সৎও তাঁর চিরসঙ্গী। আমরা বড় ধ্যান করিতে ভালোবাসি, সদাই স্তিমিতলোচন, আর ইউরোপীয়েরা কেবল দৌড়ঝাঁপ করে; এস আমরাও দৌড়াই, কিন্তু চক্ষু মুদিয়া। হিন্দুরা ঈশ্বরপরায়ণ, আর ম্লেচ্ছেরা সংসারভক্ত; যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাও, তবে ঈশ্বর ও সংসার দুই সমান মাত্রায় বজায় রাখ। আমরা কদলীপত্রে ভোজন করি, আর সাহেবেরা টেবিলে খায়; এস আমরা টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাই। সকলেরই মন রাখা উচিত, কাহাকেও ছোটবড় করা ভালো নয়। দুই জমিদার সমান ঘুষ দেওয়াতে কোনো এক ন্যায়বান্ মুন্সেফ রায় দিয়াছিলেন—এক পক্ষের অর্ধেক ডিক্রি অর্ধেক ডিস্‌মিস্, অপর পক্ষেরও অর্ধেক ডিক্রি অর্ধেক ডিস্‌মিস্। পুরাতন সভ্যরা উপহার লইয়া উপস্থিত, নূতনও ভেট পাঠাইয়াছে, এখন কাহাকে ছাড়ি, কাহাকে ফেলি। দুজনেরই

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া একটা পুরা-সভ্যতা গঠন করা চাই। তুফান হইতেছে। মুসলমান মাঝি আল্লার দোহাই দিল, আর পৌত্তলিক হিন্দু আরোহীরা 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিল। ঝড় আল্লাও মানিল না, দুর্গাও মানিল না। ইহা দেখিয়া ইংরেজি-সংস্কৃত-পড়া একজন বাবু 'দুর্গা আল্লা' 'দুর্গা আল্লা' বলিতে আরম্ভ করিল। এই সমন্বয়ের প্রভাবে নৌকা ভরাডুবি হইল, কি ঘাটে পৌঁছিল, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে, আমাদের উদার সমন্বয়বাদী ভ্রাতৃগণ ওঁকার-ববম্‌বম্‌-হালেলুয়া-আমেন-সংমিশ্রিত একটা মন্ত্র প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়াছেন—যাহার প্রভাবে স্বদেশনৌকাটি সহজেই ভবনদী উত্তীর্ণ হইবে। এই মন্ত্রপ্রণেতারাই প্রতিষ্ঠাবিহীন, সর্বনাশী সংস্কারক।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তিন প্রকার উদারতা তিনটি প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রসৃত হইয়াছিল। যুনানি বা গ্রিক সদৃশপ্রিয়তা, রোমক বিসদৃশযোগশীলতা ও হিন্দু সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।

গ্রিকেরা সকল মতের ও ভাবের অসমান, বিসদৃশ অংশ ত্যাগ করিয়া সমান, সদৃশ অংশ গ্রহণ করিত। তাহাদের নৈসর্গিক গুণসকল ভিন্নজাতির সদৃশগুণের সহিত মিশিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গ্রিক দর্শনকারগণ জগতে বিকশিত দেবত্বের ও মনুষ্যত্বের সাধারণভূমি অধিকার করিতে যত্ন করিতেন।

রোমীয়েরা বিসদৃশ পদার্থের একীকরণে পটু ছিল। কোনো দেশে রোমের জয়পতাকা উড্ডীন হইবামাত্র বন্দীদের সহিত তদ্দেশস্থিত দেবতারাও রোমে চালান হইত। রোমবাসীদের বিদেশীয় দেবদেবীর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ছিল না। তাহাদের সম্মিলন করা বড় ভালো লাগিত। মিলুক আর নাই মিলুক, সংখ্যা ও আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইলেই তৃপ্তি হইত। তাহাদের দেবতাদের তালিকা রঙ্‌বেরঙের তালি দেওয়া আউল-ফকিরদের আঙ্‌রাখার মতো। এইরূপ উদারতায় বিসদৃশের মিলন হয় বটে, কিন্তু শ্রীসৌষ্ঠব হয় না।

হিন্দুর উদারতা প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট। একটা মূলতত্ত্ব তাহারা গ্রহণ করে এবং পরে সেই মূলতত্ত্বকে পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্যান্য মতের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। গীতাশাস্ত্র ঐ প্রতিষ্ঠামূলক উদারতার সুমহৎ দৃষ্টান্তস্থল। বেদান্তের সারতত্ত্ব—এক বই দুই বস্তু পরমার্থত হইতে পারে না—ইহাই গীতার মৌলিক শিক্ষা। কিন্তু বহুবাদী-সাংখ্যদর্শন, দ্বৈতবাদী-ভক্তিশাস্ত্র, কঠোর যোগসাধন—সমস্তই সেই সারতত্ত্বে গ্রথিত হইয়াছে। গীতা কারুকার্য-খচিত স্বর্ণথালের ন্যায়। দুইটি মিলাইয়া এক করা হয় নাই, কিন্তু একেরই ঐশ্বর্য-বৈভব বৃদ্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের বিরোধ মিটানো হইয়াছে। গ্রিকেরা বিভিন্ন মতের ভিতর হইতে সাধারণ ভাবটি গ্রহণ করে, রোমীয়েরা অসমানকে পাশাপাশি বসাইয়া ঐক্যস্থাপন করে। কিন্তু হিন্দুরা একটি মৌলিক দেশ-কালাতীত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যান্য সারকথা সেই মূলের মুষায় ঢালিয়া গ্রহণ করে। আমার একটি নৈসর্গিক সুর আছে। বেহালা বা এস্‌রাজের সুরের সহিত আমার সুর মিশাইয়া মিষ্টতা ও বল বৃদ্ধি করি; কিন্তু পাঁচটা যন্ত্রের সংযোগে আমার সুর প্রস্তুত করি না। হিন্দু গ্রহণ করে, সংযোগ করে, কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি ছাড়ে না। এই একনিষ্ঠ উদারতা হিন্দু জাতির বিশেষ গুণ। আজ হিন্দুসন্তানেরা সেই একনিষ্ঠতা—সেই উদারতা হারাইয়া, তেজোহীন ও

অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

একজন 'হিন্দু'-শব্দের অর্থ করিয়াছে—'হীন' ও 'দূরপলাতক'। বাস্তবিকই হিন্দুস্থানের হীনতার অবধি নাই। হিন্দু নিঃসত্ত্ব হইয়াছে। এই দুর্দশার প্রতিকার আবশ্যক। পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া যায় না এবং দাঁড়াইয়া থাকাও শ্রেয়স্কর নহে। অগ্রসর হইতেই হইবে। এখন কোন্ প্রণালীতে আমাদের গতিবিধি নিয়মিত করা উচিত?

প্রথমে আত্মমর্যাদাজ্ঞান আবশ্যক। আমাদের কিছু আছে, আমরা অসার নহি, এইরূপ বোধ হওয়া চাই। অধ্যাত্মদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, বেদান্ত শাস্ত্র এক অপূর্ব, অপরিবর্তনীয় তত্ত্বকথা হিন্দুজাতিকে শুনাইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন গবেষণা যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে সেই বেদান্ততত্ত্ব পরিপুষ্ট ও কার্যকর হইবে না। ইউরোপে অধ্যাত্মদর্শন নাই—ইহা এক ঘোর প্রমাদ। আপ্লাতুলের (Plato) মতো আত্মদর্শী কয়জন জন্মিয়াছে? কান্ত (Kant) ও হেগেলের ন্যায় অদৃশ্যদর্শী অতি বিরল। যদি আমরা দর্শনবিদ্যায় অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে প্রতীচ্যদর্শনকে শিরোধার্য করিতে হইবে; কিন্তু আদান করিতে গিয়া যেন বেদান্তভ্রষ্ট হইয়া না যাই। বেদান্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠাস্থানীয় চিরকালই থাকিবে। কিন্তু জার্মানদর্শনের সহিত সংস্পর্শ ঘটাইয়া তাঁহাকে বিকশিত ও স্ফুটীকৃত করিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, বেদান্ত ব্রহ্মের লক্ষণ সম্বন্ধে আংশিক সত্য বলিয়াছে এবং জার্মান হেগেলও আংশিক কথা বলিয়াছে—দুটা মিলাইয়া পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে—তাঁহারা সত্য যে কি বস্তু তাহার আভাস পর্যন্ত বোধ হয় দেখেন নাই। আর যাঁহারা, বেদান্তেই সব আছে, ম্লেচ্ছদিগকে ঘরে ঢুকাইবার কোনো আবশ্যক নাই, এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা সংস্পর্শজনিত ক্রমবিকাশবিধি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না।

সমাজসংস্কারবিষয়ে এইরূপ আমাদের নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো উচিত। বর্ণাশ্রমধর্মই সেই ভিত্তি। বর্ণাশ্রমধর্ম বলিলে কেহ যেন বর্তমান কর্মভ্রষ্ট শত বিভাগচূর্ণ সামাজিকতা মনে না করেন। ইউরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মকে নষ্ট হইতে দিব না। ঐ সমস্ত ইউরোপীয় প্রথা বর্ণধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ফলকরী হইবে, নহিলে বিষফল ফলিবে।

রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রণালী। জাতীয় মহাসভার নেতারা মনে করেন যে, আমাদের রাজনীতি কিছুই ছিল না। ইউরোপ হইতে ইহার আমদানি করা আবশ্যক। ইউরোপে যেমন লোকের ভোটের উপর রাজ্যশাসন নির্ভর করে, সেইরূপ আমরাও এদেশে ভোট চালাইব। কিন্তু অবহিত হইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ইউরোপের রাজতন্ত্র অর্থোন্নতি-সাপেক্ষ। ব্যবসায়ী বণিকেরা রাজাকে অর্থের লাভ বা হানি দেখাইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদি করতে বাধ্য করিতে পারে। কোনো বিধান বা ব্যবস্থা ধনাগমের সহায় না হইলে একেবারে পরিত্যক্ত হয়। ইউরোপের রাজশক্তি তন্তুবায় ও সুরাজীবীদিগের অর্থলালসার দ্বারা চালিত। ইহা ভালো কি মন্দ, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতি যদি অর্থকরী হয়, তাহা হইলে আমাদের দুর্দশার আর সীমা থাকিবে না। যাহার ধন আছে, যে রাজস্ব দিতে পারে, সে-ই ভোটের উপর হিন্দুস্থানের রাজতন্ত্র

স্থাপিত হইলে, বড়ই এক গোলযোগ বাধিবে। হিন্দুর রাজ্যশাসনপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অস্ত্রজীবী কর্তৃপক্ষ এবং বণিক সম্প্রদায়ের উপর রাজার শক্তির বা শাসনবিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যাঁহারা জ্ঞানী অথচ অর্থহীন, যাঁহারা অস্ত্রসঞ্চালন করিতেন না, ক্রয়বিক্রয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না, এইরূপ সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক-শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের অধিকার ভোট হইতে উদ্ভূত হইত না বা ভোটে বিনষ্ট হইত না। জ্ঞান, বুদ্ধি ও বৈরাগ্যের উপর ঐ শাসনবিধাতৃগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলদৃপ্ত নৃপতি ও অর্থলোলুপ বৈশ্য ঐ সুধীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই পুরাতন হিন্দু শাসন-প্রণালীই ইউরোপীয় প্রণালী অপেক্ষা ভালো কি মন্দ, তাহা আপাতত বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তবে ইহা নিশ্চয়ই যে, যদি আমরা জাতীয়তা ভ্রষ্ট হইতে না চাহি, তাহা হইলে আর্য-রাজনীতিপ্রথাকেই আমাদের নতুন রাজতন্ত্রের ভিত্তি করিতে হইবে। তাহার উপর যত ইচ্ছা ভোট চড়াও, ক্ষতি হইবে না।

ধর্ম, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে কিরূপে আত্মমর্যাদা রাখিয়া উদারভাবে প্রতীচ্য আদর্শ সকল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

মনুষ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্রোতস্বিনী প্রাতঃকালে আমার বৃহৎ খাতাটি হাতে করিয়া আনিয়া কহিল—এ সব তুমি কি লিখিয়াছ! আমি যে-সকল কথা কস্মিনকালে বলি নাই তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ?

আমি কহিলাম—তাহাতে দোষ কী হইয়াছে?

স্রোতস্বিনী কহিল—এমন করিয়া আমি কখনও কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। যদি তুমি আমার মুখে এমন কথা দিতে, যাহা আমি বলি বা না বলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা হইলে আমি এমন লজ্জিত হইতাম না। কিন্তু এ যেন তুমি একখানা বই লিখিয়া আমার নামে চালাইতেছ।

আমি কহিলাম—তুমি আমাদের কাছে কতটা বলিয়াছ তাহা তুমি কী করিয়া বুঝিবে। তুমি যতটা বল, তাহার সহিত, তোমাকে যতটা জানি, দুই মিশিয়া অনেকখানি হইয়া উঠে। তোমার সমস্ত জীবনের দ্বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে। তোমার সেই অব্যক্ত উহ্য কথাগুলি তো বাদ দিতে পারি না।

স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া রহিল। জানি না, বুঝিল কি না-বুঝিল। বোধ হয় বুঝিল, কিন্তু তথাপি কহিলাম—তুমি জীবন্ত বর্তমান, প্রতিক্ষণে নব নব ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছ—তুমি যে আছ, তুমি যে সত্য, তুমি যে সুন্দর, এ বিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্য তোমাকে কোনো চেষ্টাই করিতে হইতেছে না। কিন্তু লেখায় সেই প্রথম সত্যটুকু প্রমাণ করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন এবং অনেক বাক্য ব্যয় করিতে হয়। নতুবা প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষ সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে কেন? তুমি যে মনে করিতেছ আমি তোমাকে বেশি বলাইয়াছি তাহা ঠিক নহে, আমি বরং তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি—তোমার লক্ষ লক্ষ কথা, লক্ষ লক্ষ কাজ, চিরবিচিত্র আকার-ইঙ্গিতের কেবলমাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে। নহিলে তুমি যে কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ ঠিক সেই কথাটি আমি আর-কাহারও কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না, লোকে ঢের কম শুনিত এবং ভুল শুনিত।

স্রোতস্বিনী দক্ষিণ পার্শ্বে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া একটা বহি খুলিয়া তাহার পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কহিল—তুমি আমাকে স্নেহ কর বলিয়া আমাকে যতখানি দেখ আমি তো বাস্তবিক ততখানি নহি।

আমি কহিলাম—আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতখানি আমি তোমাকে ততখানি দেখিতে পাইব? একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে? ঈশ্বরের মতো কাহার স্নেহ?

ক্ষিতি তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল—তুমি কী কথা তুলিলে! স্রোতস্বিনী তোমাকে এক ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আর-একভাবে তাহার উত্তর দিলে।

আমি কহিলাম—জানি। কিন্তু কথাবার্তায় এমন অসংলগ্ন উত্তর-প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে। মন এমন একপ্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যেখানে প্রশ্নস্ফুলিঙ্গ পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয়তো দশ হাত দূরে আর-এক জায়গায় দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। নির্বাচিত কমিটিতে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু বৃহৎ উৎসবের স্থলে যে আসে তাহাকেই ডাকিয়া বসানো যায়। আমাদের কথোপকথন-সভা সেই উৎসবসভা; সেখানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে 'আসুন মশায়, বসুন' বলিয়া আহ্বান করিয়া হাস্যমুখে তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দূর হয়।

ক্ষিতি কহিল—ঘাট হইয়াছে! তবে তাই করো, কী বলিতেছিলে বলো। ক উচ্চারণমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদ কাঁদিয়া উঠে, তাহার আর বর্ণমালা শেখা হয় না। একটা প্রশ্ন শুনিবামাত্র যদি আর একটা উত্তর তোমার মনে ওঠে তবে তো কোনো কথাই এক পা অগ্রসর হয় না। কিন্তু প্রহ্লাদজাতীয় লোককে নিজের খেয়াল অনুসারে চলিতে দেওয়াই ভালো, যাহা মনে আসে বলো।

আমি কহিলাম—আমি বলিতেছিলাম, যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন-কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।

ক্ষিতি মনে মনে ভাবিল—কী সর্বনাশ! আবার তত্ত্বকথা কোথা হইতে আসিয়া পড়িল! স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তিও যে তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য অতিশয় লালায়িত তাহা নহে—কিন্তু একটা কথা যখন মনের অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ লাফাইয়া ওঠে তখন তাহাতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ শেষ পর্যন্ত ধাবিত হওয়া ভাব-শিকারির একটা চিরাভ্যস্ত কাজ। নিজের কথা নিজে আয়ত্ত করিবার জন্য বকিয়া যাই, লোকে মনে করে আমি অন্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে বসিয়াছি।

আমি কহিলাম—বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের

নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই-সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।

ক্ষিতি কহিল—সীমার মধ্যে অসীম, প্রেমের মধ্যে অনন্ত, এ-সব কথা যতই বেশি শুনি ততই বেশি দুর্বোধ হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম মনে হইত যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি বা, এখন দেখিতেছি অনন্ত অসীম প্রভৃতি শব্দগুলা স্তূপাকার হইয়া বুঝিবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি কহিলাম—ভাষা ভূমির মতো। তাহাতে একই শস্য ক্রমাগত বপন করিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। 'অনন্ত' এবং 'অসীম' শব্দ দুটা আজকাল সর্বদা ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য যথার্থই একটা কথা বলিবার না থাকিলে ও-দুটা শব্দ ব্যবহার করা উচিত হয় না। মাতৃভাষার প্রতি একটু দয়ামায়া করা কর্তব্য।

ক্ষিতি কহিল—ভাষার প্রতি তোমার তো যথেষ্ট সদয় আচরণ দেখা যাইতেছে না।

সমীর এতক্ষণ আমার খাতাটি পড়িতেছিল, শেষ করিয়া কহিল—এ কী করিয়াছ! তোমার ডায়ারির এই লোকগুলা কি মানুষ না যথার্থই ভূত? ইহারা দেখিতেছি কেবল বড়ো বড়ো ভালো ভালো কথাই বলে, কিন্তু ইহাদের আকার-আয়তন কোথায় গেল।

আমি বিষণ্ণমুখে কহিলাম—কেন বলো দেখি।

সমীর কহিল—তুমি মনে করিয়াছ, আম্রের অপেক্ষা আমসত্ত্ব ভালো, তাহাতে সমস্ত আঁটি আঁশ আবরণ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়—কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়? তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল। আমার বেবাক বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়াপ্ত করিয়া যে-একটি নিরেট মূর্তি দাঁড় করাইয়াছ তাহাতে দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য। আমি কেবল দুই চারিটি চিন্তাশীল লোকের কাছে বাহবা পাইতে চাহি না, আমি সাধারণ লোকের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি।

আমি কহিলাম—সেজন্য কী করিতে হইবে?

সমীর কহিল—সে আমি কী জানি। আমি কেবল আপত্তি জানাইয়া রাখিলাম। আমার যেমন সার আছে তেমনি আমার স্বাদ আছে; সারাংশ মানুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু স্বাদ মানুষের নিকট প্রিয়। আমাকে উপলক্ষ করিয়া মানুষ কতকগুলো মত কিংবা তর্ক আহরণ করিবে এমন ইচ্ছা করি না, আমি চাই মানুষ আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে। এই ভ্রমসংকুল সাধের মানবজন্ম ত্যাগ করিয়া একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ-আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বই নই, আমি তর্কের সুযুক্তি অথবা কুযুক্তি নই, আমার বন্ধুরা আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্বদা যাহা বলিয়া জানেন আমি তাহাই।

ব্যোম এতক্ষণ একটা চৌকিতে ঠেসান দিয়া আর-একটা চৌকির উপর পা-দুটা তুলিয়া অটল প্রশান্ত ভাবে বসিয়াছিল। সে হঠাৎ বলিল—তর্ক বলো, তত্ত্ব বলো, সিদ্ধান্ত এবং উপসংহারেই তাহাদের চরম গতি; সমাপ্তিতেই তাহাদের প্রধান গৌরব। কিন্তু মানুষ স্বতন্ত্রজাতীয় পদার্থ—অমরতা অসমাপ্তিই তাহার সর্বপ্রধান যাথার্থ্য। বিশ্রামহীন

গতিই তাহার প্রধান লক্ষণ। অমরতা কে সংক্ষেপ করিবে? গতির সারাংশ কে দিতে পারে? ভালো ভালো পাকা কথাগুলি যদি অতি অনায়াস-ভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও, তবে ভ্রম হয় তাহার মনের যেন একটা গতিবৃদ্ধি নাই—তাহার যতদূর হইবার শেষ হইয়া গেছে। চেষ্টা ভ্রম অসম্পূর্ণতা পুনরুক্তি যদিও আপাতত দারিদ্র্যের মতো দেখিতে হয়, কিন্তু মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য তাহার দ্বারাই প্রমাণ হয়। তাহার দ্বারা চিন্তার একটা গতি, একটা জীবন, নির্দেশ করিয়া দেয়। মানুষের কথাবার্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রঙটুকু, অসমাপ্তির কোমলতা দুর্বলতাটুকু, না রাখিয়া দিলে তাহাকে একেবারে সাঙ্গ করিয়া ছোটো করিয়া ফেলা হয়। তাহার অনন্ত পর্বের পালা একেবারে সূচীপত্রেই সারিয়া দেওয়া হয়।

সমীর কহিল—মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প; এইজন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়। কেবল রথ নহে. রথের মধ্যে তাহার গতি সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়। যদি একটা মানুষকে উপস্থিত কর, তাহাকে খাড়া দাঁড় করাইয়া কতকগুলি কলে-ছাঁটা কথা কহাইয়া গেলেই হইবে না; তাহাকে চালাইতে হইবে, তাহাকে স্থান পরিবর্তন করাইতে হইবে, তাহার অত্যন্ত বৃহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তাহাকে অসমাপ্তভাবেই দেখাইতে হইবে।

আমি কহিলাম—সেইটাই তো কঠিন। কথা শেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে এখনও শেষ হয় নাই, কথার মধ্যে সেই উদ্যত ভঙ্গিটি দেওয়া বিষম ব্যাপার।

স্রোতস্বিনী কহিল—এই জন্যই সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি, না, বলিবার ভঙ্গিটা বেশি। আমি এ কথাটা লইয়া অনেকবার ভাবিয়াছি, ভালো বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয় তর্কের খেয়াল অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তখন সেইটাই প্রধান হইয়া উঠে।

ব্যোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল—সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ, না, ভঙ্গিটা শ্রেষ্ঠ ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি, কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন। দেহটা বর্তমানেই সমাপ্ত; জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে; সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রাখিয়াছে। যতটুকু বিষয়রূপে প্রকাশ করিলে ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ; যতটুকু ভঙ্গির দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বৃদ্ধিশক্তি, তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।

সমীর কহিল—সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।

স্রোতস্বিনী কহিল—আমার মনে হয় মানুষের পক্ষেও ঐ একই কথা। এক এক জন মানুষ এমন একটি মনের আকৃতি লইয়া প্রকাশ পায় যে, তাহার দিকে চাহিয়া আমরা পুরাতন মনুষ্যত্বের যেন একটা নূতন বিস্তার আবিষ্কার করি।

দীপ্তি কহিল—মনের এবং চরিত্রের সেই আকৃতিটাই আমাদের স্টাইল। সেইটের

দ্বারাই আমরা পরস্পরের নিকট প্রচলিত পরিচিত পরীক্ষিত হইতেছি। আমি এক একবার ভাবি আমার স্টাইলটা কী রকমের। সমালোচকেরা যাহাকে প্রাঞ্জল বলে, তাহা নহে—

সমীর কহিল—কিন্তু ওজস্বী বটে। তুমি যে আকৃতির কথা কহিলে, যেটা বিশেষরূপে আমাদের আপনার, আমিও তাহারই কথা বলিতেছিলাম। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চেহারাখানা যাহাতে বজায় থাকে আমি সেই অনুরোধ করিতেছিলাম।

দীপ্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল—কিন্তু চেহারা সকলের সমান নহে, এতএব অনুরোধ করিবার পূর্বে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। কোনো চেহারায় বা প্রকাশ করে, কোনো চেহারায় বা গোপন করে। হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতঃই প্রকাশমান, তাহার আলো বাহির করিবার জন্য তাহার চেহারা ভাঙিয়া ফেলিতে হয় না, কিন্তু তৃণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে তবেই তাহার আলোকটুকু বাহির হয়। আমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর মুখে এ বিলাপ শোভা পায় না যে, সাহিত্যে আমাদের চেহারা বজায় থাকিতেছে না। কেহ কেহ আছে কেবল যাহার অস্তিত্ব, যাহার প্রকৃতি, যাহার সমগ্র সমষ্টি আমাদের কাছে একটি নূতন শিক্ষা, নূতন আনন্দ। সে যেমনটি তাহাকে তেমনি অবিকল রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কেহ বা আছে যাহাকে ছড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতে হয়। শাঁসটুকু যদি বাহির হয় তবে সেইজন্যই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ, তাহাই বা কয়জন লোকের আছে এবং কয়জন বাহির করিয়া দিতে পারে।

সমীর হাস্যমুখে কহিল—মাপ করিবেন দীপ্তি, আমি যে তৃণ এমন দীনতা আমি কখনো স্বপ্নেও অনুভব করি না। বরঞ্চ অনেক সময় ভিতর দিকে চাহিলে আপনাকে খনির হীরক বলিয়া অনুমান হয়। এখন কেবল চিনিয়া লইতে পারে এমন একটা জহরির প্রত্যাশায় বসিয়া আছি। ক্রমে যত দিন যাইতেছে তত আমার বিশ্বাস হইতেছে—পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরির। তরুণ বয়সে সংসারে মানুষ চোখে পড়িত না, মনে হইত যথার্থ মানুষগুলো উপন্যাস নাটক এবং মহাকাব্যেই আশ্রয় লইয়াছে, সংসারে কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন দেখিতে পাই লোকালয়ে মানুষ ঢের আছে, কিন্তু 'ভোলা মন, ও ভোলা মন, মানুষ কেন চিনলি না!' ভোলা মন, এই সংসারের মাঝখানে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ্, এই মানবহৃদয়ের ভিড়ের মধ্যে। সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না সেখানে তাহারা কথা কহিবে; লোকসমাজে যাহারা এক প্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইবে; পৃথিবীতে যাহাদিগকে অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখিব তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিস্মৃত আত্মবিসর্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন মহাকাব্যের নায়ক, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজাতি আছে, সেই আত্মীয়তা কোন্ নবদ্বৈপায়ন আবিষ্কার করিবে এবং প্রকাশ করিবে!

আমি কহিলাম—না করিলে কী এমন আসে যায়! মানুষ পরস্পরকে না যদি চিনিবে তবে পরস্পরকে এত ভালোবাসে কী করিয়া? একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে বহু দূরে দু-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরিগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম,

কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না, সে এত সামান্য লোক ছিল। একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল। আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে 'পিসিমা' 'পিসিমা' করিয়া কাতরস্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল। সেই-যে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্বোধ লোক বসিয়া ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া একমনে নকল করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে শূন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ অন্ন টগ্‌বগ্‌ করিয়া না ফুটিয়া উঠিত, ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি সেই দূরকুটিরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না? একদিন যে তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সেদিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গলবার্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল! এই দরিদ্র যুবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণা কাতরতা উদ্‌বেগ জড়িত হইয়া ছিল। সহসা সেই রাত্রে এই নির্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপ্যমান হইয়া উঠিল। বুঝিতে পারিলাম এই তুচ্ছ লোকটিকে যদি কোনো মতে বাঁচাইতে পারি তবে এক বৃহৎ কাজ করা হয়। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিলাম, কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না—আমার সেই ঠিকা মুহুরির মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন খুব মহৎ, তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোনো কবি অনুমান করে নাই, কোনো পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না—একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু খোরাক-পোশাক সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারো মাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে, আর আমাদের মতো দীপ্তিহীন ছোটো ছোটো লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়; পিসিমার ভালোবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায়—মানুষে পরিপূর্ণ।

স্রোতস্বিনী দয়াস্নিগ্ধ মুখে কহিল—তোমার ঐ বিদেশী মুহুরির কথা তোমার কাছে পূর্বে শুনিয়াছি। জানি না, উহার কথা শুনিয়া কেন আমাদের হিন্দুস্থানি বেহারা নিহরকে মনে পড়ে। সম্প্রতি দুটি শিশুসন্তান রাখিয়া তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে। এখন সে কাজকর্ম করে, দুপুরবেলা বসিয়া পাখা টানে, কিন্তু এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে! তাহাকে যখনই দেখি কষ্ট হয়, কিন্তু সে কষ্ট যেন ইহার একলার জন্য নহে—আমি ঠিক বুঝাইতে পারি না, কিন্তু মনে হয় যেন সমস্ত মানবের জন্য একটা বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।

আমি কহিলাম—তাহার কারণ উহার যে ব্যথা সমস্ত মানবের সেই ব্যথা। সমস্ত

মানুষই ভালোবাসে এবং বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ও ভীত। তোমার ঐ পাখাওয়ালা ভৃত্যের আনন্দহারা বিষণ্ণ মুখে সমস্ত পৃথিবীবাসী মানুষের বিষাদ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

স্রোতস্বিনী কহিল—কেবল তাহাই নয়। মনে হয়, পৃথিবীতে যত দুঃখ তত দয়া কোথায় আছে! কত দুঃখ আছে যেখানে মানুষের সান্ত্বনা কোনোকালে প্রবেশও করে না, অথচ কত জায়গা আছে যেখানে ভালোবাসার অনাবশ্যক অতিবৃষ্টি হইয়া যায়! যখন দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে, ছেলেদুটো উঠানে গড়াইতেছে, পড়িয়া গিয়া চীৎকারপূর্বক কাঁদিয়া উঠিতেছে। বাপ মুখ ফিরাইয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছে, পাখা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে পারিতেছে না—জীবনে আনন্দ অল্প, অথচ পেটের জ্বালা কম নহে, জীবনে যতবড়ো দুর্ঘটনাই ঘটুক দুই মুষ্টি অন্নের জন্য নিয়মিত কাজ চালাইতেই হইবে, কোনো ত্রুটি হইলে কেহ মাপ করিবে না—যখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে যাহাদের দুঃখ কষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত, যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না—তখন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর। কিন্তু সেই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালোবাসে এবং ভালোবাসার যোগ্য! আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালোরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন-কি , নিজেকেও ভালোরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখদুঃখবেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলো নিক্ষেপ করা, আমাদের এখনকার কবিদের কর্তব্য।

ক্ষিতি কহিল—পূর্বকালে এক সময়ে সকল বিষয়ে প্রবলতার আদর কিছু অধিক ছিল। তখন মনুষ্যসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল; যে প্রতিভাশালী, যে ক্ষমতাশালী, সেই তখনকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইত। এখন সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্যাদা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন অকৃতী অক্ষমেরাও সংসারের খুব একটা বৃহৎ অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার কাব্য-উপন্যাসও ভীষ্মদ্রোণকে ছাড়িয়া এই সমস্ত মূক-জাতির ভাষা, এই-সমস্ত ভস্মাচ্ছন্ন অঙ্গারের আলোক, প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সমীর কহিল—নবোদিত সাহিত্যসূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।

☐ বৈশাখ ১৩০০

গ্রাম্যসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন শ্রাবণের শেষে নৌকা করিয়া পাবনা রাজশাহীর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম। মাঠ ঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়াছে। ছোটো ছোটো গ্রামগুলি জলচর জীবের ভাসমান কুলায়পুঞ্জের মতো মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে। কূলের রেখা দেখা যায় না, শুধু জল ছলছল করিতেছে। ইহার মধ্যে যখন সূর্য অস্ত যাইবে এমন সময়ে দেখা গেল প্রায় দশ-বারো জন লোক একখানি ডিঙি বাহিয়া আসিতেছে। তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে এক গান ধরিয়াছে এবং দাঁড়ের পরিবর্তে এক-একখানি বাঁখারি দুই হাতে ধরিয়া গানের তালে তালে ঝোঁকে ঝোঁকে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জল ঠেলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে। গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম, অবশেষে বারংবার আবৃত্তি শুনিয়া যে ধুয়াটি উদ্ধার করিলাম তাহা এই—

যুবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।
পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি॥

ভরা বর্ষার জলপ্লাবনের উপর যখন নিঃশব্দে সূর্য অস্ত যাইতেছে এ গানটি ঠিক তখনকার উপযুক্ত কি না সে সম্বন্ধে পাঠকমাত্রেরই সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু গানের এই দুটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল। দেখিলাম, এই গোয়ালঘরের পাশে, এই কুলগাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন ভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিল কটাক্ষপাতে গ্রাম্য কবির কবিতা ছন্দে-বন্ধে সুরে-তালে মাঠে-ঘাটে জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।

জগতে যতপ্রকার দুর্বিপাক আছে যুবতীচিত্তের বিমুখতা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য; সেই দুরগ্রহ-শান্তির জন্য কবিরা ছন্দোরচনা এবং প্রিয়প্রসাদবঞ্চিত হতভাগ্যগণ প্রাণপাত পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যখন গানের মধ্যে শুনিলাম 'পাবনা থেকে আনি দিব টাকা দামের মোটরি', তখন ক্ষণকালের জন্য মনের মধ্যে বড়ো একটা আশ্বাস অনুভব করা গেল। মোটরি পদার্থটি কি তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু তাহার মূল্য যে এক টাকার বেশি নহে কবি তাহাতে সন্দেহ রাখেন নাই। জগতের এক প্রান্তে পাবনা জিলায় যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে প্রতিকূল প্রণয়িনীর জন্য অসাধ্যসাধন করিতে হয় না, পাবনা অপেক্ষা দুর্গম স্থানে যাইতে এবং 'মোটরি' অপেক্ষা দুর্লভ পদার্থ সংগ্রহ করিতে হয় না, ইহা মনে করিলে ভাবযন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত সুসহ বলিয়া বোধ হয়। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রথম

শ্রেণীর কবিরা এমন স্থলে নিশ্চয়ই মানসসরোবরের স্বর্ণপদ্ম, আকাশের তারা এবং নন্দনকাননের পারিজাত অম্লানমুখে হাঁকিয়া বসিতেন। এবং উজ্জয়িনীর প্রথম শ্রেণীর যুবতীরা শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তাছন্দে এমন দুঃসাধ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তাবমাত্র শুনিলে প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

অন্তত কাব্য পড়িয়া এইরূপ ভ্রম হয়। কিন্তু অবিশ্বাসী গদ্যজীবী লোকেরা এতটা কবিত্ব বিশ্বাস করে না। শুদ্ধমাত্র মন্ত্রপাঠের দ্বারা একপাল ভেড়া মারা যায় কি না এ প্রশ্নের উত্তরে ভল্‌টেয়ার বলিয়াছেন, যায়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আর্সেনিক বিষও থাকা চাই। মন-ভারী-করা যুবতীর পক্ষে আকাশের তারা, নন্দনের পারিজাত এবং প্রাণসমর্পণের প্রস্তাব সন্তোষজনক হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাজুবন্ধ বা চরণচক্রের প্রয়োজন হয়। কবি ঐ কথাটা চাপিয়া যান; তিনি প্রমাণ করিতে চান যে, কেবল মন্ত্রবলে, কেবল ছন্দ এবং ভাবের জোরেই কাজ সিদ্ধ হয়—অলংকারের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাব্যালংকারের। এ দিকে আমাদের পাবনায় জনপদবাসিনীরা কাব্যের আড়ম্বর বাহুল্য জ্ঞান করেন এবং তাঁহাদের চিরানুরক্ত গ্রামবাসী কবি মন্ত্রতন্ত্র বাদ দিয়া একেবারেই সোজা টাকা-দামের মোটরির কথাটা পাড়িয়া বসেন, সময় নষ্ট করেন না।

তবু একটা ছন্দ এবং একটা সুর চাই। এই জগৎপ্রান্তে এই পাবনা জিলার বিলের ধারেও তাহার প্রয়োজন আছে। তাহাতে করিয়া ঐ মোটরির দাম এক টাকার চেয়ে অনেকটা বাড়িয়া যায়। ঐ মোটরিটাকে রসের এবং ভাবের পরশপাথর ছোঁওয়াইয়া দেওয়া হয়। গানের সেই দুটো লাইনকে প্রচলিত গদ্যে বিনা সুরে বলিলে তাহার মধ্যে যে-একটি রূঢ় দৈন্য আসিয়া পড়ে, ছন্দে সুরে তাহা নিমেষের মধ্যে ঘুচিয়া যায়, সংসারের প্রতিদিনের ধূলিস্পর্শ হইতে ঐ কটি তুচ্ছ কথা ভাবের আবরণে আবৃত হইয়া উঠে।

মানুষেব পক্ষে ইহার একটা একান্ত প্রয়োজন আছে। যে-সকল সাংসারিক ব্যাপারের দ্বারা সে সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে পরিবৃত তাহাকে সে ছন্দে লয়ে মণ্ডিত করিয়া তাহার উপর নিত্যসৌন্দর্যময় ভাবের রশ্মিপাত করিয়া দেখিতে চায়।

সেইজন্য জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলিতেছে, সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতারের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘবে টাকা-দামের মোটরি নির্মাণ হইতেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠনকার্যও চলিতেছে—তাহার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ডখণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতিদিনের বিচিত্র কাজও চলিতেছে এবং তাহার ছিদ্রে ছিদ্রে চিরদিনের একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে।

পদ্মা বাহিয়া চলিতে চলিতে বালুচরের মধ্যে যখন চকাচকীর কলরব শুনা যায় তখন তাহাকে কোকিলের কুহুতান বলিয়া কাহারো ভ্রম হয় না, তাহাতে পঞ্চম মধ্যম কড়িকোমল কোনোপ্রকার সুর ঠিকমত লাগে না ইহা নিশ্চয়, কিন্তু তবু ইহাকে পদ্মাচরের গান বলিলে কিছুই অসংগত হয় না। কারণ, ইহাতে সুর বেসুর যাহাই লাগুক, সেই নির্মল

নদীর হাওয়ায় শীতের রৌদ্রে, অসংখ্য প্রাণীর জীবনসুখসম্ভোগের আনন্দধ্বনি বাজিয়া উঠে।

গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না থাক্, সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। পদ্মাচরের চক্রবাক সংগীতের মতো, তাহা নিখুঁত সুরতালের অপেক্ষা রাখে না। মেঘদূতের কবি অলকা পর্যন্ত গিয়াছেন, তিনি উজ্জয়িনীর রাজসভার কবি; আমাদের অখ্যাত গানের কবি কঠিন দায়ে পড়িয়াও পাবনা শহরের বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই—যদি পারিত, তবে তাহার গ্রামের লোক তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিত। কল্পনার সংকীর্ণতা-দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্যহিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়; তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্যসাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে; সেইজন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে। বৈষ্ণবী যখন 'জয় রাধে' বলিয়া ভিক্ষা করিতে অন্তঃপুরের অঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন কুতুহলী গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিত বধূগণ তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসেন। প্রবীণা পিতামহী, গল্পে গানে ছড়ায় যিনি আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, কত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় ও কৃষ্ণপক্ষের তারার আলোকে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়া গৃহের বালকবালিকা যুবকযুবতী একাগ্রমনে বহুশত বৎসর ধরিয়া যাহা শুনিয়া আসিতেছে বাঙালি পাঠকের নিকট তাহার রস গভীর এবং অক্ষয়।

গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন-অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাক্‌টার উপর দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটা যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুলফল-ডালপালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।

নীচের সহিত উপরের এই-যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা-ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত

সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প, কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম-রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।

আমার হাতে যে ছড়াগুলি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত পুরাতন কি নূতন নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। কিন্তু দু-এক শত বৎসরে এ-সকল কবিতার বয়সের কমবেশি হয় না। আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পল্লীর কবি যে ছড়া রচনা করিয়াছে তাহাকে এক হিসাবে মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলা যায়; কারণ, গ্রামের প্রাণটি যেখানে ঢাকা থাকে কালস্রোতের ঢেউগুলি সেখানে তেমন জোরের সঙ্গে ঘা দিতে পারে না। গ্রামের জীবনযাত্রা এবং সেই জীবনযাত্রার সঙ্গী সাহিত্য বহুকাল বিনা পরিবর্তনে একই ধারায় চলিয়া আসে।

কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল আধুনিক কাল, দূরদেশাগত নবীন জামাতার মতো নূতন চাল চলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যেও পরিবর্তনের হাত পড়িয়াছে। এজন্য গ্রাম্য ছড়া সংগ্রহের ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা আমাকে লিখিতেছেন—

'প্রাচীনা ভিন্ন আজকালকার মেয়েদের কাছে এইরূপ কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না। বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে উহা জানেন না। দুই-একজন জানিলেও সকলে জানেন না। সুতরাং পাঁচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলে পাঁচ গ্রামের পাঁচজন বৃদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়। এ দেশের পুরাতন বৈষ্ণবীগণের দুই-একজন মাঝে মাঝে এইরূপ কবিতা বলিয়া ভিক্ষা করে দেখিতে পাই। তাহাদের কথিত ছড়াগুলি সমস্তই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক। এইরূপ বৈষ্ণবী সচরাচর মেলে না এবং মিলিলেও অনেকেই একবিধ ছড়াই গাহিয়া থাকে। এমতস্থলে একাধিক নূতন ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত বহু বৈষ্ণবীর সাহায্য আবশ্যক। তবে শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির কৃপায় প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুই-একটি বিদেশিনী নূতন বৈষ্ণবীব 'জয় রাধে' রব শুনিতে পাওয়া বড়ো কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে।'

পূর্বে গ্রাম্য ছড়াগুলি গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদেরও সাহিত্যরসতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ভিখারিনি ও পিতামহীদের মুখে মুখে ঘরে ঘরে প্রচারিত হইত। এখন তাঁহারা অনেকেই পড়িতে শিখিয়াছেন; বাংলার ছাপাখানার সাহিত্য তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছে। এখন গ্রাম্য ছড়াগুলি বোধ করি সমাজের অনেক নীচের স্তরে নামিয়া গেছে।

ছড়াগুলির বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। হরগৌরী-বিষয়ক এবং কৃষ্ণ-রাধা-বিষয়ক। হরগৌরী-বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ে বাঙালির

ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। এক দিকে সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন, আর-এক দিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।

দাম্পত্য-সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিঘ্ন বিরাজ করিতেছে, দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যশৈলটাকে বেষ্টন করিয়া হরগৌরীর কাহিনী নানা দিক হইতে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। কখনো বা শ্বশুর-শাশুড়ির স্নেহ সেই দারিদ্র্যকে আঘাত করিতেছে, কখনো বা স্ত্রী-পুরুষের প্রেম সেই দারিদ্র্যের উপরে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে।

বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্র্যকে মহত্ত্বে এবং দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বৈরাগ্য এবং আত্মবিস্মৃতির দ্বারা দারিদ্র্যের হীনতা ঘুচাইয়া কবি তাহাকে ঐশ্বর্যের অপেক্ষা অনেক বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন।—দরিদ্রসমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় আদর্শ আর কিছুই নাই। 'আমার সম্বল নাই' যে বলে সেই গরিব। 'আমার আবশ্যক নাই' যে বলিতে পারে তাহার অভাব কিসের? শিব তো তাহারই আদর্শ।

অন্য দেশের ন্যায় ধনের সম্ভ্রম ভারতবর্ষে নাই, অন্তত পূর্বে ছিল না। যে বংশে বা গৃহে কুলশীলসম্মান আছে সে বংশে বা গৃহে ধন নাই এমন সম্ভাবনা আমাদের দেশে বিরল নহে। এইজন্য আমাদের দেশে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান সর্বদাই চলিয়া থাকে।

কিন্তু সামাজিক আদর্শ যেমনই হউক ধনের একটা স্বাভাবিক মত্ততা আছে। ধনগৌরবে দরিদ্রের প্রতি ধনী কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া থাকে। যেখানে সামাজিক উচ্চ-নীচতা নাই সেখানে ধনের উচ্চনীচতা আসিয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া দেয়। এইরূপ অবস্থা দাম্পত্য-সম্বন্ধে একটা মস্ত বিপাকের কারণ। স্বভাবতই ধনী শ্বশুর যখন দরিদ্র জামাতাকে অবজ্ঞা করে এবং ধনীকন্যা দরিদ্রপতি ও নিজের দুরদৃষ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে, তখন গৃহধর্ম কম্পান্বিত হইতে থাকে।

দাম্পত্যের এই দুরগ্রহ কেমন করিয়া কাটিয়া যায় হরগৌরীর কাহিনীতে তাহা কীর্তিত হইয়াছে। সতী স্ত্রীর অটল শ্রদ্ধা তাহার একটা উপাদান; তাহার আর-একটা উপাদান দারিদ্র্যের হীনতামোচন, মহত্ত্বকীর্তন। উমাপতি দরিদ্র হইলেও হেয় নহেন, এবং শ্মশানচারীর স্ত্রী পতিগৌরবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দাম্পত্যবন্ধনের আর-একটি মহৎ বিঘ্ন স্বামীর বার্ধক্য ও কুরূপতা। হরগৌরীর সম্বন্ধে তাহাও পরাভূত হইয়াছে। বিবাহসভায় বৃদ্ধ জামাতাকে দেখিয়া মেনকা যখন আক্ষেপ করিতেছেন তখন অলৌকিক প্রভাবে বৃদ্ধের রূপযৌবন বসনভূষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই অলৌকিক রূপযৌবন প্রত্যেক বৃদ্ধ স্বামীরই আছে, তাহা তাহার স্ত্রীর আন্তরিক ভক্তি-প্রীতির উপর নির্ভর করে। গ্রামের ভিক্ষুক কথক গায়ক হরগৌরীর কথায় বারে বারে দ্বারে দ্বারে সেই উক্তি উদ্রেক করিয়া বেড়ায়।

গ্রামের কবিপ্রতিভা এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। শিবকে গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি নেশায় উন্মত্ত করিয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নহে—অসভ্য কোঁচ-কামিনীদের প্রতি তাঁহার আসক্তি প্রচার করিতে ছাড়ে নাই। কালিদাসের অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র ও নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা-বৎ

যোগীশ্বর বাংলার পল্লীতে আসিয়া এমনি দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিন্তু স্থূল কথা এই যে, হরগৌরীর কথা—ছোটোবড়ো সমস্ত বিঘ্নের উপরে দাম্পত্যের বিজয়কাহিনী। হরগৌরীপ্রসঙ্গে আমাদের একান্নপারিবারিক সমাজের মর্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনই হউক, স্ত্রী রূপযৌবন-ভক্তিপ্রীতি-ক্ষমাধৈর্য-তেজগর্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারির অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মানলক্ষ্মী।

হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান। ইহার মধ্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে তাহা আমরা ছাড়িয়া দিতেছি। কারণ, তত্ত্ব যখন রূপকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতে চেষ্টা করে তখন তো সে আপন তত্ত্বরূপ গোপন করে। বাহ্যরূপেই সে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বাংলার বৈষ্ণব অবৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞানী ও মূঢ় সকলেরই পক্ষে উপাদেয়, এই জন্যই তাহা ছড়ায় গানে যাত্রায় কথকতায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে।

সৌন্দর্যসূত্রে নরনারীর প্রেমের আকর্ষণ সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচারিত। কেবল সামাজিক কর্তব্যবন্ধনে ইহাকে সম্পূর্ণ কুলাইয়া পায় না। সমাজের বাহিরেও ইহার শাসন বিস্তৃত। পঞ্চশরের গতিবিধি সর্বত্রই, এবং বসন্ত অর্থাৎ জগতের যৌবন এবং সৌন্দর্য তাঁহার নিত্য সহচর।

নরনারীর প্রেমের এই-যে একটি মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তিবলে সে মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত চন্দ্রসূর্যতারা পুষ্পকানন নদনদীকে এক সূত্রে টানিয়া মধুরভাবে উজ্জ্বলভাবে আপনার চতুর্দিকে সাজাইয়া আনে, যে প্রেমের শক্তি আকস্মিক অনির্বচনীয় আবির্ভাবের দ্বারা এতদিনকার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উপেক্ষিত বিশ্বজগৎকে চক্ষের পলকে সম্পূর্ণ কৃতকৃতার্থ করিয়া তোলে—সেই শক্তিকে যুগে যুগে দেশে দেশে মনুষ্য অধ্যাত্মশক্তির রূপক বলিয়া অনুভব ও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ সলোমন হাফেজ এবং বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী। দুইটি মনুষ্যের প্রেমের মধ্যে এমন একটি বিরাট বিশ্বব্যাপকতা আছে যে আধ্যাত্মিক ভাবুকদের মনে হয়, সেই প্রেমের সম্পূর্ণ অর্থ সেই দুইটি মনুষ্যের মধ্যেই পর্যাপ্ত নহে; তাহা ইঙ্গিতে জগৎ ও জগদীশ্বরের মধ্যবর্তী অনন্তকালের সম্বন্ধ ও অপরিসীম ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করিতেছে।

কাব্যের পক্ষে এমন সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই। ইহা একই কালে সুন্দর এবং বিরাট, অন্তরতম এবং বিশ্বগ্রাসী, লৌকিক এবং অনির্বচনীয়। যদিও স্ত্রীপুরুষের প্রকাশ্য মেলামেশা ও স্বাধীন বরণের অভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজে এই প্রেম লাঞ্ছিত হইয়া গুপ্তভাবে বিরাজ করে, তথাপি ভারতবর্ষের কবিরা নানা ছলে, নানা কৌশলে, ইহাকে তাঁহাদের মধ্যে আবাহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সমাজের অবমাননা না করিয়া কাব্যকে সমাজের বাহিরে স্থাপন করিয়াছেন। মালিনীনদীতীরে তপোবনে সহকারসনাথ-বনজ্যোৎস্না-কুঞ্জে নবযৌবনা শকুন্তলা সমাজকারাবাসী কবিহৃদয়ের কল্পনাস্বপ্ন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম সমাজের অতীত, এমনকি, তাহা সমাজবিরোধী। পুরূরবার প্রেমোন্মত্ততা

সমাজবন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া নদীগিরিবনের মধ্যে মদমত্ত বন্য হস্তীর মতো উদ্দামভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছে। *মেঘদূত* বিরহের কাব্য। বিরহাবস্থায় দৃঢ়বদ্ধ দাম্পত্যসূত্রে কিঞ্চিৎ ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়া মানব যেন পুনশ্চ স্বতন্ত্রভাবে ভালোবাসিবার অবসর লাভ করে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সেই ব্যবধান যেখানে পড়ে হৃদয়ের প্রবল অভিমুখী গতি আপনাকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করিতে স্থান পায়। *কুমারসম্ভবে* কুমারী গৌরী যদি প্রচলিত সমাজনিয়মের বিরুদ্ধে শৈলতপোবনে একাকিনী মহাদেবের সেবা না করিতেন, তবে তৃতীয় সর্গের ন্যায় অমন অতুলনীয় কাব্যের সৃষ্টি হইত কী করিয়া? এক দিকে বসন্তপুষ্পাভরণা শিরীষপেলবা বেপথুমতী উমা, অন্য দিকে যোগাসীন মহাদেবের অগাধস্তম্ভিত সমুদ্রবিশাল হৃদয়, লোকালয়ের নিয়মপ্রাচীরের মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের এমন মহান সুযোগ মিলিত কোথায়?

যাহা হউক, মানবরচিত সমাজ আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত নয়। যে শক্তি সমাজকে সমাজের বাহিরের দিকে টানে সেই সৌন্দর্য সেই প্রেমের শক্তিকে অনন্ত মানসলোকে স্থাপন করিয়া কল্পনার দ্বারা উপভোগ না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। পার্থিব সমাজে যদি বা বাধা পায় তবে দ্বিগুণ তীব্রতার সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে তাহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। বৈষ্ণবের গান যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহাই তাহার প্রধান কারণ। বৈষ্ণবের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছৃঙ্খলতা সৌন্দর্যবন্ধনে হৃদয়বন্ধনে নিয়মিত। তাহা অন্ধ ইন্দ্রিয়ের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ততামাত্র নহে।

হরগৌরীকথায় দাম্পত্যবন্ধনে যেমন কতকগুলি বাধা বর্ণিত হইয়াছে, বৈষ্ণব গাথার প্রেমপ্রবাহেও তেমনি একমাত্র প্রবল বাধার উল্লেখ আছে—তাহা সমাজ। তাহা একাই এক সহস্র। বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই সমাজবাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এমন-কি বৈষ্ণব কাব্যশাস্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। সে গৌরব সমাজনীতির হিসাবে নহে সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহা নিছক প্রেমের হিসাবে। ইহাতে যে আত্মবিস্মৃতি, বিশ্ববিস্মৃতি, নিন্দা-ভয়-লজ্জা-শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কঠিন কুলাচার-লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ রহস্য, তাহার বন্ধনবিহীনতা. সমাজ-সংস্কার স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক-কার্যকারণের অতীত একটা বিরাট ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই কারণে যাহা বিশ্বসমাজে সর্বত্রই একবাক্যে নিন্দিত সেই অভ্রভেদী কলঙ্কচূড়ার উপরে বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের বর্ণিত প্রেমকে স্থাপন করিয়া তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সর্বনাশী, সর্বত্যাগী, সর্ববন্ধনচ্ছেদী প্রেমকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিতে না পারিলে কাব্য হিসাবে ক্ষতি হয় না, সমাজনীতি হিসাবে হইবার কথা।

এইরূপ প্রেমগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর মনে হইতে পারে। কিন্তু ফলত তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। মানবপ্রকৃতিকে সমাজ একেবারে উন্মূলিত করিতে পারে না। তাহা কাজে কথায় কল্পনায় আপনাকে নানাপ্রকারে ব্যক্ত করিয়া তোলে। তাহা এক দিক হইতে প্রতিহত হইয়া আর-এক দিক দিয়া প্রবাহিত

হয়। মানবপ্রকৃতিকে অযথাপরিমাণে এবং সম্পূর্ণভাবে রোধ করাতেই সমাজের বিপদ। সে অবস্থায় যখন সেই রুদ্ধ প্রকৃতি কোনো-একটা আকারে বাহির হইবার পথ পায় তখনই বরঞ্চ বিপদের কতকটা লাঘব হয়। আমাদের দেশে যখন বন্ধবিহীন প্রেমের সমাজবিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ, অথচ তাহাকে শাস্ত্র চাপা দিয়া গোর দিলেও সে যখন ভূত হইয়া মধ্যাহ্নরাত্রে রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্রমধ্য দিয়া দ্বিগুণতর বলে লোকালয়ে পর্যটন করিয়া বেড়ায়, তখন বিশেষরূপে আমাদের সমাজেই সেই কুলমানগ্রাসী কলঙ্ক-অঙ্কিত প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে গুপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য—বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদের সমাজের সেই চিরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবন্ধ কল্পনার বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়বিকার কোথাও স্থান পায় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে তেমনি সৌন্দর্য এবং ভাবের বেগে সেই-সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে। বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে সুরঙ্গমধ্যে পূত সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশপথ নাই। তথাপি এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন? উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানবপ্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস। বৈষ্ণব কবি যে জিনিসটাকে ভাবের ছায়াপথে সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, ইনি সেইটাকে সমাজের পিঠের উপরে দাগার মতো ছাপিয়া দিয়াছেন, যে দেখিতেছে সে-ই কৌতুক অনুভব করিতেছে।

যাহা হউক, মোটের উপর, হরগৌরী এবং কৃষ্ণরাধাকে লইয়া আমাদের গ্রাম্যসাহিত্য রচিত। তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলাদেশের একটা বড়ো মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের মস্ত ভার। কন্যাদায়ের মতো দায় নাই। কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্। সমাজের অনুশাসনে নির্দিষ্ট বয়স এবং সংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সেই কৃত্রিম তাড়না-বশতই বরের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তাহার রূপ গুণ অর্থ সামর্থ্যে আর তত প্রয়োজন থাকে না। কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা, ইহা আমাদের সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃপরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা, সর্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একান্নপরিবারে আমরা দূর ও নিকট, এমন-কি, নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই—কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী-স্ত্রী-ব্যতীত পুত্রকন্যা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহারা আমাদের এই দুঃসহ বেদনা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমাদের মিলনধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং ঘুরিয়া

ফিরিয়া সর্বদাই সেই ক্ষতবেদনায় হাত পড়ে। হরগৌরীর কথা বাংলার একান্নপরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎ-সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারিঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।

এই-সকল কারণে হরগৌরীর সম্বন্ধীয় গ্রাম্যছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতা ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই-সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রী পুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানা-পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আম-বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেন তাহা হইলে গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।

শরৎকালে রানী বলে বিনয়বচন
আর শুনেছ, গিরিরাজ, নিশাব স্বপন?

এই স্বপ্ন হইতে কথা-আরম্ভ। সমস্ত আগমনী গানের এই ভূমিকা। প্রতিবৎসর শরৎকালে ভোরের বাতাস যখন শিশিরসিক্ত এবং রৌদ্রের রঙ কাঁচা সোনার মতো হইয়া আসে, তখন গিরিরানী সহসা একদিন তাঁহার শ্মশানবাসিনী সোনার গৌরীকে স্বপ্ন দেখেন, আর বলেন: আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন? এ স্বপ্ন গিরিরাজ আমাদের পিতামহ এবং প্রপিতামহদের সময় হইতে ললিত বিভাস এবং রামকেলি রাগিণীতে শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই তিনি নূতন করিয়া শোনেন। ইতিবৃত্তের কোন্ বৎসরে জানি না, হরগৌরীর বিবাহের পরে প্রথম যে শরতে মেনকারানী স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যুষে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন সেই প্রথম শরৎ সেই তাহার প্রথম স্বপ্ন লইয়াই বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে, যাহাকে পরের হাতে দিয়াছি আমার সেই আপনার ধন কোথায়!

বৎসর গত হয়েছে কত, করছে শিবের ঘর।
যাও গিরিরাজ আনতে গৌরী কৈলাসশিখর॥

বলা বাহুল্য, গিরিরাজ নিতান্ত লঘু লোকটা নহেন। চলিতে ফিরিতে, এমনকি, শোক-দুঃখ-চিন্তা অনুভব করিতে, তাঁহার স্বভাবতই কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। তাঁহার সেই সর্বাঙ্গীণ জড়তা ও ঔদাসীন্যের জন্য একবার গৃহিণীর নিকট গোটাকয়েক তীব্র তিরস্কার-বাক্য শুনিয়া তবে তিনি অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন।

শুনে কথা গিরিরাজা লজ্জায় কাতর
পঞ্চমীতে যাত্রা করে শাস্ত্রের বিচার।
তা শুনি মেনকারানী শীঘ্রগতি ধরি

খাজা মণ্ডা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি॥
মিশ্রিসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে
চিনির ফেনা এলাচদানা মুক্তা থরে থরে॥
ভাঙের লাড়ু সিদ্ধি ব'লে পঞ্চমুখে দিলেন
ভাণ্ড ভরি গিরিরাজ তখনি সে নিলেন॥

কিন্তু দৌত্যকার্যে যেরূপ নিপুণতা থাকা আবশ্যক হিমালয়ের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। কৈলাসে কন্যার সহিত অনর্থক বচসা করিয়া তাঁহার বিপুল স্থূল প্রকৃতির পরিচয় দিলেন। দোষের মধ্যে অভিমানিনী তাঁকে বলিয়াছিলেন—

কহ বাবা নিশ্চয়, আর কব পাছে—
সত্য করি বলো আমার মা কেমন আছে।
তুমি নিষ্ঠুর হয়ে কুঠুর মনে পাসরিলা ঝি।
শিবনিন্দা করছ কত তার বলব কী॥

সত্য দোষারোপে ভালোমত উত্তর জোগায় না বলিয়া রাগ বেশি হয়। গিরিরাজ সুযোগ পাইলে শিবনিন্দা করিতে ছাড়েন না; এ কথার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া রুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

মা, তুমি বল নিঠুর কুঠুর, শম্ভু বলেন শিলা।
ছার মেনকার বুদ্ধি শুনে তোমায় নিতে এলাম॥
তখন শুনে কথা জগৎমাতা কাঁদিয়া অস্থির
পাড়া মেঘের বৃষ্টি যেন প'ল এক রীত॥
নয়নজলে ভেসে চলে, আকুল হল নন্দী—
কৈলাসেতে মিলল ঝরা, হল একটি নদী॥
কেঁদো না মা, কেঁদো না মা ত্রিপুরসুন্দরী।
কাল তোমাকে নিয়ে যাব পাষাণের পুরী॥
সন্দেশ দিয়েছিলেন মেনকারানী, দিলেন দুর্গার হাতে।
তুষ্ট হয়ে নারায়ণী ক্ষান্ত পেলেন তাতে॥
উমা কন শুন বাবা, বোসো পুনর্বার।
জলপান করিতে দিলেন নানা উপহার॥
যত্ন করি মহেশ্বরী রানুন করিলা।
শ্বশুর জামাতা দোঁহে ভোজন করিলা॥

ছড়া যাহাদের জন্য রচিত তাহারা যদি আজ পর্যন্ত ইহার ছন্দোবন্ধ ও মিলের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি না করিয়া থাকে, তবে আমাদের বলিবার কোনো কথাই নাই; কিন্তু জামাতৃগৃহে সমাগত পিতার সহিত কন্যার মান-অভিমান ও তাহার শান্তি ও পরে আহার-অভ্যর্থনা—এই গৃহচিত্র যেন প্রত্যক্ষের মতো দেখা যাইতেছে। নন্দীটা এক পাশে

দাঁড়াইয়া ছিল, সে মাঝে হইতে আকুল হইয়া গেল। শ্বশুরজামাতা ভোজনে বসিয়াছেন এবং গৌরী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া উভয়কে পরিবেশন করিতেছেন, এ চিত্র মনে গাঁথা হইয়া রহিল।

> শয়নকালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী।
> ইচ্ছা হয় যে বাপের বাড়ি কাল যাইব আমি॥
> শুন গৌরী কৈলাসপুরী তুচ্ছ তোমার ঠাঁই।
> দেখছি তোমার কাঙাল পিতার ঘর-দরজা নাই॥

শেষ দুইটি ছত্র বুঝিতে একটু গোল হয়; ইহার অর্থ এই যে তোমার বাসের পক্ষে কৈলাসপুরীই তুচ্ছ, এমন স্থলে তোমার কাঙাল পিতা তোমাকে স্থান দিতে পারেন এমন সাধ্য তাঁহার কী আছে!

পতিকে লইয়া পিতার সহিত বিরোধ করিতে হয়, আবার পিতাকে লইয়া পতির সহিত বিবাদ বাধিয়া উঠে, উমার এমনি অবস্থা।

> গৌরী কন, আমি কইলে মিছে দন্দেজ হবে।
> সেই-যে আমার কাঙাল পিতা ভিক্ষা মাংছেন কবে॥
> তারা রাজার বেটা, দালান-কোঠা অট্টালিকাময়।
> যাগযজ্ঞ করছে কত শ্মশানবাসী নয়॥
> তারা নানা দানপুণ্যবান দেবকার্য করে।
> এক দফাতে কাঙাল বটে, ভাঙ নাই তার ঘরে॥

কিন্তু কড়া জবাব দিয়া কার্যোদ্ধার হয় না। বরং তর্কে পরাস্ত হইলে গায়ের জোর আরো বাড়িয়া উঠে। সেই বুঝিয়া দুর্গা তখন—

> গুটি পাঁচ-ছয় সিদ্ধির লাড়ু যত্ন ক'রে দিলেন।

দাম্পত্যযুদ্ধে এই ছয়টি সিদ্ধির লাড়ু কামানের ছয়টা গোলার মতো কাজ করিল; ভোলানাথ এক-দমে পরাভূত হইয়া গেলেন। সহসা পিতা কন্যা ও জামাতার ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়া গেল। বাক্যহীন নন্দী সকৌতুক ভক্তিভরে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল।

> সম্ভ্রমে সম্ভাষণ করি বসলেন তিন জন।
> দুর্গা মর্তে যেয়ে কী আনিবে আমার কারণ॥
> প্রতিবারে কেবলমাত্র বিল্বপত্র পাই।
> দেবী বললেন, প্রভু ছাড়া কোন্ দ্রব্য খাই॥
> সিঁদুর-ফোঁটা অলকছটা মুক্তা গাঁথা কেশে।
> সোনার ঝাঁপা কনকচাঁপা, শিব ভুলেছেন যে বেশে॥
> রত্নহার গলে তার দুলছে সোনার পাটা।
> চাঁদনি রাত্রিতে যেন বিদ্যুৎ দিচ্ছে ছটা॥

তাড় কঙ্কণ সোন্ পৈঁছি শঙ্খ বাহুমূলে।
বাঁক-পরা মল সোনার নূপুর, আঁচল হেলে দোলে॥
সিংহাসন, পট্টবসন পরছে ভগবতী।
কার্তিক গণেশ চললেন লক্ষ্মী সরস্বতী॥
জয়া বিজয়া দাসী চললেন দুইজন।
গুপ্তভাবে চললেন শেষে দেব পঞ্চানন॥
গিরিসঙ্গে পরম রঙ্গে চললেন পরম সুখে।
ষষ্ঠী তিথিত উপনীত হলেন মর্তলোকে॥
সারি সারি ঘটবারি আর গঙ্গাজল।
সাবধানে নিজমনে গাচ্ছেন মঙ্গল॥

তখন—

গিরিরানী কন বাণী চুমো দিয়ে মুখে।
কও তারিণী জামাই-ঘরে ছিলে কেমন সুখে॥

এই ছড়াটি এইখানে শেষ হইল, ইহার বেশি আর বলিবার কথা নাই। এ দিকে বিদায়ের কাল সমাগত। কন্যাকে লইয়া শ্বশুরঘরের সহিত বাপের ঘরের একটু ঈর্ষার ভাব থাকে। বেশিদিন বধূকে বাপের বাড়িতে রাখা শ্বশুরপক্ষের মনঃপূত নহে। বহুকাল পরে মাতায় কন্যায় যথেষ্ট পরিতৃপ্তিপূর্বক মিলন হইতে না হইতেই শ্বশুরবাড়ি হইতে তাগিদ আসে, ধন্না বসিয়া যায়। স্ত্রীবিচ্ছেদবিধুর স্বামীর অধৈর্য তাহার কারণ নহে। হাজার হউক, বধূ পরের ঘর হইতে আসে; শ্বশুরঘরের সহিত তাহার সম্পূর্ণ জোড় লাগা বিশেষ চেষ্টার কাজ। সেখানকার নূতন কর্তব্য অভ্যাস ও পরিচয়বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার বাল্যকালের স্বাভাবিক আশ্রয়স্থলে ঘন ঘন যাতায়াত বা দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে দিলে জোড় লাগিবার ব্যাঘাত করে। বিশেষত বাপের বাড়িতে বিবাহিতা কন্যার কেবলই কর্তব্যহীন আদর, শ্বশুরবাড়িতে তাহার কর্তব্যের শাসন, এমন অবস্থায় দীর্ঘকাল বাপের বাড়ির আবহাওয়া শ্বশুরবর্গ বধূর পক্ষে প্রার্থনীয় জ্ঞান করেন না। এই-সকল নানা কারণে পিতৃগৃহে কন্যার গতিবিধিসম্বন্ধে শ্বশুরপক্ষীয়ের বিধান কিছু কঠোর হইয়াই থাকে। কন্যাপিতৃত্বের সেও একটা কষ্ট। বিজয়ার দিন বাংলাদেশের শ্বশুরবাড়ির সেই কড়া তাগিদ লইয়া শিব মেনকার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক অধিকার সমাজশাসনের বিরুদ্ধে বৃথা আছাড় খাইয়া মরিতে লগিল।

নাহি কাজ গিরিরাজ, শিবকে বলো যেয়ে
অমনি ভাবে ফিরে যাক সে, থাকবে আমার মেয়ে॥

তখন, শ্বশুরবাড়িতে দুর্গার যত কিছু দুঃখ আছে সমস্ত মাতার মনে পড়িতে লাগিল। শিবের ভাণ্ডারে যত অভাব, আচরণে যত ত্রুটি, চরিত্রে যত দোষ, সমস্ত তাঁহার নিকট জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। অপাত্রে কন্যাদান করিয়াছেন, এখন সেটা যতটা পারেন সংশোধন করিবার ইচ্ছা, যতটা সম্ভব গৌরীকে মাতৃক্রোড়ে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা।

শ্বশুরগৃহের আচারবিচার অনেক সময় দূর হইতে পিতৃগৃহের নিকট অযথা বলিয়া মনে হয় এবং পিতৃপক্ষীয়েরা স্নেহের আক্ষেপে কন্যার সমক্ষেই তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকেন। মেনকা তাই শুরু করিলেন, এবং শিব সেই অন্যায় আচরণে ক্ষিপ্ত হইয়া শ্বশুরবাড়ির অনুশাসন সতেজে প্রচার করিয়া দিলেন।

মর্তে আসি পূর্বকথা ভুলছ দেখি মনে।
বারে বারে নিষেধ তোমায় করছি এ কারণে॥
মায়ের কোলে মত্ত হয়ে ভুলছ দেখি স্বামী।
তোমার পিতা কেমন রাজা তাই দেখব আমি॥
শুনে কথা গিরিরাজা উদ্যাযুক্ত হল।
জয়-জোগাড়ে অভয়ারে যাত্রা করে দিল॥
যে নিবে সে ক'তে পারে, নইলে এমন শক্তি কার।
যাও তারিণী হরের ঘরে, এসো পুনর্বার॥

অনুগ্রহের সংকীর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইল, কন্যা পতিগৃহে ফিরিয়া গেল।

এক্ষণে যে ছড়ার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাতে দেবদেবীর একটি গোপন ঘরের কথা বর্ণিত আছে।

শিব সঙ্গে রসরঙ্গে বসিয়ে ভবানী।
কুতূহলে উমা বলেন ত্রিশূল শূলপাণি॥
তুমি প্রভু, তুমি প্রভু ত্রৈলোক্যের সার।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ তোমারি কিংকর॥
তোমার নারী হয়ে আমার সাধ নাহি পোরে।
যেন কেন্যা পতির ক্‌পালে প'ড়ে রমণী ঝোরে॥
দিব্য সোনার অলংকার না পরিলাম গায়।
শামের বরন দুই শঙ্খ পরতে সাধ যায়॥
দেবের কাছে মরি লাজে হাত বাড়াতে নারি।
বারেক মোরে দাও শঙ্খ, তোমার ঘরে পরি॥

ভোলানাথ ভাবিলেন, একটা কৌতুক করা যাক, প্রথমেই একটু কোন্দল বাধাইয়া তুলিলেন।

ভেবে ভোলা হেসে কন শুন হে পার্বতী
আমি তো কড়ার ভিখারি ত্রিপুরারি শঙ্খ পাব কথি॥
হাতের শিঙাটা বেচলে পরে হবে না
একখানা শঙ্খের কড়ি।
বলদটা মূল করিলে হবে কাহনটেক কড়ি॥
এটি ওটি ঠাক ঠিকাটি চাও হে গৌরী

থাকলে দিতে পারি।
তোমার পিতা আছে বটে অর্থের অধিকারী।
সে কি দিতে পারে না দুমুটো শঙ্খের মুজুরি॥

এই-যে ধনহীনতার ভড়ং এটা মহাদেবের নিতান্ত বাড়াবাড়ি, স্ত্রীজাতির নিকট ইহা স্বভাবতই অসহ্য। স্ত্রী যখন ব্রেস্‌লেট প্রার্থনা করে কেরানিবাবু তখন আয়ব্যয়ের সুদীর্ঘ হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া আপন দারিদ্র্য প্রমাণ করিতে বসিলে কোন্ ধর্মপত্নী তাহা অবিচলিত রসনায় সহ্য করিতে পারে। বিশেষত শিবের দারিদ্র্য ওটা নিতান্তই পোশাকি দারিদ্র্য, তাহা কেবল ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ সকলের উপরে টেক্কা দিবার জন্য, কেবল লক্ষ্মীর জননী অন্নপূর্ণার সহিত একটা অপরূপ কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে। কালিদাস শংকরের অট্টহাস্যকে কৈলাসশিখরের ভীষণ তুহিনপুঞ্জের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মহেশ্বরের শুভ্র দারিদ্র্যও তাঁহার এক নিঃশব্দ অট্টহাস্য। কিন্তু দেবতার পক্ষেও কৌতুকের একটা সীমা আছে। মহাদেবী এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাব যেরূপে ব্যক্ত করিলেন তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহাতে কোনো কথাই ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রহিল না।

গৌরী গর্জিয়ে কন ঠাকুর শিবাই
আমি গৌরী তোমার হাতে শঙ্খ পরতে চাই॥
আপনি যেমন যুব্‌-যুবতী অমনি যুবক পতি হয়
তবে সে বৈরস রস, নইলে কিছুই নয়॥
আপনি বুড়ো আটবয়সী ভাঙধুতুরায় মত্ত
আপনার মতো পরকে বলে মন্দ॥

এইখানে শেষ হয় নাই—ইহার পরে দেবী মনের ক্ষোভে আরো দুই-চারিটি যে কথা বলিয়াছেন তাহা মহাদেবের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশযোগ্য নহে। সুতরাং আমরা উদ্‌ধৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ব্যাপারটা কেবল এইখানেই শেষ হইল না; অর্থাৎ বাপের বাড়ি পর্যন্ত, তাহা গেল।

কোলে করি কার্তিক হাঁটায়ে লাম্বোদরে
ক্রোধ করি হরের গৌরী গেলা বাপের ঘরে॥

এ দিকে শিব তাঁহার সংকল্পিত দাম্পত্য-প্রহসনের নেপথ্যবিধান শুরু করিলেন—

বিশ্বকর্মা এনে করান শঙ্খের গঠন।

শঙ্খ লইয়া শাঁখারি সাজিয়া বাহির হইলেন—

দুইবাহু শঙ্খ নিলেন নাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কপটভাবে হিমালয়ে কৈলাসে ফেরেন॥
হাতে শূলী কাঁখে থলি শম্ভু ফেরে গলি গলি।
শঙ্খ নিবি শঙ্খ নিবি এই কথাটি ব'লে॥

সখীসঙ্গে বসে গৌরী আছে কুতূহলে।
শঙ্খ দেখি শঙ্খ দেখি এই কথাটি বলে॥
গৌরীকে দেখায়ে শাঁখারি শঙ্খ বার ক'ল্ল।
শঙ্খের উপরে যেন চন্দ্রের উদয় হল॥
মণি মুকুতা-প্রবাল-গাঁথা মাণিক্যের ঝুরি।
নব ঝলকে ঝলছে যেন ইন্দ্রের বিজুলি॥

দেবী খুশি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

শাঁখারি ভালো এনেছ শঙ্খ।
শঙ্খের কত নিবে তঙ্ক॥

দেবীর লুব্ধভাব দেখিয়া চতুর শাঁখারি প্রথমে দর-দামের কথা কিছুই আলোচনা করিল না; কহিল—

গৌরী,
ব্রহ্মালোক, বৈকুণ্ঠ, হরের কৈলাস, এ তো সবাই কয়।
বুঝে দিলেই হয়।
হস্ত ধুয়ে পরো শঙ্খ, দেরি উচিত নয়॥

শাঁখারি মুখে মুখে হরের স্থাবর সম্পত্তির যেরূপ ফর্দ দিল তাহাতে শাঁখাজোড়া যে বিশেষ সস্তায় যাইবে মহাদেবীর এমন মনে করা উচিত ছিল না।

গৌরী আর মহাদেবে কথা হল দড়।
সকল সখী বলে দুর্গা শঙ্খ চেয়ে পরো॥
কেউ দিলেন তেল গামছা কেউ জলের বাটি।
দেবের উরুতে হস্ত থুয়ে বসলেন পার্বতী॥
দয়াল শিব বলেন, শঙ্খ আমার কথাটি ধরো—
দুর্গার হাতে গিয়ে শঙ্খ বজ্র হয়ে থাকো॥
শিলে নাহি ভেঙো শঙ্খ, খড়্গে নাহি ভাঙো।
দুর্গার সহিত করেন বাক্যের তরঙ্গ॥
এ কথা শুনিয়া মাতা মনে মনে হাসে।
শঙ্খ পরান জগৎপিতা মনের হরষে॥
শাঁখারি ভালো দিলে শঙ্খ মানায়ে।
ভাণ্ডার ভেঙে দেইগে তঙ্ক, লওগে গনিয়ে॥

এতক্ষণে শাঁখারি সময় বুঝিয়া কহিল—

আমি যদি তোমার শঙ্খের লব তঙ্ক।
জ্ঞেয়াত-মাঝারে মোর রহিবে কলঙ্ক॥

ইহারা যে বংশের শাঁখারি তাঁহাদের কুলাচার স্বতন্ত্র; তাঁহাদের বিষয়বুদ্ধি কিছুমাত্র নাই; টাকাকড়ি সম্বন্ধে বড়ো নিস্পৃহ; ইঁহারা যাঁহাকে শাঁখা পরান তাঁহাকে পাইলেই মূল্যের আর কোনোপ্রকার দাবি রাখেন না। ব্যবসায়টি অতি উত্তম।

কেমন কথা কও শাঁখারি কেমন কথা কও।
মানুষ বুঝিয়া শাঁখারি এ-সব কথা কও॥

শাঁখারি কহিল—

না করো বড়াই দুর্গা না করো বড়াই।
সকল তত্ত্ব জানি আমি এই বালকের ঠাঁই॥
তোমার পতি ভাঙড় শিব তা তো আমি জানি।
নিতি নিতি প্রতি ঘরে ভিক্ষা মাগেন তিনি॥
ভস্মমাখা তায় ভুজঙ্গ মাথে অঙ্গে।
নিরবধি ফেরেন তিনি ভূত-পেরেতের সঙ্গে॥

ইহাকেই বলে শোধ তোলা। নিজের সম্বন্ধে যে-সকল স্পষ্ট ভাষা মহাদেব সহধর্মিণীর মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে শুনিয়া আসিয়াছেন, অদ্য সুযোগমত সেই সত্য কথাগুলিই গৌরীর কানে তুলিলেন।

এই কথা শুনিয়া মায়ের রোদন বিপরীত।
বাহির করতে চান শঙ্খ না হয় বাহির॥
পাষাণ আনিল চণ্ডী, শঙ্খ না ভাঙিল।
শঙ্খেতে ঠেকিয়া পাষাণ খণ্ড খণ্ড হল॥
কোনোরূপে শঙ্খ যখন না হয় কর্তন।
খড়্গা দিয়ে হাত কাটিতে দেবীর গেল মন॥
হস্ত কাটিলে শঙ্খে ভরিবে রুধিরে।
রুধির লাগিলে শঙ্খ নাহি লব ফিরে॥
মেনকা গো মা,
কী কুক্ষণে বাড়াছিলাম পা॥
মরিব মরিব মা গো হব আত্মঘাতী।
আপনার গলে দিব নরসিংহ কাতি॥

অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া দুর্গা ধূপদীপনৈবেদ্য লইয়া ধ্যানে বসিলেন।

ধ্যানে পেলেন মহাদেবের চরণ দুখান।

তখন ব্যাপারটা বুঝা গেল, দেবতার কৌতুকের পরিসমাপ্তি হইল।

কোথা বা কন্যা, কোথা বা জামাতা।
সকলই দেখি যেন আপন দেবতা॥

এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো হইল। নিমেষের মধ্যে—

> দুর্গা গেলেন কৈলাসে, শিব গেলেন শ্মশানে।
> ভাঙ ধুতুরা বেঁটে দুর্গা বসলেন আসনে।
> সন্ধ্যা হলে দুইজনে হলেন একখানে॥

এইখানে চতুর্থ ছত্রের অপেক্ষা না রাখিয়াই ছড়া শেষ হইয়া গেল।

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ছড়াগুলির জাতি স্বতন্ত্র। সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা, সাংসারিক ব্যাপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায় না। সেই অপরূপ রাখালের রাজ্য বাঙালি ছড়ারচয়িতা ও শ্রোতাদের মানসরাজ্য।

> স্থানে স্থানে ফেরেন রাখাল সঙ্গে কেহ নাই।
> ভাণ্ডীবনে ধেনু চরান সুবল কানাই॥
> সুবল বলিছে শুন ভাই রে কানাই
> আজি তোরে ভাণ্ডীবনবিহারী সাজাই॥

এই সাজাইবার প্রস্তাব মাত্র শুনিয়া নিকুঞ্জে যেখানে যত ফুল ছিল সকলেই আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

> কদম্বের পুষ্প বলেন সভা-বিদ্যমানে
> সাজিয়া দুলিব আজি গোবিন্দের কানে॥
> করবীর পুষ্প বলেন, আমার মর্ম কে বা জানে—
> আজ আমায় রাখবেন হরি চূড়ার সাজনে॥
> অলক ফুলের কনকদাম বেলফুলের গাঁথনি—
> আমার হৃদয়ে শ্যাম দুলাবে চূড়ামণি॥
> আনন্দেতে পদ্ম বলেন, তোমরা নানা ফুল
> আমায় দেখিলে হবে চিত্ত ব্যাকুল॥
> চরণতলে থাকি আমি কমল পদ্ম নাম
> রাধাকৃষ্ণে একাসনে হেরিব বয়ান॥

কোনো ফুলকেই নিরাশ হইতে হইল না, সেদিন তাহাদের ফুটিয়া ওঠা সার্থক হইল।

> ফুলেরই উড়ানি ফুলেরই জামাজুরি
> সুবল সাজাইলি ভালো।
> ফুলেরই পাগ ফুলেরই পোশাক
> সেজেছে বিহারীলাল॥

নানা আভরণ ফুলেরই ভূষণ
চূড়াতে করবী ফুল।
কপালে কিরীটি অতি পরিপাটি
পড়েছে চাঁচর চুল॥

এ-দিকে কৌতূহলী ভ্রমর-ভ্রমরী ময়ূর-ময়ূরী খঞ্জন-খঞ্জনীর মেলা বসিয়া গেল। যে-সকল পাখির কণ্ঠ আছে তাহারা সুবলের কলানৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল; কোকিল সস্ত্রীক আসিয়া বলিয়া গেল 'কিংকিণী কিরীটি অতি পরিপাটি'।

ডাহুক ডাহুকী টিয়া টুয়া পাখি
ঝংকারে উড়িয়া যায়।

তাহারা ঝংকার করিয়া কী কথা বলিল?

সুবল রাখাল সাজায়েছে ভালো
বিনোদবিহারী রায়।

এ দিকে চাতক-চাতকী শ্যামকে মেঘ ভ্রম করিয়া উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'জল দে' 'জল দে' বলিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। বনের মধ্যে শাখায় পল্লবে বাতাসে আকাশে ভারি একটা রব পড়িয়া গেল।

কানাই বলিছে, প্রাণের ভাইরে সুবল।
কেমন সাজালে ভাই বল্ দেখি বল্॥

কানাই জানেন তাঁহার সাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। কোকিল-কোকিলা আর ডাহুক-ডাহুকীরা যাহাই বলুক-না কেন, সুবলের রুচি এবং নৈপুণ্যের প্রশংসা করিবার সময় হয় নাই।

নানা ফুলে সাজালে ভাই, বামে দাও প্যারী।
তবে তো সাজিবে তোর বিনোদবিহারী॥

বৃন্দাবনের সর্বপ্রধান ফুলটিই বাকি ছিল। সেই অভাবটা পশু-পক্ষীদের নজরে না পড়িতে পারে, কিন্তু শ্যামকে যে বাজিতে লাগিল।

কুঞ্জপানে যে দিকে ভাই চেয়ে দেখি আঁখি
সুখময় কুঞ্জবন অন্ধকার দেখি॥

তখন লজ্জিত সুবল কহিল—

এই স্থানে থাকো তুমি নবীন বংশীধারী।
খুঁজিয়া মিলাব আজ কঠিন কিশোরী॥

এদিকে ললিতা-বিশাখা সখীদের মাঝখানে রাধিকা বসিয়া আছেন।

সবলকে দেখিয়া সবাই হয়ে হরষিত—
এসো এসো বসো সুবল একি অচরিত॥

সুবল সংবাদ দিল—

মন্দ মন্দ বহিতেছে বসন্তের বা, পত্র পড়ে গলি।
কাঁদিয়া বলেন কৃষ্ণ কোথায় কিশোরী॥

কৃষ্ণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া রাধা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন—

সাধ করে হার গেঁথেছি সই দিব কার গলে।
ঝাঁপ দিয়ে মরিব আজ যমুনার জলে॥

রাই অনাবশ্যক এইরূপ একটা দুঃসাধ্য দুঃসাহসিক ব্যাপার ঘটাইবার জন্য মুহূর্তের মধ্যে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অবশেষে সখীদের সহিত রফা করিয়া বলিলেন—

যেই সাজে আছি আমি এই বৃন্দাবনে
সেই সাজে যাব আমি কৃষ্ণদরশনে॥
দাঁড়া লো দাঁড়া লো সই বলে সহচরী।
ধীরে যাও, ফিরে চাও রাধিকাসুন্দরী।

রাধিকা সখীদের ডাকিয়া বলিলেন—

তোমরা গো পিছে এস মাথে করে দই।
নাথের কুশল হোক. ঝটিৎ এস সই॥

রাধা প্রথম আবেগে যদিও বলিয়াছিলেন যে সাজে আছেন সেই সাজেই যাইবেন, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রহিল না।

হালিয়া মাথার বেণী বামে বাঁধি চূড়া,
অলকা তিলকা দিয়ে, এঁটে পরে ধড়া।
ধড়ার উপরে তুলে নিলেন সুবর্ণের ঝরা॥
সোনার বিজটা শোভে হাতে তাড়বালা।
গলে শোভে পঞ্চরত্ন তক্তি কণ্ঠমালা॥
চরণে শোভিছে রাইয়ের সোনার নূপুর।
কটিতে কিংকিণী সাজে, বাজিছে মধুর॥
চিন্তা নাই চিন্তা নাই বিশাখা এসে বলে
ধবলীর বৎস একটি তুলে লও কোলে॥

সখীরা সব দধির ভাণ্ড মাথায় এবং রাধিকা ধবলীর এক বাছুর কোলে লইয়া, গোয়ালিনীর দল ব্রজের পথ দিয়া শ্যাম-দরশনে চলিল। কৃষ্ণ তখন রাধিকার রূপ ধ্যান করিতে করিতে অচেতন।

সাক্ষাতে দাঁড়ায়ে রাই বলিতেছে বাণী
কী ভাব পড়িছে মনে শ্যাম গুণমণি।
যে ভাব পড়েছে মনে সেই ভাব আমি॥

রাধিকা সগর্বে সবিনয়ে কহিলেন, তোমারই অন্তরের ভাব আমি বাহিরে প্রত্যক্ষ বিরাজমান।—

গাও তোলো চক্ষু মেলো ওহে নীলমণি।
কাঁদিয়ে কাঁদাও কেন, আমি বিনোদিনী॥
অঞ্চলেতে ছিল মালা দিল কৃষ্ণের গলে।
রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন ভাণ্ডীরবনে॥

ভাণ্ডীরবনবিহারীর সাজ সম্পূর্ণ হইল; সুবলের হাতের কাজ সমাধা হইয়া গেল।

ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া বাংলার গ্রামদৃশ্য গৃহচিত্র কিছুই নাই। গোয়ালিনীরা যেরূপ সাজে নূপুর-কিংকিণী বাজাইয়া দধি-মাথায় বাছুর-কোলে বনপথ দিয়া চলিয়াছে তাহা বাংলার গ্রামপথে প্রত্যহ, অথবা কদাচিৎ, দেখিতে পাওয়া যায় না। রাখালেরা মাঠের মধ্যে বটচ্ছায়ায় অনেকরকম খেলা করে, কিন্তু ফুল লইয়া তাহাদের ও তাহাদিগকে লইয়া ফুলের এমন মাতামাতি শুনা যায় না। এ-সমস্ত ভাবের সৃষ্টি। কৃষ্ণরাধার বিরহ-মিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহ-মিলনের আদর্শ; ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণসমাজ বা মনুসংহিতা নাই, ইহার আগাগোড়া রাখালি কাণ্ড। যেখানে সমাজ বলবান্ সেখানে বৃন্দাবনের গোচারণের সঙ্গে মথুরার রাজ্যপালনের একাকার হওয়া অত্যন্ত অসংগত। কিন্তু কৃষ্ণ-রাধার কাহিনী যে ভাবলোকে বিরাজ করিতেছে সেখানে ইহার কোনো কৈফিয়ত আবশ্যক করে না। এমন-কি, সেখানে চিরপ্রচলিত সমস্ত সমাজপ্রথাকে অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনের রাখালবৃত্তি মথুরার রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। আমাদের দেশে, যেখানে কর্মবিভাগ শাস্ত্রশাসন এবং সামাজিক উচ্চনীচতার ভাব সাধারণের মনে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সেখানে কৃষ্ণরাধার কাহিনীতে এই প্রকার আচারবিরুদ্ধ বন্ধনবিহীন ভাবের স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরাভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।

কৃষ্ণ মথুরায় রাজত্ব করিতে গেলে রাধিকা কাঁদিয়া কহিলেন—

আর কি এমন ভাগ্য হবে ব্রজে আসবে হরি।
সে গিছে মথুরাপুরী, মিথ্যে আশা করি॥

রাজাকে পুনরায় রাখাল করিবার আশা দুরাশা, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বৃন্দা বৃন্দাবনের আসল কথা বোঝে, সে জানে নিরাশ হইবার কোনো কারণ নাই। সে জানে বৃন্দাবন-মথুরায় কাশী-কাঞ্চীর নিয়ম ঠিক খাটে না।

বৃন্দে বলে আমি যদি এনে দিতে পারি
তবে মোরে কী ধন দিবে বলো তো কিশোরী॥
শুনে বাণী কমলিনী যেন পড়িল ধন্দে—
দেহ প্রাণ করেছে দান কৃষ্ণপদারবিন্দে।
এক কালেতে যাঁক সঁপেছি বিরাগ হলেন তাঁই।
যম-সম কোনো দেবতা রাধিকার নাই॥

ইহা বই নিশ্চয় কই কোথা পাব ধন।
মোর কেবল কৃষ্ণনাম অঙ্গের ভূষণ॥
রাজার নন্দিনী মোরা প্রেমের ভিখারি।
বঁধুর কাছে সেই ধন লয়ে দিতে পারি।
বলছে দূতী শোন্ শ্রীমতী মিলবে শ্যামের সাথে।
তখন দুজনের দুই যুগল চরণ তাই দিয়ো মোর মাথে॥

এই পুরস্কারের কড়ার করাইয়া লইয়া দূতী বাহির হইলেন। যমুনা পার হইয়া পথের মধ্যে—

হাস্যরসে একজনকে জিজ্ঞাসিলেন তবে।
কও দেখি কার অধিকারে বসত কর সবে॥
সে লোক বললে তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়।
মেঘের ধারা রৌদ্রে যেমন লাগল দূতীর গায়॥
ননিচোরা রাখাল ছোঁড়া ঠাট করেছে আসি।
চোর বিনে তাকে কবে ডাকছে গোকুলবাসী॥

কৃষ্ণের এই রায়বাহাদুর খেতাবটি দূতীর কাছে অত্যন্ত কৌতুকাবহ বোধ হইল। কৃষ্ণচন্দ্ররায়! এ তো আসল নাম নয়। এ কেবল মূঢ় লোকদিগকে ভুলাইবার একটা আড়ম্বর। আসল নাম বৃন্দা জানে।

চললেন শেষে কাঙাল বেশে উতরিলেন দ্বারে।
হুকুম বিনে রাত্রিদিনে কেউ না যেতে পারে॥

বহুকষ্টে হুকুম আনাইয়া 'বৃন্দাদূতী গেল সভার মাঝে'।

সম্ভাষণ করি দূতী থাকল কতক্ষণ।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখে কৃষ্ণের বদন॥
ধড়াচূড়া ত্যাগ করিয়ে মুকুট দিয়েছ মাথে।
সব অঙ্গে রাজ-আভরণ, বংশী নাইকো হাতে॥
সোনার মালা কণ্ঠহার বাহুতে বাজুবন্ধ।
শ্বেত চামরে বাতাস পড়ে দেখে লাগে ধন্দ॥
নিশান উড়ে, ডঙ্কা মারে, বলছে খবরদার।
ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘটা ব্যবস্থা বিচার॥
আর এক দরখাস্ত করি শুন দামোদর।
যমুনাতে দেখে এলেম এক তরী মনোহর॥
শূন্য হয়ে ভাসছে তরী ওই যমুনাতীরে।
কাণ্ডারী-অভাবে নৌকা ঘাটে ঘাটে ফিরে॥
পূর্বে এক কাণ্ডারী ছিল সর্বলোকে কয়।
সে চোর পালালো কোথা তাকে ধরতে হয়॥
শুনতে পেলেম হেথা এলেম মথুরাতে আছে।
হাজিরা না হয় যদি জানতে পাবে পাছে॥

মেয়ে হয়ে কয় কথা, পুরুষের ডরায় গা।
সভাশুদ্ধ নিঃশব্দ, কেউ না করে রা—।
ব্রজপুরে ঘর-বসতি মোর।
ভাণ্ড ভেঙে ননি খেয়ে পলায়েছে চোর॥
চোর ধরিতে এই সভাতে আসছে অভাগিনী।
কেমন রাজা বিচার করো জানব তা এখনি॥

বৃন্দা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের রাজসম্মান রক্ষা করিয়া ঠিক দস্তুরমত কথাগুলি বলিল, অন্তত কবির রিপোর্ট্ দৃষ্টে তাহাই বোধ হয়। তবে উহার মধ্যে কিছু স্পর্ধাও ছিল; বৃন্দা মথুরার উপরে আপন বৃন্দাবনের দেমাক ফলাইতে ছাড়ে নাই। 'হাজির না হয় যদি জানতে পাবে পাছে' এ কথাটা খুব চড়া কথা; শুনিয়া সভাস্থ সকলে নিঃশব্দ হইয়া গেল। মথুরার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় কহিলেন—

ব্রজে ছিল বৃন্দা দাসী বুঝি অনুমানে।
কোন্‌দিন বা দেখাসাক্ষাৎ ছিল বৃন্দাবনে॥
তখন বৃন্দা কচ্ছেন, কী জানি তা হবে কদাচিৎ।
বিষয় পেলে অনেক ভোলে মহতের রীত॥

কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে বৃন্দা কহিলেন—

হাতে ননি ডাকছে রানী গোপাল কোথা রয়।
ধেনু বৎস আদি তব তৃণ নাহি খায়॥
শতদল ভাসতেছে সেই সমুদ্রমাঝে।
কোন্ ছার ধুতুরা পেয়ে এত ডঙ্কা বাজে॥

মথুরার রাজত্বকে বৃন্দা ধুতুরার সহিত তুলনা করিল; তাহাতে মত্ততা আছে, কিন্তু বৃন্দাবনের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ কোথায়?

বলা বাহুল্য ইহার পর বৃন্দার দৌত্য ব্যর্থ হয় নাই।—

দূতী কৃষ্ণ লয়ে বিদায় হয়ে ব্রজপুরে এল।
পশুপক্ষী আদি যত পরিত্রাণ পেল॥
ব্রজের ধন্য লতা তমালপাতা ধন্য বৃন্দাবন।
ধন্য ধন্য রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন॥

বাংলার গ্রাম্যছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতারাম ও রামরাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণকথাই সাধারণের মধ্যে বহুলপরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরীকথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণকথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে

সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণকথায় এক দিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদ্‌বৃত্তিকে মহৎধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণকথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।

□ *ভারতী*, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫

স্বদেশী সমাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্মেন্টের মন্তব্য প্রকাশিত
হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

'সুজলা সুফলা' বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক পক্ষীর মতো ঊর্ধ্বের দিকে তাকাইয়া আছে—কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জন শুরু হইয়াছে—গবর্মেন্টে সাড়া দিয়াছেন—তৃষ্ণানিবারণের যা-হয় একটা উপায় হয়তো হইবে—অতএব আপাতত আমরা সেজন্য উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত—দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না?

আমাদের যে-সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কার্জনসাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, নাহয় অ্যান্ড্রুয়ুল্‌-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্তি করিতে থাকুন; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্বালাময় তরলরসের তৃষ্ণা—যাহা প্রলয়কালের সূর্যাস্তচ্ছটাব ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে—তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিমদিগ্‌দেবী তাহার পরিবেশনের ভার লইলে অসংগত হয় না—কিন্তু জলের তৃষ্ণা তো স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিস! ব্রিটিশ গবর্মেন্ট আসিবার পূর্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালোরূপেই হইয়া আসিয়াছে—এজন্য শাসনকর্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন তো চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিযা আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ

নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহত ভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে সুদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে! নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্তচলাচলের জন্য যেমন টৌনহল্‌-মিটিং অনাবশ্যক—সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে, তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে-গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে-গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে-গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে-গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। নাহয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই-সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কী?

ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না তাহা নহে—কিন্তু কেবল আংশিকভাবে; বস্তুত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে—কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন—তাহারা কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত বড়ো বড়ো কর্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগচর্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্যই ইউরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলন্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানির্বিচারে গবর্মেন্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালোবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্মভার সাধারণের সর্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভালো, না, তাহা বিশেষভাবে সরকার-নামক একটা জায়গায় নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। আমার বক্তব্য এই যে,

এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে, বিলাতরাজ্যের স্টেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না—অত্যন্ত ভালো হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকারবাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে-কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভুক্ত স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন-কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি—কোনো আপত্তি করি নাই। এ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরেজের আইনে বাঁধিয়া গেছে—পরিবর্তনমাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান—যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মর্মস্থান—আজ অনাবৃত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ নহে।

পূর্বে যাহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চ ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তি লাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে-সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের অখ্যাত গ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে

সর্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই ; কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে।

এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্মেন্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক্, বিদ্যা ও ধনমান অর্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালিজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উলটাপালটা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

এইজন্য কবিকথিত 'স্রোতের সেঁওলি'র মতো ভাসিয়াই চলিয়াছি।

কিন্তু বাঙালির চিত্ত ঘরের মুখ লইয়াছে, নানা দিক হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে এবং স্বদেশী ভাষা স্বদেশী সাহিত্যের দ্বারা অলংকৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নহে—স্বদেশের শিল্পদ্রব্য আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, স্বদেশের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজদ্বারে ভিক্ষাযাত্রার জন্য যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যহই একটু একটু করিয়া আমাদিগকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অদ্ভুত অসংগতি আমাদের চোখে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সই তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। এ কনফারেন্স দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরেজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে

হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই।

পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্যকলাপে যে-সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে-সমস্ত দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে করো প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশি ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ির মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য।

তাহার পরে এই মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশে নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য এক দল লোক প্রস্তুত হন—তাঁহারা নতুন নতুন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিক-লণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইঁহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ, সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়! অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না—সে-স্থলে 'ইতরে জনাঃ' মিষ্টান্নের উপায় জোগাইতে থাকে, কিন্তু 'মিষ্টান্নম্' 'ইতরে জনাঃ' কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না—ভোগ করেন 'বান্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে-সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদ্বারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট

ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে—তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

এ কথা শুনিবামাত্র যেন আমাদের মধ্যে হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া না ওঠেন—এ কথা না বলিয়া বসেন যে, এই মেলাগুলির প্রতি গবর্মেন্টের অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে—অতএব আমরা সভা করিয়া কাগজে লিখিয়া প্রবলবেগে গর্বমেন্টের সাঁকো নাড়াইতে শুরু করিয়া দিই—মেলাগুলির মাথার উপরে দলবল-আইনকানুনসমেত পুলিস কমিশনার ভাঙিয়া পড়ুক। সমস্ত একদমে পরিষ্কার হইয়া যাক। ধৈর্য ধরিতে হইবে—বিলম্ব হয়, বাধা পাই, সেও স্বীকার, কিন্তু এ সমস্ত আমাদের নিজেদের কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘর নিকাইয়া আসিয়াছেন—ম্যুনিসিপালিটি সরকারি ঝাঁটায় পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে, এ কথা যেন আমরা না ভুলি।

আমাদের দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ হইতে পারে, আমি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, এবং এই উপলক্ষটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কী করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের মঙ্গল-ব্যাপার বলিয়া গণ্যই করেন না তাঁহাদিগকে অন্য পক্ষে 'পেসিমিস্ট' অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভদ্রাক্ষাগুচ্ছলুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ 'পেসিমিস্ট' আশাহীন দলের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারি দিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা

ছিল। দূর আত্মীয়দের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা-নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামী-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে—এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালো মন্দ দুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন-কি, তদপেক্ষাও বড়ো, ইহা প্রাচ্য।

জাপান-যুদ্ধব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধব্যাপারটি একটা কলের জিনিস সন্দেহ নাই—সৈন্যদিগকে কলের মতো হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতোই চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক সৈন্য সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহারা অন্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোন্মাদগ্রস্ত পশুবৎও নহে; তাহারা প্রত্যেক মিকাডোর সহিত এবং সেই সূত্রে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—সেই সম্বন্ধের নিকট তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্য আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত—রণক্ষেত্রে শতরঞ্জখেলার দাবাবোড়ের মতো মরিত না—মানুষের মতো হৃদয়ের সম্বন্ধ লইয়া ধর্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট আত্মহত্যার মতো হইয়া দাঁড়াইত—এবং এইরূপ কাণ্ডকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন, 'ইহা চমৎকার—কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে।' জাপান এই চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, এইরূপই আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং অনাবশ্যক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সংকীর্ণ—আপিসের মধ্যেই তাহার শেষ। প্রভুভৃত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কাজ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনোপ্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে পুত্রকন্যার বিবাহ এবং শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন। আমি রাজসাহি ও ঢাকার প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এই কন্‌ফারেন্স-ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের জিনিস বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই—কিন্তু আশ্চর্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই সুপরিস্ফুট। যেন বরযাত্রীদল গিয়াছি—আহার-বিহার আরাম-আমোদের জন্য দাবি ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বানকর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাঁহারা বলিতেন,

তোমরা নিজের দেশে কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই—এত চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয়, এত শয়নাসন, এত লেমনেড-সোডাওয়াটার-গাড়িঘোড়া, এত রসদের দায় আমাদের 'পরে কেন—তবে কথাটা অন্যায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাঁকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে যত ভয়ংকর কেজো হইয়া উঠি না কেন, তবু আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কন্‌ফারেন্সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই, আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কন্‌ফারেন্স তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারিগণ আহূতবর্গকে অতিথিভাবে আত্মীয়ভাবে সংবর্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কী পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কংগ্রেসের মধ্যেও যে অংশ আতিথ্য, সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পুরা কাজ করে—যে অংশ কেজো, তিন দিন মাত্র তাহার কাজ, বাকি বৎসরটা তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে সেবার সম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অনুশীলনের উপলক্ষ ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথ্য গৃহে আচরিত হয়, তাহাকে বৃহৎ পরিতৃপ্তি দিবার জন্য পুরাকালে বড়ো বড়ো যজ্ঞানুষ্ঠান হইত—এখন বহুদিন হইতে সে-সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া যেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া জনসমাগম হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অব্যবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞভাণ্ডারের মাঝখানে তাঁহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এমনি করিয়া কংগ্রেস-কনফারেন্সের মাঝখানে খুব যখন বিলাতি বক্তৃতার ধুম ও চটপটা করতালি—সেখানেও, সেই ঘোরতর সভাস্থলেও, আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন, সকলকে ভাঙিয়া বাঁটিয়া খাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কী করা হইতেছে তাহা তিনি ভালো বুঝিতেই পারেন না। মার মুখেই হাসি আরো একটুখানি ফুটিত, যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজ্ঞের ন্যায় এই-সকল আধুনিক যজ্ঞে কেবল বইপড়া লোক নয়, কেবল ঘড়িচেনধারী লোক নয়—আহূত-অনাহূত আপামর সাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত—কিন্তু আনন্দে মঙ্গলে ও মাতার আশীর্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধুর্যটুকু ভুলিতে পারে নাই। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে।

আমরা এই সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে পরে, উচ্চে নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ দেশে টোল পাঠশালা জলাশয় অতিথিশালা দেবালয় অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের

প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান জলদান আশ্রয়দান স্বাস্থ্যদান বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য সমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব? প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প—একমুষ্টি বা অর্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই, এই আমাদের দেবতার বিচারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষসম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না? স্বদেশের সহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ—সে কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না? আমরা কি স্বদেশকে জলদান বিদ্যাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্মগুলিকে পরের হাতে বিদায় দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব? গবর্মেন্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেছেন—মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না। তাহার ফল কী হইল। তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের সূত্রে দেশের যে-হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি—কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেন্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে? এইজন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না। ইহা কখনোই চিরদিন এ দেশে প্রশ্রয় পাইবে না কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। আমরা আমাদের অতিদূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই—তাহাদিগকেও নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি; আমাদের বহুকষ্ট-অর্জিত অন্নও বহুদূর-কুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা একদিনের

জন্যও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই—আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেও আমরা চিৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়—দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না—এইজন্য অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা-ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালোই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতা লাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

পূর্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল হইতে বাধ্য হইয়া পল্লীসমাজই খণ্ড খণ্ড ভাবে আপনার কাজ আপনি সম্পন্ন করিয়াছে—স্বদেশী সমাজ তেমন ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আজও আমাদের মনুষ্যত্ব আছে—কিন্তু আমাদের কর্তব্য ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে আমাদের চরিত্রে সংকীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে। সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে, এইজন্য যাহা ভাঙিয়াছে তাহার জন্য আমরা শোক করিব না—যাহা গড়িতে হইবে তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত

চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আজকাল জড়ভাবে, যথেচ্ছাক্রমে, দায়ে পড়িয়া যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহাই ঘটিতে দেওয়া কখনোই আমাদের শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ করো, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকেই আপনার কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজের কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহারা যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভালো, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকেই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন। সমাজের সমস্ত অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো

মঠমন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে জলে স্বাস্থ্যে বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনোই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম এক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে—কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

কী করিয়া কালের সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হয়, কী করিয়া রাজার সহিত স্বদেশের সংযোগসাধন করিতে হয়, জাপান তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একই কালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব—আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশী সমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষ স্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গর্বমেন্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হোক, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি ঐ কান্নাকাটি বৃথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল! দেশকে খণ্ডিত করিলে যে-সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভালো—কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার, স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না? সেই কর্তৃপক্ষ যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ় সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নির্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ আমাদিগকে উপাধি বিতরণ করিয়া থাকেন—কিন্তু সৎকর্মের সাধুবাদ ও আশীর্বাদ আমরা স্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধন্য হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মতো আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের দেশে

মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয়তো সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন—নির্বাচন করিব কী করিয়া, সবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে তো সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই-সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনো কালে কাজে নামা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে— যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারি দিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজে অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ-রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে—পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব—সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে-শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে-শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা কলসের মতো শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও সমাজের শক্তি সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সহিত যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানির মতো সমস্ত লাভলোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই—কিন্তু বড়ো ব্যাপারের

হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে এক-একটা বড়ো দিন আসে, সেই দিন বড়ো লোকের তলবে দেশের সমস্ত সালতামামি নিকাশ বড়ো খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধ সমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল। আপাতত আমাদের কাজ—দপ্তর তৈরি রাখা, কাজ চালাইতে থাকা; যেদিন মহাপুরুষ হিসাব তলব করিবেন, সেদিন অপ্রস্তুত হইয়া শির নত করিব না—দেখাইতে পারিব, জমার ঘরে একেবারে শূন্য নাই।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড়ো করিব, এতবড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো, তাহা নহে। কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়ো। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে—মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি, আমার এই প্রস্তাব যদি বা অনেকে অনুকূলভাবেও গ্রহণ করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এমন-কি, প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষত্রুটি ও স্খলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে থাকা আশ্চর্য নহে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। অদ্যকার সভামধ্যে আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই, এ কথা বলিলেও পাছে অহংকার প্রকাশ করা হয়, এ জন্য আমি কুণ্ঠিত আছি। আমি অদ্য যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে তাহা বলাইতে উদ্যত করিয়াছে। তাহা আমার কথা নহে, তাহা আমার সৃষ্টি নহে; তাহা আমাকর্তৃক উচ্চারিত মাত্র। আপনারা এ শঙ্কামাত্র করিবেন না আমি আমার অধিকার ও যোগ্যতার সীমা বিস্মৃত হইয়া স্বদেশী সমাজ গঠনকার্যে নিজেকে অত্যুগ্রভাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, আসুন, আমরা মনকে প্রস্তুত করি—ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া কর্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতি সূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভঙ্গুলতাকে সবেগে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র রক্ততৃষার্ত শিকড়সমেত হৃদয়ের অন্ধকার গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্র-বিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি, আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি—শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গল প্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি—শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ধূপের পবিত্র গন্ধ হইতে থাক্—দেবতার কল্যাণদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেশ আপনাকে সর্বতোভাবে সার্থক বলিয়া একবার অনুভব করুক।

এই অভিষেকের পরে সমাজপতি কাহাকে তাঁহার চারি দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, কী ভাবে সমাজের কার্যে সমাজকে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলিবার বিষয়

নহে। নিঃসন্দেহে, যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের চিরন্তন সমাজপ্রকৃতির অনুগত, তাহাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে—স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি নূতনকে যথাস্থানে যথাযোগ্য আসনদান করিবেন। আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও দলবিশেষের হাত হইতে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্য করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে—সমস্ত কলরব-কোলাহলের মধ্যে আপনার গৌরবে তাঁহাকে দৃঢ়গম্ভীরভাবে অবিচলিত থাকিতে হইবে।

অতএব যাঁহাকে আমরা সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের দ্বারা বরণ করিব, তাঁহাকে একদিনের জন্যও আমরা সুখস্বচ্ছন্দতার আশা দিতে পারিব না। আমাদের যে উদ্ধত নব্যসমাজ কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সম্মত না হইয়া নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতেছে, সেই সমাজের সূচিমুখ কণ্টকখচিত ঈর্ষাসন্তপ্ত আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে, বিধাতা যেন তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে বল ও সহিষ্ণুতা প্রদান করেন—তিনি যেন নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে শান্তি ও কর্মের মধ্যেই পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন—সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাসস্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনই এই মুহূর্তেই ধীরে ধীরে নূতন কালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি।

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্যেরা আদিম অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্যসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর-একবার সুদীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল; বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব আরো গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে—মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধ-ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই এশিয়াব্যাপী ধর্মপ্লাবনের সময় নানা জাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া

পুনর্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল: পূর্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, নানা স্বতোবিরোধ-আত্মখণ্ডনসংকুল এই হিন্দুধর্মের এই হিন্দুসমাজের ঐক্যটা কোন্‌খানে? সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। সুবৃহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেমনি কঠিন—কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোটো গোলকের গোলত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে তাহারা ইহাকে চ্যাপটা বলিয়াই অনুভব করে। তেমনি হিন্দুসমাজ নানা পরস্পর-অসংগত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যসূত্র নিগূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অঙ্গুলির দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাত-প্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজের এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের প্রক্রিয়া সর্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীস্থ বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যে-সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্য-সাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর-এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান—তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্যস্ততা ঘটিয়াছিল, তাহাতে পরবর্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে। নূতনত্ব ও পরিবর্তন মাত্রেরই প্রতি সমাজে একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা, আঘাতের আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবস্ত রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়—তাহা একপ্রকার জীবন্মৃত্যু।

বৌদ্ধপরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎ পদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকল দিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র কি জ্ঞানময় সমুদ্র। আমরা ছিলাম বিশ্বের, দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে সেই শক্তিই কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্যবিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলংকারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে তাহা খোওয়াই যাইতেছে।

বস্তুত, এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ্‌রূপে ছিল না।—তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার, অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচারপালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল, যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর-সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না—সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব ঐশ্বর্য বিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভার গ্রহণ করিল—তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল তাহাকেও অকর্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাট মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় কেবল ভারস্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত, কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বার বাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক,

সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্‌বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটলিপাঁটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরেজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেক স্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কী আশ্চর্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কী আশ্চর্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরেজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল 'গেল গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরেজ হইতে পারিব না, নকল ইংরেজ হইয়াও আমরা ইংরেজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া

আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে-একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যে, চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব তাহা নহে—ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন, তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। আমাদের ভারতের মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব ও জন্মতত্ত্বের ক্ষেত্রকে এক সীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন—মনস্তত্ত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া দাঁড় করাইবেন না তাহা বলিতে পারি না। এই ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে—ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্বে—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' যে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো। আমরা কি এই জননীর জীর্ণ গৃহ সংস্কার করিতে পারিব না? পাছে সাহেবের বাড়ির বিল চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা আসবাব-আড়ম্বরে কমতি পড়ে, এইজন্যই, আমাদের যে মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন পরের পাকশালার দ্বারে তাহারই অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে

প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে? কখনোই নহে। নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুই-চারি দিনের এই ইস্কুলেব মুখস্থবিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' একবার স্বীকার করো, মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্য অদ্য আমরা প্রস্তুত হইলাম; একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

□ *বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র ১৩১১

এ-কাল ও এ-কালের মেয়ে

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

আমাদের বর্তমান অবস্থাতে আমরা কখনই সম্পূর্ণ সুখ উপলব্ধি করি না। অতীত কালের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের কল্পনায় আমরা প্রকৃত সুখ অনুভব করি। কিন্তু বর্তমানে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, প্রায় সকলেই নিজ নিজ অবস্থা অপ্রীতিজনক বোধ করিয়া থাকি! অতীত কালের স্মৃতিতে কাঁটা খোঁচা নাই, ভবিষ্যতের কল্পনায় নিগড় নাই। সময়ের পরিবর্তনে অতীতের আশ-পাশের ঝঞ্ঝাট চলিয়া যায়—থাকে শুধু সুখময় স্মৃতিটুকু। প্রতি বৎসর শরতের জ্যোৎস্নায়, বসন্তের বাতাসে, বৈশাখী বেল-জুঁইয়ের গন্ধে পরিতৃপ্ত হইয়াও ভাবি, পূর্বে যেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না হইত—কই, তেমন তো আর এখন হয় না! বসন্তে এ-বৎসর বসন্ত নাই—এ তো শীত—বেলফুলে গন্ধ নাই—মালীরা কুঁড়ি তুলে মালা গেঁথেছে। গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছি—বাতাসটি মন্দ নহে—ঢেউগুলি বেশ কিন্তু শরীরটা ভালো নয়, এত জল হাওয়া লাগল, তাই তো! কিন্তু আজ আর সে সকল কিছু মনে নাই—মনে আছে শুধু গঙ্গার ধারটুকু—তাহার ঢেউগুলি, মৃদুমন্দ বাতাস—মোহময় জ্যোৎস্না।

পানসিতে ঢেউ লাগায়—সে দিন মাথা ঘোরায় যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা মনে নাই—মনে আছে সেই মাঝির গান—সেই দাঁড়ের ঝুপঝুপ শব্দ। অসুখকর স্মৃতি কি থাকে না? থাকে, কিন্তু তাহা তীব্রভাবে থাকে না;—অথবা আমরা মনুষ্য জাতি, তাহাকে সমাদরে স্থান দান করিতে চাহি না। আমাদের প্রিয়তমের রুগ্ন শয্যায় যখন আমরা তাহার সেবা করি, তখন আমরা কখনই মনে আনিতে পারি না যে, সে বিনা আমরা জীবিত থাকিতে পারি! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরে আর সে দুঃখের তীব্রতা থাকে না—মৃতকে বিস্মৃত হই—অন্তত হইতে চেষ্টা করি। কিন্তু সুখের স্মৃতি জ্বলন্তভাবে আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, স্মৃতিতেই আমরা প্রকৃত সুখানুভব করি। সুখের স্মৃতিকে আমরা অতি যত্নে আদরে পোষণ করি, বার বার তাহা স্মরণ করি, বার বার তাহার উল্লেখ করি। রুগ্ন শয্যায় সে যে কত কষ্ট পাইয়াছিল—তাহা মনে আনি না—কত যে মিষ্ট কথা কহিত, তাহাই মনে মনে শত বার আন্দোলন করিয়া থাকি।

এই বর্তমানের স্বাভাবিক অসন্তোষের ফলেই বোধ হয়, আজকাল বঙ্গসমাজের এক দল মানব এক দলের মেয়ের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট। তাঁহারা সেকালের মেয়েদের প্রভূত প্রশংসা ও এ-কালের মেয়েদের যথোচিত নিন্দা করিয়া দিন রাত খুঁত খুঁত

করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, এ-কালের মেয়েরা অতিশয় বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে. কোনো কাজকর্ম করে না, কেবল বিছানায় শুইয়া নভেল পড়ে, চেয়ারে বসিয়া কার্পেট বুনে। কেহ বলেন, বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া মেয়েরা নিতান্ত অকর্মণ্য হইয়াছে, বিনা পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হওয়াতে স্বামীর উপার্জিত অধিকাংশ ধনই ডাক্তারের ঘরে যায়। ছেলেরা দাসদাসীর দ্বারায় প্রতিপালিত হওয়াতে তাহারাও অনিয়ম ও অযত্নে রুগ্ন ও অসৎচরিত্র হয়। কেহ বলেন, শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে এ-কালের মেয়েরা ভক্তি করেন না, অতিথি অভ্যাগতদের যত্ন করেন না, ছেলেপিলেকে স্নেহ করেন না। তাঁহারা বলেন, এ সমস্তই লেখাপড়ার দোষ—লেখাপড়া শিখিয়া মেয়েরা বিবি হইয়াছেন, তাহাদের আর লেখাপড়া শেখানো উচিত নহে। এইরূপ নানা জনে নানাবিধ দোষ দেখাইয়া পরিশেষে উপসংহারে বলেন যে, কখন গার্হস্থ্য সুখ চলিয়া গিয়াছে—দাম্পত্য প্রেম নাই, মাতৃস্নেহ নাই—বেচারী পুরুষদের মহা কষ্ট। তাঁহারা প্রাণপণে যে পরিবারের জন্য ধন উপার্জন করেন, সে পারিবারিক সুখ তাঁহার তিল মাত্র নাই, কেবল জ্বালাতন। অভাব কিছুতেই ঘোচে না। কেবল টাকা নাই, টাকা নাই! স্ত্রী-শিক্ষার দোষেই তো এত অভাব। গৃহিণীর বিবিয়ানার খরচ চাই, ডাক্তার খরচ চাই, দাস দাসী চাই, রাঁধুনি চাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় এ-কালের প্রবলা অবলারা, বেচারি পুরুষদের অভিযোগ হইতে কিয়ৎপরিমাণে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

এ-কালের মহিলাদের অভিযোগকারীগণ কহেন, সেকালে এত দাস দাসী রাখা প্রথা ছিল না—মহিলারা নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিতেন, নিজ হস্তে অন্য অন্য কাজকর্ম সকলই নির্বাহ করিতেন, কিন্তু এ-কালেব মেয়েদের দাস দাসী নহিলে চলে না। তাঁহারা হাত ময়লার ভয়ে পান সাজেন না, দুর্গন্ধ বলিয়া গোময়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

সত্য বটে, এ-কালের মেয়েরা কতক পরিমাণে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা পান সাজিতে বসিয়া কাপড়ময় চুন খয়েরের হাত মুছিতে রাজি নহেন, তাঁহারা ভাতের হাঁড়ির কালি ও ব্যঞ্জনের হলুদে হস্ত রঞ্জিত করিতে নারাজ। পূর্ব প্রচলিত নিয়ম আছে যে, রন্ধনকারিণী হাত মুখ ধুইয়া, পরিধানবস্ত্র পরিবর্তন করিয়া, পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়া তবে পরিবেশনে যাইতেন। এ নিয়ম যত পালন হউক বা না হউক, সেকালের মহিলারা গামছার কার্য সমস্তই নিজ পরিধানবস্ত্রে সারিয়া লইতেন। এ-কালের মেয়েরা পরিচ্ছন্ন হওয়াতে যাহাতে হাত অপরিষ্কার না হয়, তাহার উপায় করেন, তাঁহারা হাত মুছিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন।

সেকালে তেল মাখিয়া স্নান করা পদ্ধতি ছিল, আজকাল সাবান মাখিয়া স্নান প্রচলিত হইয়াছে—চারি দিকে সাবান ছড়াছড়ি হওয়াতে সকলেই তাহা ব্যবহার করেন—মহিলারাও অবশ্য ব্যবহার করেন। কিন্তু যে সকল প্রভুরা দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলুন দেখি যে, তাঁহারাই কি আপিসের ফেরত সাবান, চিরুনি, পাউডার কিনিয়া আনিয়া গৃহলক্ষ্মীকে প্রলোভিত ও প্রফুল্লিত করেন কি না? বাস্তবিক যদি বিজাতীয় বিলাসদ্রব্য ব্যবহার ও বিজাতীয় অনুকরণ বঙ্গীয় পুরুষদিগের অনুমোদিত না হইত, তাহা হইলে কি বঙ্গীয় রমণীগণ তাহা ব্যবহার করিতেন—না তাহা ব্যবহার করিতে সাহস

পাইতেন? যাহা হউক, তা বলিয়া কি এ-কালে যাঁহার রাঁধুনি রাখিবার ক্ষমতা নাই, তিনি কি বাজার হইতে ভাত কিনিয়া খাইয়া থাকেন? না তিনি নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া আহার করেন? তাঁহার স্ত্রী বা মাতা রন্ধন করিয়া দেন না তো কে দেয়? প্রায়ই শোনা যায়, বউ রাঁধে না; বুড়ো শাশুড়িকে দিয়ে রাঁধায়। কিন্তু সেটা এমনই কি দোষের? বিবেচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থের সকলের পক্ষে সুবিধা বলিয়াই শাশুড়িকে রাঁধিতে সচরাচর দেখা যায়—এবং শাশুড়ি বা মাতা ইচ্ছাপূর্বক রন্ধনের ভার লইয়া থাকেন। তবে কন্যাকে রন্ধন-ভার হইতে মুক্ত করিয়া মাতা তাহাকে খোঁটা দেন না, কিন্তু শাশুড়ি এবং তাঁহার আত্মীয়ারা বধূকে দুই এক কথা না শোনাইয়া থাকিতে পারেন না।

আমাদের দেশে হিন্দু বিধবারা প্রায় সকলেই স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়া থাকেন। এমন স্থলে তাঁহার নিজের জন্য রাঁধিতেই হইল, তখন তাহার উপর আরও দু-চার জনের রাঁধিতে কিছু কষ্ট হয় না। বিশেষ গার্হস্থ্যের অন্য অন্য কার্যের তুলনায় বসিয়া বসিয়া রন্ধন করাই প্রাচীনাদের পক্ষে অল্প কষ্টকর। কারণ, প্রাচীন অবস্থায় নড়াচড়া স্বাভাবিক নহে। ছোট ছোট সন্তানাদি লইয়া ব্যস্ত হইতেও হয় না। অনেক স্থলে শাশুড়ি নিরামিষ রাঁধিলেন, বৌ একটু মাছ রাঁধিয়া লইলেন। নিতান্ত যদি বৌ ছেলেপিলে লইয়া বিব্রত থাকেন তো শাশুড়িই মাছ রাঁধিয়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলেন। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বয়োবৃদ্ধির সহিত সকল স্ত্রীলোকেরই রন্ধনে পটুতা জন্মে। বাস্তবিক পাক-প্রণালী পাঠ করিয়া ওজন করিয়া প্রত্যেক তরকারি রাঁধিতে হইলে দিনান্তে আহার জোটা ভার। সুতরাং বধূ হইতে শাশুড়ির রান্না উত্তম হওয়ায় এবং রন্ধন-কৌশলাদি জানা থাকাতে অল্প খরচে হওয়ায় শাশুড়ির উপর রন্ধন-ভার থাকা গৃহস্থেরও সুবিধা এবং মঙ্গল। শাশুড়ি নিজ পুত্র পৌত্রের জন্য রাঁধিতে কিছু ক্লেশ বোধ করেন না। তার পর যাঁহার ঘরে রাঁধুনি আছে, এমন মহিলারাও কি রান্না হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন? বাবুর সখের খাবার, ছেলেদের জলখাবার—এ সকলই তো প্রায় তাঁহাদের নিজ হস্তে প্রস্তুত করিতে হয়।

এই কলিকাতায় রাঁধুনি বা দাস দাসী সহজে পাওয়া যায় বলিয়া এখন প্রায় সকলেই দাস দাসী রাখিয়া থাকেন। বিশেষ অন্তত একটি দাসী না রাখিলে কলিকাতায় বঙ্গকুলবধূর মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। কলিকাতায় বাড়ির চৌকাঠের বাহিরে কুলবধূর পা বাড়াইবার জো নাই. কোনো লোক বাড়িতে আসিলে স্বামী-পুত্রের অনুপস্থিতিতে কথা কহিবার কেহ নাই। কলিকাতায় একটি দাসী ভিন্ন বাস করা যে কত অসুবিধা, তাহা যাঁহাদের দাস দাসী নাই, তাঁহারাই অনুভব করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে দাস দাসীর তত আবশ্যক হয় না—পল্লীগ্রামে মহিলাদিগের কতকটা স্বাধীনতা থাকে, এবং বাটিতেও নিতান্ত পরিচিতেরাই সচরাচর হামেশা থাকে—তাঁহাদের সামনে যাওয়া ও স্পষ্ট না হউক, ইঙ্গিতেও কথা কহা চলে। অথবা আবশ্যক স্থলে খিড়কিদ্বার দিয়া বাহির হইতে পাড়ার মাসি, পিসি বা ভাইপো ভাইঝিকেও আনিয়া হাজির করা চলে। পল্লীগ্রামে দাস দাসী পাওয়াও সুকঠিন। জমিদার বা গ্রামের ধনী ব্যক্তিও অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া দাস দাসী পাইয়া থাকেন। সেখানে সকলেই প্রায় গৃহস্থ ও চাষি লোক। তাহারা নিজের ঘরে খাটে-খোটে, পরের

দুয়ারে যায় না। পরের দুয়ারে যাইতে হইলেই কলিকাতায় চলিয়া আসে—কারণ, রাজধানীতে কাজ মিলিবেই। কলিকাতায় দাস দাসী সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া এবং আবশ্যকও অধিক বলিয়া এখানে সকল প্রয়োজনানুসারে ক্ষমতানুসারে দাস দাসী রাখিয়া থাকেন। একটা রাঁধুনির অসুখ হইলে সহজেই যদি আর একটা পাওয়া যায়, তবে কেনই বা কষ্ট স্বীকার করিবে? সকলেই তো সকল বিষয়ে দেখিতেছেন যে, হাতের কাছে উপায় থাকিতে কেহ কষ্ট করিতে চাহেন না। ট্রাম হওয়াতে ইতর ভদ্র সকলেই ট্রামে উঠিতেছে। পূর্বে যাহারা চিরদিন হাঁটিয়া দলে দলে কালীঘাট যাতায়াত করিত, এখন তাহাদের মধ্যে কয় জন হাঁটিবার কষ্ট স্বীকার করে? এখন শাদা ফুলের মালা গলায়, কপালে সিন্দূর, কোলে ছেলে মাথায় বোঝা, পরিশ্রান্ত পদাতিক যাত্রী বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেলা দুই প্রহরের সময় কালীঘাটের ফেরত ট্রামে যাত্রী বোঝাই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ একান্নবর্তী প্রথা উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া দাস দাসীর আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইয়াছে। সেকালে একজন রাঁধিতে গেলেন, একজন বাড়ির সকল ছেলেগুলিকে একত্র করিয়া ভাত খাওয়াইতে গেলেন। তখন এড়া ভাত খাওয়া ছেলেদের একটা পদ্ধতি ছিল—তখন প্রায়ই কর্তারা প্রাতে উঠিয়া কাজকর্ম করিতেন বা দেখিতেন, দ্বিপ্রহরে বাটি আসিয়া স্নানাহ্নিক ও আহারাদি করিতেন। তাহাতে ২।৩ টার কম পুরুষদেরই আহার হইত না। সুতরাং রন্ধনকারিণী কিছু দশটার পূর্বে রান্নাঘরে যাইতেন না। তাই জন্য নিয়ম ছিল, একজন সকল ছেলেগুলিকে একত্র করিয়া 'চড়িভাতির' মতো দুই একটি ব্যঞ্জন ও ভাত রাঁধিয়া আহার করাইতেন। ইহাতে স্নানের বা শুচির বিশেষ আবশ্যক ছিল না—সকল দিন রন্ধন করাও হইত না—এক এক দিন গ্রীষ্মকালে চাহি কি পান্তা ভাতও খাওয়ানো হইত। তাই এই ভাতের নাম 'এড়াভাত' বা 'বাসী ভাত' সেকালে বহু পরিবার একত্রে থাকায় আজ ইনি, কাল উনি, এইরূপ পালা করিয়া রাঁধা হইত, সুতরাং সকলেরই সকলের নিকট কোনো-না-কোনো বিষয়ে সাহায্য পাওয়াতে তাদৃশ ক্লেশানুভব করিতেন না। কিন্তু এখন সকলেই প্রায় পৃথক্ হওয়াতে রোগে, শোকে, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়ও শিশু সন্তানগুলিকে লইয়া প্রত্যেককেই এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় যে দাস দাসী না রাখিলে চলে না। অনেক নির্বিরোধী প্রভু কহিবেন যে, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা উঠিয়া যাওয়ারও তো বৌ বৌ ঝগড়াই কারণ। একান্নবর্তী প্রথা আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র কথা আসিয়া পড়ে, সুতরাং এখানে তাহার বিশেষরূপে আলোচনা ছাড়িয়া দেওয়া গেল। পৃথক রহিবার একটি প্রধান কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ইংরেজ রাজত্বে কাশী যাইতে হইলে আর উইল করিয়া যাইতে হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বল্প আয়াসে অল্প খরচে বহু দূরদেশে যাতায়াত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং সকলেই নিজ নিজ কর্মস্থলে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া যান। সুতরাং ঝগড়া-ঝাঁটি না হইলেও পৃথক্ থাকা হয়—সেকালে বিদেশে নিজ প্রাণ রক্ষাই দুষ্কর ছিল, সুতরাং কেহই কর্মস্থানে নিজ স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতে পারিতেন না। দূরত্বানুসারে কেহ সপ্তাহে, কেহ মাসান্তে, কেহ বৎসরান্তে বাটি যাইতেন। কেহ বা দশ বিশ বৎসর উপার্জন করিয়া একেবারে বাটি ফিরিতেন। সুতরাং তখন এক কর্তার অধীনে বহু পরিবার প্রতিপালিত হইত। সময়ানুসারে একান্নবর্তী প্রথার আবশ্যকতা

ছিল, এই জন্য সকলেই কিছু-না-কিছু কষ্ট সহ্য করিতেন। স্ত্রী পুত্র, মাতা পিতা, সকলেই পরস্পরে পরস্পরের কাছাকাছি থাকিতে চাহে। এখন রেলের গাড়ি হওয়াতে যাতায়াতের খুব সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতার কাছাকাছি পল্লীগ্রামে যাঁহাদের বাটি , সকলেই জানেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের পরিবার নিজ গ্রামে থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন না। তাঁহাদের ভিন্ন খরচ করিয়া থাকিতে যে অতিরিক্ত খরচ হয়, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে রেলওয়ে কোম্পানিকে দিয়া থাকেন। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া স্নেহপূর্ণ গৃহে তাঁহারা যে আরাম পাইয়া থাকেন, তাহা কলিকাতার বাসায় পান না—তাই জন্য তাঁহারা নিজে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও বাটি হইতে যাতায়াত করেন।

যাহা হউক, এ-কালের মেয়েরা যে শুদ্ধ কার্যাক্ষম বলিয়া দাস দাসী রাখা হয়, এমন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সেকালে ছেলেরা প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, পাড়ার পাঁচ সাতটি ছেলে একত্রে পাঠশালায় হাজির হইত—দ্বিপ্রহরে বাড়ি আসিয়া খাওয়া দাওয়া করিত। কিন্তু এ-কালের ভিন্ন প্রথা—বেলা নয়টার সময় যেমন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বাড়ির কর্তাকে আপিস যাইবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতে হয়—তেমনি ছেলেদেরও স্কুলের তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়। এখন 'পাঠশালা' পরিবর্তন হইয়া যেমন 'স্কুল' হইয়াছে, তেমনই বেশভূষারও পরিবর্তন হইয়াছে। জামা জুতা, ছাতা, কত কি চাহি। অনেক সময় জুতা অভাবে স্কুল যাওয়া বন্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেকালে গৃহস্থ-বালকের মধ্যে কয় জন বারো মাস জুতা ব্যবহার করিতে পাইত? পাল পার্বণে পোশাকি কাপড়ের মতো অধিকাংশের মাঝে মাঝে হয়তো জুতা আবশ্যক হইত। সেকালে যে-যাহার পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিত—এ-কালে কি কায়স্থ, কি ব্রাহ্মণ, কি অন্য শ্রেণীর লোক, সকলেই স্কুল আপিস যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে। এই সকল স্কুল আপিসের হাঙ্গামায় গৃহিণী ধীর ভাবে রন্ধনাদি করিবে, না সকলকে আবশ্যকীয় ভাবে গুছাইয়া দিবে? আর এই তাড়াতাড়িতে কি রন্ধনই ভালো হয়? না সকল রকম ব্যঞ্জন হইয়া উঠে? মাছের ঝোল ভাত হয় তো ঢের। তাও বাজার আনিতে বিলম্ব সহে না, প্রায়ই বাসী মাছ রাখা হয়। প্রভাতে উঠিয়া, কয়লার উনানে আগুন দিয়া স্নান-সমাপনান্তে ভাত না চড়াইতে 'দাও দাও' শব্দ। কর্তা ভাত দাও দাও চিৎকার করিতেছেন; আপিসে জবিমানার ভয়। বড় ছেলে নূতন অ্যাপ্রেন্টিস্, ত্রাহি মধুসূদন—ভাতের জন্য বুঝি নাম কাটা যায়। মধ্যম 'স্কুলের বেলা হল, একটু সকাল সকাল না গেলে পড়া শুনতে পাব না।' তৃতীয়, 'মাস্টার মারবেন'। চতুর্থ, 'খিদে পেয়েছে' করিয়া আঁচল ধরিয়া ঝুলিতেছে—কোলের খুকিটি একাকী পড়িয়া দুগ্ধ অভাবে ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেছে। কে কাহাকে দেখে!—এমন অবস্থায় যে কি বিপদে পড়িতে হয়, তাহা যাঁহারা কখনও এমন অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন।

এ-কালের মেয়ে এ-কালেরই উপযোগী। দোষেই হোক, আর গুণেই হোক, এ-কালের মেয়ে, সেকালের মেয়ের মতো হইলে কি এ-কাল চলে? শুধু শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট রাঁধিতে জানিসে এ-কালে আর মান সম্ভ্রম নাই। পাঁঠার বড়া বড়ি চচ্চড়ি কে কতরকম জানেন, তাহারই এখন সকলে খবর লইয়া থাকেন। সাদা ভাতের মান নাই—

হলদে ভাত রাঁধিতে জানা চাহি। 'পিঁড়া আলপনা,' 'ছাঁচ কাটা,' 'কাঁথা শিয়ান' এখন আর শিল্পের মধ্যে গণ্য নহে। আর তাহা বাস্তবিকই এত সহজ যে, এ-কালের মেয়েদের পক্ষে তাহা কষ্টকর নহে। এ-কালের মেয়েরা 'পিঁড়া আলপনা,' 'কাঁথা শিয়ান' সত্ত্বেও অতি সুন্দর সুন্দর নানাবিধ শিল্প ও আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন। সেকালের মেয়েরা অবকাশ পাইলেই গল্প করিতে বসিতেন—গল্পটা কিরূপ, তাহা বোধ হয় বেশি বলিতে হইবে না, সেই গল্পের অধিকাংশই যে পরনিন্দায় পূর্ণ, সে বিষয়ে হলপ করা যাইতে পারে। এ-কালে একটু লেখা পড়া জানা থাকাতে, এবং বঙ্গভাষায় অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তক হওয়াতে কেবল পরনিন্দা করিয়া সময় কাটাইতে তাঁহাদের আবশ্যকও হয় না।, প্রবৃত্তিও হয় না। পাড়ার বামন পিসি কায়েত মাসিকে একটু নুন, চারটি চাল দিয়া, ভাব-সাব রাখিয়া আবশ্যকমতো সময় কাটাইবার খোরাক জোগাড় করিতে এ-কালের মেয়েরা ব্যস্ত হয়েন না। ধনী মহিলারা দাসীবেষ্টিত হইয়া নিজ প্রশংসা ও পরনিন্দা শ্রবণ করা অপেক্ষা নভেল পাঠ করিয়া, কার্পেট বুনিয়া সময় কাটানো গৌরবের বিষয় বিবেচনা করেন। এ-কালের মেয়েরা কিছু গর্বিতা, এ-কালের মেয়ে নিজ মনোদুঃখ বা সাংসারিক অভাব বা স্বামী পুত্রের নিন্দাবাদ যাহার তাহার কাছে করেন না। নিতান্ত সখ্যতা বা আত্মীয়তা না থাকিলে, সকল পেটের কথা খুলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তৃপ্তিলাভ করা, এ-কালের মেয়েরা পছন্দ করেন না। তাঁহারা বইখানি, কার্পেটটুকু, নিজের স্বামী পুত্র লইয়া দিন যাপন করিতে বা একেলা থাকিতে কষ্ট বোধ করেন না। সুতরাং পরনিন্দার হাতে ততটা আত্মসমর্পণ করিতে হয় না। ধনীর গৃহ ব্যতীত কয় জন গৃহস্থ মহিলা বিছানায় পড়িয়া দিন কাটাইতে সময় পাইয়া থাকেন, তাহা আমরা তো বুঝিতে পারি না এবং জানিও না। রন্ধন বা বাসন মাজা ব্যতীত কত কাজ আছে, গৃহস্থ ঘরের মহিলাদের স্বহস্তে যে সকলই সম্পন্ন করিতে হয়। বিছানায় পড়িয়া যে তাঁহারা অসুস্থতা টানিয়া আনেন, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অন্যায় দোষারোপ করা হয়। পল্লীগ্রাম যে এদানিক ম্যালেরিয়া জ্বরে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা তো আলস্যের ফলে নহে। তারপর অতিথি অভ্যাগতকে যত্ন করা—সত্য বটে, এ-কালের মেয়েরা অতিথি অভ্যাগতকে যত্ন করেন না। কিন্তু অতিথি কোথায়—কাহাকে যত্ন করিবেন?

সেকালে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে পদব্রজে যাইতে লোকের আতিথ্য আবশ্যক হইত। তখন বহু পরিবারের অন্ন হইতে অনায়াসে দুই এক জনের অন্ন হইত এবং 'আসুন্তি যায়ুন্তি হাঁড়িতে দুটি চাল বেশি করে দাও' বলা হইত। কিন্তু আজকাল রেলওয়ের কল্যাণে কে কাহার দুয়ারে যায়? সুতরাং কালধর্মে অতিথির অভাবে আতিথ্যের ভাবও ঘুচিয়া যাইতেছে। আর কি এখন কেহ পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে চটি দেখিতে পান? সেকালে প্রতি ক্রোশে চটি—প্রতি পাঁচ ক্রোশ অন্তরে সরাই থাকিত। চটিতে মুদিনী—সে কি দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য বা পরকালের ফল ভোগের জন্য অতিথিদের যত্ন করিত, এ বিশ্বাস বোধ হয় কাহারও নাই। এখন রেলওয়ে স্টেশনে লুচি কচুরি, মোণ্ডা মেঠাই, দুগ্ধ ফল প্রভৃতি সকল জাতিরই আবশ্যকীয় সকল রকম খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। আবশ্যক হইলেই উপাদান হয়। সমাজের যখন যেরূপ আবশ্যক, তখন সেইরূপ

পাওয়া যাইবেই। নিজ নিজ স্বার্থের জন্যই সকলেই আবার পরস্পরে পরস্পরের আবশ্যকীয় হইয়া উঠে। আজ আমার ঘরে অতিথি এল, আমি আজ সেবা যত্ন করলে, তারা আমাদের আবার করবে এখন—এই স্বার্থটুকু মনের এক প্রান্তে লুক্কায়িত থাকিতই। এখন তোমারও দরকার নাই, আমারও দরকার নাই—অতিথিও নাই, আতিথ্যও নাই।

এ-কালের মেয়েদের রুচি এখন সেকাল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াছে। সেকালের বাউটি পৈঁছার আর এখন আদর নাই। 'কলসির কাণা'র মতো বাউটি পরিয়া নিমন্ত্রণ-সভায় গেলে আর কেহ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে না। 'অমুক বোস্ অমন করে বেড়ায় বটে—কিন্তু দেখেছিস ভাই, মিন্‌সের পয়সা আছে—নইলে গিন্নিকে অমন কলসির কাণার মতো বাউটি দিতে পারে!' কথাগুলি সঙ্গিনীকে যদিও যথাসাধ্য চুপি চুপি বলা হইল বটে, কিন্তু বাউটি-ধারিণীর কানে তাহা পৌঁছিল। তিনিও প্রফুল্ল মনে, গৌরব নেত্রে বাউটি-সমালোচনাকারিণীর দিকে কটাক্ষ করিয়া 'ঠিক বলেছ' ভাবটি প্রকাশ করা এখন আর কেহ গৌরবের বিবেচনা করেন না।

এক ঝুড়ি সুতায় গাঁথা সোনার নুড়ি, ঢিল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, লম্বা, চওড়া পদার্থ—নারকেল ফুল, মাদুলি রুসণো, মরদানা, যবদানা নামে অভিহিত করিয়া এবং তাহাদের সোনার কলসির কাণায় সুকোমল বাহু আচ্ছাদন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী হরণ করা এ-কালের মেয়েরা যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন না। এবং 'আমার একখানি বেনারসি শাড়ি আছে গো' দেখাইবার মতো। একটি বার বেনারসি শাড়ি পরিয়া নিমন্ত্রণ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, অসহ্য গরমে শ্রান্ত হইয়া '১২৫্ টাকার শাড়ি, খাসা! এক বার পরেই কি মাটি করিব' এই কথা বার বার দাসীকে বলিয়া ও আশপাশের শুভ্র শাড়িধারিণীদের শুনাইয়া কাপড়খানি সন্তর্পণে ছাড়িয়া রাখা তাঁহারা হাস্যজনক বিবেচনা করেন না।

পরিপাটি ও সুশ্রী দেখাইবার জন্য বস্ত্র অলংকার পরিধান করা—বস্ত্র অলংকারে যদি তাহা বিনষ্টই হইল, তবে তাহাতে আবশ্যক কি? এ-কালে অলংকারসকল ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে—অলংকারের কারুকার্য এখন নজরে পড়ে—মূল্যের লাঘবতায় তাহার মানহানি হয় না। মূল্যের সমষ্টি ট্যারচা, চৌখোপা, বেনারসি, আলমারি, বাক্সে পোকা ধরিতেছে।

শুভ্র বস্ত্রের আদর আজকাল অধিক পরিমাণে দেখা যায়। কনে বধূদেরই বেনারসি শাড়ি ব্যবহার করানো হইয়া থাকে। ঢাকার গুলবাহার পঞ্চম পেড়ে, কেবল মাত্র আইবড় ভাতে মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া থাকে। এখন সুন্দর সুন্দর পাড়ের ঢাকাই শাড়ি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। লজ্জাহীনা বলিয়া এ-কালের মেয়েদের একটি দুর্নাম রটনা করা হইয়া থাকে। যদিও এ-কালে ঘোমটা দেওয়া পদ্ধতিটা কিয়ৎপরিমাণে কম দেখা যায় বটে, কিন্তু কোনো মহিলাই বিনা আচ্ছাদনে নীলাম্বরী শাড়ি পরিধান করেন না। এ-কালে বরঞ্চ বঙ্গমহিলাদের পরিচ্ছদ লজ্জাশীলতা এবং সুরুচির পরিচায়ক।

সকলেই জানেন যে, বাঙালি মেয়ের 'যজ্ঞি' কি এক বিষম ব্যাপার। ৫০ জনকে নিমন্ত্রণ করিলে ২০০ শত জনের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে হয়। অনেক সময়ে লুচি সন্দেশ বাঁধিবার বাহুল্যতায় এত অধিক পরিমাণে খাদ্য মজুত রাখিয়াও

নিমন্ত্রণকারিণীকে অপ্রতিভ হইতে হয়। এই কুপ্রথা এ-কালের মেয়েরা অতিশয় ঘৃণা করেন। আজকাল যে এই প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। তবে ধনীদের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ গৃহস্থ মহিলাও সেকালের মতো আহারস্থলে উপবেশন করিয়াই সরা কয়খানি এবং পাতের লুচি কয়খানি তুলিয়া পশ্চাতে রক্ষা করেন না। এই বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া যে অতিশয় কুপ্রথা এবং সুবিধাজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?—ইহাতে পরস্পরকেই কষ্ট পাইতে হয়। আজ তোমার ছেলের ভাতে আমি এক পালকি খাদ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া লইয়া আসিলাম—কাল আমার মেয়ের বিয়েতে তোমাকে তাহার সুদ সমেত বুঝাইয়া দিতে হইল। তবুও প্রত্যেকেই বাঁধিয়া লইতে ছাড়িতেন না, এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রণকারিণীও অসন্তুষ্ট হইতে ছাড়েন না। এই লজ্জাকর প্রথা এ-কালের মেয়ের রুচি অনুসারে বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা না হইলে আর সরা তুলিতে কোনো মহিলারই হস্ত অগ্রসর হয় না।

এ-কালের মেয়ের স্বামী-ভক্তি লইয়া মাঝে মাঝে বড়ই আন্দোলন হইয়া থাকে। বোধ হয় কোনো কোনো দুর্ভাগা পুরুষ স্ত্রীর অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আত্মবৎ জগৎসংসার দেখিয়া থাকেন। স্ত্রী পুরুষে অল্পবিস্তর বিবাদ বিসংবাদ সেকালেও ছিল, এ-কালেও আছে। সেকালের মহিলারা স্বামীদিগকে ভক্তি স্নেহের সহিত ভয়ও করিতেন, এ-কালের মেয়ে স্বামীকে ভক্তি ও স্নেহ করিয়া থাকেন। 'মেয়েলি কথা,' 'মেয়েমুখো,' 'স্ত্রৈণ' প্রভৃতি কথাতে মনে হয় যে, সেকালের পুরুষরা মেয়েদের কতকটা হীন ভাবে দেখিতেন। সুতরাং মেয়েরাও কতকটা ভয় করিয়া চলিতেন। সেকালের মেয়েরা স্বামী-নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এবং স্বামীকেও সকল কথা কহা নিন্দনীয় বিবেচনা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে স্বামীর সহিত তাঁহাদের বড় একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিত না।

এ-কালে স্বামী স্ত্রীকে কতকটা বন্ধুভাবে দেখেন; সকলকেই নিজ নিজ বাটিতে কর্তৃত্ব করিতে হয়, সকলেরই অনেক সময় পরামর্শের আবশ্যক হয়, সুতরাং স্ত্রীই অনেক সময়ে পরামর্শদায়িনী হয়েন। কারণ, তাঁহাদের ঘরকন্নার মঙ্গলাঙ্গল ইষ্টানিষ্ট উভয়ের সমান। এই সকল নানা কারণে এ-কালের স্বামীকে স্ত্রী তত দূর ভয় করেন না, বরং তিনিই বাটির গৃহিণী হওয়াতে স্বামী সদা সর্বদাই তাঁহার যত্ন স্নেহ পাইয়া থাকেন। এ-কালে স্নেহ ভক্তির সহিত ভয় নামক পদার্থটি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাস্তবিক এ-কালে গৃহস্থের মধ্যে দরিদ্রতার অতিশয় পীড়ন দেখা যাইতেছে। কিন্তু এ-কালের মেয়ের দোষে তাহা নহে। সেকালে ২ টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, এখন ৪ টাকার কম এক মণ চাউল পাওয়া যায় না। 'যত আনি, তত নাই' তাহা এ-কালের মেয়ের জন্য নহে—আহার্য সামগ্রী মহার্ঘ্য হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।

অধিক আর কিছু বলিবার নাই, একটু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিবেন যে, কালের পরিবর্তনে ও ইংরাজ রাজা হওয়াতে আমাদের যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার গতিরোধ মানুষের অসাধ্য। আমাদের নব্যসম্প্রদায় ইংরেজি সম্প্রদায় দেখিয়া মুগ্ধ! তাহারা যথাসাধ্য সেইরূপ ধরনধারণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ সুখী না হইতে পারিয়া বোধ হয় মহিলাদিগকে সকল অসুখের মূল বিবেচনা করিতেছেন। রমণীগণ

চিরকালই পুরুষদিগের আশ্রিত ও তাঁহারা যে চিরকালই পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া থাকেন, তাহা কাহারও মনে হইতেছে না। আমাদের বাঙালি যুবকদিগের রুচি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনুসারেই এ-কালের মেয়ে গঠিত হইতেছে। লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি পরা, মাথায় চওড়া সিন্দুর, কপালে বৃহৎ সিন্দূরটিপ, নাকে নথ, দাঁতে মিশি, কৃষ্ণবর্ণ ঠোঁট, হাতে শাঁখা, পায়ে দু-গাছা মল—ঝোটন করিয়া খোপাবাঁধা স্ত্রীর সহিত, বোধ করি এ-কালের স্বামী বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক, ঘরে ঢুকিতেও দিবেন না। তাঁহারা অতীত কালের মহিলাদের গুণটুকু মাত্র স্মরণ করিয়া, এ-কালের মেয়েদের উপর নানাবিধ দোষার্পণ করিতেছেন। বাস্তবিক ঐ সকল দোষে মহিলারা দোষী কি না—বাস্তবিক মহিলাদের নিজস্ব সম্পত্তি মায়া মমতা, স্নেহ ভালোবাসা এ-কালের মেয়েদের আছে কি না, তাহা কেহ কখন ভাবিয়াও দেখেন না। হাতের কাছে কলম পাইলেই এ-কালের মেয়ে সম্বন্ধে যাহা মনে আসে, লিখিয়া ফেলেন। কিন্তু এ-কালের মেয়ে সেকালের মেয়ের মতো হইতে পারে না এবং হইলেও তাহাদের উপর অধিকতর অনুরাগী হওয়া নব্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অসম্ভব। দূর হইতে লেপাপোছা উঠান—চালে লাউগাছ, মাচায় শশাগাছ, আশেপাশে কামিনীফুলের গাছ, লেবুগাছ, দু-চারটি বেল ও জুঁইয়ের গাছ-বেষ্টিত কুটিরখানি দেখিয়া আমরা কল্পনায় কত বার ঐ কুটিরে বাস করিতে কত না সাধ করিয়া থাকি, নিজেদের কোঠাবাড়ির ইট-কাঠের উপর কত তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ করি। কিন্তু বাস্তবিক যদি কোঠাবাড়ি ছাড়িয়া ঐ কুটিরে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তখন তাহার সমস্ত অসুবিধা আমরা জানিতে পারি। তখন কুটিরে বাস যে কতটা কষ্টকর এবং আমাদের পক্ষে কত দূর অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারি। এখনও পল্লীগ্রামে প্রতি গৃহস্থ বধূরা বাসন মাজে. রাঁধে, ধান সিদ্ধ করে, উঠান ঝাঁট দেয়, গরুর সেবা করে। কিন্তু বল দেখি—কয় জন গৃহস্থ পুরুষ গরুর দড়ি ধরিয়া চরাইয়া বেড়ায়—কাটারি দিয়া বাঁশ কাটিয়া বাগানের বেড়া দিয়া থাকে? কয় জন পুরুষ ছাতা জুতা ব্যতীত টোকা মাথায়, খড়ম পায়ে দিয়া পথ চলিতে অপমান বিবেচনা করেন না? চাষাভূষার ঘরেও অন্তত একটি কামিজ নাই, এমন ব্যক্তি কয় জন আছে? কিন্তু তাহাদের মেয়েরা জ্যাকেট একটা বৃহৎ জানোয়ার, কি বিলাতি খাবার, তাহা জানে না। তুমি আজ যদি আদর করিয়া তোমার মেয়েকে পূজার সময় একটি জ্যাকেট কিনিযা দাও. তাহা হইলে সে শ্বশুরবাড়ি হইতেও কি দোলের সময় আর একটি জ্যাকেটের প্রার্থী হইবে না—এবং মেয়ের মা হইয়া স্বামীর নিকট সন্তানদের পোশাকের জন্য দৌরাত্ম্য করিবে না? অনেকে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার বিরোধী, কিন্তু এখন ছোট ছোট মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হইয়া থাকে, পাড়ায় স্কুল পাঠশালা বিরাজিত। পিতা মাতা ভাবেন, 'আহা, পরের ঘরে যাবে,—একটু লিখিতে পড়িতে শিখুক—এর পর তবু দুটো মনের কথা লিখেও তো জানাতে পারবে—পরের খোসামোদ করতে হবে না।' শুদ্ধ তাহা নহে, এ-কালে কন্যা দেখিতে আসিয়া, 'তোমার নাম কি?' জিজ্ঞাসা করিয়া 'যাও মা, উঠে যাও' ইহা কেহ বলেন না। তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা করিয়া, মেয়েটি বোবা কি না, পরীক্ষা করা হইল। এখন বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন, তাহারও তো পরীক্ষা চাই। 'কি পড়' তাহার প্রশ্ন। একটু পড়াশুনা জানা না

থাকিলে এ-কালের মেয়ের বিবাহ হওয়া পর্যন্ত দায়। অধিকাংশ এম.এ., বি.এ.-র ধনুর্ভঙ্গ পণ, যেন শুধু রূপ দেখে না বিয়ে দেওয়া হয়, লেখাপড়া জানা চাই। বিবাহের সময় শিক্ষিত বর অশিক্ষিত ক'নে, অর্থাৎ কিছুই পড়িতে লিখিতে পারে না, শুনিলে অতিশয় দুঃখিত হন। তিনি বাসরঘরে শালি শালাজদের কনেকে লেখাপড়া শিখাইতে অনুরোধ করেন। ফুলশয্যা বাদে বর্ণপরিচয় প্রথম দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী ইত্যাদি অসংখ্য পুস্তক শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দেন এবং বার বার লেখেন, যেন লেখাপড়াটা শেখানো হয়। বালিকার বিবাহ হইয়াছে, আর স্কুলে যাইবার নিয়ম নাই, সুতরাং স্কুলের ভয় বা বন্ধন নাই—তাহার পুতুলখেলায় মন—সেও পড়িবে না, মাতাও ছাড়িবেন না—ভয়, পাছে জামাই রাগ করে। তিনি কর্তাকে পেড়াপীড়ি করেন—'ও গো, মেয়েটাকে একটু পড়াও না।' ছেলেকে বলেন, 'ও রে, সুশীকে সকাল বিকেল তোর কাছে বইখানা নিয়ে বসাতে পারিস্ নে?' দুপুরবেলা পাড়ার বিদ্যাবতী মহিলাদের সাধ্যসাধনা করিয়া বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইতে অনুরোধ করেন। এ দিকে 'ক খ' আরম্ভ না হইতে হইতে বরের নিকট হইতে মস্ত মস্ত প্রেমলিপি আসিতে আরম্ভ হইল। বিষম বিভ্রাট, কন্যার মাতা প্রমাদ গণিলেন, বাপ মেয়েকে লেখাপড়া শেখান নাই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পাড়ার মেয়েরা উক্ত পত্রের উত্তর দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন—কেহ ভালো কবিতা খোঁজেন, কেহ গান পছন্দ করেন—তাহাদের দিনগুলা বেশ আমোদে কাটিল—দেখিয়া শুনিয়া ঠাট্টার হাসিতে মেয়েটা লজ্জায় সারা হইল। তাই বলি, একটু লেখাপড়া না জানা থাকিলে বিবাহ হওয়া পর্যন্ত দায়। তবে যদি লেখাপড়াই শিখিল, তাহা হইলে এ-কালের মেয়ের ভাব ও রুচির পরিবর্তন অনিবার্য।

এ বিষয়ে আর অধিক কত বলি, এইখানেই ইতি করা যাক। শেষ কথা এই যে, এ-কালের মেয়ে এ-কালেরই উপযোগী।

☐ *ভারতী ও বালক*, আশ্বিন-কার্তিক, মাঘ ১২৯৮

নূতন ও পুরাতন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

'Ring out the old ring in the new'

চাকদহস্থ কোনো কৃষকের শ্যামনগরস্থ কোনো বন্ধু কোনো কার্য উপলক্ষে তাহার বাড়িতে আসিলে সে কৃষক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কি প্রকারে উক্ত গ্রামদ্বয়ের ব্যবধান অতিক্রম করিল। তাহার বন্ধু তাহাতে উত্তর করিল যে, সে চারিগণ্ডা পয়সা খরচ করিয়া রেলে চাপিয়া আসিয়াছে। তাহাতে কৃষক একান্ত আন্তরিক অবজ্ঞা সহকারে কহিল, 'দূর বোকা, চারগণ্ডা পয়সা রেলওয়ে কোম্পানিকে দিলি? এই সাড়ে আট ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসে মোড়ে ঐ নিতাই ময়রার দোকানে ঐ চারগণ্ডা পয়সার গুড় খেলে কাজ দেখ্‌ত।' এই উক্তিতে প্রমাণ হয় যে, হয় ইংরেজকৃত বাষ্পীয় যানের প্রতি কৃষকের তাদৃশী ভক্তি ছিল না, নয় তো গুড় তাহার অতীব প্রিয় জিনিস ছিল।

ইংলন্ডেরও রেল হইবার পূর্বে নগর হইতে নগরান্তরে যাইবার জন্য বৃহদশ্বদ্বয়সংযুক্ত স্প্রিংওয়ালা মেলকোচের বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে রেল স্থাপিত হইবার সময় মেলকোচ্‌ম্যানরা অবশ্য এই অদ্ভুত উদ্ভাবনকে বিশেষ বন্ধুর চক্ষে দেখিত না এবং বাষ্পীয় যানের হীনত্ব ও মেলকোচের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য সদা-সর্বদাই নিরতিশয় ব্যগ্র হইত। এক দিন এক জন গাড়োয়ান এক জন ভদ্রলোককে অতি আত্মীয়ভাবে অনেক অকাট্য যুক্তিতে মেলকোচে গমনাগমনের সুবিধা ও রেলে যাতায়াতের অসুবিধা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করাইয়া যাহা বলিয়া তাহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়াছিল, তাহা এতই সুন্দর ও সরল যে, আমি তাহার মূল ইংরেজিটা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সে শেষে বলিল, 'above all sir, the upsetting of trains is a serious matter, Mail coaches too are upset, I admit sir, I but, sir, if a mail-coach is upset, why, there you are but if a train is upset, you don't know where you would be.'

ভাবার্থ : সব চেয়ে, দেখুন মহাশয়, রেল উল্টোনোর ব্যাপারটা কি সঙ্গিন্! হাঁ মানি মেলকোচও উল্টোয়; কিন্তু যদি মেলকোচ উল্টোয়,—ব্যস! কিন্তু যদি ট্রেন উল্টোয় তো কোথায় থাকবেন যে, তা বল্‌তে পারেন না।

উক্ত সুন্দর সরল ও অকাট্য যুক্তিটা ভদ্রলোকটির কাছে খুব উপাদেয় ও বিশদ বোধ

হইয়াছিল কি না, জ্ঞাত নহি। কিন্তু এটি সকলে বেশ দেখিতে পাইতেছেন যে তথাপি মেলকোচের কার্য শেষ হইল, ও রেল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল।

যখন ইংলন্ড চক্রহল [wheel plough] বাষ্পচালিত হল [steam plough] পূর্ব প্রচলিত চক্রহীন হলের [swing plough] স্থান দখল করিল, প্রচলিত লাঙলের পক্ষপাতী প্রাচীন কৃষকসম্প্রদায় দুঃখ করিয়া কহিতে লাগিল 'হাঁ, নূতন লাঙলে সুবিধা বটে, কিন্তু হায়, তাহাতে হলচালনার হস্তকৌশল চলিয়া যাইবে।' তথাপি, পুরাতন হলের দিন গেল ও নূতন প্রকারের হল প্রচলিত হইল।

যখন পুরানো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ধর্মের পরিবর্তে ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাংশে খ্রিস্টীয় ধর্ম আসিল, তখন এক [Norse] কবি অতি করুণ-স্বরে সেই পুরাতন ধর্মের মৃত্যুগান গাহিয়াছিলেন। গ্রিসীয় ও রোমীয় পৌত্তলিক ধর্মের অবসানেও পণ্ডিত ও কবি উভয় সম্প্রদায়ই নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। তথাপি খ্রিস্টের সরল ধর্ম আসিয়া স্বীয় সিংহাসন অধিকার করিল; এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গ্রিসীয় ও রোমীয় ধর্মসমুদয় তাহাদের কবিত্ব ও প্রতিভা লইয়া অস্তমিত হইল।

হার্মিশ আর দৌত্যকার্য করেন না। ভিনস্ ও এডোনিস তাঁহাদের প্রেমরাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। থরের বজ্র আছে, কিন্তু থর বিশ্ব-জগতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপে সুকুমার কলার যুগ চলিয়া গিয়া তাহার স্থানে যে শুষ্কবিজ্ঞান আসিয়া বসিয়াছে, তাহা কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছেন না? 'হোমরের সমুদ্র-নির্ঘোষ-গম্ভীর দুন্দুভি-নিনাদ, ভার্জিলের প্রবল মধুর অভ্রভেদী ভেরীধ্বনি, শেক্সপিয়রের মর্মস্পর্শী তরঙ্গায়িত বীণা-নিক্বণ আজ নীরব। এঞ্জেলোর অদ্ভুত সুন্দর মর্মর-প্রতিমার রচনা, রাফেলের বিচিত্রবর্ণ-সমাবেশময় অভিরাম চিত্রাঙ্কন, বেট্‌হোভনের অপূর্ব হৃদয়োন্মাদী স্বর্গীয় সঙ্গীতসৃষ্টির যুগ গিয়াছে। তাহার স্থানে লাপলাসের জ্যোতিষ ও নিউটনের গণিত, লিনিয়াসের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও ডারউইনের প্রাণীতত্ত্ব, লাভয়সিয়ারের রসায়ন ও হার্বার্ট স্পেন্সারের দর্শন আসিয়া বসিয়াছে।

শুদ্ধ ইউরোপে কেন, সমস্ত পৃথিবীতে পুরাতন নূতনকে আসন ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আসীরিয়া গেল, গ্রিস আসিল। গ্রিস গেল রোম আসিল। রোম গেল, তাহার স্থলে ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন আসিল। এশিয়া গেল ইউরোপ আসিল। আবার ইউরোপ যাইবে, আমেরিকা আসিবে। পৃথিবীময় সর্বত্রই পুরাতন যায়, নূতন আসে।

অসীম ব্যোমের এক প্রান্তে জ্যোতির্ময় সূর্য জ্বলিয়া উঠে, নিভিয়া যায়; আবার নূতন সূর্য অনন্ত ব্যাপ্তির কোন্ সুদূর সীমান্তে জ্বলিয়া উঠে, নিভিয়া যায়। বিচ্যুত সূর্যখণ্ড গ্রহরূপে পরিণত হয়, গ্রহ নিস্তেজ ও হীনতাপ হইয়া বাসযোগ্য হয় ও তাহাতে অগণ্য উদ্ভিদ, প্রাণী জন্মে, মরে; আবার জন্মে, আবার মরে; এক জাতীয় প্রাণী চলিয়া যায়—নূতন জাতীয় প্রাণী আসে। ক্রমে গ্রহ স্বয়ং নিস্তাপ হইয়া জীবনশূন্য হয়; আবার আকাশের সুদূর প্রান্তে নূতন গ্রহ বাসযোগ্য হয় ও ঐ নাটক বিভিন্নাকারে সেখানে অভিনীত হয়।

ভারতেও আবহমান কাল উহাই হইয়া আসিয়াছে। বৈদিক যুগ গিয়াছে, পৌরাণিক

যুগ আসিয়াছে; পৌরাণিক যুগ গিয়াছে, বৌদ্ধযুগ আসিয়াছে; বৌদ্ধযুগ গিয়াছে, তান্ত্রিক যুগ আসিয়াছে।

আদিমনিবাসি-রাজত্ব গিয়াছে, আর্য-রাজত্ব আসিয়াছে; পরে যথাক্রমে পাঠান, মোগল রাজত্ব গিয়া ইংরেজ-রাজত্ব আসিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ঐ একই খেলা চলিতেছে। এক প্রকার শিল্প যায়, অপর প্রকার শিল্প আসে; এক ভাষা যায়, অপর ভাষা আসে; এক ধর্ম যায়, অন্য ধর্ম আসে; এক জাতি যায়, অন্য জাতি আসে; এক প্রাণী যায়, অন্য প্রাণী আসে; এক গ্রহ যায়, অন্য গ্রহ আসে; এক সূর্য যায়, অন্য সূর্য আসে। পুরাতন যায়, নূতন আসে। এই বিশ্বের অখণ্ড নিয়ম।

পরশুরাম অজেয় বীর ও বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে, সূর্যোদয়ে চন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া গেলেন। ইহাতে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা দেখাইয়াছেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরের অবতারেরও নূতন অবতারের জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

স্বয়ং পিতা পুত্রের কাছে হারিয়া থাকেন। রাম সসৈন্যে নিজের শিশু-পুত্রদ্বয় কুশীলবের কাছে যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। অর্জুন স্বীয় ঔরসজাত বভ্রুবাহনের হস্তে নিহত হইলেন। পুত্রেরা পিতৃগণ হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও পিতার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

এই সত্যযুগেও পুত্রগণ, পিতৃগণ হইতে যে তাঁহারা অভিজ্ঞ, এটি যেন স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করেন; যাহাতে কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

'We call our fathers fool,
so wise we grew,
Our wiser sons will doubtless
think us so.'

কবি দুঃখ করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে পুত্রদিগের ঐ প্রকার বিশ্বাস অপনীত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না। ইংরেজেরা প্রচলিত ভাষায় একটি কথা বলিয়া থাকেন— Every dog has its day অর্থাৎ সকলেরই 'এককাল' যায়। পুত্রগণ পিতৃগণকে মুখে কিছু না বলিলেও প্রকারান্তরে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের কাল গিয়াছে।

কেন পুরাতন যায় ও নূতন আসে? পুরাতন কেন চিরকাল সমভাবে, বা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া টিকিয়া থাকে না? মানুষ কেন মরে? জাতি বা ধর্ম কেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়? সূর্য কেন নিষ্প্রভ হইয়া নিভিয়া যায়?

এক অজ্ঞেয় শক্তিপ্রভাবে মানুষ জন্মে ও বর্ধিত হয় এবং যৌবনে এই শক্তির চরম বিকাশ হইয়া গেলে মৃত্যুমুখী হয় ও পরে মরে। যেন প্রস্তরখণ্ড এক অজ্ঞেয় শক্তি দ্বারা ঊর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত হইয়া সেই শক্তি অনুযায়ী উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া মাধ্যাকর্ষণশক্তি দ্বারা নিজ প্রক্ষেপণ-শক্তির ব্যয় হইয়া গেলে আবার অধোগামী হয়। মনুষ্যেরই মতো আবার জাতি বা ধর্ম, সঞ্চিত নবশক্তি-প্রভাবে উঠিয়া, যত দূর সম্ভব প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, সে শক্তির ব্যয় হইয়া গেলে, অধোগামী হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়। সূর্য কোন প্রাপ্ত তেজে ব্যোমমার্গে

জ্বলিয়া উঠে ও তাহার ব্যয় হইয়া গেলে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া মরিয়া যায়। সর্বত্রই একই কথা বিভিন্নাকারে।—শক্তিসমষ্টির একীভূততায় জন্ম ও তাহার বিকিরণে মৃত্যু।

জানি না কেন শক্তিসমষ্টি কদাপি কেন্দ্রীভূত ও কদাপি বিকীর্ণ হয়। জানি না, কেন এ অসংখ্য জন্মমৃত্যু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় প্রতি যুগে, প্রতি বর্ষে, প্রতি পলে সংঘটিত হইতেছে। জানি না, নিত্য নিয়ত এই পুরাতনের অবসান ও নূতনের অভ্যুদয় প্রত্যেকে কি উদ্দেশ্যসাধন করিতেছে। শুদ্ধ বুঝি যে ইহা ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের অংশমাত্র ও তাহার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ভূতত্ত্বে, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে ও প্রাণীতত্ত্বে ইহা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এই অনন্ত জন্মমৃত্যুতেই পৃথিবী ও সম্ভবত সমস্ত বিশ্বজগৎ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। এঞ্জিনের পিস্টনের [piston] এই পুরোগতি ও পশ্চাদ্‌গতিতেই এঞ্জিন ক্রমাগত চলিতেছে।

জানি না, কোথায় এক অন্তর্নিহিত অনন্তকর্মমত্তা এক দুর্দাম আদ্যাশক্তি আছেন—যিনি এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকে ধীরে সহিষ্ণুভাবে এইরূপে নিয়ত বিবর্তিত করিতেছেন; ও এই অসীমব্যাপ্তির কোন দূরদেশে অবস্থিত হইয়া এই অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন করিতেছেন। কিন্তু ইহা জানি যে, এ শক্তি অদম্য, এ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, এ বিধি মঙ্গলময়।

সেই আদ্যাশক্তির অনুল্লঙ্ঘ্য কল্যাণকর নিয়মে নূতন জাতির, নূতন সভ্যতার, নূতন আলোকের সংঘাতে আজ ভারতবর্ষে পুরাতনের অবসান ও নূতনের অভ্যুদয় হইতেছে। কে এই তীব্র গতি রোধ করিতে পারে?

যখন হিন্দুজাতি এক অদম্য বিরাট-ঢেউয়ের মতো আর্যাবর্তে ও ব্রহ্মাবর্তে আসিয়া পড়িয়াছিল, কেহ কি তাহার গতি রোধ করিতে পারিয়াছিল? আবার যখন মুসলমান জাতি নব ধর্মবলে বলীয়ান্ হইয়া এক প্রবল ঝড়ের ন্যায় পৃথিবীময় ছাইয়া পড়িয়াছিল, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও সুদূর খ্রিস্ট-ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত তাহাদের শাণিত অসি সঞ্চালিত করিয়াছিল, সে উন্মত্ত বীর্যকে কে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিল? আবার যে এখন খ্রিস্ট-ইউরোপ এক সুদৃঢ় সংযত বিক্রমে পৃথিবীর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা কে নিবারণ করিতে পারিতেছে?

হিন্দুর নিরীহ নিশ্চেষ্ট ধ্যানরত ধর্মনিষ্ঠা মুসলমানের অভূতপূর্ব ধর্মোন্মাদের নিকট পরাস্ত হইল। আবার মুসলমানের ধর্মোন্মাদ খ্রিস্ট-ইংরেজের সংযম, শিক্ষা ও ন্যায়পরতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কোন্ নিয়মানুযায়ী এ কার্যপরম্পরা হইল? কেন মুসলমানের কাছে হিন্দুর ও ইংরেজের কাছে মুসলমানের এই পরাভব হইল? এ পরাভবের অর্থ কি? ইহা কেবল নবশক্তির নিকট পুরাতন শক্তির অনিবার্য পরাজয়। শক্তিব্যয় হইয়া এক জাতি বা ধর্ম নামিয়া যায়, আর লব্ধ নবশক্তির প্রভাবে এক নূতন জাতি বা ধর্ম উঠে। শুদ্ধ ইহার অর্থ—পুরাতন যায়, নূতন আসে।

এ বিধি যে জগতের পক্ষে মঙ্গলময়, ইহা এই তিন জাতির ইতিহাসে প্রত্যক্ষ হয়।

মধ্য ও পূর্ব এশিয়া যেরূপ বর্বর ও ধর্মহীন ছিল, তাহার জন্য উন্নত, শিক্ষিত, ধর্মানুপ্রাণ আর্যজাতির বিস্তার ও সে সভ্যতার পুষ্পস্বরূপ বুদ্ধের জন্ম প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ইউরোপের অন্ধযুগে মুসলমানগণ বিদ্যালয়, পুস্তকালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়া গ্রিসীয় বিদ্যা ও প্রতিভা ইউরোপময় ছড়াইয়া দিয়াছিল। ভারতবর্ষে আমাদিগের নিশ্চেষ্ট অসাড়

ধর্মান্ধতা লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। আবার ইংরেজের ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির উদয়ে সংযম-শিক্ষা ও ন্যায়ের মহিমা প্রচারিত হইল।

আমাদের পুরাতন চলিয়া গিয়াছে। যে সভ্যতাসূর্য দ্বিসহস্র বর্ষ ধরিয়া এশিয়াকে আলো দিয়াছিল, সে সূর্য ডুবিয়াছে। শুদ্ধ তাহার গোধূলিমাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। তাহাও চলিয়া যাইবে। সে সূর্যকে কে ফিরাইতে পারে?

হিন্দু-জাতির জাতীয়ত্ব অনেক কাল গিয়াছে। হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহার প্রাণ-বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দু হাজার টিকি রাখুন, ফোঁটা কাটুন, ভগবদ্‌গীতার পাতা উলটান, সে কেবল ইংরেজবিদ্বেষিতা বা আপনার জিনিসে মমতার নামান্তর মাত্র। হিন্দুধর্মে আসল বিশ্বাস যাহা ছিল, তাহা গিয়াছে। তাহার দৈব উৎপত্তিতে, তাহার সর্বাঙ্গীণতায়, তাহার নিষ্প্রমাদতায় আন্তরিক বিশ্বাস আমরা হারাইয়াছি। কে তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারে?

হিন্দু ধর্মে যে আমরা স্বমস্তিষ্ককল্পিত নূতন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, আমরা বিশ্বাসটি হারাইয়াছি। ইউরোপেও বিজ্ঞান কর্তৃক নির্দয়রূপে আক্রান্ত হইয়া খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকগণ বাইবেলের এইরূপই নূতন অর্থ বাহির করিতেছেন। তাহার প্রভূত পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য ধীশক্তি এবং গভীর গবেষণা দর্শিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা সে লুপ্তবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করিতে পারে না। ধর্মে প্রকৃত বিশ্বাস উৎসের ন্যায় স্বতঃই মাটি ফুঁড়িয়া উঠে, স্বতঃই প্রবাহিত হয়, তাহাকে মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে হয় না। যখন চেষ্টা করিয়া বিশ্বাস টানিয়া আনিতে বা ধরিয়া রাখিতে হয়, তখন আর আসল বিশ্বাস নাই। এটি ধর্মের সেই অবস্থা যাহা কার্লাইল এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।— We belive that we believe. [অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি বলিয়া যেন আমাদের বোধ হয়।] যখন ধর্মের এই অবস্থা তখন সেটি তাহার অন্তিম কাল। বিশ্বাস যদি না হারাইয়া থাকি, তবে এ সব ব্যাখ্যা এ সব যুক্তি, এ সব তর্ক কেন?

সত্য বটে, যে, এই পঞ্চবিংশতি কোটি হিন্দুর মধ্যে এখনও অন্তত বিংশতি কোটি হিন্দু হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নাকারে অন্তরে বিশ্বাস করে। কিন্তু সে বিংশতি কোটি অশিক্ষিত।

শিক্ষার বিস্তারের সহিত তাহাদেরও আন্তরিক বিশ্বাস অন্তর্হিত হইবে। নূতনের সহিত তাহার সম্যক্ সংঘাত হয় নাই বলিয়াই তাহা এখনও টিকিয়া আছে।

তবে কি তাহাদের শিক্ষা বন্ধ করিয়া তাহাদের বিশ্বাস অটুট রাখিবে? গৃহের গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া পাশ্চাত্য আলোক ঢুকিতে না দিয়া কি তাহাদের অন্ধকারে রাখিতে চাহ?

হিন্দুরাজত্ব হইলেও হয় তো তাহা কিছুদিনের জন্য সম্ভব হইত ও তাহাতে ইন্দ্রিয়াসক্ত, নীচপ্রবৃত্তি, অর্থলোলুপ পাণ্ডা ও মোহান্তদিগের উপজীবিকা এখনও কিছু দিন চলিত। কারণ দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ দেশীয়দিগকে পাশ্চাত্যজাতি হইতে তফাৎ রাখিবার জন্য সর্বপ্রকার বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুর গমন নিষিদ্ধ হইলেও পাশ্চাত্য জাতি নিজে আসিয়া সবলে এ রুদ্ধদ্বার ভাঙিয়া প্রবেশ করিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকজাল দেশময় বিস্তার করিল।

ঐ তীব্রালোকের ঢেউ এখন বাঁধ ভাঙিয়া অপ্রতিহতবেগে ও প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে ঘরে ঘরে ঢুকিতেছে। আর এ কত দিন। এখনই দেখিতে পাই যে, শিষ্যেরা আর ব্রাহ্মণসেবা করিতে চাহিতেছে না; নিজের স্বার্থসেবায় অধিক মন দিতেছে। ব্রাহ্মণও শিষ্যের ভক্তির উপর আর নির্ভর না করিয়া উপজীবিকার জন্য চাকুরি করিতে বাধ্য হইতেছে। আর এ কত দিন!

হতভাগ্য ব্রাহ্মণজাতি! ভাবিয়াছিল কি যে, শূদ্র কর্তৃক বেদপাঠ বন্ধ করিয়া, বিজাতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে জাতিকে তফাত রাখিয়া ও জনসাধারণকে প্রতিমাপুত্তলি দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া, নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখিবে? ঐ দেখ, সেই শূদ্রে শুধু শাস্ত্রপাঠ করিতেছে না, ইংরেজি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সটীক শাস্ত্র প্রকাশ করিতেছে, সেই ধর্মশত্রু ভিন্ন জাতি ঘরে আসিয়া একাধিপত্য করিতেছে ও তোমাকেই চাকর রাখিয়া হুকুম চালাইতেছে। সেই প্রতিমা আজ ভক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শুদ্ধ মদ্যপায়ী বিলাসীর ভড়ং দেখাইবার উপায়স্বরূপমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমরা নিজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য যদি এত ব্যস্ত না হইয়া, জাতির মানসিক ও নৈতিক উন্নতির দিকে একটু বেশি মনোযোগ দিতে, তাহা হইলেও বোধ হয়, তোমাদের প্রভুত্ব এখনও থাকিত, জাতিও উন্নতির পথে অগ্রসর হইত। উঃ! কি ক্ষমতা তোমাদের হস্তে ছিল ও তাহার কি অপব্যবহারই করিয়াছ! নহিলে তোমাদের এ দুর্দশা হইবে কেন? অথবা এ জাতির পতন হইবে বলিয়াই তোমাদের ঐ বুদ্ধি আসিয়া জুটিয়াছিল। বুঝি পূর্বজ্ঞান, পূর্ববুদ্ধি, পূর্বপ্রতিভা হারাইয়া সেই অখণ্ড নিয়মে পূর্বমহিমা হইতে অবনত হইয়া নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট, নিরুপায়ভাবে স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে? ইউরোপের পোপগণও কাথলিক-ধর্মরক্ষার্থও ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই একই নিয়মে কার্যপরম্পরা হইয়া থাকে।

আমাদের হিন্দুধর্মের আন্তরিক বিশ্বাস যে গিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই এবং যতই পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে, ততই যে জনসাধারণের তাহা যাইবে, তাহাতে সংশয় করিবার কারণ দেখি না। কিসে বিশ্বাস থাকিবে?

আমরা দেখিতেছি যে ব্রহ্মতেজে সগরবংশ দগ্ধ করা দূরে থাকুক, সামান্য তৃণটি পর্যন্ত জ্বালা যায় না; দেয়াশালাই চাই। দৈবশক্তিতে শিলার সেতুবন্ধ করিয়া আর সিংহল বা ব্রহ্মদেশ যাওয়া যায় না; ইস্টিমার চাই। কামধেনুতে দুবেলা অন্নটি পর্যন্ত জোগাইতে পারে না; পরিশ্রম চাই বা অন্তত বাপের বিষয় চাই।

সে দুর্বাসার তেজ, সে কপিলের তপস্যা, বশিষ্ঠের বুদ্ধি ও বিবেক গিয়াছে। এখনকার ব্রাহ্মণগণ কি আর শুদ্ধ ফোঁটা কাটিয়া, টিকি রাখিয়া, নামাবলি গায়ে দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে সে ভক্তি পাইবেন? তবে এখনও বিবাহে, শ্রাদ্ধে ও উপবীতে পৌরোহিত্য করিবার জন্য ও ভাত রাঁধিবার জন্য ব্রাহ্মণ দরকার হয় বলিয়া তাহারা টিকিয়া আছেন মাত্র। তবে এই রকমে যতদিন কাটে!

পৃথিবীময় একই কথা! যেরূপ চাষা ও মেলকোচমান রেলের অপ্রতিহত ।বস্তারে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল; যেরূপ প্রবীণ ইংরেজ কৃষক চক্রহীন হলের দিন শেষ হওয়ায় বিলাপ

করিয়াছিল; যেরূপ ইউরোপে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের অবসানে কবিগণ কাঁদিয়াছিলেন; এবং যেরূপ ইউরোপে সুকুমার কলার মৃত্যুতে আধুনিক ইউরোপীয় লোক নিরুপায়ভাবে রোদন করেন; আজ বঙ্গের লেখক সেইরূপ হিন্দুধর্মের নিষ্প্রাণপ্রতিমাকে দেখিয়া অশ্রু-বিসর্জন করেন ও তাঁহাকে যেন জড়াইয়া করুণ ভক্তিস্নেহগদ্‌গদ স্বরে ডাকিয়া কহেন— 'কোথা যাও, তোমাকে যাইতে দিব না।' হায়! তথাপি যাইতে দিতে হয়; তথাপি পুরাতন যায়, নূতন আসে। সন্তানের আর্তনাদ ও প্রতিবেশীর হাহাকার, প্রণয়ীর অন্ধ আলিঙ্গন ও জগৎ কর্তৃক তদ্‌গুণকীর্তন—পুরাতনকে ফিরাইতে বা মৃতদেহে প্রাণ আনিতে পারে না।

পুরাতনের সমাধির উপর এই বিফল ক্রন্দনে কেমন একটু কারুণ্য আছে। পুরাতনের মৃতদেহও, যেন তাহার প্রতি প্রত্যঙ্গ, প্রতি লোমকূপ হইতে সজলদীননেত্রে ভক্ত সন্তানদিগের প্রতি চাহিয়া বলে,—আমাকে ছাড়িও না; আমি এত দিন তোমাকে মানুষ করিয়াছি, অবারিত ধারে স্নেহ দিয়াছি, দুঃখে সান্ত্বনা দিয়াছি, আমাকে ধরিয়া রাখো, ছাড়িও না। কিন্তু হায়, তথাপি ছাড়িয়া দিতে হয়। গভীর ক্রন্দনে আকাশ বিদীর্ণ করিলেও, বিধাতার সিংহাসনের সম্মুখে আছাড়িয়া পড়িলেও, এই অটল নিষ্ঠুর নিয়মের চরণে আত্মবলি দিলেও, মৃতদেহে প্রাণ আসে না; পুরাতন ফিরে না। জগতের এমনই হৃদয়হীন নিয়ম যে, নূতনের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

পুরাতন যে বিশুদ্ধ মন্দ, কে বলিবে? পুরাতনের সহিত কত না সৌন্দর্য, কত না সুখ, কত না মহিমা চলিয়া যায়। কত শস্য-শ্যামলতা, কত লতানিকুঞ্জ, কত তরুচ্ছায়াপথ এই পুরাতন রাজ্যের সহিত কালের অতল সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায়। কত নক্ষত্রের স্বপ্নরাজ্য, কত স্থিরগাম্ভীর্য, কত ঘননীলিমা, কত চন্দ্রালোক রাত্রির সহিত মিলাইয়া যায়। তথাপি রাজ্য সাগরজলে ডুবিয়া যায়—নবরাজ্য সৃষ্ট হয়; রাত্রি যায়, দিন আসে। তথাপি পুরাতন যায় নূতন আসে।

আহা! পুরাতনের গাম্ভীর্য-মাধুর্য-সৌন্দর্যগুলি যদি ধরিয়া রাখিতে পারা যাইত, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই উদ্দাম বিকাশের সহিত যদি গ্রিসীয় স্থপতিকার্য, ইটালির ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প, জার্মানির সংগীত ও ইংলন্ডের কবিত্ব মিলাইতে পারা যাইত! পুরাকালের সৌন্দর্যবোধ ও মধ্যযুগের নিঃস্বার্থ প্রেমান্ধতা যদি অদ্যকার একাগ্রতার সহিত একত্রে দ্রবীভূত করা যাইত! প্রাচীন ভারতের ধর্মানুপ্রাণতা যদি অদ্যকার পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত সংমিশ্রিত করা যাইত!

আমরা পুরাতনের জন্য কাঁদি; তাহার স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখি; ইহা বাঞ্ছনীয়। কারণ যদি বা তাহার মধ্যে যাহা সুন্দর, উজ্জ্বল ও পবিত্র, তাহার কিছুও ধরিয়া রাখিতে পারি। আর তাহা না পারিলেও এই পুরাতনের স্মৃতি অনেক দুঃখে, দৈন্যে ও দুর্দিনে সান্ত্বনা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যেন নূতনকে স্বাগত-সম্ভাষণ দিতে বিস্মৃত না হই। আমরা অগ্রসর হইতে হইতে স্মৃতির স্কন্ধে ভর দিয়া মধ্যে মধ্যে পুরাতনের দিকে চাহিয়া দেখি, সে ভালো। কেন না, অতি বেগে অগ্রসর হইতে গেলে পতনের সম্ভাবনা, কিন্তু

তাই বলিয়া সত্য সত্য যেন পিছাইয়া ও সম্মুখের প্রশস্ত আলোকিত জনাকীর্ণ পথ ছাড়িয়া, পশ্চাতের সংকীর্ণতায়, অর্ধান্ধকার ও পরিত্যক্ত পথে ফিরিয়া না যাই।

যদি অদ্য নূতনের আলোক ইউরোপ হইতে আসিতেছে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? একদিন এশিয়া ইউরোপকে আলো দিয়াছিল, ধর্ম ও জ্ঞানের খাদ্য ও বসন দিয়া হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। এখন ইউরোপ না হয় পিতার কাছে পুত্রের ঋণ পরিশোধ করিতেছে। তাহাতে লজ্জা বা অপমান নাই। পরজাত বলিয়া এ অমূল্যধনে—এ অনিচ্ছা, এ অভিমান, এ ক্ষোভ কেন?

পুরাতনকে ফিরাইয়া আনিবার শক্তি আমাদের নাই। জগতে কোনো কালে, কোনো দেশে, কেহ পুরাতনকে ফিরাইতে পারে নাই। গ্রিস পারে নাই; তাহারা তাহাদের পুরাতন প্রথা ত্যাগ করিয়া সাধারণ ইউরোপীয় নীতি আচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদের পুরাতন হিন্দুসভ্যতা ও গৌরব হইতে তো ন্যূন ছিল না। তাহারা তো পুরাতনের গৌরব করিয়া বসিয়া নাই। পুরাতনের গৌরব করিয়া যাহারা বসিয়া থাকে, তাহাদের মনে কতক সান্ত্বনা হইতে পারে বটে, কিন্তু দৈন্য ঘোচে না। বরং তাহাদের দৈন্য বাড়িবার সম্ভাবনা। কারণ, নূতনকে ডাকিয়া না আনিলেও সে আপনিই অনাহূত হইয়া আসে ও উগ্র প্রবল উচ্ছ্বাসে বন্যার ন্যায় প্রবেশ করিয়া পুরাতনের ভগ্ন মন্দিরকে উপাড়িয়া, টানিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বীয় প্রাচীন সভ্যতার অহংকার করিয়া বসিয়া থাকিয়া চীন তাহার 'স্বর্গীয় রাজ্য' রক্ষা করিতে পারিল না। জাপান কর্তৃক আলিঙ্গিত পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা পরাজিত হইল। শুদ্ধ যুদ্ধবিদ্যায় নহে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, সর্ববিষয়েই সে হীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতের সেই দুর্দশা ঘটিয়াছে।

শুদ্ধ জাতিতে কেন, একই দেশে, একই ধর্মে, পুরাতন যায় নূতন আসে। 'ক্যাথলিক' খ্রিস্টধর্ম আর 'প্রোটেস্টান্ট' খ্রিস্টধর্মের নিকটে তাহার সাবেক প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছে না। আবার 'প্রোটেস্টান্ট' ধর্ম আধুনিক 'মেটিরিয়ালিজমে'র বিপক্ষে নিষ্ফল অস্ত্র ধারণ করিতেছে। এই ভারতবর্ষেই ধর্মের কত যুগ গিয়া কত নবযুগ আসিয়াছে। কি ভাষায়, কি শিল্পে, কি ধর্মে, কি জাতিতে; কি ভূখণ্ডে, কি সৌরজগতে;—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই একই খেলা চলিতেছে—পুরাতনের অবসান ও নূতনের অভ্যুদয়। আমরা কি এই নিরানন্দতার মধ্যে ক্ষীণদেহে, হীনবুদ্ধিতে, হৃত উদ্যমে, এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী নিয়মের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া পুরাতনের এই বিভিন্ন বিখণ্ড বিচ্যুত পচনোন্মুখ দেহে প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে পারিব?—অথবা পুরাতন যে গিয়াছে, সে বিষয়ে কি আমাদের এখনও সন্দেহ আছে? আমরা যে আর উন্নতিশীল জাতি নহি, আমাদের ধর্মকর্ম যে বিশ্বাসহীন হইয়া নির্জীব নিষ্প্রাণ ক্রিয়াকলাপে পরিণত হইয়াছে, আমাদের যে শাস্ত্র সব অলঙ্ঘ্যভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া জড়, অবরুদ্ধ, ব্যাকরণগত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? জীবন অসাড়তায় নহে, পরিচালনাতেই লক্ষিত হয়; আমরা যে চলৎশক্তিরহিত হইয়াছি এবং কেহ চলিতে চাহিলেও যে রোষ-কষায়িত নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে কি? কেহ কি বিবেচনা করে যে, আমাদের এখনও উন্নতির অবস্থা? অথবা আমরা কি বিবেচনা করিতেছি যে, এ নূতন সভ্যতা জগতের

একটা অস্থায়ী ব্যাপার, ভূমিকম্পের ন্যায় একটা মুহূর্তের নৈসর্গিক ঘটনা? আমরা কি ভাবিতেছি যে, ইহাতে বেগ নাই, যাহাতে ইহা একটি স্থায়ী সরিৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এ কি বিধাতার যথেচ্ছাচারিতা, ক্ষিপ্ততা বা ব্যাধিগ্রস্ত মস্তিষ্কের স্বপ্নমাত্র? এই উদ্দাম বিকাশ, এই বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ, এই তৎপর মানবহিতৈষিতা ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বা পরদেশজয়হেতু এত যুদ্ধের সরঞ্জাম সত্ত্বেও এই অন্তর্নিহিত ন্যায়পরতা, এই বুদ্ধি, এই বিবেক, এই প্রতিভা, এই সাহস, এই সংযম—এই সকল কি প্রকৃতির বিকারমাত্র? ইহা কি হিন্দুর নিশ্চেষ্ট, আত্মমোক্ষচিন্তানিরত ধর্মপরায়ণতা ও মুসলমানের অসিনীতির স্থান অধিকার করিবার যোগ্য নহে? যিনি ইহা বিবেচনা করেন, তিনি হয় আত্মপ্রেমান্ধ নতুবা বিকৃতমস্তিষ্ক।

আমরা উঠিতে চাই তো নূতন করিয়া গড়িতে হইবে; পুরাতনে আর কত জোড়া দিবে? এ বাড়ি নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে, ইহা ভাঙিয়া নূতন বাড়ি নির্মাণ করার প্রয়োজন হইবে। সে উদ্যম না থাকে তো, এইরূপ পচিতে হইবে! অনেক প্রথা জরাজীর্ণ, শ্লথগ্রন্থি ও সময়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়াছে। তাহা মেরামত করিয়া রাখিবার চেষ্টা দস্তুরমতো বাতুলতা। আর ছাই মেরামতই বা করিতে চাই কই? পুরাতনকেই যে আমরা সাবেক আকারে খাড়া করিয়া রাখিতে চাহিতেছি।

পুরাতন বিশুদ্ধ উত্তম হইলেও এবং তাহাকে ধরিয়া রাখা সম্ভব হইলেও, অন্তত তাহাকে সাবেক আকারে রাখা আর শ্রেয় নহে। মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন দরকার। অমরাবতী কাহারও বাসস্থান হইলেও পর্যটন শিক্ষাপ্রদ, আনন্দময়ী ও স্বাস্থ্যকর! বদ্ধ পুষ্করিণীর জল অতি নির্মল হইলেও শীঘ্রই কীটপূর্ণ হয়। সর্বোত্তম আসনেও দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল ও অসাড় হইয়া যায়। হিন্দুধর্মের এখন সেই অবস্থা হইয়াছে। অনেক দিন না নাড়িয়া এখন নড়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আচার ও প্রথা উত্তম হইলেও তাহার মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন আবশ্যক :

'Lest one good custom should corrupt the world.'

স্বপ্নের কাল গিয়াছে, উপন্যাসের কাল গিয়াছে; অন্ধবিশ্বাসের কাল গিয়াছে। বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডের, কষ্টিপাথরের, ক্রু সিবিলের কাল আসিয়াছে। সূর্যের প্রখর দিব্য শুভ্র-কিরণে রাত্রির অন্ধকার প্রত্যূষের কুজ্ঝটিকা রঞ্জিত মেঘ ও লোহিত আকাশ অপসারিত হইয়াছে। ভূত-প্রেতের সহিত দেব, দৈত্য ও পরীদের রাজ্যও চলিয়া গিয়াছে। আছে শুদ্ধ নির্মেঘ নির্মুক্ত নীলাকাশ।

নূতনের অনন্ত আলোক-স্রোত সম্মুখে বহিয়া যাইতেছে। আমরা কি বাহুতে বাহু বেষ্টন করিয়া নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট, নির্লিপ্তভাবে দাঁড়াইয়া ইহার পানে চাহিয়া থাকিব? উঠিতে হইলে আমাদের এই নূতন আলোক-স্রোতে ঝাঁপ দিতে হইবে।

নূতন বিশুদ্ধ উত্তম নহে, কিন্তু পৃথিবীতে কখনও কোনো সভ্যতাই বিশুদ্ধ উত্তম হয় নাই, হইলে তাহার লোপ পাইবার কারণ দেখি না। প্রতি সভ্যতায় ভালো মন্দ উভয়ই বিজড়িত আছে। এই মন্দটুকু—যাহা জীবাণুর ন্যায় প্রতি সভ্যতার শরীরে লুক্কায়িত থাকে, তাহাই সেই সভ্যতার অবনতিতে তাহার কালস্বরূপ হইয়া যেন নূতনের সহিত

ষড়যন্ত্র করিয়া পুরাতনের বিনাশ সাধন করে। যখন কোনো সভ্যতাই কখনই বিশুদ্ধ উত্তম হয় নাই, তখন যে এই নূতন সভ্যতা বিশুদ্ধ উত্তম হইবে—এমন আশা করাও বৃথা। কিন্তু কন্যার বিবাহ দেওয়া হইতে রাজ্যশাসন পর্যন্ত সকল বিষয়ই ভালো-মন্দ ওজন করিয়া বাছিয়া লইতে হয়। মিল্ বলেন যে, সামাজিক প্রশ্ন বা রাজনৈতিক প্রশ্ন গণিতের প্রশ্নের মতো নহে, যাহাতে সব সত্যটুকু একদিকে ।এ প্রশ্নগুলির উভয় দিকেই ভালো-মন্দ আছে। তাহার মধ্য হইতে বিবেচনা করিয়া বাছিয়া লইতে হয়।

নূতন পুরাতন অপেক্ষা কখনও বা নিকৃষ্টও হয়। সভ্যতা ক্রমাগত উঠে না। ইহা যেন জোয়ারের মতো অগ্রসর হয়; অনেক দূর আগাইয়া আসে, আবার একটু পিছায়, আবার আগাইয়া যায়। এইরূপে সে যেন মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া অগ্রসর হয়। ইতিহাসে সেই জন্য দেখা যায় যে, অনেক সময় একই ঘটনা বিভিন্ন যুগে বিভিন্নাকারে পুনরাবৃত্ত হয়। তাই বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে. সভ্যতা চক্রাকারে ঘুরিতেছে না বা সরল ঊর্ধ্বগামী হইতেছে না; ইহা আবর্তরেখায় [spiral line-এ] উঠিতেছে।

তথাপি নূতনকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভালো হউক, মন্দ হউক, এই নূতনের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, নূতনে প্রাণ আছে, পুরাতনে প্রাণ নাই; নূতনেই জীবন, পুরাতনে মৃত্যু; নূতনকে ভালোদিকে চালাইতে পারে, কিন্তু পুরাতন চলে না।

জগতে সবই ঘুরে। অবিশ্রান্ত পুরাতন যাইতেছে, নূতন আসিতেছে। কেবলমাত্র কেন্দ্রবৎ মেরুদণ্ডবৎ; স্থির থাকে জীবন্ত, জ্বলন্ত, জাগ্রত মহাসত্য। সে সত্যের আদি নাই, বিকার নাই, নাশ নাই। যুগে যুগে এক এক মহাত্মা আসিয়া সেই স্থির মহিমময় আলোকপ্রতিমার আবরণ অংশত উন্মোচন করেন; বিপুল শ্রমে, মহৎ উদ্যমে, ঐশিক প্রতিভায় তাহার রত্নগুলি অজ্ঞান, অবিদ্যা, কুসংস্কারের গভীর অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহার অক্ষয়মুকুট রচনা করেন ও বিশুদ্ধ ভঙ্গিতে, অটল বিশ্বাসে দুর্দম্য সাহসে, শত্রুর অসিঝনৎকার ও অগ্নিশিখা, ক্রুশ ও কারাগার, দুর্বহ যন্ত্রণা ও আরক্ত হত্যার মধ্যেও তাঁহার নির্ভীক সুস্পষ্ট শঙ্খনিনাদে বিশ্ব বিকম্পিত করেন।

সমুদ্রের অন্ধ তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কত দেশ মহাদেশ বুদ্‌বুদের মতো উঠিয়া মগ্ন হইয়া যায়; শুদ্ধ পদতলে জলধির নিস্ফল আস্ফালনের দিকে চাহিয়া উপরে দাঁড়াইয়া থাকে—অচল, অনম্য তুষারকিরীটি-তুঙ্গ-পর্বতশিখর। বায়ুর প্রমত্ত ক্রীড়ায় কত বিতাড়িত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড— সে মহাদৈত্যের উষ্ণ নিশ্বাসবাষ্পের ন্যায় আসিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; শুদ্ধ উপরে একই ভাবে চাহিয়া থাকে—স্থির অক্ষুব্ধ অটল নির্নিমেষ নক্ষত্রের জ্যোতিঃপুঞ্জ। ব্যাপ্তির অনন্ত স্পন্দনে কত সূর্য গ্রহ চন্দ্র উদিত হইয়া বিলীন হইয়া যায়; শুদ্ধ কোটি কোটি সৌরজগতের উদয় ও বিলয়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি ও ধ্বংসের কোলাহলে, অনন্তকাল ও অনন্ত স্থানের সঙ্গমে, ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে—অবিচলিত, অনাদি, অবিনশ্বর অখণ্ড নিয়ম।

☐ *ভারতী*, পৌষ ১৩০২

দেবতা ও অসুর

স্বামী বিবেকানন্দ

সমাজ সৃষ্টি হতে লাগল। দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করত, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। যারা সমতল জমিতে, তাদের—চাষবাস; যারা পার্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল উট চরাতে লাগল; কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে শিকার করে খেতে লাগল। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগল। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্বল হতে লাগল। যাদের শরীর দিনরাত খোলা হাওয়ায় থাকে, মাংসপ্রধান আহার তাদের; আর যারা ঘরের মধ্যে বাস করে, শস্যপ্রধান আহার তাদের; অনেক পার্থক্য হতে লাগল। শিকারি বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী আহারে অনটন হলেই ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুটতে আরম্ভ করলে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য ঘনদলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগল, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হতে লাগল।

দেবতারা ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম নগর উদ্যানে বাস, পরিধান—বোনা কাপড়; আর অসুরদের পাহাড় পর্বত মরুভূমি বা সমুদ্রতটে বাস; আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফল-মূল; পরিধান ছাল; আর [আহার] বুনো জিনিস বা ভেড়া ছাগল গোরু, দেবতাদের কাছ থেকে বিনিময়ে যা ধানচাল। দেবতার শরীর শ্রম সইতে পারে না, দুর্বল। অসুরের[১] শরীর উপবাস, কৃচ্ছ্র, কষ্ট-সহনে বিলক্ষণ পটু।

অসুরের আহারাভাব হলেই দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে গ্রাম নগর লুঠতে এল। কখনও বা ধনধান্যের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগল। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু। আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার যন্ত্র-তন্ত্র নির্মাণ করতে লাগল। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র—সব দেবতাদের। অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারংবার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না, চাষবাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায় তো সে

১. 'দেবতা' ও 'অসুর' এখানে গীতার ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত দৈবী ও আসুরী সম্পদের প্রাধান্যযুক্ত মানব (জাতি) সম্বন্ধে ব্যবহৃত।

কিছুদিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধিকৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অসুর লুঠ করে সরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে অসুরদের তাড়ায়, তখন হয় তাদের সমুদ্রমধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে দু-দিকেই দল বাড়তে লাগল, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগল, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগল। মহাসংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজেতি চলতে লাগল।

এ সব রকমের মানুষ মিলেমিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথাসকলের সৃষ্টি হতে লাগল, নানা রকমের নূতন ভাবের সৃষ্টি হতে লাগল, নানা বিদ্যার আলোচনা চলল। একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগল। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগল, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম। যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো। পাহারাওয়ালার নাম হল রাজা, মুটের নাম হল সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগল। যে জিনিস তৈরি করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগল।

ক্রমে এই সকল ভাব—প্যাঁচাপেঁচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্য গেরো হয়ে বর্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হলেন। কিন্তু ছিট মরে না। যেগুলো পূর্ব জন্মে[২] ভেড়া চরাত, মাছ ধরে খেত, সেগুলো সভ্য-জন্মে বোম্বেটে ডাকাত প্রভৃতি হতে লাগল। বন নেই যে সে শিকার করে, কাছে পাহাড় পর্বতও নেই যে ভেড়া চরায়; জন্মের দরুন শিকার বা ভেড়া চরানো বা মাছ ধরা কোনোটারই সুবিধা পায় না সে—কাজেই ডাকাতি করে, চুরি করে; সে যায় কোথায়? 'প্রাতঃস্মরণীয়া'দের কালের মেয়ে, এ জন্মে তো আর এক সঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা। ইত্যাদি রকমে নানা ঢঙের, নানা ভাবের, নানা সভ্য-অসভ্য, দেবতা-অসুর জন্মের মানুষ একত্র হয়ে সমাজ। কাজেই সকল সমাজে এই নানারূপে ভগবান বিরাজ করছেন—সাধু-নারায়ণ, ডাকাত-নারায়ণ ইত্যাদি। আবার যে সমাজে যে দলে সংখ্যায় অধিক, সে সমাজের চরিত্র সেই পরিমাণে দৈবী বা আসুরী হতে লাগল।

জম্বুদ্বীপের তামাম সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংসিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস-তীর। এ সকল সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান। আর ইউরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বোম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুরভাব অধিক।

২. সভ্য হইবার পূর্বে

বর্তমানকালে যতদূর বোঝা যায়, জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগ ও আরবের মরুভূমি অসুরদের প্রধান আড্ডা। ঐ স্থান হতে একত্র হয়ে পশুপাল মৃগয়াজীবী অসুরকুল সভ্য দেবতাদের তাড়া দিয়ে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইউরোপখণ্ডের আদিমনিবাসী এক জাত অবশ্য ছিল। তারা পর্বতগহ্বরে বাস করত; যারা ওর মধ্যে একটু বুদ্ধিমান, তারা অল্প গভীর তলাওয়ের জলে খোঁটা পুঁতে মাচান বেঁধে, সেই মাচানের ওপর ঘর-দোর নির্মাণ করে বাস করত। চকমকি পাথরের তীর, বর্শার ফলা, চকমকির ছুরি ও পরশু দিয়ে সমস্ত কাজ চালাত।

দুই জাতির সংঘাত

ক্রমে জম্বুদ্বীপের নরস্রোত ইউরোপের উপর পড়তে লাগল। কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতের অভ্যুদয় হল, রুশ-দেশান্তর্গত কোনো জাতির ভাষা ভারতের দক্ষিণী ভাষার অনুরূপ।

কিন্তু এ সকল জাত বর্বর অতি বর্বর অবস্থায় রইল। এশিয়া মাইনর হতে একদল সুসভ্য মানুষ সন্নিকট দ্বীপপুঞ্জে উদয় হল, ইউরোপের সন্নিকট স্থান অধিকার করলে, নিজেদের বুদ্ধি আর প্রাচীন মিশরের সাহায্যে এক অপূর্ব সভ্যতা সৃষ্টি করলে। তাদের আমরা বলি যবন, ইউরোপীয়রা বলে গ্রিক।

পরে ইতালিতে রোমক [Romans] নামক এক বর্বর জাতি ইট্রস্কান্ [Etruscans] নামক এক সভ্য জাতিকে পরাভূত করে, তাদের বুদ্ধিবিদ্যা সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্য হল। ক্রমে রোমকেরা চারিদিক অধিকার করলে; ইউরোপখণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের যাবতীয় অসভ্য মানুষ তাদের প্রজা হল। কেবল উত্তরভাগে বনজঙ্গলে বর্বর-জাতিরা স্বাধীন রইল। কালবশে রোম ঐশ্বর্যবিলাসপরতায় দুর্বল হতে লাগল; সেই সময় আবার জম্বুদ্বীপ অসুরবাহিনী ইউরোপের উপর নিক্ষেপ করলে। অসুর-তাড়নায় উত্তর-ইউরোপীয় বর্বর রোমসাম্রাজ্যের উপর পড়ল। রোম উৎসন্ন হয়ে গেল। জম্বুদ্বীপের তাড়ায় ইউরোপের বর্বর আর ইউরোপের ধ্বংসাবশিষ্ট রোমক গ্রিক মিলে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হল; এ সময় ইহুদিজাতি রোমের দ্বারা বিজিত ও বিতাড়িত হয়ে ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নূতন ধর্ম খ্রিস্টানিও ছড়িয়ে পড়ল। এই সকল বিভিন্ন জাত, মত, পথ নানাপ্রকারের অসুরকুল, মহামায়ার মুচিতে[৩], দিবারাত্র যুদ্ধ মারকাটের আগুনে গলে মিশতে লাগল; তা হতেই এই ইউরোপী জাতের সৃষ্টি।

হিঁদুর কালো রঙ থেকে, উত্তরে দুধের মতো সাদা রঙ, কালো, কটা, লাল বা সাদা চুল, কালো চোখ, কটা চোখ, নীল চোখ, দিব্যি হিঁদুর মতো নাক মুখ চোখ, বা জাঁতামুখো চীনেরাম—এই সকল আকৃতিবিশিষ্ট এক বর্বর, অতি বর্বর ইউরোপী জাতির সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছুকাল তারা আপনা আপনি মারকাট করতে লাগল; উত্তরেরগুলো বোম্বেটেরূপে বাগে পেলেই অপেক্ষাকৃত সভ্যগুলোর উৎসাদন করতে লাগল। মাঝখান থেকে খ্রিস্টান

৩. ধাতু গলাইবার পাত্র, Crucible

ধর্মের দুই গুরু ইতালির পোপ [ফরাসি ও ইতালি ভাষায় বলে 'পাপ্'] আর পশ্চিমে কনস্টান্টিনোপলসের পাট্রিয়ার্ক, এরা এই জন্তুপ্রায় বর্বর বাহিনীর উপর, তাদের রাজারানি—সকলের উপর কর্তাত্তি চালাতে লাগল।

এদিকে আবার আরব মরুভূমে মুসলমানি ধর্মের উদয় হল। বন্যপশুপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে পৃথিবীর উপর আঘাত করলে। পশ্চিম পূর্ব দুপ্রান্ত হতে সে তরঙ্গ ইউরোপে প্রবেশ করলে। সে স্রোতমুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রিসের বিদ্যাবুদ্ধি ইউরোপে প্রবেশ করতে লাগল।

তাতার জাতি

জম্বুদ্বীপের মাঝখান হতে সেলজুক তাতার [Seljuk Tartars] নামক অসুর জাতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এশিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে ফেললে। আরবরা ভারতবর্ষ জয়ের অনেক চেষ্টা করেও সফল হয়নি; মুসলমান-অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবী বিজয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গেল। সিন্ধুদেশ একবার আক্রমণ করেছিল মাত্র, কিন্তু রাখতে পারেনি; তারপর থেকে আর উদ্যম করেনি।

কয়েক শতাব্দীর পর যখন তুর্ক প্রভৃতি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে মুসলমান হল, তখন এই তুর্কিরা সমভাবে হিন্দু, পার্শি, আরব, সকলকে দাস করে ফেললে। ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান বিজেতার মধ্যে একদলও আরবি বা পার্শি নয়, সব তুর্কাদি তাতার। রাজপুতানায় সমস্ত আগন্তুক মুসলমানের নাম তুর্ক—তাই সত্য, ঐতিহাসিক। রাজপুতানার চারণ যে গাইলেন, 'তুরুগণকো বড়ি জোর' তাই ঠিক। কুতুবউদ্দিন হতে মোগল বাদশাই পর্যন্ত ও-সব তাতার—যে জাত তিব্বতি, সেই জাত; কেবল হয়েছেন মুসলমান, আর হিঁদু পার্শি বে করে বদলেছেন চাকামুখ। ও সেই প্রাচীন অসুরবংশ। আজও কাবুল, পারস্য, আরব্য, কনস্টান্টিনোপলে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছেন সেই অসুর তাতার; গান্ধারি[৪], ফারসি, আরব সেই তুরস্কের গোলামি করছেন। বিরাট চীনসাম্রাজ্যও সেই তাতার মাঞ্চুর [Manchurian Tartars] পদতলে, তবে সে মাঞ্চু নিজের ধর্ম ছাড়েনি, মুসলমান হয়নি, মহালামার [Grand Lama] চেলা। এ অসুর জাত কস্মিন্‌কালে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিশলে যুদ্ধবীর্য বড় হয় না। উত্তর ইউরোপ, বিশেষ রুশের প্রবল যুদ্ধবীর্য—সেই তাতার। রুশ তিন হিস্যে তাতার রক্ত। দেবাসুরের লড়াই এখনও চলবে অনেক কাল। দেবতা অসুরকন্যা বে করে, অসুর দেবকন্যা ছিনিয়ে নেয়—এই রকম করে প্রবল খিচুড়ি জাতির সৃষ্টি হয়।

তাতাররা আরবি খলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলে, খ্রিস্টানদের মহাতীর্থ জেরুজালেম প্রভৃতি স্থান দখল করে খ্রিস্টানদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলে, অনেক খ্রিস্টান মেরে ফেললে। খ্রিস্টান ধর্মের গুরুরা ক্ষেপে উঠল; ইউরোপময় তাদের সব বর্বর চেলা; রাজা প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুললে—পালে পালে ইউরোপী বর্বর জেরুজালেম উদ্ধারের

৪. কান্দাহারের অধিবাসী

জন্য এশিয়া মাইনরে চলল। কতক নিজেরাই কাটাকাটি করে মলো, কতক রোগে মলো, বাকি মুসলমানে মারতে লাগল। সে ঘোর বর্বর ক্ষেপে উঠেছে—মুসলমানেরা যত মারে, তত আসে। সে বুনোর গোঁ। আপনার দলকেই লুঠছে, খাবার না পেলে মুসলমান ধরেই খেয়ে ফেললে। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমান-মাংসে বিশেষ খুশি ছিলেন, প্রসিদ্ধি আছে।

বুনো মানুষ আর সভ্য মানুষের লড়াইএ যায় হয়, তাই হল—জেরুজালেম প্রভৃতি অধিকার করা হল না। কিন্তু ইউরোপ সভ্য হতে লাগল। সে চামড়া-পরা, আম-মাংসখেকো[৫] বুনো ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি এশিয়ার সভ্যতা শিখতে লাগল। ইতালি প্রভৃতি স্থানের নাগা ফৌজ দার্শনিক মত শিখতে লাগল; একদল খ্রিস্টান নাগা [Knights-Templars] ঘোর অদ্বৈতবেদান্তী হয়ে উঠল; শেষে তারা খ্রিস্টানীকে ঠাট্টা করতে লাগল, এবং তাদের ধনও অনেক সংগৃহীত হয়েছিল। তখন পোপের হুকুমে ধর্মরক্ষার ভানে ইউরোপীয় রাজারা তাদের নিপাত করে ধন লুটে নিলে।

উভয় সভ্যতার তুলনা

এদিকে মুর নামক মুসলমান জাতি স্পেন [Spain] দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানাবিদ্যার চর্চা করলে, ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হল; ইতালি, ফ্রান্স, সুদুর ইংলন্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখতে এল; রাজা-রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা আচার কায়দা সভ্যতা শিখতে এল। বাড়ি ঘর-দোর মন্দির সব নূতন ঢঙে বনতে লাগল।

কিন্তু সমগ্র ইউরোপ হয়ে দাঁড়াল এক মহা সেনানিবাস—সে ভাব এখনও। মুসলমানেরা একটা দেশ জয় করে, রাজা—আপনাব এক বড় টুকরা রেখে বাকি সেনাপতিদের বেঁটে দিতেন। তারা খাজনা দিত না, কিন্তু রাজার আবশ্যক হলেই এতগুলি সৈন্য দিতে হবে। এই রকমে সদা-প্রস্তুত ফৌজের অনেক হাঙ্গামা না রেখে, আবশ্যককালে-হাজির প্রবল ফৌজ প্রস্তুত রইল। আজও রাজপুতানায় সে ভাব কতক আছে; ওটা মুসলমানেরা এদেশে আনে। ইউরোপীরা মুসলমানের এ-ভাব নিলে। কিন্তু মুসলমানদের ছিল রাজা, সামন্তচক্র, ফৌজ ও বাকি প্রজা। ইউরোপে রাজা আর সামন্তচক্র বাকি সব প্রজাকে করে ফেললে এক রকম গোলাম। প্রত্যেক মানুষ কোনো সামন্তের অধিকৃত মানুষ হয়ে তবে জীবিত রইল—হুকুম মাত্রেই প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধযাত্রায় হাজির হতে হবে।

ইউরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হল উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ি সমুদ্রতটময় প্রদেশ। এর তুলো হচ্ছে—সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা-জাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ি-জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলোয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড়; যে তলোয়ার না ধরতে পারে সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোনো বীরের তলোয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলোয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য

৫. কাঁচা বা আরাঁধা মাংসাহারী।

ইহ-পারলৌকিক ভোগ।

আমাদের কথাটি কি? আর্যরা শান্তিপ্রিয়, চাষবাস করে, শস্যাদি উৎপন্ন করে শান্তিতে স্ত্রী-পরিবার পালন করতে পেলেই খুশি। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনক রাজা স্বহস্তে লাঙল চালাচ্ছেন এবং সে-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মবিৎও তিনি। ঋষি, মুনি, যোগীর অভ্যুদয়—গোড়া থেকে; তাঁরা প্রথম হতেই জেনেছেন যে, সংসারটা ধোঁকা, লড়াই কর আর লুঠই কর, ভোগ বলে যা খুঁজছ তা আছে শান্তিতে; শান্তি আছেন শারীরিক ভোগ-বিসর্জনে; ভোগ আছেন মননশীলতায়, বুদ্ধিচর্চায়; শরীরচর্চায় নেই। জঙ্গল আবাদ করা তাদের কাজ। তারপর, প্রথমে সে পরিষ্কৃত ভূমিতে নির্মিত হল যজ্ঞবেদী, উঠল সে নির্মল আকাশে যজ্ঞের ধূম, সে বায়ুতে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, গবাদি পশু নিঃশঙ্কে চলতে লাগল। বিদ্যা ও ধর্মের পায়ের নীচে তলোয়ার রইল। তার একমাত্র কাজ ধর্মরক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ করা, বীরের নাম আপৎ-ত্রাতা ক্ষত্রিয়। লাঙল, তলোয়ার সকলের অধিপতি রক্ষক রইলেন ধর্ম। তিনি রাজার রাজা, জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সদা জাগরূক। ধর্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন।

ঐ যে ইউরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন—ও-সব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শোনানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।

আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই এ পারি-সভায় বিশেষ প্রতিবাদ করেছি। এদেশি এবং স্বদেশি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করছি। সময় পেলে আরও সংশয় ওঠাবার আশা আছে। এ-কথা তোমাদেরও বলি—তোমরা পণ্ডিত-মনিষ্যি. পুঁথি-পাতড়া খুঁজে দেখ।

ইউরোপীরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্যরাও তাই করেছে!! ওরা হা-ঘরে, 'হা-অন্ন' করে, কাকে লুঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়—আর্যরাও তাই করেছে!! বলি, এর প্রমাণটা কোথায়—আন্দাজ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখগে।

কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন্ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া তো হয়নি, খামকা এক বৃহৎ গল্প—রামায়ণের উপর—কেন বানাচ্ছ?

রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশি ছিল বরং, কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু, মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র

ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না?

হতে পারে দু-এক জায়গায় আর্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে দু-একটা ধূর্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসেরা ঢিলঢেলা হাড়গোড় ছোঁড়ে। যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকিকান্না ধরে রাজাদের কাছে গমন। রাজারা লোহার জামাপরা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন; বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে, কোথায় পাচ্ছ?

অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র—আর্য সভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে বর্ণাশ্রমাচার[৬], এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ-নিবারণ।

তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভালো করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলন্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ—তোমাদের আফ্রিকা?

কোথা সে সকল বুনো জাত আজ? একেবারে নিপাত, বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ; যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অন্য জাত জীবিত।

আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন্‌কালেও করেননি। আর্যেরা অতি দয়াল ছিলেন। তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে অমানবপ্রতিভাসম্পন্ন মাথায় ওসব আপাতরমণীয় পাশব প্রণালী কোনো কালেও স্থান পায়নি। স্বদেশি আহাম্মক। যদি আর্যেরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তাহলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত?

ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলোয়ার; আর্যের উপায়—বর্ণবিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান—বর্ণ বিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।

পরিশিষ্ট[৭]

ইউরোপীরা যার এত বড়াই করে, সে 'সভ্যতার উন্নতি'র [Progress of Civilization] মানে কি? তার মানে এই যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধি— অনুচিত উপায়কে উচিত করে।

৬. প্রাচীন আর্য সমাজব্যবস্থায় চারি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র। চারি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

৭. স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁহার কাগজপত্রের সহিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র এই অংশটুকু পাওয়া যায়।

চুরি, মিথ্যা এবং ফাঁসি অথবা স্টানলি [Stanley] দ্বারা তাঁর সমভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত মুসলমান রক্ষীদের—এক গ্রাস অন্ন চুরি করার দরুন চাবকানো, এ-সকলের ঔচিত্য বিধান করে; 'দূর হও, আমি ওথায় আসতে চাই'-রূপ বিখ্যাত ইউরোপী নীতি, যার দৃষ্টান্ত—যেথায় ইউরোপীয়-আগমন, সেথায়ই আদিম জাতির বিনাশ—সেই নীতির ঔচিত্য বিধান করে। এই সভ্যতার অগ্রসরণ লন্ডন নগরীতে ব্যভিচারকে, পারীতে স্ত্রী-পুত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালানোকে এবং আত্মহত্যা করাকে 'সামান্য ধৃষ্টতা' জ্ঞান করে—ইত্যাদি।

এখন ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী ক্ষিপ্র সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে খ্রিস্টানধর্মের প্রথম তিন শতাব্দীর তুলনা কর। খ্রিস্টানধর্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎ সমক্ষে আপনাকে পরিচিত করতেও সমর্থ হয়নি, এবং যখন কনস্টান্টাইন [Constantine]-এর তলোয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান দিলে, সেদিন থেকে কোন্‌কালে খ্রিস্টানী ধর্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতা বিস্তারের কোন্ সাহায্য করেছে? যে ইওরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সচলা, খ্রিস্টানধর্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন্ বৈজ্ঞানিক কোন্ কালে খ্রিস্টানি ধর্মের অনুমোদিত? খ্রিস্টানি সংঘের সাহিত্য কি দেওয়ানি বা ফৌজদারি বিজ্ঞানের শিল্প বা পণ্য-কৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে? আজ পর্যন্ত 'চর্চ' প্রোফেন [ধর্ম ভিন্ন অন্য বিষয়াবলম্বনে লিখিত] সাহিত্য প্রচারে অনুমতি দেন না। আজ যে মনুষ্যের বিদ্যা এবং বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে, তার কি অকপট খ্রিস্টান হওয়া সম্ভব? নিউ টেস্টামেন্ট [New Testament]-এ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। ইউরোপের সর্বপ্রধান মনীষীগণ—ইউরোপের ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ফ্লমারিয়ঁ, ভিকটর হ্যুগো-কুল বর্তমানকালে খ্রিস্টানি দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত;অপরদিকে এই সকল পুরুষকে ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর-বিশ্বাসের অভাব। ধর্মসকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষরূপে পরীক্ষিত হোক; দেখা যাবে ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিম-নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে-সব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।

খ্রিস্টান ধর্ম কোথায় এমন কাজ দেখাতে পারে? স্পেনের আরব, অস্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিম-নিবাসীরা কোথায়? খ্রিস্টানেরা ইউরোপীয় ইহুদিদের কি দশা এখন করছে? এক দানসংক্রান্ত কার্যপ্রণালী ছাড়া ইউরোপের আর কোনো কার্যপদ্ধতি, গস্‌পেলের [Gospel] অনুমোদিত নয়—গস্‌পেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত। ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই খ্রিস্টানধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইউরোপে খ্রিস্টানির শক্তি থাকত, তাহলে 'পাস্তের' [Pasteur] এবং 'ককে'র [Koch] ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত এবং ডারউইন-কল্পদের শূলে দিত। বর্তমান ইউরোপে খ্রিস্টানি আর সভ্যতা—আলাদা জিনিস। সভ্যতা এখন আর প্রাচীন শত্রু খ্রিস্টানির বিনাশের জন্য পাদ্রিকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং

দাতব্যালয়সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহলে খ্রিস্টানি তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হত না এবং সমূলে উৎপাটিত হত; কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই খ্রিস্টানি ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু। এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান-দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলামধর্মের উপরে সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকেরা সমস্ত রাজকর্মচারীদের বহুপূজিত এবং অন্য ধর্মের শিক্ষকেরাও সম্মানিত।

পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর এখন কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের জিনিস সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজেই একটু সুচ্ছবি চায়। খাওয়া-দাওয়া ঘর-দোর সমস্তই একটু সুচ্ছবি দেখতে চায়। আমাদের দেশেও ঐ ভাব একদিন ছিল, যখন ধন ছিল! এখন একে দারিদ্র্য, তার ওপর আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি ছিল, তাও যাচ্ছে—পাশ্চাত্য দেশেরও কিছুই পাচ্ছি না। চলা-বসা কথাবার্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নেই। পূজা পাঠ প্রভৃতি যা কিছু ছিল, তা তো আমরা বানের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি, অথচ কালের উপযোগী একটা নূতন রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা এই মধ্যরেখার দুর্দশায় এখন পড়ে।

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়িরা ঘর-দোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র করত। বাহার করে কলাপাতা কাটত, খাওয়াদাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরিতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরনোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি!! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরনো কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসগে। কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না!! দোর কি আগড় বোঝবার জো নেই!!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতি যন্ত্র কেনা!! এই অবস্থা সর্ববিষয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের যা ছিল, তা তো সব যাচ্ছে; অথচ বিদেশি শেখবার মধ্যে বাক্যিযন্ত্রণা মাত্র!! খালি পুঁথি পড়ছ আর পুঁথি পড়ছ! আমাদের বাঙালি আর বিলেতে আইরিশ, এ দুটো এক ধাতের জাত। খালি বকাবকি করছ। বক্তৃতায় এ দু-জাত বেজায় পটু। কাজের— এক পয়সাও নয়, বাড়ার ভাগ দিনরাত পরস্পরে খেয়োখেয়ি করে মরছে!!!

পরিষ্কার সাজানো-গোজানো এ দেশের [পাশ্চাত্যে] এমন অভ্যাস যে, অতি গরিব পর্যন্তরও ও-বিষয়ে নজর। আর নজর কাজেই হতে হয়—পরিষ্কার কাপড়-চোপড় না হলে তাকে যে কেউ কাজ-কর্মই দেবে না। চাকর চাকরানি, রাঁধুনি সব ধপধপে কাপড়— দিবারাত্র। ঘর-দোর ঝেড়েঝুড়ে, ঘষেমেজে ফিটফাট। এদের প্রধান শায়েস্তা এই যে, যেখানে সেখানে যা তা কখনও ফেলবে না। রান্নাঘর ঝকঝকে—কুটনো-ফুটনো যা ফেলবার তা একটা পাত্রে ফেলেছে, তারপর সেখান হতে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। উঠানেও ফেলে না। রাস্তায়ও ফেলে না।

যাদের ধন আছে তাদের বাড়িঘর তো দেখবার জিনিস—দিনরাত সব ঝকঝক। তার

ওপর নানাপ্রকার দেশবিদেশের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেছে। আমাদের এখন ওদের মতো শিল্পসংগ্রহে কাজ নেই, কিন্তু যেগুলো উৎসন্ন যাচ্ছে সেগুলোকে একটু যত্ন করতে হবে, না—না? ওদের মতো চিত্র বা ভাস্কর্য-বিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরি! ওদুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুরদেবতা সব দেখ না, জগন্নাথেই মালুম!! বড্ড জোর ওদের [ইউরোপীয়দের] নকল করে একটা-আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভালো—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুরে সোনালি চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভালো। ইউরোপী ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির কথা বারান্তরে উদাহরণ সহিত বলবার রইল। সে এক প্রকাণ্ড বিষয়।

□ *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, (১৩০৯)

ফলিত জ্যোতিষ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পুরাতন কথার পুনরুক্তি সকল সময়ে প্রীতিকর হয় না; অথচ পুনঃ পুনঃ না বলিলেও সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না।

ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিব কি না, এই একটা পুরাতন কথা। উভয় পক্ষ হইতে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা বহু কাল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; আর নূতন কিছু বলিবার আছে, তাহা বোধ হয় না। অথচ এক পক্ষ হঠাৎ এমন বেগে অপর পক্ষকে আক্রমণ করেন যে, তখন তাড়াতাড়ি পুরাতন মরিচা-ধরা অস্ত্রগুলি বাহির করিয়া কোনোরূপে শাণ দিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসা এ পর্যন্ত হইল না; অথচ আমার বোধ হয়, এক কথায় ইহার মীমাংসা হওয়া উচিত। একটা উত্তর দিলেই যেন গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে।

উত্তরটা এই। মহাশয় ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন; মহাশয় যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার তৃপ্তি হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহপূর্বক সেই প্রমাণগুলি আমার নিকট উপস্থিত করুন; আমার তৃপ্তি জন্মে, বিশ্বাস করিব, নতুবা করিব না। আপনার সংগৃহীত প্রমাণে যদি আমার তৃপ্তি না জন্মে, তজ্জন্য আমাকে নির্বোধ বা ভাগ্যহীন মনে করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া গালি দিবেন না। কেন না, এই শেষোক্ত অধিকার আপনারও যেমন আছে, আমারও তেমন আছে। পাল্‌টা গালি দিতে আমাকে বাধ্য করিবেন না।

এ-কালে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহাদের একটা ভয়ানক দুর্নাম আছে যে, তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা এ জন্য যথেষ্ট তিরস্কারের ভাগী হইয়া থাকেন। সম্যক্ প্রমাণ পাইয়া তাঁহারা যদি তৃপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গালি দিলে বিশেষ পরিতাপের হেতু ঘটিত না; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহারা গালি দিবার সময়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ উপস্থিত করিবার সময় তাঁহাদিগকে একেবারে নিশ্চেষ্ট দেখা যায়; এবং যখনই তাঁহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা যায়, তখনই তাঁহারা প্রমাণের বদলে তত্ত্বকথা ও নীতিকথা শোনাইতে প্রবৃত্ত হন।

তাঁহারা তর্ক করিতে বসিবেন, রামচন্দ্র খাঁয়ের পুত্রের জন্মকালে বুধ গ্রহ যখন কর্কট রাশিতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই পুত্র ভাবী কালে ফিলিপাইনপুঞ্জের রাজা হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি? ইহা অসম্ভব কিরূপে? বিশেষত যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে

যে, প্রত্যহ সূর্যোদয় হইবা মাত্র পাখি সব রব করিতে থাকে, কাননে কুসুমকলি ফুটিয়া উঠে, এবং গোপাল গোরুর পাল লইয়া মাঠে যায়। আমরা বৎসর বৎসর দেখিয়া আসিতেছি যে, সূর্যদেব বিষুবসংক্রমণ করিবা মাত্র, দিনরাত্রি অমনই সমান হইয়া যায়; তখন শনি-শুক্র-সঙ্গম ঘটিলে সাইবেরিয়াতে ভূমিকম্প ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? আবার চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, ইহা যখন কবি কালিদাস হইতে বৈজ্ঞানিক কেল্‌ভিন পর্যন্ত সকলেই নির্বিবাদে স্বীকার করিতেছেন, তখন সেই চন্দ্র বৃহস্পতির সমীপস্থ হইলে লুই নেপোলিয়নের দৌহিত্রের শিরঃপীড়া কেন না ঘটিবে? একটা যদি সম্ভব হয়, আর একটা অসম্ভব কিসে হইল? বিশেষত মহাকবি যখন বলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন কত কি আছে, যাহা মানবের জ্ঞানাতীত!

বাস্তবিকই স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন কত বিষয় আছে, যাহা মানবের পক্ষে স্বপ্নাতীত। বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচকগণ যে তাহা না জানেন, এমনও নয়। স্বর্গ পর্যন্ত যাইতে হইবে কেন, এই মর্ত্যেই দেখ প্রিস্টলি ক্যাভেন্ডিশ লাভোয়াশিয়ার পর হইতে এক শত বৎসর কাল আমরা রসায়ন-গ্রন্থে মুখস্থ করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমাদের অন্তরিক্ষে গোটা-পাঁচেকের বেশি বায়ু নাই; কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই কয় বৎসরের মধ্যে সেই চিরপরিচিত অন্তরিক্ষমধ্যে অজ্ঞাতপূর্ব অশ্রুতচর কত নূতন বায়ুর অস্তিত্ব বাহির হইতে চলিল, এবং পৃথিবীর যাবতীয় রসায়ন-গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির করার প্রয়োজন হইয়া উঠিল; কয়েক বৎসর আগে ইহা কে ভাবিয়াছিল? বিধাতা অত্যন্ত যত্নের সহিত মনুষ্যের বীভৎস অস্থি-কঙ্কালকে মোলায়েম 'মসৃণ ত্বকের' আবরণের ভিতর সঙ্গোপনে রাখিয়া পেলীর ও তাঁহার শিষ্যগণের নিকট দূরদর্শিতার ও সৌন্দর্যবুদ্ধির জন্য কত বাহবা পাইয়া আসিতেছিলেন, সহসা ক্রুক্‌স টিউবের ভিতর হইতে নূতন ধরনের রশ্মি বাহিরে আসিয়া সেই কঙ্কালকে প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহাই বা কে জানিত!

সুতরাং এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীরই সকল সংবাদ যখন অদ্যাপি জ্ঞানগোচর হইল না, পরন্তু নিত্য নূতন ঘটনা মনুষ্যের বিজ্ঞান-বিদ্যাকে এক-একটা ধাক্কা দিয়া বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে, তখন এত বড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কি সম্ভব, কি অসম্ভব, তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তোমাদের বিজ্ঞানেই না কি বলে যে, ঐ সূর্যটার আয়তন বারো লক্ষ পৃথিবীর সমান; ঐ নক্ষত্রটা হইতে আলো আসিতে বারো বৎসর পনর দিন অতিবাহিত হয়, সেই আলো আবার সেকেন্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে ইত্যাদি। ইতরের পক্ষে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন কঠিন। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটার সম্বন্ধে এটা সম্ভব, ওটা অসম্ভব, এরূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বালকের পক্ষেই শোভা পায়, বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষে নহে।

অহো, সকলই যথার্থ; তথাপি বৈজ্ঞানিক আপনার জেদ ছাড়িবে না। সে বলিবে, সবই যথার্থ—জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। উল্কাবর্ষণে রাষ্ট্রবিপ্লব, যোগবলে আকাশবিহার ও মন্ত্রবলে পিশাচসিদ্ধি, কিছুই অসম্ভব নহে। অমুক ঘটনাটা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের প্রতিকূল, অমুক ঘটনাটা শক্তির নিয়মের প্রতিকূল, ইত্যাদি বলিয়া তাহার অসম্ভাব্যতা সপ্রমাণ করিতে বসা ঠিক নহে। এমন কি, সেকালের ঋীরেরা দেবতার সহিত কারবার করিতেন এবং এ-

কালের বীরেরা উপদেবতার সহিত কারবার করেন, ইহাতেও অসম্ভব বলিয়া উপহাসের কথা কিছুই নাই। আমার বোধ হয় না, এ কালের কোনো বৈজ্ঞানিকের এরূপ দুঃসাহস আছে যে, তিনি যুক্তিবলে ঐ সকল ঘটনার অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন।

বস্তুত বৈজ্ঞানিকের উপর এমন অনেক উক্তি সর্বদা আরোপিত হয়, যাহা তিনি কখনই করেন নাই। লোকে বলে, বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যভিচারিতায় নিতান্ত বিশ্বাসী, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা। এ পর্যন্ত আমি একখানি খাঁটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ দেখি নাই, যাহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, কাঁঠাল ফল বৃন্তচ্যুত হইলে ভূমিতে পড়িতে বাধ্য, অথবা সূর্যদেব পৃথিবীকে চতুঃস্পার্শ্বে ঘুরাইতে বাধ্য। বস্তুত জগতে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। এ পর্যন্ত কাঁঠাল ফল বৃন্তচ্যুত হইলেই ভূমিতে পড়িয়া আসিতেছে, কাহারও ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে নাই; তাই পদার্থবিদ্যাবিদেরা বলেন, কাঁঠাল ফলের ঐরূপ স্বভাব, সে ভূমিতেই পড়ে আকাশে ওঠে না; এতকাল তাহাই করিতেছে, সম্ভবত কাল পরশুও সেইরূপই করিবে। কিন্তু কাল হইতে যদি কাঁঠাল ফল আর ভূমিতে পতন অনুচিত ভাবিয়া আকাশে আরোহণই কর্তব্য বিবেচনা করে, সমস্ত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী নিতান্ত নির্বিকার চিত্তে আপন আপন খাতার মধ্যে তখন লিখিতে থাকিবেন, কাঁঠাল ফলের স্বভাবের অমুক দিন হইতে পরিবর্তন হইয়াছে—অমুক তারিখ পর্যন্ত সে ভূমিতে পড়িত, এখন সে আকাশে উঠে। এবং কাঁঠালের দেখাদেখি সকল দ্রব্যই যদি সেই পন্থা অবলম্বন করে, তাহা হইলে পদার্থবিদ্যাগ্রন্থগুলির ভবিষ্যৎ সংস্করণে দেখা যাইবে, পৃথিবী এখন আর আকর্ষণ করেন না, দূরে ঠেলেন। প্রকৃতির নিয়মটা যদি বদলাইয়া যায়, কেন বদলাইল, তাহা প্রকৃতি দেবীই বলিতে পারেন; বৈজ্ঞানিকের তজ্জন্য মাথাব্যথার কোনোই প্রয়োজন হয় না এবং প্রকৃতির নিকট তাহার কৈফিয়ত চাহিবারও উপায় নাই।

ফলত আম কাঁঠালের ভূতলপাতে সর্বসাধারণের প্রচুর স্বার্থ আছে, বিশেষত ঐ ঐ দ্রব্য যখন সুপক্ক অবস্থায় থাকে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের তাহাতে বিশেষ স্বার্থ কিছুই নাই। দলিলের ভিতর যাহাই থাকুক, রেজিস্ট্রার বাবু তাহা রেজিস্টারি করিয়া যান, দাতা ও গ্রহীতার অভিসন্ধি জানা তাঁহার আবশ্যক হয় না; বৈজ্ঞানিক সেইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে কেবল রেজিস্টারি করিয়া যান; ঘটনাটা এমন কেন হইল, তাহা ভাবিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয় না। অন্তত এ পর্যন্ত এমন কোনো বিজ্ঞানবিদের নাম শুনি নাই, যিনি কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধানে সমর্থ হইয়াছেন বা তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন দেখিয়াছেন।

তবে কোনো একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কি না এবং ঘটনাটা প্রকৃত কি না, তাহা রেজিস্টারির পূর্বে জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অনুসন্ধান-কার্যই বোধ করি তাঁহার প্রধান কার্য। প্রকৃত তথ্যের নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। বরং তজ্জন্য তাঁহার বুদ্ধি নানা সংশয়ের উদ্ভাবন ও সেই সংশয় অপনোদনের বিবিধ উপায় আবিষ্কার করে। আমাদের মতো অবৈজ্ঞানিকের সহিত বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য। আমরা যত সহজে কোনো একটা

ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া ফেলি, তিনি তত সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না; নানারূপ প্রমাণ অনুসন্ধান করেন। আমরা ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস নিতান্ত অসামাজিক কাজ ও অনুচিত কাজ মনে করি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের এই সামাজিকতা-বোধ অতি অল্প। তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম না। এইটাই বিজ্ঞানবিদের ভয়ানক দোষ; তবে তাঁহার এই সংশয়পরতা কেবল অন্যের প্রতিই নহে; তাঁহার নিজের উপরেও তাঁহার বিশ্বাস অল্প। তিনি আপনার ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করেন না ও আপনার বুদ্ধিকেও বিশ্বাস করেন না। কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে, কখন্ কবে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও একটা স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিবেন, এই ভয়েই তিনি সর্বদা আকুল। তাঁহার যখন নিজের প্রতি এইরূপ সংশয়, তখন তাঁহার পরের প্রতি অবিশ্বাস ক্ষমাযোগ্য।

প্রমাণ সংগ্রহ যে সকল সময়েই অত্যন্ত কঠিন, এমন নহে। এমন অনেক নূতন ঘটনা সর্বদা আবিষ্কৃত হয় যাহাতে প্রমাণ খুঁজিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। মনে কর, সে দিন যে একটা নূতন প্রাকৃতিক ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল যে, এমন এক রকম আলো আছে, যাহার সাহায্যে বাক্সর ভিতর টাকা রাখিলেও ধরা পড়ে, মানুষের অস্থি-কঙ্কালে হাড় কয়খানা, তাহা দেখানো চলে। এই ব্যাপার সত্য কি না, তাহার প্রমাণ পাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। একটা কাচের গোলার ভিতর হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া তন্মধ্যে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ পুনঃ পুনঃ চালাইতে থাক ও একখানা কাগজে একটা প্রলেপ মাখাইয়া আঁধার ঘরে সেই কাগজখানা ঐ গোলার সম্মুখে ধর; উভয়ের মাঝে ধরিলেই সেই প্রলেপের উপর বাক্সর ভিতরের টাকার ছায়া ও হাতের হাড়গুলার ছায়া দেখিতে পাইবে। পাঁচ মিনিটের পরিশ্রমেই ব্যাপারটা যে-কোনো ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এরূপ স্থলে ঘটনা সত্য কি না, প্রতিপন্ন করিতে কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু যদি আমার কোনো বন্ধু আসিয়া বলেন, কাল রাত্রিতে চন্দ্রলোক হইতে একটা ভালুক আসিয়া আমার সহিত অনেক কথাবার্তা কহিয়া গিয়াছে ও সেই ভালুকের তিনটা চোখ ও লম্বা দাড়ি, তাহা হইলে আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কথাটা মিথ্যা বলিলে আমাকে বন্ধুর প্রেমে বঞ্চিত হইতে হইবে, আর সত্য মনে করিয়া অন্যের নিকট গল্প করিতে গেলে অন্যরূপ বিপদের আশঙ্কা রহিবে। অথচ ঘটনাটা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা কোনো তার্কিকেই সাহস করিয়া বলিবেন না। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান লোকে কি করিয়া থাকেন? বন্ধুর সত্যপরতায় তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা থাকিলেও তিনি 'বানরে সংগীত গায়' ইত্যাদি প্রবচন স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঘটনাটা মিথ্যা, কি সত্য, তাহা অপ্রতিপন্ন থাকিয়া যায়।

বস্তুত ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাঁহাদিগের সংশয়ের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান, ততটুকু তাঁহারা পান না। তার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা বাড়ে, ইত্যাদি যুক্তি কুযুক্তি। কালকার ঝড়ে আমার বাগানে কাঁঠালগাছ ভাঙিয়াছে, অতএব হরিচরণের কলেরা কেন না হইবে, এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। গ্রহগুলা কি অকারণে এ-রাশি ও-রাশি ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যদি উহাদের গতিবিধির সহিত আমার শুভাশুভের কোনো সম্পর্কই না থাকিবে, এরূপ যুক্তিও কুযুক্তি। নেপোলিয়নের ও মহারানি ভিক্টোরিয়ার

কোষ্ঠী ছাপানোর পরিশ্রমও অনাবশ্যক। একটা ঘটনা গণনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র গণনায় যাহা না মিলিবে, তাহা চাপিয়া যাইব অথবা গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব, এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। সূর্যও অকস্মাৎ ফাটিয়া দ্বিধা হইতে পারে; অগ্নির দাহিকা-শক্তিও নষ্ট হইতে পারে; মরা মানুষও সমাধি হইতে উঠিতে পারে। আমারও অদ্য তোমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ জুটিতে পারে; কিন্তু জুটিল কি না, তাহার প্রমাণ অন্যরূপ! অবিশ্বাসীরা যেরূপ প্রমাণ চাহেন, বিশ্বাসীরা সেরূপ প্রমাণ দেন না। বিশ্বাসীরা যে প্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অবিশ্বাসীরা সে প্রমাণে তুষ্ট নহেন। এই আত্যন্তিক সংশয় জন্য বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদিগকে গালি দেন। বলেন, আমি যে প্রমাণে তৃপ্ত হইলাম, তুমি তাহাতে তৃপ্ত হইতেছ না কেন; আমি কি নির্বোধ, আমি কি অন্ধ, আমি কি বধির, ইত্যাদি। এ সকল যুক্তির উত্তর নাই। এ সকল যুক্তি বিফল হইলে তাঁহারা লাঠি বাহির করেন, তখন প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে হয়।

একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে, তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে। কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিলে কি ফল হইবে, তাহা খোলসা করিয়া বলিতে হইবে। বলিবার ভাষা যেন স্পষ্ট হয়—ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তার পর হাজারখানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে। শিশুদের নাম-ধাম পরিচয় স্পষ্ট দেওয়া চাই, যেন যাহার ইচ্ছা, সে পরীক্ষা করিয়া জন্মকাল সম্বন্ধে সংশয় নাশ করিতে পারে। গণনার নিয়ম পূর্ব হইতে বলা থাকিলে যে-কোনো ব্যক্তি গণনা করিয়া কোষ্ঠীর বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিতে পারিবে। যত দূর জানি, এই গণনায় পাটিগণিতের অধিক বিদ্যা আবশ্যক হয় না। পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে; যতটুকু মিলিবে, ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয়-শ মিলিয়া যায়, মনে করিতে হইবে, ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে; যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে, মনে করিতে হইবে, তেমন কিছু নাই। হাজারের স্থানে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভালো। বৈজ্ঞানিকেরা সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন, সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে আবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে গঙ্গার জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।[১]

১. *জিজ্ঞাসা*, ১৯০৪

□ *রামেন্দ্র রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৪

বাঙালি সমাজের গোড়ার কথা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালি সমাজের, তথা উত্তর-ভারতের সকল প্রাদেশিক হিন্দু সমাজের গোড়ার কথা এইবার বলিয়া রাখিতে হইবে। সমাজের গড়ন কেমন ছিল তাহার আংশিক পরিচয় না থাকিলে, সামাজিক কোনো তত্ত্বই ঠিকমতো বোধগম্য হইবে না।...

এখন আমরা যে হিন্দু সমাজকে লইয়া ঘর করিতেছি, তাহা আসল পুরাতন হিন্দু সমাজের চিতাচুল্লির অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডবৎ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ কাহারও উপর বিন্যস্ত নহে, কেহ কাহাকেও নির্ভর করিয়া থাকে না। পূর্বে যখন অবাধ বাণিজ্য ছিল না, অবাধে বিদেশীয় শিল্পজাত সামগ্রীসকল এ দেশে আমদানি হইতে পাইত না, যখন এ দেশের শিল্পীর সাহায্যে এ দেশের জনগণের সকল অভাব দূর করিতে হইত, তখন এ দেশের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে Socio-economic Protection সমাজ-শক্তির প্রয়োগ ঋদ্ধিগত কবচের প্রচলন ছিল। স্যার টমাস মনরো উহা লক্ষ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মের বেষ্টনীর দ্বারা যত দিন এ দেশের শিল্পকলা সুরক্ষিত থাকিবে, তত দিন এ দেশের হাটে গঞ্জে বিদেশীয় শিল্পীর কোনো মালের কাটতি সম্ভবপর হইবে না। কাজেই সেকালের ব্যবস্থা কেমন ছিল, তাহার খবর আগে দিতে হইবে।

১. প্রত্যেক গ্রামের শিল্পীদিগের রক্ষার ভার সেই গ্রামবাসীদের উপর ন্যস্ত ছিল। গ্রামের কামার, কুমার, ছুতার, তন্তুবায়দিগের প্রস্তুত মাল সর্বাগ্রে গ্রামবাসীদিগের অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইত; গ্রামের অভাব দূর করিয়া অতিরিক্ত মাল জমা হইলে তাহাই বড় বড় হাটে এবং গঞ্জে পাঠানো হইত।

২. প্রত্যেক গ্রামবাসী গ্রামের শিল্পীগণকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিত। প্রত্যেক গৃহস্থের কামার, কুমার, তাঁতি, ছুতার প্রভৃতি নির্দিষ্ট থাকিত; সেই সকল নির্দিষ্ট শিল্পীর নিকট হইতে গৃহস্থকে শিল্পজাত সামগ্রীসকল সংগ্রহ করিতে বা খরিদ করিতে হইত। ধোপা, নাপিত, নফর, তল্পিদার, ঘরামি, তবলদার, গুরু, পুরোহিত, এ সকলেরও নির্দেশ ছিল। কোনো গৃহস্থ নির্দিষ্ট শিল্পী বা ধোপা, নাপিত, গুরু, পুরোহিত, ঘরামি বর্জন করিয়া অপরকে নিযুক্ত করিতে পারিতেন না; কেহ এমন ভাবে বর্জন করিলে বা গ্রামান্তরের শিল্পীর সাহায্য গ্রহণ করিলে তাহাকে সমাজের নিকট কৈফিয়ত দিতে হইত। কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হইলে তেমন গৃহস্থকে 'ঠেকো' বা একঘরিয়া হইয়া থাকিতে হইত।

৩. নগরে যাইয়া বা সুদূর কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া কোনো কিছু খরিদ করিতে হইলে পরিচয় দিয়া খরিদ করিতে হইত; প্রত্যেক দোকানদার বিদেশের বা নবাগত খরিদ্দারের সকল পরিচয় খাতায় লিখিয়া রাখিত। ইরানের, মধ্য-এশিয়ার বা চীন দেশের কোনো ব্যবসায়ী মাল সমেত এ দেশে ব্যবসায় করিতে আসিলে সর্বাগ্রে এ দেশের সুবাদারের দপ্তরে হাজির হইয়া নিজের পরিচয় বা Passport দেখাইতে হইত, প্রত্যেক মালের নিরিখ দিতে হইত। সুবাদার বা দেওয়ান ছাড়পত্র দিলে তবে তিনি এ দেশের হাটে গঞ্জে কেনা-বেচা করিতে পারিতেন। বিদেশীয় বণিককেও খরিদ্দারের পরিচয় রাখিতে হইত। খরিদ্দারদের পরিচয় রাখার একটা প্রয়োজন ছিল। মুসলমানদের আমলেও সকল জাতীয় মানুষ সকল সামগ্রী ব্যবহার করিতে বা খরিদ করিতে পাইত না। প্রত্যেক জাতির—এমনকি ব্যক্তিরও বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের এক একটা নির্দেশ ছিল, সে নির্দেশ অতিক্রম করিয়া কেহই ইচ্ছামতো সামগ্রী খরিদ করিতে পারিত না। উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইব। যাহারা কৃষিকার্য করিত, হলচালনা করিত, তাহারা জুতা ও ছাতা ব্যবহার করিতে পাইত না; এমন কি, তন্তুবায়, কামার, কুমার ও ছুতোর প্রভৃতি শিল্পী জাতি ছাতা জুতার ব্যবহারে বঞ্চিত থাকিত। ইহারা ছাতা জুতা খরিদ করিতে চাহিলে দোকানদার তাহাদিগকে ঐ সকল সামগ্রী বেচিত না, বেচিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। কোমরের নীচে স্বর্ণালঙ্কার, সোনালি জরি-জড়ানো জুতা, সোনার পাতমোড়া খড়ম ব্রাহ্মণে ব্যবহার করিতে পারিতেন না, এ সকল সামগ্রী ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করা চলিত না। এমনই নানা রকমের বিধি-নিষেধ প্রত্যেক জাতি, এমন কি, প্রত্যেক গৃহস্থের প্রতি নির্দিষ্ট ছিল; এ সকল বিধিনিষেধ সকলকেই মান্য করিয়া চলিতে হইত। তাই প্রত্যেক খরিদ্দারের জাতিকুলের পরিচয় প্রত্যেক দোকানদারকে রাখিতে হইত। এখন অনেকে শুনিলে হাসিবেন, সোনার জরিজড়িত বেনারসি শাড়ি ব্রাহ্মণী ব্যবহার করিতে পারিতেন না, ব্রাহ্মণও সোনার জরির পাড়দার জোড় ব্যবহার করিতে পারিতেন না। ইংরেজদের আমলে এই সকল নিষেধ-বিধি উঠিয়া যাওয়াতে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, এমন কি, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ধনী ও চাকুরে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বেনারসি শাড়ির ও জোড়ের খুব প্রচলন হইয়াছিল। কবি হেমচন্দ্র বেনারসি শাড়ির খস্‌খসানির উল্লেখ 'বাজী মাৎ' কবিতায় এবং 'বাঙালির মেয়ে' শীর্ষক ছড়ায় স্পষ্টভাবে করিয়াছেন। আমাদের বালককালে বেনারসি শাড়িই উৎসব আনন্দের পরিধেয় ছিল। বেনারসি জোড় না হইলে, জরির জুতা না পাইলে ব্রাহ্মণতনয়ের উপনয়নই যেন ঠিকমতো হইত না।

৪. দাদন ছাড়া কোনো শিল্পী বা দোকানদার গ্রামের গৃহস্থকে কোনো সামগ্রী জোগান দিত না। ব্রাহ্মণ, গুরু পুরোহিত নারায়ণশিলার নির্মাল্য দিয়া দাদন দিতেন এবং শিল্পীকে বলিয়া আসিতেন যে, নির্দিষ্ট দিনে, একটা কার্য উপলক্ষে এত জোড়া কাপড় চাই। অন্য জাতীয় গৃহস্থে একটা সিধা দিয়া দাদন দিতেন। তাহার পরে মাল সরবরাহ করা হইত এবং ছয় পক্ষের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিতে হইত। সদ্য সদ্য কোনো মাল খরিদ করিতে হইলে নগর বা গঞ্জে যাইয়া দোকানদারবিশেষের আশ্রয় লইতে হইত। দোকানদারদের নির্দিষ্টসংখ্যক দালাল থাকিত, তাহারাই খরিদ্দার জোগাইত। দালাল ছাড়া

কোনো প্রকারের খরিদবিক্রয় হইতে পাইত না। দালালই খরিদ্দারের পরিচয় দোকানদারকে বলিয়া দিতেন, তাহার জাতিগত এবং ব্যক্তিগত অধিকারের নির্দেশ তিনিই বলিয়া দিতেন। তাহার পর খরিদ্দারকে বলিতে হইত, কেন তিনি গ্রাম ছাড়িয়া গঞ্জে আসিয়া মাল খরিদ করিতেছেন, উত্তর সন্তোষজনক হইলে তবে মাল বাহির করা হইত এবং বেসাতি চলিত।

ব্রাহ্মণ, শূদ্র, রাজা জমিদার, সুবাদার বাদশাহ, কেহই এই সকল নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারিতেন না। সকলেরই শিল্পী, নফর চাকর নির্দিষ্ট ছিল, পুরুষানুক্রমিকভাবে তাহারা এইভাবে কাজ করিত; কেহই কাহাকেও বৃত্তিচ্যুত করিতে পারিত না। এই সকল নিষেধবিধি ছিল বলিয়াই ভদ্রপুরের তন্তুবায়গণ প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ নন্দকুমার রায়কে একঘরিয়া করিতে পারিয়াছিল। শিল্পী ও শ্রমজীবী জাতি সকলই তখনকার দিনে গৃহস্থবিশেষকে 'ঠেকো' রাখিতে পারিত; এই 'ঠেকো' করিবার পদ্ধতিরও একটু পরিচয় দিব।

ধর্মঘট

প্রথম উপায় ছিল ধর্মঘট। সে এক অপূর্ব ব্যাপার ছিল। এই ধর্মঘটের মধ্যে এখনও বৌদ্ধধর্ম আমাদের সমাজে কতকটা সজীব আছে, তাহা বুঝা যাইবে। যে শিল্পী জাতি বা গৃহস্থ ধর্মঘট স্থাপন করিত, সে বা সেই জাতির প্রধানগণ অন্য সকল শিল্পী জাতির প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া গ্রামচত্বরে, বারোয়ারিতলায় বা শিবমন্দিরের সম্মুখে সমবেত করিত। সেই সভায় তাহারা জাতিগত বা ব্যক্তিগত অভিযোগের কথা ব্যক্ত করিত; তাহার পর 'ঘোঁট' হইত। ঘোঁট শব্দের অর্থ debate, discussion, বিষয়টাকে ঘুঁটিয়া তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার খাঁটি বাংলা শব্দ হইল ঘোঁট। এই ঘোঁট শেষ হইলে পুরোহিত ডাকিয়া ধর্মরাজের ঘট স্থাপনা হইত। ধর্মরাজ তোমার আমার জানা যমরাজ নহেন, খোদ বুদ্ধদেব। এই ঘটস্থাপনা ধর্মযাজী 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী ব্রাহ্মণেই করিত। ঘটকে জলপূর্ণ করিয়া তাহার মুখে আম্রপল্লব সাজাইয়া দেওয়া হইত। ঘটের গাত্রে সিন্দূর তৈলযোগে একটা চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহারই নিম্নে যে জাতি বা যে গৃহস্থের বিরুদ্ধে ধর্মঘট স্থাপনা হইয়াছে, তাহার নাম লেখা হইত। নিয়মিত ধর্মরাজের আহ্বান ও পূজার পরে পান-ভোজন হইত। ঘটের সম্মুখে একতাড়া পান, সুপারি এবং হরিদ্রাখণ্ড সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত। ভোজের শেষে প্রত্যেক শিল্পী জাতির মাতব্বরগণ একটা পান, একটা সুপারি ও একটা হরিদ্রাখণ্ড লইয়া ঘট স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেন যে, আমি অদ্যকার ঘোঁট অনুসারে, স্থিরীকৃত ব্যবস্থা অনুসারে অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তিকে বা সম্প্রদায়কে আমার স্বীয় শিল্পজাত সামগ্রী জোগাইব না। ধর্মরাজের পান সুপারি লইলাম, হুকুম অমান্য করিব না, এবং আমার গ্রামের সকলকে হুকুমমতো কাজ করিতে বাধ্য করিব। এই সংকল্প শেষ হইলে, ঐ ঘট মাথায় করিয়া অভিযোক্তার দল দূরদূরান্তের গ্রামসকলে ঘট ঘুরাইয়া বেড়াইতেন। এক ঢাকি ঢাক লইয়া ঘটের সহিত বেড়াইত এবং প্রত্যেক গ্রামে যাইয়া ঢাকে কাঠি মারিয়া অভিযোগের বার্তা শুনাইত এবং সামাজিক

ঘোঁটের মীমাংসা গ্রামবাসীগণকে বলিত। এই ব্যবস্থা হইতেই বাংলায় প্রবচন প্রচলিত হইয়াছে—

'আর কি রক্ষে আছে,
ঢাকে কাঠি পড়েছে।'

ইহাই ধর্মের ঢাক, ধর্মের ঢাকে কাঠি পড়িলে কুৎসা নিন্দা দেশময় ছড়াইয়া পড়িত, একটা পরগনার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস করিতে পারিত না। তাহার ধোপা, নাপিত, ঘরামি, তবলদার, নফর, তল্পিদার প্রভৃতি সকল জনবল নষ্ট হইত। ধোপা তাহার কাপড় কাচিত না, নাপিত কামাইত না, জলবাহী জল জোগাইত না, ঘরামি ঘর ছাইত না, এমন কি, মেথর-মুদ্দফরাসও তাহার সহায়তা করিত না। ইহা অতি দুর্জয় শাসন ছিল, সমাজের এই ভীষণ শাসন মুসলমানেও মান্য করিয়া চলিত; 'ঠেকোর' ঘরের কাহাকেও মোসলেম ইমামগণও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিত না। মুসলমান মতে পাপ ক্ষালন করিলে, 'পাক' হইলে তবে তেমন ব্যক্তি মোসলেম দলভুক্ত হইতে পারিত। সুবাদারী খাস দপ্তরে একজন খাসনবিশ থাকিতেন, তিনিই এমন সকল সামাজিক ব্যাপারে বিচার ব্যবস্থা করিতেন। পাঠানদের আমলে ধর্মঘট বসাইলে ফৌজদারকে বা গ্রামের কাজি মুফতিকে এতালা দিতে হইত, অর্থাৎ তাঁহার কাছে তাবৎ বিবরণ সমেত এক রুবকারি বা পত্র পাঠাইতে হইত। অনেক ক্ষেত্রে নবাবি দপ্তর হইতে নূতন ঘোঁটের ব্যবস্থা করা হইত। এই সঙ্গে আর একটা কাণ্ডের কথা বলিব। তাহা—

হাটে হাঁড়ি ভাঙা

এই পদ্ধতি কুম্ভকার সম্প্রদায় প্রধানত অবলম্বন করিত। একটা হাঁড়িতে সিন্দুর মাখাইয়া 'লুইয়ের হাঁড়ি' বলিয়া তাহার স্থাপনা করা হইত। লুইপাদ একজন প্রসিদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য ছিলেন। তাঁহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এখনও পশ্চিম ও দক্ষিণ রাঢ়দেশে প্রবল আছে। এই হাঁড়ি বসাইয়া লুইপাদের পূজা হইত। একটা খাসি বলিদান দিয়া তাহারই নাড়িভুঁড়ি ঐ হাঁড়িতে পোরা হইত। খানা-পিনা শেষ হইলে, অভিযোক্তা তাহার অভিযোগের কথা বর্ণনা করিতেন। তাহা শুনিয়া ঘোঁট হইত। প্রায়শ লাম্পট্যের অভিযোগই করা হইত। পত্নী, ভগিনী, কন্যা, কাহারও সহিত ঘরের বাহির হইলে, নর-নারী উভয়ের বিরুদ্ধে হাঁড়ি স্থাপনা হইত। তাহার পর এই নাড়িভুঁড়িপূর্ণ হাঁড়ি মাথায় করিয়া হাটের দিনে একটা কেন্দ্রস্থ বড় হাটে উপস্থিত হইতে হইত। হাট যখন জমজমা চলিতেছে, তখন হাটের মধ্যস্থানে কুৎসা কীর্তন করিয়া আছাড় মারিয়া হাঁড়ি ভাঙা হইত। হাঁড়ি ভাঙিলেই লম্পট নর-নারীর আর কুত্রাপি আশ্রয়ের স্থান মিলিত না, তাহারা সকলে অস্পৃশ্য 'ঠেকো' হইয়া থাকিত। একটা মজার প্রবচন এই উপলক্ষে প্রচলিত ছিল।

'ফাট্‌ল হাটে হাঁড়ি,
ছড়াল কুচ্ছার ভুঁড়ি ও নাড়ি
দূর দূর ছোঁড়া ও ছুঁড়ি।'

ধর্মঘটের স্থাপনা এবং পরিচালনা ও হাটে. হাঁড়ি ভাঙার আরও নানাবিধ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রদেশবিশেষে ও জাতিবিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি, ছড়া, মন্ত্র প্রচলিত ছিল। আমি রাঢ়ের স্থানবিশেষের দুইটা পদ্ধতির সংক্ষেপে বিবরণ দিলাম। এইবার '*ঠেকো*' শব্দের অর্থ বলিব।

'*ঠেকো*'

যাহারা *ঠেকা* থাকে, সমাজের কোনো ব্যবহারে আসে না, হিন্দু মুসলমান দুই সমাজের বাহিরে যাহাদিগকে থাকিতে হয়, তাহাদিগকে '*ঠেকো*' বলা হইত। যাহারা *ঠেকো* থাকিত, তাহাদিগকে '*ঠেকোর* ঘর' বলা হইত। বৈবাহিক আদান-প্রদানের ব্যত্যয় ঘটাইলে, অগম্যাগমন করিলে, গো শূকরমাংস উদরস্থ করিলে, রাজদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হইলে '*ঠেকো*' হইয়া থাকিতে হইত। *ঠেকো*দিগের গুরু পুরোহিত, ধোপা নাপিত, সবই স্বতন্ত্র ছিল। মোগলদিগের আমলে আকবর বাদশাহের *দীন-ই-ইলাহী* নব ধর্মের প্রভাব এবং পতিতপাবনাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপায় পাঠান-যুগের '*ঠেকো*' সম্প্রদায় অনেকটা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের জলচল ব্যবহার যোগ্য হইয়াছিল। *ঠেকো*দিগের ইতিহাস পরে প্রয়োজন বোধ করিলে প্রকাশ করিব। এখনও '*ঠেকোর* দল' বাংলায় নিতান্ত বিরল নহে।

অন্যবিধ সমাজশাসন

এই সঙ্গে অন্য নানাবিধ সমাজশাসন-পদ্ধতি সকলের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এখন কি আছে, পূর্বে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজে public opinion লোকমত অতি প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতি বড় ধনী জমিদার, সুবাদার, ফৌজদারেও লোকমতকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। সে লোকমত খাঁটি Demos-এর জনগণের লোকমত ছিল; সে লোকমত ধন, জন, পদ-মর্যাদা, কোনো কিছুরই অপেক্ষা রাখিত না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 'মিত্রভোজের' পংক্তি হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ উঠিয়া গিয়াছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে গোষ্ঠীপতির মালাচন্দন না দিয়া, এক বৃদ্ধ বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান ব্রাহ্মণ নিজের গোদের উপর মালা জড়াইয়া চন্দন ঢালিয়া দিয়াছিল। অতি সামান্য, অতি দরিদ্র ব্যক্তির অভিযোগ উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না, সে উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহার জাতীয় সকলে উঠিয়া দাঁড়াইত এবং দেখাদেখি সমবেদনার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া অন্য সকলকে পংক্তি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইত। সেকালের

পংক্তি

অতি উৎকট ব্যাপার ছিল। প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পংক্তি ছিল; নিমন্ত্রিত সকলে আসিয়া সমবেত না হইলে কেহই পংক্তিতে উপবেশন করিত না। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না পারিলে রীতিমতো কৈফিয়ত দিতে হইত; সে কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। খোশমেজাজের উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও নিমন্ত্রিত করা চলিত না; সমাজ, সম্প্রদায় এবং গ্রাম

হিসাবে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। গ্রামের, সমাজের বা সম্প্রদায়ের কাহাকেও নিমন্ত্রণ হইতে বর্জন করা চলিত না; বর্জন করিতে হইলে সে বার্তা গ্রামের বা সম্প্রদায়ের মোড়ল বা সমাজপতিগণকে জ্ঞাত করিতে হইত। সমাজপতিগণ অনুমতি না দিলে এমন বর্জন কেহ করিতে পারিত না। ক্রিয়াকর্মহীন হইয়া কেহই গ্রাম্য সমাজে থাকিতে পারিতেন না, পূর্বজগণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, পূজাপার্বণ উপলক্ষে, পুত্র-কন্যার বিবাহ উপলক্ষে গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেই হইত। বিবাহে বাদ্যভাণ্ড, আজকালকার মতন procession করিলে পঞ্চগ্রামীণগণকে নিমন্ত্রণ করিতেই হইত, সমাজে সামাজিক হিসাবে তৈজসপত্র বিলাইতেই হইত। পংক্তিতে যে-সে পরিবেশন করিতে পারিত না, ব্রাহ্মণ হইলেই—পৈতাধারী হইলেই যে থালা ধরিবে, এমন কোনো বিধান ছিল না। প্রধানত দৌহিত্র সন্তানগণই পরিবেশনের অধিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশজ গোষ্ঠীপতির বাটিতে ক্রিয়াকর্ম হইল বংশজনন্দনগণ থালা ধরিয়া পরিবেশন করিতে পারিতেন না; সে কাজ কুলীন দৌহিত্র ও ভাগিনেয়গণের একচেটিয়া ছিল। রন্ধনকার্যও অজ্ঞাতকুলশীল কেহ করিতে পারিতেন না; ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণীদেরই এ অধিকার ছিল, কুলীন-করা মেয়েই প্রায়শ পাকশালায় প্রবেশ করিতেন। সমাজপতি প্রধানগণ পাকশালায় আসিয়া দেখিয়া যাইতেন—হাতা-বেড়ি কাহার হাতে আছে। যাহাদের সহিত অন্নপানের চলন আছে, কেবল তাহাদেরই বাটিতে ব্রাহ্মণসাধারণ অন্ন গ্রহণ করিতেন; নহিলে আলোনা লুচি-চিনি বা চিঁড়ে-দই ফলাহারই প্রশস্ত ছিল।

পরিচয়

ইংরেজের আমলের পূর্বে অপরিচিতের বা অজ্ঞাতকুলশীলের স্থান কোনো গ্রামে বা সমাজে ছিল না, সহজে হইতে পারিত না। অপরিচিত ব্যক্তি দোকান খুলিলে তাহার দোকানে কোনো খরিদ্দার যাইত না, অপরিচিত বিদেশীয়কে চাকর বেহারার পদে নিযুক্ত করা চলিত না। পরিচয়ের প্রয়োজন হইত সামাজিক দণ্ডের জন্য; অপরাধী হইলে নগদ বিদায়ের হিসাবে মার-ধর অল্পবিস্তর চলিলেও আসল দণ্ড ছিল—সামাজিক দণ্ড। পাঠান মোগলদের কাজি মুফ্‌তি সমাজের সাহায্যেই সকল অপরাধীকে দণ্ডিত করিতেন; সে দণ্ড বড় ভয়ানক হইত এবং সে দণ্ডের ফলে অপরাধেয় সংকোচ ঘটিত। রাজদ্বারে যে ব্যক্তি দণ্ডিত হইত, সে সামাজিক দণ্ড পাইত, একঘরিয়া বা ঠেকো হইয়া তাহাকে থাকিতে হইত। কোনো চোর ধরা পড়িলে, সর্বাগ্রে তাহার কোন্ গ্রামে বাস, কোন্ জাতিভুক্ত সে, সে জাতির মোড়ল কে, এবং সে গ্রামের জমিদার কে, তাহার খবর সংগ্রহ করা হইত। তাহার পর মোড়ল ও জমিদারকে ডাকাইয়া তাহাকে সনাক্ত করা হইত এবং চোরাই মাল কোথায় রাখিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান চলিত। ঘর-বাড়ি, সমাজ গ্রাম জানিতে পারিলে চোরাই মাল বাহির হইতে তেমনি বিলম্ব ঘটিত না। তাহার পর মোড়ল এবং জমিদারকে সঙ্গে লইয়া কাজি সাহেব বিচার করিতেন। বিচারের শেষে দণ্ডের বিধান দুই প্রকারের হইত; প্রথম রাজদণ্ড, দ্বিতীয় সমাজদণ্ড। রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিত; তাহাকে লইয়া কেহ পানভোজন করিত না, তাহার পুত্র-কন্যার সহজে

বিবাহ হইত না। *আইন-ই-আকবরী*তে মোগলাই বিচার ও শাসনপদ্ধতির বিবরণ আছে। ইহা ছাড়া আর একটা সমাজশাসন পুরাকালে এ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা লোকনিন্দা। এই লোকনিন্দা সঙে, ছড়ায়, কবির গানে ও পাঁচালিতে প্রকট হইত। এই নিন্দাপদ্ধতির একটু পরিচয় দিব।

সংক্রান্তির সঙ

চৈত্রসংক্রান্তির দিনে এবং রাসপূর্ণিমা বা পটপূর্ণিমার কালে পূর্বে গ্রামে গ্রামে সঙ বাহির হইত; অনেক স্থানে জন্মাষ্টমীতে বা রামনবমীতে সঙ বাহির হইত। এই সঙে গ্রামের অনেকের কুৎসা কীর্তিত হইত। সঙের ছড়ার ভয় সকলকেই করিতে হইত। এখনও কলিকাতায় জেলেপাড়ার সংক্রান্তির সঙ সজীব আছে। সারা বৎসরের একটা গ্রামের কুৎসা-কাহিনী সঙে প্রকাশ পাইত। অনেক গ্রামে সঙ হইবার পূর্বে একটা ঘোঁট বসিত; সেই ঘোঁটের ফলে অনেককে টাকা কড়ি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অব্যাহতি পাইতে হইত। মালদহ জেলায় বৈশাখ মাসের 'গম্ভীরা' এখনও অনেকের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করে। সে গম্ভীরায় মেয়ে পুরুষ, ভদ্র অভদ্র, সবাই নাচ-গান করিত এবং কুৎসা কীর্তনে যোগ দিত। মূলে গম্ভীরা বৌদ্ধ বা নাথী সম্প্রদায়ের উৎসব ছিল, পরে সমাজের সকলে উহাতে যোগ দিতেন। ইহা ছাড়া রাঢ় দেশে 'ভাদোর নাচ' নামক একটা এমনই কুৎসাবহুল নাচ-গানের প্রচলন ছিল। আমরা ভাদোর নাচের শেষ অবস্থা একটু আধটু দেখিয়াছি; সে ঢোলের বাজনা এবং নাচ সত্যই অপূর্ব ছিল, বাঙালি যে নৃত্যকলায় অতি পটু ছিল, তাহা ভাদোর নাচ যে দেখিয়াছে, সেই স্বীকার করিবে। পুরুষের লাস্যলীলা যে অতটা নয়নমনোহর হইতে পারে, তাহা পূর্বে আমাদের ধারণাই ছিল না। লখনউ নগরে যিনি 'কল্‌কা বিন্দার' নাচ দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন, নৃত্যে পুরুষেও নারীকে পরাজয় করিতে পারে। এই সকল নাচ, গান, ছড়ায় ও কবিতায় যে সমাজ-শাসন হইত, শত প্রকারের রাজদণ্ডে ততটা শাসন সম্ভবপর ছিল না। এক কালে সঙ ও ছড়ার প্রভাবে বাঙালি সমাজ সুশাসিত থাকিত।

বিলাস ও সংযম

এই সঙ্গে আর একটা কথা কহিয়া রাখিব। বৌদ্ধ যুগে ভারতবাসী অতিমাত্রায় বিলাসী ও ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে বিলাসের প্রভাব নব্য হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুদয়েও সংকুচিত হয় নাই। রানি বিলাসবতীর প্রসাধন-কলার বর্ণনা *হর্ষচরিতে* এখনও পাঠ করিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়, তাহার একচতুর্থাংশও আধুনিক ইউরোপীয় ভামিনীসকল আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া শয্যাবিলাসী, ভোজনবিলাসী, বসনবিলাসী প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে ধারণা হয় যে, সেকালের বিলাস-ব্যসন অতি উচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিল। *কথাসরিৎসাগর* প্রভৃতি পুস্তকে এই সকলের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, ভোজনাদি বিলাস তখনও একটা Fine Artএ পরিণত হইয়াছিল। বাৎস্যায়নের *কামসূত্রে* ভোজ্য পাকের পদ্ধতিসকল পাঠ করিলে, বসন, ভূষণ, গন্ধলেপন প্রভৃতির

প্রস্তুতির বিবরণ পাঠ করিলে মনে এ বিশ্বাস স্থির জন্মে যে, এ সকল ব্যাপারেও বৌদ্ধ ভারতবর্ষ সভ্যতার সর্বোচ্চ সোপানে আরূঢ় হইয়াছিলেন। *কামসূত্র* পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, পোলাও, কোর্মা, কাবাব, কোপ্‌তা, কিমা, ইহার কোনোটাই খাস মুসলমানদের নহে, উহা আমাদেরই ছিল; বরং এখন জোর করিয়া বলিব যে, পাঠানগণ সূপকারশাস্ত্র বৌদ্ধ ভারতবাসীর নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া বসন ও ভূষণ বিষয়ে ভারতবাসীর বিশিষ্টতা খুব প্রকটই ছিল। চোগা, চাপ্‌কান, আচকন্‌, আবা, কাবা, জামা, নানাবিধ পাগড়ি বা উষ্ণীষ, চুড়িদার পায়জামা ইজার-পায়জামা, গোল টুপি, কামরাঙা আকারের টুপি প্রভৃতি পোশাক-পরিচ্ছদ খাস ভারতবর্ষের; উহার কোনোটাই বিদেশ হইতে আমদানি নহে, পাঠানদের নিকট হইতে সংগৃহীত নহে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার *Indo-Aryans* পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, ছবি দেখাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার পর আধুনিক আবিষ্কারে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতবাসী স্যুত বসন-ভূষণ সম্বন্ধে স্বীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। জুতা সম্বন্ধেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য ঠিক ছিল; চটি জুতা তো ছিলই, রীতিমতো সু (shoe) ছিল এবং বুট (boot) জুতাও আমরা ব্যবহার করিতাম। সম্প্রতি মথুরার নিকটে হুবিষ্কের এক প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা বাহির হইয়াছে, তাহার পায়ে বুট জুতা—অশ্বারোহীর বুট জুতা খোদিত রহিয়াছে। *সাহিত্য* মাসিকপত্রে শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ধারাবাহিকরূপে কয়টা সন্দর্ভ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বসন-ভূষণ সম্বন্ধে ভারতবাসী উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনিই দেখাইয়াছেন, ভারতবর্ষে 'তুন্দুরের' ব্যবহার ছিল, আমরা পাঁউরুটি-বিস্কুট তৈয়ার করিতে পারিতাম। আস্‌কে আদি পৌষপার্বণের পিষ্টকসকল তুন্দুরের সাহায্যে তৈয়ার করা হইত।

কেবল এইটুকুই নহে, বৌদ্ধ যুগে এবং তাহার পরেও পান-ভোজন ব্যাপারে ভারতবাসী বিদেশীয় ভিন্নধর্মাবলম্বিগণকে সমকক্ষের তুল্য ব্যবহার করিতেন। 'ছুৎমার্গ' ব্যাপারটা পৌরাণিক যুগে বা বৌদ্ধ যুগে, পূর্বগামী কোনো কালেই প্রচলিত ছিল না। চাঁদ বর্দ্দয়ের *রাসা* গ্রন্থ হইতে একটা উপাখ্যানের কথা বলিব। বাপ্পা রাওয়ের সময়ে আরব দেশ হইতে দুই জন মোসলেম ধর্মাবলম্বী চিতোরে আগমন করেন। তাঁহারা চিতোরের রাণার বৃত্তিভোগী সেনানির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া শিশোদীয় ক্ষত্রিয়গণ এক পংক্তিতে পান-ভোজন করিতেন; তাঁহারা দুই শিশোদীয়া রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এই দুই আরবি মুসলমান কিছুকাল চাকরি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহাদের দুই হিন্দু রমণী 'সতী' হইয়া জ্যান্ত গোরে প্রবেশ করেন। ইহারা যখন চিতোরে আসেন, তখন সিন্ধুদেশেও মুসলমানদের সমাগম ঘটে নাই। পরম্পরায় একটা কথা প্রচারিত হইয়াছিল যে, আরব দেশে ইসলাম ধর্ম নামক এক নব ধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছে: উহা বৌদ্ধবিরোধী, 'বোধপরস্ত' নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই উহার অভ্যুত্থান। এই সমাচার শুনিয়া নব্য হিন্দুগণ, অগ্নিকুলের ক্ষত্রিয়গণ আশান্বিত এবং আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। তাই মুসলমান অতিথিদ্বয়কে চিতোরের ক্ষত্রিয়গণ সমাদর করিতে ভুলেন নাই। শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতে পাঠানদের অভিযানের কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে

এবং সকল জাতির মধ্যে বৌদ্ধবিরাগ অতিমাত্রায় প্রবল হইয়াছিল। এই বিরাগের ফলে সর্বত্র অন্তর্বিপ্লব, অন্তর্দ্রোহ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল! বৌদ্ধ বিদ্বেষবশতই পাঠানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন; বৌদ্ধ গোয়েন্দার ইঙ্গিতে পাঠানগণ

'ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটি পালটি
লুটি নিল যা ছিল সার ও—।'

এই লুটপাটের ফলে, গজনবীর মামুদের উপদ্রবের ফলে, ঘোরের মহম্মদের চাতুরিবশেই পরে ভারতবাসী হিন্দুর মনে মোসলেমবিদ্বেষ অনপনেয়, লেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। আর এই বিদ্বেষবশতই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবাসী সংযম এবং তিতিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সে সংযম ও তিতিক্ষা পরবর্তী সকল প্রাদেশিক হিন্দু সমাজের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। কথাটা একটু খুলিয়া বলিব।

সংযমের নিদান

বৌদ্ধ যুগের ব্যসন-বিলাস ও সামাজিক অনৈক্যের ও আত্মদ্রোহের ফলেই পাঠানগণ ভারতবর্ষে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাও অনায়াসে সিদ্ধ হয় নাই। ঘূর্ণাবর্তের মতন অপ্রতিহত প্রভাবে বার বার একুশ বার উত্তর ও পশ্চিম-ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া, লুটিয়া কাটিয়া পোড়াইয়া জনশূন্য করিয়া গজনবীর মামুদ মোসলেম বাহুবলের প্রতিষ্ঠা সাধন করেন। তাঁহার উপদ্রবে উত্তর-পাঞ্জাব হইতে গুর্জরের সোমনাথ পর্যন্ত পশ্চিম ভূভাগ দুই শতাব্দীকাল যেন জনশূন্য শ্মশানতুল্য হইয়াছিল। তাহার পরে ঘোরের মহম্মদ আসিলেন, তিনি সম্মুখসমরে হিন্দুগণকে পরাজিত করিয়া পাঠানরাজ্যের বনিয়াদ স্থাপন করেন। এ কার্যও এক প্রচেষ্টার ফলে সম্ভবপর হয় নাই। তাহার পর এক শতাব্দীর প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত পাঠান অধিকারভুক্ত হয়। ভারতবর্ষের হিন্দু বুধগণ বুঝিলেন, এ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বাহুবলে সহজে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না, তিন শতাব্দীর চেষ্টায় কোনো ফল দেখিল না। অথচ জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রে, কাশীধামে, গৌড়ের নিকট গঙ্গা এবং কৌশিকীর (কুসী নদীর) সঙ্গমক্ষেত্রে সাধু সন্ন্যাসী সকলের মহাসভা ও বিচার হইয়াছিল। সে বিচারফলে নৃসিংহাচার্য-ব্যাখ্যাত

কমঠব্রত

সমাজের অবলম্বনযোগ্য বলিয়া নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে ও জাতিবিশেষের মধ্যে এই কমঠব্রত কোন্ আকারে অবলম্বিত হইবে, তাহাই ধার্য করিবার জন্য স্মার্তপরম্পরা পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে ভবদেব, জীমূতবাহন হইতে স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন পর্যন্ত স্মার্তপরম্পরা বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও মীমাংসা ঘাঁটিয়া এই কমঠব্রতের অত্যুৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই কমঠব্রত অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের হিন্দুসমাজ এখনও সজীব আছে। সাতশত বর্ষের মুসলমান-প্রাধান্য, তুরগি হাব্‌শির উপদ্রব

আমাদের বিশিষ্টতা নষ্ট করিতে পারে নাই। এই কমঠব্রতের একটু আলোচনা প্রয়োজন। আগে উহারই ব্যাখা করিব।

কমঠকবচ

কমঠ শব্দের অর্থ কচ্ছপ। কচ্ছপের যেমন বুকে পিঠে কঠিন কঠ আবরণ কবচের কাজ করে, তেমন এক এক সময়ে সমাজকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে কমঠকবচের আশ্রয় লইতে হয়, কচ্ছপপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। কমঠব্রতের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন হইল সংযম ও তিতিক্ষা। ব্যসন-বিলাস বহু লোকের, বহু শিল্পীর, বহু দেশজ সামগ্রীর উপর নির্ভর করে। পরাজয়ের অবস্থায় পতিত জাতির জনবল ও ধনবল কমিয়া যায়; বিশেষত পরাজিত অবস্থায় বিলাসী হইতে হইলে রাজার জাতির অনুচিকীর্ষু হইতেই হইবে। বিজেতার অনুচিকীর্ষার ফলে পরাজিতের জাতিগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়। বিশিষ্টতা নষ্ট হইলে জাতিনাশ ঘটে, ধর্মনাশ ঘটে, পরাজিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকে না। অতএব বিজিত জাতিকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ব্যসন-বিলাস পরিহার করিতেই হইবে, সংযম তিতিক্ষার আশ্রয় লইতেই হইবে। জার্মান যুদ্ধের সময় যখন বিলাতের জাহাজের গতাগতি অনেকটা প্রতিরুদ্ধ হয়, তখন কিছু কালের জন্য ব্রিটিশ জাতিকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কমঠব্রত আংশিকভাবে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। জার্মান জাতিকে মহারণের সময়ে, চারি বৎসরকাল আগাগোড়া কমঠব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। এই কমঠব্রত অবলম্বনের প্রথম স্তর হইল বিদেশীয় সামগ্রী সকলের নিন্দাকীর্তন; উহা যে অস্পৃশ্য, তাহা স্বজাতীয়গণকে বুঝাইয়া দেওয়া সর্বাগ্রে কর্তব্য। বিলাতে জার্মান যুদ্ধের কালে মহারানি আলেকজান্দ্রা হইতে সামান্য পুরনারী পর্যন্ত সকলকে British-made goods-এর গুণকীর্তন করিতে হইয়াছিল; এখন বিলাতে Made in Germany ছাপ-মারা সামগ্রীপত্র অনেকের কাছে অস্পৃশ্য; ফ্রান্সে তো বটেই। নৃসিংহাচার্য বলিয়াছেন যে, কমঠকবচ সনাতন মানবমনীষাসঞ্জাত ধর্ম এবং কর্তব্য। পরাজয়ের দুর্বার পেষণে অধীর হইলে প্রত্যেক জাতিই ঐ ব্রত অনাদি কাল হইতে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। কমঠব্রতের ফলস্বরূপ 'ছুৎমার্গ, স্পৃশ্য-অস্পশ্য বিচার, জলচল এবং জল অচলের ব্যবস্থা।' কমঠকবচ পাইয়াই আমরা হাজার বৎসরকাল কেবল গাড়ু গামছা, খড়ম ও ধুতি সার করিয়া জীবিত ছিলাম, দরজির আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, সেলাই-করা কাপড় পরি নাই, পূর্বপুরুষের পোলাও, কোর্মা, কাবাব উদরস্থ করি নাই। কমঠকবচ পাইয়া আমরা দই চিঁড়ে খাইয়া, কাঁচকলা-ভাত খাইয়া বাঁচিয়া আছি। কমঠকবচ পাইয়া মুসলমানের—বিদেশিদের ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করি নাই। ট্রিভিলিয়ান সাহেবের ভাষায় বলিতে হইলে বলিব—'We have learnt the rare art of living upon nothing and we have secured for ourselves the path to immortality.' কমঠকবচই আমাদিগকে অমৃতের আস্বাদ দিয়াছে, আমরা অমরত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছি। এই কমঠকবচের প্রকৃতি ও ধাতু ঠিকমতো বুঝিতে পারিলে আমাদের সমাজ-বিন্যাসের তত্ত্ব অনেকে বুঝিতে পারিবেন। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ এবং নন-কো-অপারেশন এই কমঠকবচের

বেদীর উপরে বিন্যস্ত। কমঠকবচ আছে বলিয়া আমাদের সমাজের মূল তত্ত্ব হইল স্থিতি; ইউরোপ এতকাল গতি বা progress লইয়া ব্যস্ত ছিল, এইবার তাহাকেও স্থিতির অক্ষয় বটকে আলিঙ্গন করিয়া বাঁচিতে হইবে।

গোঁড়ামি

গোঁড়ামি এই কমঠকবচের প্রথম ও প্রধান ফল। আমার যাহা, তাহা অত্যুত্তম, নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক, জগতে তাহার তুল্য আর নাই, আর হইতে পারে না,—এই ভাব, এই ধারণা, এই বিশ্বাস গোঁড়ামির বেদী। আমার জাতি অতি পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ, আমার আচারপদ্ধতি আমার পক্ষে অতি উপযোগী এবং নির্দোষ, আমার বসন-ভূষণ অতি সুন্দর ও মনোহর, আমার ভাষা অতি মধুর দেবভাষা, আমার নারী লোকললামভূতা অনিন্দ্য সুন্দরী, আমার ধর্ম স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত;—সোজা কথায় আমার যাহা, তাহার তুলনা হয় না—করিতে পারা যায় না। ইহাই সকল স্বাধীন জাতির ভাষা ও ভাব। সকল স্বাধীন জাতির গোঁড়ার দল এই ভাবের কথাই বলিয়া থাকে। কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, গোঁড়া যে দেশে যাইবে, সেই দেশে ও জাতির মধ্যে স্বীয় সভ্যতাগত বিশিষ্টতা পরিস্ফুট রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। ব্রিটিশ জাতির তুল্য গোঁড়া জাতি আর দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই উষ্ণপ্রধান ভারতবর্ষে বাস করিলেও তাহারা সেই তুষারধবল ক্ষুদ্র দ্বীপ ইংলন্ডের উপযোগী আচার-ব্যবহার, সাজ-পোশাক, পান-ভোজন-পদ্ধতি, অশন বসন পুরামাত্রায় বজায় রাখিতে সার্থক চেষ্টা করে। ইংরেজ ইংরেজের দোকানে বেসাতি করিতে ভালোবাসে, ইংলন্ডের শিল্পজাত সামগ্রীপত্রকে অত্যুৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকে, বিলাতি টিনে-মোড়া কত কালের শুঁটকি মাছ, গো-বলদ-জিহ্বা, জেলি, হ্যাগিশ্ প্রভৃতি সানন্দে ভোজন করিয়া থাকে, মোটা ধোকড় বিলাতি কম্বলের কোট পাৎলুন এ দেশে বারো মাস দেহের উপর চড়াইয়া বহন করিবার প্রয়াস পায়। কেবল নিজেরাই স্বদেশের এবং স্বজাতির সভ্যতার ও জীবিকা নির্বাহের বিষয়গুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়া তৃপ্তি বোধ করে না, ব্রিটিশ জাতির প্রায় সকলেই বিজিত ভারতবাসী ইংরেজিশিক্ষিতগণকে নিজেদের আদর্শে কালা গোরা বানায়, আমাদিগকে ঐ সাজ-পোশাক পরাইয়া, ঐ রকমের পান-ভোজনের, বচন-বাচনের পদ্ধতি শিখাইয়া দিয়া তৃপ্তি বোধ করে। ভারতবর্ষের কালা আদমি অন্তত একবার বিলাত ঘুরিয়া না আসিলে যেন সে ইংরেজের মনোমতো সভ্য ও সুমার্জিত হয় না; কোনো উচ্চপদের যোগ্য হয় না। ব্রিটিশ জাতির এই দুর্বার গোঁড়ামির প্রতিরোধ করিতে হইলে বিজিত ও সম্মূঢ় প্রজার জাতির পক্ষে কমঠকবচ অবলম্বন করা ছাড়া জাতিগত বিশিষ্টতা রক্ষার উপায়ান্তর নাই। সাধারণত সকল বিজেতা জাতিই পরাজিত প্রজার কাছে মাত্রাধিক্যে গোঁড়া হইয়া থাকে। প্রজাকে তাহার সামাজিক গণ্ডির বন্ধনী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, বিজেতার অনুচিকীর্ষু করিতে হইলে, তাহার জাতি, কুল, ধর্ম নাশ করিতে হইলে, তাহার সমাজগত সংহতিশক্তি চূর্ণ করিতে হইলে, তাহার সম্মুখে বিজেতা জাতির সকল বিষয়েরই অধিক মাত্রায় শ্লাঘা প্রকাশ করিতে হয়, এবং প্রজার সকল বিষয়ের, সভ্যতার সকল প্রত্যঙ্গের

ঘোরতর নিন্দা করিতে হয়। রাজার জাতির মুখে প্রজার সাজ-পোশাক, সভ্যতা-ভব্যতার নিন্দা অহরহ শুনিতে থাকিলে প্রজার যদি কমঠকবচের আবরণ না থাকে, তাহা হইলে ক্রমে প্রজা বিগড়ায়, স্বীয় জাতি, কুল, ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া বিজেতা জাতির অঙ্গীভূত হইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। এক বার বিজেতার অঙ্গীভূত হইবার বাসনা মনে জাগিলে পরাজিতের বিশিষ্টতা আর রক্ষা পায় না। মোগল পাঠানের আমলে এমন প্রজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত, ইংরেজের আমলে এমন প্রজা হ্যাট-কোট পাৎলুন পরিহিত, বিলাতি হাবভাবপূর্ণ সাহেব সাজে। সাহেবি পোশাকের নগদ বিদায়টা যে খুব মোটা। রেলগাড়িতে চড়িলে সাহেবি পোশাকে আঠারো আনা লাভ, আইন আদালতে অনেক সুবিধা, রাজপথে পদে পদে সুবিধা, কদাচিৎ যে কনেস্টবলের নিকট হইতে সেলামও পাওয়া যায়। সামাজিক গোষ্ঠীপতিগণ এটুকু বুঝেন বলিয়া কমঠকবচের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সকলকে গোঁড়া হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কবীর বলিয়া গিয়াছেন যে, উর্বশী মেনকার মনোমোহিনী শক্তি অপেক্ষা বিজেতা জাতির সম্মোহনশক্তি প্রবলতম, দুর্বার এবং অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য। পরাজিত হইলেই একটু মনটা ছোট হইয়া পড়ে; বিজেতা জাতিকে মনে মনে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করে, প্রজা এক বার বিজেতাকে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলে বিজেতার গোঁড়ামি প্রজাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবেই। তাই কবীর বলিয়াছেন—জয়-পরাজয় ক্ষণসাপেক্ষ; হারিয়াছি বলিয়া যে একেবারে স্থায়ীভাবে ছোট হইয়াছি, অসভ্য বর্বর হইয়াছি, এমন ধারণা পোষণ করা ঠিক নহে। এই ধারণাই জাতিনাশের মূল।

গোঁড়ামির বেদী

আমাদের হিন্দুয়ানির গোঁড়ামির বেদী হইল পাপ-পুণ্যের নির্দেশ। আমার যাহা, তাহা পুণ্যময়; অন্যের যাহা, তাহা পাপজ; এই ধারণা হইতেই হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি গজাইয়াছে। ভালো মন্দ বুঝি না, সুন্দর কুৎসিত বুঝি না, কেবল বুঝি এই যে, আমার যাহা, আমার অবলম্বনীয় যাহা, তাহা পুণ্যময়, আমার ইহপরকালের পোষক ও রক্ষক, পক্ষান্তরে তোমার যাহা, তাহা আমার পক্ষে পাপজ; তাহার দ্বারা আমার আয়ুক্ষয় ঘটে, বংশনাশ ঘটে, শেষে সর্বনাশ সম্ভবপর হয়। আমি হিন্দু, আমার বিশিষ্টতা রক্ষার উদ্দেশ্যে, আমাকে অমর অজর করিয়া রাখিবার বাসনায় আমি গোষ্ঠীতে ও ব্যষ্টিতে কমঠব্রত অবলম্বন করিয়াছি। সেলাই-করা জামা-জোড়া আমার পরিতে নাই, পোলাও কোর্মা কাবাব খাইতে নাই; পায়ের দিক দিয়া অর্থাৎ প্রথমে পা গলাইয়া যাহা পরিতে হয়, তেমন ইজার, পায়জামা, মোজা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নাই, মৃৎপাত্র ব্যতীত অন্য পাত্রে কিছু রন্ধন করিয়া খাইতে নাই; নিত্যসংযমী তিতিক্ষাপরায়ণ হইয়া, গাড়ু গামছা সার করিয়া আমাকে থাকিতে হয়। তুমি রাজা, বিজেতা; জগৎ ছানিয়া তুমি ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়া উপভোগ করিতে পার—করিতেছও; তুমি তেজস্বী, তোমাতে ঐ সকল শোভা পায়। আমি পরাজিত; আত্মরক্ষার হিসাবে, বংশরক্ষার সাধে, আমার জাতিগত বিশিষ্টতা রক্ষার বাসনায় আমি কমঠব্রত অবলম্বন করিয়াছি, কচ্ছপমূর্তি অবলম্বন করিয়াছি; পৃথিবীর আর সকল দেশ,

আর সকল জাতি আমার পক্ষে নাই বলিলেও চলে; আমি কাহারও কিছু গ্রহণ করিতে চাহি না; গ্রহণ করিয়া করিবই বা কি! রাখিবই বা কোথায়—কোন্ দেশে—কোন্ স্থানে? আমার বলিয়া আমার কিছু আছে কি? আমার ঘর নাই, দুয়ার নাই, দেশ নাই, সমাজ নাই,—আমার বলিবার কুত্রাপি কিছু নাই। থাকিবার মধ্যে আছে দেহযষ্টি, তাহাকেই নিত্যশুদ্ধ এবং পৈতৃক ধারানুযায়ী পবিত্র রাখিবার জন্যই আমি ব্যস্ত; এই দেহ ঠিকমতো রক্ষা পাইলে হিন্দু Type বা আদর্শ এই চৌদ্দ পোয়া দেহে অব্যাহত থাকিলে আবার শুভ দিন উদয় হইতে পারে, আবার শুভ অবসর আসিলে আমার অপহৃত সর্বস্ব, আমার আগামীগণ তেমন ভাগ্যবান হইলে তাহারা পরে করায়ত্ত করিবে, এই আশায় আমি দেহে জীবন ধারণ করিয়াছি। ইহাই হইল আচারধর্মের, রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রের শুদ্ধিতত্ত্বের ফিলজফি। এই ফিলজফির আবৃত্তি রামানুজ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও জীব গোস্বামী পর্যন্ত সকল আচার্যপাদ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই করিয়া গিয়াছেন; ইহারই ব্যাখ্যা কবীর দোঁহাবলীতেও করিয়াছেন, এই কথাই গোস্বামী তুলসীদাস অপূর্ব হিন্দিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। কমঠ-তত্ত্বই ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের আধুনিক সকল জাতির প্রচলিত সকল উপধর্মের ও নব সমাজবিন্যাসের গোড়ার কথা। প্রথমে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বৌদ্ধগণ পাঠানদিগকে আদর করিয়াছিলেন, বাংলার রমাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণে সে বার্তা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; পরে যখন সব যায়, এমন সম্ভাবনা ঘটিল, যখন কালাপাহাড়ের উপদ্রবে, মোগল পাঠানের ঘোরতর সংগ্রামে সর্বনাশের সম্ভাবনা ঘটিল, তখনই কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টায় সমাজ গঠন, নব ধর্ম প্রচার প্রভৃতি আরব্ধ হইয়াছিল, তখনই কমঠ-ব্রতের প্রচলন হয়, তখনই কমঠকবচ হিন্দু মাত্রেই অবলম্বন করে, তখনই মোসলেম হিন্দুর অস্পৃশ্য হইয়াছিল, মুসলমানের ছায়া মাড়াইলে হিন্দুর জাতি যাইতে লাগিল। কমঠকবচ অবলম্বন করিয়াছিলাম বলিয়া মুসলমানের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতা করিয়া মোগলাই আমলে আমরা জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছিলাম। কেবল বাঁচিয়া থাকাই নহে, রাজপুতপ্রমুখ অনেক হিন্দু জাতি মোগলের সমকক্ষ হইয়াছিল। সেটুকু বুঝিয়াই আওরঙ্গজেব আবার হিন্দুপীড়ন আরম্ভ করেন, আবার মন্দির-মঠ ভাঙিতে উদ্যত হন, আবার জোর করিয়া হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে ব্যস্ত হন। উহার পরিণাম শিখ ও মারাঠার উদ্ভব, মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ তাহার পর ইংরেজের পূতনার আদরে, নগদ টাকার লোভে, বিলাসব্যসনের মোহে, ইংরেজি স্বাধীনতার বংশীধ্বনির আকর্ষণে আমরা সে শুদ্ধিতত্ত্বের কমঠকবচ পরিহার করিয়া যাহা সাজিয়াছি, তাহা প্রত্যেক গৃহের মুকুরেই প্রতিফলিত। আমাদের পল্লীবাস গিয়াছে, স্বাবলম্বন গিয়াছে,—আমার বলিবার যাহা ছিল, তাহার কণা মাত্র নাই। আছে কেবল স্মৃতি, তাহারই তাড়নায় এত কথা ব্যক্ত করিলাম। এ স্মৃতিও আর অধিক দিন বুঝি টিকে না।

মহামন্ত্র

কমঠকবচের মহামন্ত্র গোঁসাই তুলসীদাস অতি সংক্ষেপে, অতি মৃদু ভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই—

'সব্‌সে রসিও, সব্‌সে বসিও, কিজিয়ো আপন কাম।
হাঁ জি হাঁ জি কহতে রহিও, বৈঠিও আপন ঠাম॥'

অর্থাৎ সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া উঠা বসা করিবে, মেলা-মেশা চালাইবে বটে, পরন্তু কদাপি স্বীয় কর্তব্য পালনে অবহেলা করিবে না, স্বকর্ম সাধনে সদা তৎপর থাকিবে। সকলের সকল কথায়, সকল রকমের বাদ বিতণ্ডায় হাঁ হাঁ, বেশ বেশ বলিতে ভুলিও না, পরন্তু কদাপি নিজের গণ্ডি কাটিয়া বাহিরে যাইবে না, স্বীয় আহার আচ্ছাদন ছাড়িবে না, রীতি-নীতি ভুলিবে না, পূজা-পাঠ, আচার-ধর্মে অবহেলা বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবে না। এই কমঠকবচের মহামন্ত্র অনুসারে স্বীয় জীবনকে প্রণালীবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিলেন ইদানীং বাংলার একজন ইংরেজিনবিশ মহাপুরুষ, তাঁহার নাম স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকালের বাংলা ভাষায় এমন আর্যা শ্লোক নানাবিধ প্রচলিত ছিল, তাহার আর আবৃত্তি করিলাম না। স্যার গুরুদাসের দীর্ঘ জীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে কমঠকবচের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে; কেমন করিয়া ইংরেজের শাসনাধীনে থাকিয়া, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার ভিতর দিয়া যাইয়া ইউরোপীয় বিলাস-ব্যসনের দুর্বার আকর্ষণী শক্তিকে ব্যাহত রাখিয়া স্বীয় জাতি ও সমাজগত বিশিষ্টতাকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা স্যার গুরুদাস বাঙালি জাতিকে—বাংলার ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে করিয়া কর্মিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বাংলার বাহিরে মাদ্রাজের স্যার মথুস্বামী আয়ার, বোম্বাইয়ের কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ এবং বালগঙ্গাধর তিলক কমঠকবচ ধারণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। নৃসিংহাচার্য স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক গৃহস্থের পত্নী, পুত্র, কন্যা অনিন্দ্যসুন্দরমূর্তি হয় না, অথচ প্রত্যেক সাধু গৃহী স্বীয় পত্নীকে সুরূপা দেখেন, পুত্রকন্যাগণকে সোনার চাঁদের টুকরা বলিয়া মনে করেন। অত সুধাময়, সুষমা-মাখানো বলিয়া হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা না হইলে শিশু পুত্র-কন্যার প্রতিপালন সম্ভবপর হয় না—জনক জননী অতুল্য সহিষ্ণুতার সহিত পুত্র-কন্যাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারেন না। মমত্ববোধ এই সৌন্দর্যসৃষ্টির মূল উপাদান। আমার পত্নী, আমার পুত্রকন্যা, তাই উহারা আমার দৃষ্টিতে অতি সুন্দর—অতীব মনোহর। এই মমত্ববোধ সমাজ ও ধর্মের প্রতি আরোপ করিতে হইবে, এই মমত্ববোধে মাতোয়ারা হইয়া সমাজের ও জাতির বিশিষ্টতাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। শত কষ্টে, শত যন্ত্রণা পাইলেও জননী যেমন শিশুকে ক্রোড় হইতে নামাইতে পারেন না, তেমনি সামাজিক মানুষ অচ্ছেদ্য বন্ধনে স্বীয় জাতিগত বিশিষ্টতাকে স্বদেহে স্বীয় হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিবে, তবে পরাজিত প্রজার জীবনে স্বীয় বিশিষ্টতাকে অব্যাহত রাখিয়া দিনাতিপাত করিতে পারিবে। হও না কেন তুমি বিজেতা, আমি পরাজিত পরাধীন প্রজা হইলেও আমার অশন-বসন, সাজ-পোশাক রীতি-নীতি, পূজা-পাঠ ধর্ম-কর্ম আমার পক্ষে অতি উপযোগী, অতি সুন্দর, অতীব মনোহর। উহা দেবতার দান, উহার কল্যাণে আমার ঐহিক সুখ ও মঙ্গলসাধন হইবে, আমার পারলৌকিক সদ্‌গতি ও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। আমার জাতির মতন সুরূপ, সুঠাম অন্য জাতি নহে; সুন্দরী খুঁজিতে হয় আমার স্বজাতির ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিব, আমার বিলাস-ব্যসনের পর্যবসান আমার জাতির শিল্পকলা, রাগরঙ, গন্ধপুষ্প, যুবক-যুবতী, নৃত্যগীত প্রভৃতির

দ্বারা সাধিত হইবে। মনের মধ্যে অহরহ এই ধ্যান, এই ধারণা, এই বিশ্বাস সজীব সতেজ ভাবে যাহার জাগিয়া না থাকিবে, সে কোনো ক্রমেই কমঠকবচ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এ বড় কঠিন ব্রত, উৎকট তপস্যাসাধ্য কর্ম। এই দুরারাধ্য তপশ্চারণ করিয়া যে প্রজার জাতি দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারে, সেই প্রজার জাতি অমর হইয়া থাকিতে পারে, তাহারই ভাবী কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী হয়।

কষ্টিপাথর

নৃসিংহাচার্য-ব্যাখ্যাত কমঠ-ব্রতের এই তত্ত্ব বৌদ্ধ যুগের পরে নব্য হিন্দুজাতির অভ্যুত্থানের মূল বেদী—কষ্টিপাথর। শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক, মাধবাচার্য প্রভৃতি আচার্যপাদগণ এই জাতিগত মমত্ববোধের নানাবিধ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা বিবৃতির প্রভাবে হূণ, শবর আদি জাতিসকলের আক্রমণ হইতে হিন্দু আত্মরক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছে, তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছে; শেষে মোগল পাঠানের আমলে উহারই কল্যাণে ভারতবর্ষের বারো আনা অংশ হিন্দু ছিল, এখনও আছে। উহাই Indian Federationএর মূল বেদী, মৌলিক ফিলজফি। বাংলায় যত রকমের সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-গঠন হইয়াছে, সকলই এই কমঠব্রতকে কীলকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, উহারই অবলম্বনে পরিবর্তন বা কোনোরূপ পরিবর্ধন ঘটাইয়াছেন। এই কষ্টিপাথরে ঘষিয়া সকল ব্যবস্থা ও পদ্ধতির যাচাই করিতে হয়। Nationalism বল, Imperialism বল, সকল ism-ই এই কমঠ-ব্রতের বনিয়াদের উপর বিন্যস্ত। উহা যে ভারতবাসীর একচেটিয়া সম্পত্তি, এমন কথা বলিতে পারি না। উহা সকল সজীব, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জাতির শেষ অবলম্বন; উহা না হইলে, উহার সাধনা করিতে না পারিলে কোনো জাতিই জাতিগত বিশিষ্টতার ধারা অব্যাহত রাখিয়া চিরজীবী হইতে পারে না। জার্মান মহাযুদ্ধের পরে এই কমঠ-কবচের তত্ত্ব ইউরোপে আকারান্তরিত হইয়া উন্মেষ লাভ করিতেছে—ইংলন্ড, ফ্রান্স, উহার আলোচনায় ব্যস্ত হইয়াছে। বল্লভাচার্য বলিয়া গিয়াছেন—প্রেমিক ভক্ত কখনই উদার হইতে পারে না; প্রেমিক রেশমের গুটিপোকার মতন মমত্বের আবেষ্টনীর ভিতরে স্বীয় ঈপ্সিতকে রক্ষা করে। এই কমঠ-কবচই ভক্তিধর্মের প্রধান উপাদান; সে কথা পরে প্রয়োজন হইলে বলিব।

☐ *বঙ্গবাণী*, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৯

দেশের অবস্থা

সখারাম গণেশ দেউস্কর

'কহিতে বুক চায় দু'ভাগ হ'তে।
নয়নে উথলে জল-স্রোত শতে॥'

ইংরাজ ত্রিবিধ সংগ্রামে ভারতবর্ষ জয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে শাসন-দণ্ডের পরিচালন করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের সংগ্রামকে আমরা 'বাহুযুদ্ধ' নামে অভিহিত করিতে পারি। রাজনীতিক কূট কৌশলে, ও অভিনব অস্ত্র-শস্ত্রের বলে, ইংরাজ এদেশে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার সংগ্রামের ফল। প্রাচীন কাল হইতে ইংরাজের আগমন কাল পর্যন্ত এদেশে এইরূপ সংগ্রামই রাজ্যলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। দেশবাসীর বাহুবল বিনষ্ট বা বিনত হইলেই এত দিন বিজেতারা সন্তুষ্ট হইতেন। এই কারণেই এই প্রকার যুদ্ধকে 'বাহু-যুদ্ধ' নামে অভিহিত করিয়াছি। ইহাকে 'শারীর যুদ্ধ' নামেও আখ্যাত করিতে পারা যায়।

ইংরাজের এদেশে পদার্পণের পর হইতে ভারতবাসী এক অভিনব সংগ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে আহূত হইয়া তাহারা আপনাদিগের ধন-বল হারাইল। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা 'বাণিজ্য-সংগ্রামের' কথা বলিতেছি। বণিক-রাজ ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-যুদ্ধে আমরা কতদূর বিপন্ন হইয়াছি, তাহা অনেকেরই সুবিদিত আছে। একশত বৎসর পূর্বে যে ভারতবর্ষ অশেষ শিল্প-পণ্যের প্রধান উৎপত্তি-স্থান ছিল, এশিয়া ও ইউরোপের বিপণী-শ্রেণী যাহার শিল্প-সামগ্রীতে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিয়া বৈদেশিকদিগের বিস্ময় ও অসূয়া উৎপাদন করিত, সেই ভারতবর্ষের অধিবাসীরা এখন সামান্য সূচিসূত্র-ক্রীড়নক হইতে যন্ত্র-যানাদির উপকরণ পর্যন্ত—জীবনযাত্রা ও সমাজযাত্রা-নির্বাহোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের জন্য নিতান্ত দীনের মতো পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছেন। এদেশে এক্ষণে ইংরাজের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতবাসীর বাহুবল ও অস্ত্রবল-হ্রাসের সহিত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজের 'বাহু-যুদ্ধ' ইদানীং স্থগিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগের বাণিজ্য-সংগ্রামের বিরাম হয় নাই, কখনও হইবে কি না, ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। বাষ্পীয় শকট, তাড়িত বার্তাবহ, পণ্যবাহী অর্ণবপোত ও অবাধ বাণিজ্যনীতি এই সমরের প্রধান অস্ত্র। প্রবল রাজশক্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত শ্বেতাঙ্গ বণিকসমাজ এই সমরের যুযুৎসু। দুর্বল ভারতবাসীর ধনহরণ ও ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির বিনাশ ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই সংগ্রামে দিন দিন আমাদিগের ধনবল হ্রাস পাইতেছে। দুর্ভিক্ষ আমাদিগের

নিত্য-সহচর হইয়াছে। দেশবৎসল কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

'নিজ অন্ন পরে কর-পণ্যে দিলে।
পরিবর্ত ধনে দুর্ভিক্ষ নিলে॥'

ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে নেত্রপাত করিলে, দুর্ভিক্ষের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই কিরূপ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সর্বত্র একপ্রকার অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, ইংরাজি ইতিহাসে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ শতবৎসরের মধ্যে ভারতে চারিবারের অধিক দুর্ভিক্ষ-পাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষের বিক্রমও এক একটি প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইংরাজের শাসন ক্রমশ বিস্তারলাভ করিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসও আপনার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে বা ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষজনিত অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উহার দ্বিতীয় পাদে পাঁচ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এদেশে সিপাহিবিদ্রোহ সংঘটন ও পরিণামে সমগ্র ভারতে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পঞ্চবিংশ বৎসরে দুর্ভিক্ষও আপনার শাসন এদেশে সুদৃঢ় করিয়াছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, খ্রিস্টীয় ১৮৫০ অব্দ হইতে ১৮৭৫ অব্দের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাসী জঠর-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের দুর্ভিক্ষ-কাহিনী অধিকতর শোকাবহ। এই পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে এদেশে অষ্টাদশবার দুর্ভিক্ষ-দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই মহানলে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ মহাপ্রাণী ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শুদ্ধ বিগত দশ বৎসরেই এক কোটি ৯০ লক্ষ ভারত-সন্তান হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া বিষম যন্ত্রণায় প্রাণ-বিসর্জন করিয়াছে। এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে 'দুর্ভিক্ষ-নিহত' হতভাগ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া মহামতি উইলিয়ম ডিগ্‌বি, সি. আই. ই. মহোদয় গভীর খেদ সহকারে বলিয়াছেন,

You have died You have died uselessly
'তোমরা মরিয়াছ। তোমরা অনর্থক মরিয়াছ!'

সাধারণের বিশ্বাস যুদ্ধে যেরূপ লোক-ক্ষয় হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে এই ধারণার ভ্রমাত্মকতা প্রতিপন্ন হইবে। ডিগ্‌বি মহাশয় দেখাইয়াছেন, বিগত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক শত সাত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বসমেত ৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে, ভারতে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ লোক অনশনে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে।

তৃণাভাবে গো-মেষ মহিষাদি যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ফলত ভারতের দুর্ভিক্ষ সর্বলোকের ভয়প্রদ মহাসমর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 'ভারতীয় দুর্ভিক্ষের সহিত ইংরাজের বাণিজ্য সংগ্রামের

সম্বন্ধ কি? দেবতা বৃষ্টি না দিলে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রে পুড়িয়া যায়। দেবতা বিরূপ হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে।' যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহারা এ বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত নহেন। এ বিশাল ভারত-ভূমির সর্বত্র কখনও এককালে অনাবৃষ্টি হয় না—অন্তত বিগত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে এরূপ অভাবনীয় ঘটনা কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। ভারতের এক অংশে অনাবৃষ্টি হইলেও অন্য অংশে সুবৃষ্টির কখনও অভাব হয় না। সুবৃষ্টি হইলে ভারতের এক চতুর্থাংশ ভূমিতে এত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তাহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশসমূহের অধিবাসীদিগের অনশন-মৃত্যু অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। দেশের সর্বত্র রেলপথের বিস্তার হওয়ায় এক প্রদেশের অন্ন অল্প সময়েব মধ্যে অন্য প্রদেশে প্রেরণ করাও কষ্ট-সাধ্য নহে। রাজপুরুষেরা বলেন, দুর্ভিক্ষকালে অন্নবহনের সৌকর্যবিধানের উদ্দেশ্যেই বহু ব্যয় ও ক্ষতি-স্বীকার করিয়া এ দেশের সর্বত্র রেলপথ নির্মাণ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এতৎ সত্ত্বেও ভারতে দুর্ভিক্ষরাক্ষসের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আসল কথা এই যে, শস্যাভাব ভারতীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ নহে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক দেশ আছে, যেখানে জন-সংখ্যার অনুপাতে শস্যোৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমাণ অতি সামান্য। বিলাতেই কৃষি-যোগ্য ভূমির অভাব অত্যন্ত অধিক। তথায় যে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহাতে সমগ্র ইংলন্ডবাসীর ৯১ দিনের অধিক উদর-পূর্তি হওয়া অসম্ভব। তথাপি বৎসরের অবশিষ্ট ২৭৪ দিন ইংলন্ডবাসীকে অনশনে যাপন করিতে হয় না। জার্মানির অবস্থাও অনেকাংশে এইরূপ। তত্রত্য লোকদিগকে যদি স্বদেশোৎপন্ন শস্যের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরের মধ্যে ১০২ দিন তাহাদিগের অন্নাভাব ঘটে। হল্যান্ড মার্কিন প্রভৃতি দেশে সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি ঘটিয়া কৃষিকার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তথাপি সে সকল দেশে কখনও দুর্ভিক্ষ-পাত হইয়াছে, এরূপ কথা শুনা যায় না।

সুতরাং দেশে শস্যাভাব ঘটিলেই যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, এমন কথা বলা অসঙ্গত। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় বা দৈবের বিড়ম্বনায় অন্নকষ্টের সম্ভাবনা হইলে সভ্যজাতি মাত্রেই দূরদেশ হইতে শস্য আনয়ন করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন। আমাদিগের ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর প্রায় ১৬.৫ কোটি টাকার গোধূম-তণ্ডুলাদি সমুদ্র-পথে ঐ সকল দেশে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। ইউরোপীয় দেশসমূহের লোকেরা সহস্র-যোজন-দূরবর্তী দেশ হইতে শস্যসংগ্রহ পূর্বক সুখ ও স্বচ্ছন্দতা-সহকারে কালযাপন করে, আর ভারত-সন্তান গৃহপার্শ্বে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র থাকিতেও দলে দলে অনশনে প্রাণত্যাগ করে।

ভারতবাসীর ধন-বলের অভাবই এদেশে ঘনঘন দুর্ভিক্ষ-ঘটনার প্রধান কারণ। ভারতে অন্নাভাব অপেক্ষা অর্থাভাব সমধিক প্রবল। ইংরাজের বাণিজ্য-সংগ্রামে জর্জরিত হইয়া আমরা এরূপ কপর্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে, এক বৎসর দৈব দুর্বিপাকে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রে মরিয়া গেলে আমাদের আর আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। দেশের শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় কৃষিই এখন শতকরা ৮৫ জনের একমাত্র উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। অনাবৃষ্টি-

হেতু কৃষি নিষ্ফল হইলে লোকে এখন একেবারে সম্বল-শূন্য হইয়া পড়ে। অন্য স্থান হইতে শস্য-ক্রয় করিবার জন্য যেরূপ অর্থ-বলের প্রয়োজন, সেরূপ অর্থ-বল অনেকেরই নাই। দেশবাসীর নিকট যদি শস্য-ক্রয়োপযোগী অর্থ থাকিত, তাহা হইলে ঘোর দুর্ভিক্ষের বৎসরেও আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ গোধূম-তণ্ডুলাদি বিদেশে রপ্তানি হইত কেন? লোকের তণ্ডুল কিনিবার শক্তি থাকিলে দুর্ভিক্ষ-কালে কখনই রাজানুগ্রহজীবীর (পুওর হাউস বা সরকারি অন্নসত্রে ও রিলিফ আশ্রয়-গ্রহণকারীর) সংখ্যা এত অধিক হইত না। পূর্ব দেশে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু লোকের অর্থোপার্জনের বহু পথ উন্মুক্ত ছিল, অর্থসঙ্গতি অধিক ছিল। তখন কৃষকের সংখ্যা অল্প ও কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় কৃষিকার্যেও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। এই সকল কারণে, সেকালে দেশে দুর্ভিক্ষ-পাত হইলেও তাহার পরিণাম এখনকার মতো ভয়াবহ হইত না। ইদানীং ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-সংঘর্ষে বিপন্ন হওয়ায় লোকের ধনবল দিন দিন যতই কমিয়া আসিতেছে, ততই দেশে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে অর্থের দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইলেই অন্নের দুর্ভিক্ষও বিরল হইবে।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে আর্ল ক্রোমার মহোদয় গভর্নমেন্টের আদেশে ভারতবাসীর আয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, গড়ে ভারতবাসীর আয় প্রতি জনে বার্ষিক ২৭ টাকা মাত্র। সেই সময়ে পার্শি-প্রবর শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজি মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের বার্ষিক আয় গড়ে জনপ্রতি ২০ টাকার অধিক নহে। ইহার পর লর্ড ডাফরিনের আদেশক্রমে এদেশবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একবার অনুসন্ধান হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও সে অনুসন্ধানের বিবরণ ও ফল এদেশের কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন হইল, মি. ডিগ্‌বি মহোদয়ের চেষ্টায় উহার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল অংশে এদেশের লোকের দুরবস্থার যে শোচনীয় চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কোনও হৃদয়বান ব্যক্তিই অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, গত ১৯০১ সালের মার্চ মাসে লর্ড কার্জন বাহাদুর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত দশ বৎসরেব দুর্ভিক্ষাদিজনিত অসীম ক্ষতি সত্ত্বেও ইদানীং ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজার বার্ষিক আয় গড়ে জনপ্রতি অন্যূন ৩০ টাকা হইয়াছে। কিন্তু ডিগ্‌বি মহোদয় অশেষ শ্রমসহকারে তাঁহার মতের বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সরকারি গণনায় বহুল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। মি. ডিগ্‌বির গণনামতে এক্ষণে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত-সন্তানের বার্ষিক আয় গড়ে প্রতিজনে উর্ধ্ব সংখ্যায় ১৮·৫৬ মাত্র।

এই আয়ের অধিকাংশই কৃষিলব্ধ। ইহার প্রায় এক-সপ্তমাংশ ২৪৩ রাজকর প্রদানে ব্যয়িত হয়। আয়ের অনুপাতে ইংলন্ডবাসীকে প্রতি পাউন্ডে ১ শিলিং ৮ পেন্স বা ১২৫ টাকা ও ভারতবাসীকে (বার্ষিক আয় গড়ে ৩০ টাকা বলিয়া স্বীকার করিলে) দুই শিলিং চার পেন্স বা একটাকা পঁচাত্তর পয়সা করিয়া ট্যাক্স দিতে হয়। সে যাহা হউক, মি. ডিগ্‌বির হিসাবে এদেশের ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ সকলের বার্ষিক আয় (ট্যাক্স বাদে) গড়ে প্রতি জনে ১৫।১৬ টাকার অধিক নহে। সঞ্চিত অর্থের হিসাব করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে,

ভারতবাসীর সঞ্চিত ধনের পরিমাণ নগদ ও অলংকারাদিতে গড়ে জনপ্রতি ১৪ টাকা মাত্র।

ইহার সহিত একবার শিল্প-বাণিজ্য প্রধান পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসীবৃন্দের আয়ের তুলনা করুন—

দেশ	বার্ষিক আয় প্রতিজনে	দেশ	বার্ষিক আয় প্রতিজনে
রুশিয়া	১১ পাউন্ড	জার্মানি	২২ পাউন্ড
ইটালি	১২ "	কানাডা	২৬ "
অস্ট্রিয়া	১৫ "	ফ্রান্স	২৭ "
স্পেন	১৬ "	বেলজিয়াম	২৮ "
সুইজারল্যান্ড	১৯ "	যুক্তরাজ্য (মার্কিন)	৩৯ "
নরওয়ে	২০ "	অস্ট্রেলিয়া	৪০ "
হল্যান্ড	২২ "	স্কট্ল্যান্ড	৪৫ "

ইংলন্ডবাসীর বার্ষিক আয় ও সঞ্চিত ধনের পরিমাণ গড়ে জনপ্রতি যথাক্রমে ৪২ ও ৩০০ পাউন্ড! (আমাদের ১৫ টাকায় বিলাতি এক পাউন্ড হয়)।

উল্লিখিত আয়ের সহিত তুলনা করিলে লর্ড কার্জন বাহাদুরের নির্দিষ্ট ভারতবাসীর (বার্ষিক ত্রিশ টাকা) আয়ও অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পাশ্চাত্যদেশসমূহে জীবিকানির্বাহ ভারতের ন্যায় স্বল্প ব্যয়সাধ্য নহে, এ-কথা স্বীকার করি। তথাপি ভারতবাসীর বর্তমান আয় যে স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবিকানির্বাহের উপযোগী নহে, এ-কথাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডা. হন্টার সাহেব বারমিংহাম নগরে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে চারিকোটি লোক অর্ধাশনে জীবন-যাপন করে। সে সময় ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা বিংশতি কোটিরও ন্যূন ছিল। বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট বাহাদুর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সেটেলমেন্ট অফিসররূপে কার্য করিবার সময় দেশবাসীর অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক বলিয়াছিলেন :

> 'I do not hesitate to say that half our agricultural population never know from year's end to year's end what it is to have their hunger fully satisfied.'

অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সংবৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কিরূপ সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।

ব্রিটিশ ভারতে প্রায় বিংশতি কোটি লোক কৃষিকার্য করিয়া জীবন-ধারণ করে। স্যার চার্লস ইলিয়টের উক্তি অনুসারে এই বিংশ কোটির মধ্যে দশ কোটি লোক চিরকাল

অর্ধাশনে যাপন করে। ইলিয়ট মহোদয় যখন এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন এদেশে বিশ কোটি লোক কৃষিজীবী ছিল না সত্য; কিন্তু এলাহাবাদের অর্ধ-সরকারি সংবাদপত্র *পাইওনীয়ার* ১৮৯৩ সালে মে মাসে ভারতীয় দারিদ্র্যপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে দশ কোটি ভারত প্রজার অর্ধাশনের কথাই সপ্রমাণ হয়। উক্ত পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন—

> Nearly one hundred millions of people in British India are living in extreme poverty.

অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রায় দশ কোটি লোক দারিদ্র্যে কাল-যাপন করে।

যে সমাজ এইরূপ ঘোর নিপীড়িত, সে সমাজে আধি-ব্যাধির প্রকোপ সহজেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ব্রিটিশ ভারতেও নিত্য নব রোগের সঞ্চার হইতেছে। ভারতবাসীর শরীর ক্রমেই ব্যাধি-মন্দিরে পরিণত হইতেছে। প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর কারণ যে, অন্নকষ্ট ও দারিদ্র্য, এ কথা বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকে। যে সকল দেশের লোকের পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ-সংগ্রহে অর্থের অভাব হয় না, সে সকল দেশে প্লেগের প্রকোপ দেখিতে পাই না। পূর্বে ইউরোপে ঘন ঘন প্লেগের আবির্ভাব হইত ও তাহাতে সহস্র নরনারী প্রাণত্যাগ করিত। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবার পর হইতে আর তথায় প্লেগের বিক্রম প্রকাশ পায় না। ফল কথা, সমাজের ধনবল যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, মহামারীর প্রকোপও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে।

দারিদ্র্যবশত জ্বরের প্রভাবও ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সবকারি মেডিকেল রিপোর্টে প্রকাশ যে—

> Fever is a euphemism for insufficient food, scanty clothing and unfit dwelling.

পুষ্টিকর খাদ্য ও পর্যাপ্ত বস্ত্রের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানই জ্বর রোগের প্রধান কারণ। প্রতি বৎসর ভারতের অন্যূন পাঁচ কোটি লোক জ্বরের যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই পাঁচ কোটির মধ্যে ৫০ লক্ষের অধিক লোক ইহধাম পরিত্যাগ করে। দশ বৎসর পূর্বে জ্বর রোগে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা প্রায় ১৫ লক্ষ কম ছিল। ভারতবাসীর অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই দুর্ঘটনা হইতেও তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

অর্থাভাব, অন্ন-কষ্ট ও আধি-ব্যাধির পরিমাপ-বৃদ্ধির সহিত ভারতবাসীর আয়ুঃক্ষয়ও ঘটিতেছে। ইংলন্ডবাসীর জীবনকালের পরিমাণ গড়ে ৪০ বৎসর বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ভারতবাসীর আয়ুষ্কাল যে ইদানীং গড়ে ২৩ বৎসরের অধিক নহে, মহামতি ডিগ্‌বি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাকালে সরকারি রিপোর্ট অবলম্বনে দেখাইয়াছেন যে, বিগত বিংশতি বৎসর

হইতে ক্রমাগত ভারতবাসীর মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রদেশে গড়ে হাজার করা ২৩ জন মরিয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রি. প্রতি সহস্র জনের মধ্যে ২৬ জন, ১৮৮৯ খ্রি. ২৮ জন, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ৩৫ জন, ও ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৩৬ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজাগণের দিন দিন কিরূপ বংশ-ক্ষয় হইতেছে, তাহা নিম্নের তালিকায় নেত্রপাত করিলে উপলব্ধ হইবে—

১৮৭০	সাল	—	১৮,৫৫,৩৭,৮৫৯	লোকসংখ্যা
১৮৮১	”	—	১৯,৮৭,৯০,৮৫৩	”
১৮৯১	”	—	২২,১১,৭২,৯৫২	”
১৯০১	”	—	২৩,১০,৮৫,১৩১	”

ইটালি ও জার্মানিতে যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৬ জন করিয়া লোক বৃদ্ধি পায়। তথাপি ঐ সকল দেশে ভারতের ন্যায় সকলে বিবাহ করিয়া দাম্পত্য-জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয় না; রমণীগণও গর্ভধারণ ও সন্তান-পালনের ক্লেশ স্বীকারে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভারত গভর্নমেন্ট ১৮৮৪ খ্রি. অনুমান করিয়াছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে গড়ে প্রতি সহস্রে ১০ হইতে ১৫ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহহীন দাম্পত্যজীবন-প্রিয় শান্তিপূর্ণ উর্বর দেশে শতকরা বৎসরে ১·৫০ হিসাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া কিছুই অধিক নহে। এতদনুসারে ১৯০১ সালের লোক-গণনায় ব্রিটিশ ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৮ কোটি ২১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৮৬ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহা হয় নাই, তদপেক্ষা ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৫৪ জন কম হইয়াছে। ১৮৮১ সালের লোক গণনার সময় ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা ৯২·২৫ লক্ষ। এই জনসংখ্যা বাদ দিলে ১৮৯১ ও ১৯০১ সালেব পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবে।

সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বিগত দশ বৎসরে, শতকরা গড়ে ২·৫০ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী দশ বৎসরে (১৮৮১-১৮৯১ খ্রি.) কেবল ব্রিটিশ ভারতেই জনসংখ্যা শতকরা ১১·২৫ হারে বাড়িয়াছিল : দেশীয় রাজ্যসমূহের বৃদ্ধির হার এতদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। বঙ্গদেশের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হারও বিগত ত্রিশ বৎসরে অনেক কমিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ, প্রথম দশ বৎসরে শতকরা ১১·৫০ জন, পরবর্তী দশ বৎসরে ৭·২৫ জন ছিল। শেষ দশ বৎসরে উহা পাঁচ জনে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গদেশে ত্রিশ বৎসরে বৃদ্ধির হার অর্ধেক কমিয়াছে!

কেবল যে জনসংখ্যাই দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, তাহা নহে। গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও ভারতবর্ষে ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা চল্লিশ লক্ষ মাত্র. অথচ তত্রত্য পশুর সংখ্যা ১১ কোটি ৩৫·৫০ লক্ষেরও অধিক। অনুপাতে ভারতবর্ষের

ন্যায় কৃষি-প্রধান ও জনবহুল দেশে ২৬২৮০ কোটি গৃহপালিত পশু থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে এক্ষণে গো-মেষ-মহিষ-অশ্ব-অশ্বতর-ছাগাদিতে পূর্ণ দশকোটি পশুর অধিক বিদ্যমান নাই। গৃহপালিত ও কৃষিকার্যোপযোগী পশুর বংশ যে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, বিগত দশ বৎসরের সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

অর্থাভাবে যেমন কৃষিকার্যোপযোগী পশুকুলের হ্রাস হইতেছে, সেইরূপ কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ও উৎকর্ষ কমিয়া যাইতেছে। ব্রিটিশ ভারতে গোধূম, ইক্ষু, কার্পাস, পাট, নীল ও সর্ষপাদির আবাদ বিগত দশ বৎসর হইতে কমিতেছে। ১৮৯১ সাল হইতে ইক্ষুর অবনতি ঘটিয়াছে। ১৮৯৩ হইতে কার্পাস ও সর্ষপাদির চাষ কমিয়া গিয়াছে। আজকাল ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর যে তুলা বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ দেশীয় করদ রাজ্যসমূহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৯০/৯১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে সর্বশুদ্ধ ৫৮৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৯০ হাজার বিঘা ভূমি কর্ষিত হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ৫৯৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬১ হাজার বিঘা হয়। ইহার মধ্যে ব্রহ্মদেশ, সিন্ধু, আসাম, কুর্গ ও আজমীর প্রভৃতি দেশে এক কোটি ষাট লক্ষ কুড়ি হাজার বিঘা নূতন ভূমিতে চাষ হইয়াছে। এই নূতন আবাদি জমির পরিমাণ বাদ দিলে দৃষ্ট হইবে যে, ব্রিটিশ ভারতীয় পুরাতন প্রদেশগুলিতে বিগত দশ বৎসরে ৯৭,৮০,০০০ বিঘা জমি কমিয়াছে অর্থাৎ কৃষিকার্যের অযোগ্য হইয়াছে, মাননীয় অধ্যাপক গোখলে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

মি. ডিগ্‌বি বলেন, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের পর ব্রিটিশ ভারতে চার কোটি আশি লক্ষ বিঘা জমি বাড়িয়াছে; তথাপি ভারতের কৃষিলব্ধ আয় বিংশতি বৎসর পূর্বের আয়ের অপেক্ষা ৬৪,২১,৬৫,৪৩৮ টাকা কম হইয়াছে। লোকের যদি পূর্ববৎ অর্থবল থাকিত, প্রতিবৎসর সার দিয়া ভূমির উৎকর্ষ রক্ষা করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে কৃষিযোগ্য ভূমির এরূপ অপকর্ষ ও বিলোপ ঘটিত না।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মি. স্যামুয়েল স্মিথ বিলাতের পার্লামেন্ট মহাসভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন—'ভারতীয় আয়করের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, সেখানে প্রতি সাত শত জনের মধ্যে একজনমাত্র লোকের আয় বার্ষিক পাঁচ শত টাকা।' স্মিথ মহোদয় যদি জানিতেন যে, এদেশের এসেসার মহাশয়েরা সরকারের আয় বাড়াইয়া আপনাদিগের পদোন্নতি ঘটাইবার আশায় কত স্বল্পবিত্ত লোকের নিকট হইতেও অন্যায়ভাবে আয়কর আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বলিতেন যে, ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে হাজার করা একজনের আয় পাঁচ শত টাকা! এদেশে ধনীর সংখ্যা কিরূপ বিরল, ইহা হইতেই তাহা সকলের বোধগম্য হইবে।

ভারতবাসীর দারিদ্র্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য মি. জে. সেমুর (Mr. J. Seymour Keay) মহোদয়ের সংগৃহীত আর একটি তালিকার প্রতি মনোযোগ করিতে হয়। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মি. সেমুর দেখাইয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ধনবানের সংখ্যা এইরূপ—

সংখ্যা	পদ	বার্ষিক আয়
১০,০০০	রাজা, মহারাজা, জমিদার আদি	৫০,০০০ টাকা
৭১,০০০	ব্যবসায়ী মহাজন আদি	১০,০০০ টাকা
৭,৫০,০০০	দোকানদার আদি	১,০০০ টাকা

(এই ৮,৩৫,০০০ জনের মোট আয় ২০০ কোটি টাকা)

এই সকল ধনশালী ব্যক্তির অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। যে সকল রাজা, জমিদার ও মহাজন ব্রিটিশ ভারতে বাস করেন, তাঁহাদিগের আয় ধরিয়া ডিগ্‌বি মহোদয় দেখাইয়াছেন, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবাসীর আয় প্রতিজনে গড়ে বাৎসরিক ১৮ ৫৬ মাত্র! এক্ষণে বড়লোকদিগের (অর্থাৎ যাঁহাদিগের আয় বাৎসরিক সহস্র মুদ্রার অধিক) আয় বাদ দিলে ভারতীয় সাধারণ প্রজার আয় গড়ে ১৮ ৫৬ টাকার অপেক্ষা অনেক কম হইবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে ট্যাক্সের কথাও একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভারতবাসীকে গড়ে প্রতিজনে বার্ষিক দুই টাকা তেতাল্লিশ পয়সা কর দিতে হয়। ইহা অবশ্য সরকারি পক্ষের কথা। কিন্তু এই দুই টাকা তেতাল্লিশ পয়সায় 'ছোট খাটো' অপ্রত্যক্ষ করের সমাবেশ করা হয় নাই। বিগত নভেম্বর মাসে বিলাতের এক স্থানে বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত দেখাইয়াছেন যে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অধিবাসীকে গড়ে জনপ্রতি বার্ষিক সর্বসমেত সাড়ে তিন টাকা কর দিতে হয়। ইংলন্ডে এইরূপ আয়ে এক টাকা পঁচাত্তর পয়সার অধিক কর গৃহীত হয় না। সামান্য আয়ে রাজাকে এইরূপ উচ্চ হারে কর দিতে হইলে সকল দেশেই প্রজার অন্ন-কষ্ট স্বভাবত বৃদ্ধি হইতে পারে।

আসামের ভূতপূর্ব কমিশনার কটন সাহেব তাঁহার *নব-ভারত* (*New India*) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

> The resources of India will vie with those of America itself. The dimensions of Indian trade are already enormous and yet *no country is more poor than this.*

ভারতের নৈসর্গিক সম্পদ (খনি, অরণ্য ও কৃষিজাত ধন) আমেরিকার অপেক্ষাও অধিক। এখানকার বাণিজ্যও বহু বিস্তৃত; তথাপি ভারতের অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্র দেশ পৃথিবীতে আর নাই।

কেন এরূপ হইয়াছে, ভারতভূমি রত্ন-গর্ভা হইলেও কেন তাহার সন্তানগণ ঘোর দারিদ্র্য-ভোগ করিতেছে, তাহার কারণ নির্দেশ-স্থলে মি. ডিগ্‌বি বলিয়াছেন—

> Because among other things we have destroyed native industries, and, besides, have taken from India since 1834-35 (ac-

cording to a calculation made by that sane and moderate Journal, the *Economist* two years ago. (in 1898)

more than ten thousand millions of Rupees.

India, on the other hand, has entirely lost her much more than ten thousand millions : this, with interest, and if circulated in the ordinary way among her people, at 5 p.c. interest value only would, by this time, have been of the value at least of *fifty thousand millions of Rupees.*

ভাবার্থ—ভারতবাসীর দারিদ্র্যের অন্যান্য কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম, ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ও দ্বিতীয়, ভারতের ধন-শোষণ। আমরা (ইংরাজেরা) ভারতবর্ষীয় শিল্পের বিনাশ-সাধন করিয়াছি ও ১৮৩৪।৩৫ সাল হইতে ১৮৯৮ খ্রি. পর্যন্ত (*ইকনমিস্ট* পত্র-সম্পাদকের গণনানুসারে) এক সহস্র কোটি মুদ্রা ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিয়াছি। এই সহস্র কোটি মুদ্রা যদি ভারতবর্ষেই থাকিত ও শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদে ভারতবাসী কৃষক ও শিল্পীদিগকে ধার দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে এতদিনে উহার পরিমাণ সুদ সহ ন্যূনকল্পে পঞ্চ সহস্র কোটি মুদ্রা হইত।

এতদ্ভিন্ন এদেশে বিলাতি মহাজনদিগের বহু শত কোটি টাকা খাটিতেছে। ইহার সুদ ও লভ্যাংশ-স্বরূপে এত দিনে কত টাকা বিদেশে গিয়াছে, তাহা নির্ধারণ করা সহজ-সাধ্য নহে। পলাশির যুদ্ধের পর হইতে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে নগদ প্রায় এক সহস্র কোটি মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে! আজকাল এদেশ হইতে যে টাকা বিদেশে যাইতেছে, তাহার পরিমাণ শ্রবণ করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। এই বিষয়ের তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, রাজস্বে ও বিলাতি মহাজনের লাভে এদেশ হইতে বৎসরে পঞ্চশত কোটি মুদ্রা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর এরূপ অজস্র ধারায় অর্থহানি ঘটিতে থাকে, সে দেশে দশ কোটি লোক অর্ধাশনে দিন-যাপন করিতে বাধ্য হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। দুর্ভিক্ষই বা সেই দেশবাসীর নিত্যসহচর না হইবে, কেন। অধ্যাপক সিলি তাঁহার *Expansion of England* নামক গ্রন্থে ভারতীয় দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থাদর্শনে লিখিয়াছেন—

Their susceptibilities dulled and their very wishes crushed out by want.

অর্থাৎ তাহাদিগের বোধ-শক্তি অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বাসনা পর্যন্ত অভাবের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে! শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ জাতীয় মহাসমিতির বিগত ঊনবিংশ অধিবেশন-কালে বলিয়াছেন, মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতন-কালে এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক অন্তর্বিগ্রহ ও অরাজকতার জন্য প্রাণ হারাইত, এখন লক্ষ লক্ষ লোক

দুর্ভিক্ষজনিত অনশন-ক্লেশে জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলত জনসাধারণের ভাগ্যে সেকাল ও একালে বিশেষ কিছুই প্রভেদ ঘটে নাই। তাঁহার উক্তি এই—

> We cannot forget that there is another side of the balance sheet. After all it makes but little difference whether millions of lives are lost on account of war and anarchy or whether the same result is brought about by famine and starvation.

☐ *দেশের কথা* ১৯০৪

বাংলার কথা

চিত্তরঞ্জন দাশ

আজ বাঙালির মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য। আজ এই মিলনমন্দিরে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকার বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহংকার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাংলার যে মূর্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনী মূর্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে! এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ও ভালোবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জ্বলন্ত প্রদীপের মতো আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে। আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

সেই ভরসায় আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। যে কথাগুলো অনেক দিন ধরিয়া আমার প্রাণে জাগিয়াছে, সে-সব কথা আমার জীবনের সকল রকমের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া জীবনের ধ্যান-ধারণার বিষয় করিয়াছি, সে সব কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোনো ভয় হয় না, লজ্জা হয় না। হয়তো আমাদের শাসনকর্তাদের কাছে আমার অনেক কথা অপ্রিয় লাগিবে, হয়তো আমার অনেক কথার সঙ্গে আপনাদের অনেকের মনের মিল হইবে না। কিন্তু 'সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্' এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, এবং যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে তাহা করিও না। সে তো কাপুরুষের কথা, দেশ-ভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারি বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্য কোনো অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক, কি অপ্রিয়ই হউক, অম্লানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে

আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

প্রথমেই হয়তো অনেকেরই মনে হইবে যে, এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাংলার কথা আবশ্যক কি? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির লক্ষণ। সমগ্র জীবনকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি, এবং এই ধার-করা জিনিস ভালো করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে আমরা রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাংলা দেশের, সমগ্র বাঙালি জাতির একটা সর্বাঙ্গীণ সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, এইসব মনগড়া জীবন-খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীর-বেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন-খণ্ড ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আবদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙালি জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক্ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় রাজনীতি কাহাকে বলে। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি। আমাদের সাধনায় ইহার কোনো বিশিষ্ট নাম নাই, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহার নামকরণ করার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। ইউরোপীয় সাধনায় যাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, তাহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজায় প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিত্য সার্বভৌমিক সত্য নিহিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করা। ঐ মতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনার বিষয় কোনো জাতির বা দেশের রাজা প্রজার কি রকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যটা সদ্ভাবে ও সৎপথে চালনা করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কতটা রাজার হাতে থাকিবে, কতটা প্রজার হাতে থাকিবে, তাহাই বিচার ও নির্ণয় করা।

কিন্তু ঐ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙালিকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙালি যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙালি বলিতে একটা অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙালির যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙালিকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাংলাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যাক বাঙালির কতকগুলো দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক এবং সেই ভাবে ধরিয়া লওয়া যাক যে, বাঙালি অমানুষ। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্যই আমাদের দেশে রাজা প্রজার যে সম্বন্ধ

হওয়া উচিত, তাহা বিচার করিতে গেলে, আমাদের যে এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার করিতে হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাদের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভালো করিয়া লইতে হইলে আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, কেন আমাদের পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক শহরে আসিয়া বাস করে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অ-স্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোনো কারণে? সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষযোগ্য জমি আছে, সব ভালো করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ সচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এই সব কথা ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কিরূপ ছিল, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা পূর্বে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া আমরা গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতাম, এ সব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া আমরা শিক্ষা বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইতাম এবং এখন বর্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিত, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথারই বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ কথাকেও তাচ্ছিল্য করা যায় না। কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে না পারিলে আমাদের বর্তমান অবস্থায় কি সম্বন্ধ থাকা উচিত, কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে, কতটা আমাদের হাতে থাকা উচিত, এই প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করিয়া হইবে?

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্যন্ত আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্য কর্তব্য। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিব। সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোনো মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি বিপদ যে

আমরা ক্রমশই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে, অনেকটা ইংরাজি ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা Politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলন্ডে গিয়া পৌঁছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। এ দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না তাহা তো একবারও ভাবি না। Burke-বুলি যাহা স্কুলে কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstone-এর কথামৃত পান করি আর মনে করি ইহাই রাজনৈতিক চরম। Seely-র *Expansion of England* নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwick-এর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসি স্কুল এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে কোরানে যত ধারালো বাক্য আছে, একেবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তা কেমন করিযা আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বির্তকের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারকরা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবত সহজ সরল, তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক, তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাংলার কথা—বাঙালির কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্বতোভাব তুচ্ছ করি। আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা অনেকে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে? আমরা চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না? আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহংকার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধাবণের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? কেন নাই? আমরা যে ভিতরে ইংরাজি ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা যে ইংরাজি পড়ি ও ইংরাজিতে ভাবি, এবং ইংরাজি তর্জমা করিয়া বাংলা বলি ও লিখি, তাহারা যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই ভালো। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কার্যে তাহাদের ডাকি? Government-এর কাছে আবেদন করিতে হইলে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? আমাদের কোন্ কমিটিতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্যশ্রেণীভুক্ত? কোন্ কাজ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের মত লইয়া করি? যদি না করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদেব ত্রুটি স্বীকার করিব না? কেন সত্য কথা বলিব না? মিথ্যার উপব কোনো সত্য বা সত্ত্ব

প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলাব সব দিক্ দিয়াই দেখিতে হইবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আজ এই মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি।

কিন্তু আমি যে বিপদের কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য নিরাশ হইবার কোনোই কারণ নাই। আমাদের এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহার যথাযথ কারণ আছে। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন, দুর্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে যে অপূর্ব প্রেমধর্মবলে মহাপ্রভু সমস্ত বাংলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক-কাটা ও মালা ঠক্ঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাংলার হিন্দুর সমগ্র ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী। বাঙালি জীবনের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্মে, কি জ্ঞানে বাংলার হিন্দু তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দি খাঁর পর হইতেই বাংলার মুসলমানও ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্বলতানিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরাজি সভ্যতার সেই প্রখর আলোকে সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহবশত আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম কর্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজদের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে 'বিজ্ঞানের তূর্যধ্বনি' করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্তুতপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে তো আমাদের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা তো

আমরা একবারও মনে করি নাই। তারপর দিন গেল। আমাদের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল। তারপর বঙ্কিম সর্বপ্রথমে বাংলার মূর্তি গড়িলেন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গ-জননীকে দর্শন করিলেন। সেই 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্' তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।' কিন্তু আমরা তো তখন সে মূর্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না! তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।' তারপর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন, আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা লইয়া আলোচনা করা আমি অনাবশ্যক মনে করি। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অল্প ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালি জাতির, অন্ততপক্ষে শিক্ষিত বাঙালির, আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস—একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তারপর আরও দিন গেল। ১৯০৩ খ্রি. হইতে স্বদেশি আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙালি আপনাকে চিনতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

বাংলার মাটি বাংলার জল
সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান্

বাংলার জল বাংলার মাটি আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী গুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশি আন্দোলন, ইহা একটা বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার! আমরা নাকি সবদিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্থ করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; কিন্তু অহংকার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যাঁরা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিস সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বলেন। তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিস লইয়া আঁক কষিতে বসেন। কিন্তু, প্রাণের যে ব্যথা, সে তো অঙ্কশাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাটি হইয়া যায়। স্বদেশি আন্দোলন একটা ঝড়ের মতো বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে, তখন তো হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে তো হিসাব করিয়া জন্মায় না। না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই সে প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া, বাঁচিয়াছি। বাংলার যে জীবন্ত প্রাণ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাংলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাংলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণব ভক্তি,

সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধনসংগীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল; বুঝিলাম, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম কি। বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি সেই—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে—

সেই মাকে দেখিলাম চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।' বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়? বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম বাঙালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিস্টান হউক, বাঙালি বাঙালি। বাঙালির একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালির একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙালিকে প্রকৃত বাঙালি হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালি সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙালি একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাংলা সেই রূপের মূর্তি। আমার বাংলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সেই রূপের বালাই লইয়া মরি।

□ *নারায়ণ*, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

নিমন্ত্রণ-সভা

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধনীই হই বা দরিদ্রই হই, আমাদের নিমন্ত্রণশালার সজ্জায়োজন বড় অধিক নহে। কদলীপত্র ও মৃৎপাত্র হইলেই আমাদের বৃহৎ যজ্ঞ অনায়াসে সমাধা হয়, এবং ইহার উপরে যদি একখানি কুশাসন জুটে, তাহা হইলে যজ্ঞশালাসজ্জাব কোনো অঙ্গই অসম্পূর্ণ থাকে না। তাহার পর অভ্যাগত নিমন্ত্রিতগণকে সমাদরপূর্বক আহ্বান করিয়া আনিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে আসন পরিগ্রহ করিতে বলা যায়, এবং গৃহকর্তা প্রসন্ন স্মিতমুখে পাতে পাতে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন শুরু করিয়া দেন। ধনীর ভবনে দুই ভাগ ব্যঞ্জন অধিক হয়, এবং হয়তো দুই দশ জন লোকও বেশি হইতে পারে; তদ্ভিন্ন আসনে বাসনে পরিবেশনে বা ভোজনশালার অন্যান্য আয়োজনে ধনী দরিদ্রের কোনোরূপ পার্থক্য চক্ষে পড়ে না। আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপার যেরূপ বিপুল, তাহাতে সজ্জাড়ম্বরের কিছুমাত্র বাহুল্য থাকিলে ধনীগণেরই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া আসিত, দরিদ্রজনের দুর্দশার তো কথাই ছিল না।

কারণ, ইংরাজের মতো দশ কুড়িটি অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পরম বন্ধু লইয়া আমাদের কারবার নহে; আমাদের ক্রিয়াকর্মে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিকটস্থ দুই দশ পল্লী, পাঁচ সাত গ্রাম, দূরতম আত্মীয়ের দূরসম্পর্কীয় বৈবাহিককুল এবং বন্ধুর বন্ধুজনকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে, এবং সকলের প্রতি নির্বিশেষে যথোচিত আতিথ্য প্রয়োগপূর্বক গৃহস্থকে আত্মরক্ষা করিতে হয়। যেখানে বিশ পঁচিশ জন মাত্র বন্ধুসমাগম, সেখানে মঞ্চসজ্জা ও নানান খুঁটিনাটি অলংকরণের প্রতি দৃষ্টি বাখা সহজ, কিন্তু কথায় কথায় যাহাদের শতাধিক লোক জমিয়া যায় এবং দফায় দফায় যাহাদেব প্রাঙ্গণ নিকাইয়া আসন বিছাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে এরূপ খুঁটিনাটি পরিপাটি রক্ষার বাবস্থা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং বাহিবের এসকল আড়ম্বর খর্ব করিয়া অন্য উপায়ে তাহাদিগকে লোকেব পরিতোষ সাধনে চেষ্টা পাইতে হয়। হৃদ্যতা ও আত্মীয়তাই তাহার একমাত্র প্রশস্ত পথ।

সেই জন্য আমাদের নিমন্ত্রণে গৃহকর্তার স্থান ঠিক পাশ্চাত্য গৃহকর্তার অনুরূপ নহে। সে দেশে নিমন্ত্রণ-মজলিসে গৃহকর্তা একরূপ সভাপতিস্থানীয় বলিলেই হয়—ভোজনমঞ্চের শীর্ষস্থানে বসিয়া তিনি সকলকে যথোপযুক্তরূপে মর্যাদা বণ্টন করিয়া দেন এবং অতিথিরা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা। গৃহকর্তা ধনে মানে কুলে শীলে যত বড় লোকই হউন না কেন, দীনতম অতিথির নিকটেও তিনি সশঙ্কিত। এবং সকলকে পরিতোষপূর্বক আহার করাইয়া, সকলের

সর্বপ্রকার ফরমাস জোগাইয়া, তবে তিনি দুই এক গ্রাস অন্ন মুখে গুঁজিবার অবসর পান। অতিথির এখানে সর্বপ্রকার জুলুম করিবার অধিকার আছে এবং প্রতাপও বড় অল্প নহে। আহারে যোগদান করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া অতিথি গৃহস্থকে পলকের মধ্যে অপদস্থ করিতে পারেন, তখন হাতে পায়ে ধরিয়া গৃহস্থকে তাঁহার ক্রোধশান্তি করিতে হয়। কোনো কারণে কেহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না আসিলে গৃহস্বামী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েন এবং মর্মে মরিয়া থাকেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যেখানে নিমন্ত্রণ পাইয়া লোকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ পায় না, আমাদের দেশে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহস্বামীই যেন ধন্য হয়েন।

এইরূপে আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে গৃহস্থের বড় একটি মনোহর বিনয় প্রকাশ পায়। এবং তাহাতেই তিনি সর্বজনের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করেন। আমাদের অভ্যাগতগণের ক্ষমতা ও অধিকার এক দিকে যেরূপ অপরিসীম, সেইরূপ অন্য দিকেও বলা যায় যে, নিতান্তই পরের মতো খাড়া না থাকিয়া তাঁহারা গৃহস্থকে সর্বপ্রকার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তাও করিয়া থাকেন। গৃহস্থও যেন তাঁদেরই মধ্যে একজন, মধ্যে কোনোরূপ দুরধিগম্য ব্যবধান নাই। তাঁহার কর্মটি যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং কোনো বিষয়ে কোনোরূপ ত্রুটি থাকিয়া না যায়, তাহা সকলেরই অবশ্যকর্তব্য। এবং সেই জন্য নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে যিনি যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও যাঁহার যেরূপ শোভা পায়, তদনুসারে কেহ কটি বাঁধিয়া পরিবেশনে লাগেন, কেহ সারি সারি আসন বিছাইয়া যান, কেহ আহারান্তে তাম্বুল বিতরণ করেন, কেহ কাহাকেও তামাক সাজিয়া রাখিতে বলেন, এবং যাঁহারা পংক্তিতে বসিয়াছেন, তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্তী জনের পাতে লুচি অথবা সন্দেশের অভাব দেখিলে তাহা পূরণ করিবার জন্য যথোচিত ডাকহাঁক ও হুকুমহাকাম পরিচালনা দ্বারা আসর সরগরম করিয়া তুলেন; সকলেই যেন পরস্পরের আতিথ্যবিষয়ে সর্বদাই উন্মুখ এবং সকলেরই যেন নিজের ঘরবাড়ি।

এই হৃদ্যতা ও পরস্পরাত্মীয় ভাবেই আমাদের এত বড় বড় নিমন্ত্রণসভাগুলি জমাট হয়। ইহার মধ্যে বড় একটি পরিতোষ ও সদ্ভাব নিহিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য ভোজনশালার সর্বাঙ্গীণ পারিপাট্য আমাদের নাই বটে, এবং কোলাহল কলরবটাও আমাদের কিঞ্চিদধিক—এমন কি, বিদেশির নিকট তাহা কতকটা বর্বরতারও পরিচায়ক ঠেকিতে পারে—কিন্তু সর্বজনের আন্তরিক প্রীতিগুণে ইহার একটি বড় শুভ প্রভাব অনুভব হয়। পাশ্চাত্য নিমন্ত্রণে যে পরিমাণ আমোদমাত্রোপভোগ, ইহাতে আমোদ ততখানি আছে কি না সন্দেহ; কারণ, আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপার নিতান্ত আমোদ নহে, তাহা কাজ, এবং কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার উপরেই তাহার আনন্দ। এই কারণে তাহার আনন্দও ঢের বেশি ব্যাপক এবং উচ্চ স্তর হইতে নিম্ন ভূমি অবধি তাহা প্রবাহিত। পাশ্চাত্য নিমন্ত্রণগুলি ইহার তুলনায় অত্যন্ত সংকীর্ণ। একজন ধনী ব্যক্তি সেখানে অসম্ভব ব্যয়ে দেশদেশান্তরের দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ ফল বা উপাদেয় মদিরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দুই দশ জন ধনী বন্ধুর রসনাতৃপ্তি করিয়া সন্তোষ অথবা গর্ব অনুভব করেন মাত্র। আমাদের নিমন্ত্রণের মতো সর্বজনের পরিতোষ সাধন তাহার লক্ষ্যই নহে।

অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, ঘরের কাছেই দুএকটি ছোটোখাটো উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। সকলেই জানেন, আমাদের নিমন্ত্রণাদিতে প্রভুর আহারের পর ভৃত্যদেরও আহারাদির যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আমি যেখানে নিমন্ত্রণে যাই, সেখানে আমার পাল্‌কিবেহারা বা গাড়োয়ানের খোরাকির জন্য কখনই ভাবিতে হয় না। কারণ, তাহারা ক্ষুধিত থাকিলে গৃহের আতিথ্য ক্ষুণ্ণ হয়। বরঞ্চ অভ্যাগত জনের দাসবর্গ নিমন্ত্রণভবনে যেরূপ আদর যত্ন ও আতিথ্য লাভ করে, তাহা আমাদের আজকালকার বিবেচনায় কিছু অতিরিক্ত। তাহাদেরও যেন গৃহস্থের উপরে দাবি আছে, সেখানে তাহারা উপদ্রব করিতে পারে। এই গেল আমাদের দেশি ব্যবস্থা। ইহার অনতিদূরেই চৌরঙ্গীর ময়দানের সম্মুখে ইংরাজের নিমন্ত্রণভবনের দৃশ্য দেখা যায়। রুদ্ধ সার্সির মধ্যে তাড়িতালোকে যতক্ষণ নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রভুর রসনাতৃপ্তি করিতেছে এবং আমোদপ্রবাহ ডিশের উপর ডিশ ছাপাইয়া পড়িতেছে, বেচারা গাড়োয়ান ততক্ষণ দুই সহিস সহ নিরাশহৃদয়ে শীতরজনীর হিম ভোগ করে মাত্র, এবং পার্টিশেষে প্রভুকে লইয়া যথাসময়ে জুড়ি হাঁকাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। প্রভুর সুখদুঃখ বেদনা আনন্দ উৎসব সমারোহের সহিত, কেবল মাত্র সজ্জার হিসাবে ভিন্ন, ভৃত্যের সেখানে কোনো সম্বন্ধ নাই। চাপ্‌কান আঁটিয়া ও তক্‌মা পরিয়াই তাহাদের যাহা কিছু সুখ—হৃদ্যতার গণ্ডির মধ্যে তাহারা স্থান পায় না।

এই কারণে ইংরাজের নিমন্ত্রণকলা আমাদের নিকট নিতান্ত নীরস দস্তুররক্ষা বলিয়া বোধ হয়। তাহা বন্ধ্য আমোদ মাত্র, সহৃদয় শুভ কর্ম নহে। আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে গৃহস্থের কত প্রযত্ন ও উদ্যম, কত উদ্বেগ ও পরিশ্রম, কত সংযম ও হৃদ্যতা। বাহিরের জাঁকজমকে ইহার সফলতা নহে। প্রত্যেক ছোটোখাটো অনুষ্ঠানে প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে গৃহস্থের অন্তরের যেন একটি ছাপ পড়া চাহি—নহিলে তাহার মর্মস্থলের বেদনাটুকু ব্যক্ত হয় না, এবং সমুদয় ব্যর্থ হইয়া যায়। তক্‌তকে নিকানো প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র কুশাসন এবং সম্মুখে এক একখানি শ্যামল কদলীপত্র ও নূতন মৃৎপাত্রের সারি; গৃহকর্তা পাড়া-প্রতিবেশী পাঁচজন মুরুব্বি ও বন্ধুজনের সহিত মিলিয়া পরিবেশন করিতেছেন, এবং সমবেত অভ্যাগতেরা পরিতোষব্যঞ্জক বিবিধ ধ্বনি সহকারে গ্রাসের পর গ্রাসে ভোজ্যাবলীর যথোচিত মর্যাদারক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্তঃপুরে রন্ধনশালা; প্রাঙ্গণের রোয়াকের উপরে রন্ধনশালার কপাটের ফাঁকের মধ্য হইতে অন্তঃপুরিকাজনের কুতূহলী কুবলয়দৃষ্টি সযত্নপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ও নানাবিধ মিষ্টান্নাদিতে একটি মনোহারিণী প্রীতি সঞ্চারিত করিয়া দেয়, এবং পরিতৃপ্তচিত্ত অতিথি জনের প্রশংসাকুশল পরিতোষবাক্যে তাঁহাদের সর্বান্তঃকরণ ভরিয়া উঠে ও শ্রম সার্থক হয়। এই সুমধুর হৃদ্যতা ও নিরতিশয় পরিতোষ, এক দিকে আন্তরিক প্রীতিপ্রযত্ন ও অন্য দিকে সর্বাঙ্গীণ শুভকামনা, গৃহস্থের সংযত নিষ্ঠা ও নিমন্ত্রিত জনের অক্ষুণ্ণ সদ্ভাব, ইহাতেই নিমন্ত্রণ-সভার মনোহারিতা। এখানে পাত পাতিয়া বসিয়া খাইতেও সুখ এবং দৃঢ়রূপে কটি বাঁধিয়া পরিবেশন করিতেও আনন্দ।

কারণ, এই নিমন্ত্রণব্যাপারে কোনোরূপ বিজাতীয় ভাড়াটিয়া ভাব নাই। ইহার কুটনা কোটা হইতে শুরু করিয়া হাঁড়ি নামানো এবং আসন বিছানো হইতে পরিবেশন পর্যন্ত,

এমন কি, আহারান্তে তাম্বূলসেবনবিধি অবধি সকল কর্মে সকল অনুষ্ঠানে অন্তঃপুরের একটি শ্রীহস্ত ও শুভ দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। এবং নিজগৃহে যেমন মাতা স্ত্রী কন্যা ও আত্মীয়া জনের যত্নে আহারেরর ব্যবস্থাটি পরিপাটি হয়, নিমন্ত্রণভবনেও সেইরূপ আহারের ব্যবস্থায় বন্ধু জনের শুচিস্নাত অন্তঃপুরের একটি ঐকান্তিক প্রযত্ন প্রকাশ পায়, যাহাতে ব্যঞ্জনের স্বাদ শতগুণ বর্ধিত করে এবং অন্তরে বেশ একটি নিরাবিল আনন্দ সঞ্চারিত করিয়া দেয়। সেই জন্য সামান্য দধি চিপিটকেও গৃহস্থের আতিথ্যগুণে যে পরিতোষ জন্মে, তাহার তুলনায় ভারতবিদিত পেলিটি এবং উইল্‌সনের বিপুলায়োজনও ব্যর্থ হইয়া যায়।

কিন্তু ইংরাজের উইল্‌সন পেলিটি—এবং সস্তা স্থলে মঙ্গলু খানসামা—ক্রমশ আমাদের ভবনেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে দেখা যায়। নব্যতন্ত্রীরা বলেন, টাকা ফেলিয়া দিলেই যেখানে হাঙ্গামা চুকে, সেখানে অনর্থক গৃহিণীকে পাকশালায় পাঠানো কেন? নিমন্ত্রণের মধ্যে যে একটি পবিত্র নিষ্ঠার ভাব আবহমান কাল আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, এবং যাহার উপরে আমাদের নিমন্ত্রণসভার প্রতিষ্ঠা, সে সকল প্রীতিভাব বিস্মৃত হইয়া আমরা ইহাকেও আপিসী কাজের সামিল করিয়া লইয়াছি, এবং ঠিকা লোক দিয়াই হউক, বা যে উপায়ে হউক কাজ সারিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই পরম চরিতার্থতা লাভ করি। সেই জন্য এই সকল নিমন্ত্রণে কোনোরূপ আনন্দ বা পরিতোষ নাই—উদরতৃপ্তিও হয় বটে, রসনাতৃপ্তিও যথেষ্ট হয়, কিন্তু সমস্ত আড়ম্বর লইয়াও ইহা মনের কোণে কিছু মাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এমন কি, বলিতে সংকোচ হয়, আমাদের গৃহিণীরা আসিয়া এই ভোজনশালা উজ্জ্বল করিয়া বসিলেও ইহার মধ্য হইতে সেই মনোজ্ঞ শুভ পরিতৃপ্তিটুকু পাওয়া যায় না।

বরঞ্চ, গৃহিণীও এখানে নিষ্প্রভ প্রতিভাত হয়েন। অন্তত আমাদের গৃহে নিত্য তাঁহার যে লক্ষ্মীশ্রী, কল্যাণী মূর্তি, সকল কাজে কর্মে গতিবিধিতে স্নেহে যত্নে ভাবে ভঙ্গিতে উছলিয়া পড়ে, সেটুকু এখানে প্রকাশ পায় না। তাঁহারা যদি রাগ না করেন, তাহা হইলে সাহস করিয়া বলি, তাঁহাদের সমস্ত গতিভঙ্গি বেশবিন্যাস রকম-সকম এখানে কেমন যেন ছাঁচে ঢালা হইয়া আসে—তাহার মধ্যেই যেন কি একটি সন্ত্রস্ত সচেতনতা আমাদিগকে সারাক্ষণ বিদ্ধ করিতে থাকে। সে অন্নদা অন্নপূর্ণাকে এখানে কিছু মাত্র অনুভব করা যায় না। শুধু যেন আমাদিগকে ইংরাজের টেবিলের আদবকায়দা অভ্যাস করাইবার জন্য কয়টি কলের পুত্তলী বলিয়া ভ্রম জন্মে।

কারণ, এখানে খানসামাহস্তপরিবেশিত অন্নে তাঁহার শুভ হস্ত স্পর্শ মাত্র করে নাই, এবং কোনো দ্রব্যে তাঁহার অন্তরের শুভাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয় নাই। আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে অন্তত মিষ্টান্নেও তাঁহাদের রচনাকলার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাম্বূলরচনা তো অন্তঃপুরিকাগণের বাঁধা কাজ বলিলেই হয়। এবং শসার চাটনি, আদার কুচির সহিত কালো জিরা ও নেবুর রস দিয়া চাটনিবৎ একটা কিছু, দধির লুড়কি, ক্ষীরকমলা কিংবা অভিনব দু-একটি কিছুতে না কিছুতে তাঁহাদের সিদ্ধ হস্ত প্রকাশ পাইতই। সে কালে, এমন কি, এক একটি জিনিসে এক এক বাড়ির বিশেষ একটু প্রতিপত্তিও থাকিয়া যাইত।

কোনো বাড়ির পান সাজা, কোনো বাড়ির মিষ্টান্ন, কোনো ঘরের কাসন্দি, কোনো গৃহের নবান্ন, কাহারও বাড়ির আমানি, কাহারও বাড়ির রন্ধন। এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ির ক্রিয়াকর্মে নিপুণাগণের বিশেষ সমাদরও ছিল। বহু দূর হইতে পাল্‌কিভাড়া দিয়া সাধনা করিয়া লোকে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইত। এবং লোকের বাড়ির ক্রিয়াকর্মে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া তাঁহাদের পরিতোষও যথেষ্ট হইত।

নব্যতন্ত্রিণীরা ইহা পছন্দ করিবেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে বড় একটি শ্রী ছিল, এবং নারীজন্মের যেন বিশেষ একটু সফলতা ছিল। এবং সত্য কথা বলিতে কি, অধুনাতন পার্টিতে রমণীর যে স্থান, তদপেক্ষা ইহাতে তাঁহাদের মর্যাদাও ছিল। কারণ, তাঁহারা আমাদের সর্ব শুভ কর্মের অধিষ্ঠাত্রী কল্যাণীরূপে বিরাজ করিতেন। এক্ষণকার মতো সখের পার্টিতে তাঁহারা নিতান্তই পুরুষের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র ছিলেন না। এবং তাঁহাদের সম্মানও অন্যরূপ ছিল। তরুণেরা সেখানে শ্রদ্ধাভরে নত হইয়া রহিত, এবং বৃদ্ধেরা আশীর্বচনে তাঁহাদের সংবর্ধনা করিতেন। রুমালকুড়ানো ডিগ্রি-পাওয়া সুলভ গ্যালান্ট্রী তখনও এ-দেশে আমদানি হয় নাই, এবং স্ত্রীসম্মানবিষয়ে এত বড় বড় বিলাতি ফাঁপা কথাও আসিয়া জুটে নাই।

অন্তত শহরের বড় বড় বিলাতফেরতি পার্টিগুলি দেখিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধ চিত্তে এইরূপই ধারণা জন্মে। কয়েকটি বাঁধা গতে সাধনা করিয়া কোনো মহিলাকে পিয়ানোতে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং অপর কাহাকেও বার বার অনুরোধ করিয়া সংগীতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। এবং সংগীত শুরু হয়, গল্পও জমিতে থাকে, অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই নিমন্ত্রণশালা সহস্র কণ্ঠের যুগপৎ গুঞ্জনে ভ্রমরের চাকের মতো মুখরিত হইয়া উঠে। যেমন পিয়ানো থামে, এক পশলা করতালিবর্ষণ হইয়া যায়, এবং অপেক্ষাকৃত সাহসী ড্রয়িংরুমবীরেরা চিরাভ্যস্ত সনাতন কম্‌প্লিমেন্টমুখে পিয়ানোর একটু নিকটে ঘেঁষিয়া আসেন। এবং যথাসময়ে একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া ইয়ার বন্ধুজন সহ, সমাগত মহিলাবৃন্দ সম্বন্ধে, আমাদের দেশের কল্পনাতীত অশোভন ইঙ্গবঙ্গ ভাষায় নির্লজ্জভাবে সমালোচনা শুরু করিয়া দেন!

এই করতালি ও কম্‌প্লিমেন্টে সৌভাগ্য অনুভব করেন, এরূপ লঘুচিত্ত তরুণী যদি কেহ থাকেন—জানি না, কিন্তু আমাদের কুলকন্যাগণের এত দূর অবনতি তো কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। মাতৃ-অনুক্রমে তাঁহারা সমস্ত দেশের হৃদয় হইতে যে ভাষাহীন সম্ভ্রম লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহার সহিত কি এই ড্রয়িংরুমরঙ্গমঞ্চের দীর্ঘচ্ছন্দ বক্তৃতাগত সম্মানের তুলনা হয়? আমাদের দেশে রমণী গৃহলক্ষ্মীরূপে সকলের হৃদয় হরণ করেন। সে সম্ভ্রম, সে প্রতিষ্ঠা আন্তরিক, তাহা চায়ের পেয়ালার উপর কথার ফুৎকারে বুদ্বুদের মতো ভাসিয়া উঠে না। যেখানে গৃহ আছে, সেইখানেই গৃহিণীর আদর; যেখানে যে ক্রিয়াকর্ম হয়, গৃহিণীরা না মিলিলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং তাঁহার মর্যাদা আমাদের নিকট স্বাভাবিক। তাঁহার একটি বিশেষ কাজ আছে—এবং কর্মানুযায়ী পদও আছে—তাহা নিতান্ত অনুগ্রহের দান নহে। সেই জন্য কাজ করিয়া তাঁহাদের পরিতোষ, এবং তাঁহাদের প্রসাদে আমাদেরও আনন্দ।

গৃহস্থালির যে সৌন্দর্য, তাহা গৃহী ব্যক্তিই বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন। এবং আমাদের

নিমন্ত্রণসভা এই গৃহস্থালিরই উৎসব বলিয়া আমাদের এত হৃদয়গ্রাহী। যে গৃহিণী নিত্য নানা প্রকারে স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন পোষ্য পরিজনবর্গের সর্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়া সংসারের কল্যাণসাধন করিতে থাকেন, এই নিমন্ত্রণব্যাপারে তাঁহার মহিমা যেন সমস্ত সমাজে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এবং সমস্ত লোকের পরিতোষজনিত শুভ কামনা তাঁহার অভিমুখে উত্থিত হইয়া শুভ কর্মে তাঁহাকে অধিকতর উৎসাহিত করে। এবং সারা বৎসর ধরিয়া কখনও কাসন্দি প্রস্তুতে, কখনও চাল কোটায়, কখনও বড়ি দেওয়ায়, এইরূপ নানাবিধ খুঁটিনাটি ছোটোখাটো আয়োজনে যেন এই বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা চলিতে থাকে।

এই সকল আয়োজনের মধ্যেও বিশেষ একটু শ্রীছাঁদ আছে। স্নাহাহ্নিক হইতে শুরু করিয়া নানাবিধ অনুষ্ঠানপূর্বক এই সকল আয়োজন করিতে হয়। ইহার আদ্যোপান্ত একটি শুচি শুভ ভাব বিদ্যমান। বৈশাখ মাসে কাসন্দির দিন। দুই দিন পূর্ব হইতে বধূরা আসিয়া ঢেঁকিশালের মেঝে ও সম্মুখের দাওয়াটি বেশ করিয়া নিকাইয়া দিয়া যায়, এবং সায়াহ্নে গোয়ালঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে আসিয়া গৃহিণী ঢেঁকিশালায়ও ধূপধুনার গন্ধ ছড়াইয়া যান। শুভদিনে গ্রামের তরুণীরা মিলিয়া পুকুরঘাট হইতে ধামা ধামা সরিষা ও হলুদ ধুইয়া আনেন এবং রৌদ্রে শুকাইয়া শুচিবাসে তৎসহ ঢেঁকিশালে প্রবেশ করেন। সেখানে তেল থাকে, সিন্দূর থাকে, একটি কাঁচা আম ও একটি লেবু থাকে; ঢেঁকিকে বরণ করিয়া হুলুধ্বনিপূর্বক প্রথম পাড় দেওয়া হয়। এবং তরুণী এয়োগণের অলক্তকরঞ্জিত চারু চরণতাড়নে ছন্দে ছন্দে তালে তালে ঢেঁকি সরিষা কুটিতে থাকে। পানাপুকুড়পাড়ে চিতার বেড়াঘেরা আম্রকুঞ্জবনমধ্য হইতে বউ-কথা-কও থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া ওঠে, এবং পল্লীগ্রামের ঝাঁঝাঁ মধ্যাহ্ন যেন নিঃশব্দে সেই কাসন্দির ঝালের মধ্যে তাপ সঞ্চার করে। এমনি, কাসন্দির পর কুলচুর, কুলচুরের পর বড়ি, কুমড়া কোটা, ডাল কোটা, সরুচুকলি ও পিঠার সময় চাল কোটা, ধান ভানা, এক ঢেঁকিশালেই কত অনুষ্ঠান। এবং ঢেঁকিশালের বাহিরেও অনুষ্ঠান কম নহে। সে জন্য কুরুণী আছে, বঁটি আছে, ছাঁকনি আছে, অজ্ঞাতনাম আরও অনেক প্রকারের সরঞ্জাম আছে; এবং সেই সঙ্গে বিচিত্র আসন করচালন গ্রীবাভঙ্গি ও গৃহলক্ষ্মীগণের একান্ত অভিনিবেশ সংযুক্ত হইয়া সমস্তটিকে চিত্তহারী করিয়া তুলিয়াছে।

এবং আমাদের গৃহিণীগণের এই সকল আচার অনুষ্ঠানও যেমন বিচিত্র, নিমন্ত্রণের মধ্যেও সেইরূপ বৈচিত্র্য আছে। ইংরাজের যেমন চা আছে, ডিনার আছে, প্রাতরাশ আছে, এবং বিবাহ ও পর্বাদির বিশেষ বিশেষ ভোজ আছে, আমাদেরও সেইরূপ ভাতের নিমন্ত্রণ, জলপানের নিমন্ত্রণ, ফলাহারের নিমন্ত্রণ, পূজার নিমন্ত্রণ, শুভ-কর্মের নিমন্ত্রণ, অরন্ধন, নবান্ন, শ্রীপঞ্চমী, পিঠাপার্বণ ইত্যাদি বিচিত্র প্রকারের নিমন্ত্রণ আছে এবং তাহাতে আহারাদির ব্যবস্থারও যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এখানে তাহার তালিকা দিবার প্রয়োজন নাই—মোটামুটি সকলেরই এ সকল জানা কথা। এতদ্ভিন্ন, আমের সময় ব্রাহ্মণ কাঙাল দীন দুঃখীকে আম সন্দেশ না খাওয়াইয়া সুগৃহিণী আম্র মুখে তুলেন না। বৈশাখ মাসে অতিথিদের জন্য ডাব বাতাসার ব্যবস্থা। এবং ইহার উপর বার ব্রত উপলক্ষেরও

অভাব নাই। সবশুদ্ধ অতিথিপরায়ণতা প্রাচ্য জাতির একটি বিশেষ ভাব। এবং নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সমাজিকতায় এই আতিথ্যধর্মের একটি বিশেষ স্ফূর্তি অনুভব হয়। আমাদের সকল ব্যাপারেরই অন্তরে অন্তরে যে একটি সাত্ত্বিক শুভ ভাব প্রবাহিত, তাহাতেই আমাদের অন্তরের সমুদয় আকর্ষণ।

এবং এই শুভ সংকল্পটুকু ক্রমশ আমাদের অন্তঃপুর হইতেও যে তিরোহিত হইতেছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়। আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে আমাদের একটি শুভ ভাব থাকা চাহি—নহিলে, তাহা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয় না। দান করিয়া, খাওয়াইয়া, সেবা করিয়া পাঁচজনকে সুখী করিয়া সুখ। অন্তঃপুরেও যদি অতিথিবিমুখতা আসে, সেখানেও যদি তামসিকতা মাত্র মনোহর হইয়া উঠে, ক্রিয়াকর্মে কেবল বাহিরের আড়ম্বর ও বাজে জাঁকজমকের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে এ দরিদ্র দেশের দুর্গতির আর শেষ কোথায়? জাঁকজমকে আড়ম্বরে তো পরিতোষ কোথাও নাই, এবং অগাধ অর্থব্যয়ে এক ব্যক্তি যাহা করে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনের পক্ষে তাহা আদর্শ হইতে পারে না। সেই জন্যই আমাদের চিরদিন কলাপাতা ও মাটির খুরি ব্যবস্থা। এ দিকে বাজে ধুমধামে অনর্থক বিপুল অর্থ ব্যয় না করিয়া, সেই অর্থে আমরা দশ জনকে আহ্বান করিয়া পরিতোষপূর্বক খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করি। আমাদের সরঞ্জাম অল্প, লোক অনেক। যত লোকের সহিত মিলিয়া আমরা আনন্দ উপভোগ করি, ততই আমাদের আনন্দ অধিক হয়। হে গৃহিণী, তোমার তক্‌তকে গৃহপ্রাঙ্গণে পুরাতন দিনের মতো আমাদিগকে আবার আহ্বান কর এবং তুমি স্বহস্তে পাতে পাতে অন্ন পরিবেশন করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন কর। তোমার ভাণ্ডার অক্ষয় হউক, তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।

☐ *ভারতী*, ফাল্গুন, ১৩০৫ (*বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী*. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬০)

শিল্প ও ভাষা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে ॥"

বাংলা ভাষা যে বোঝে সেই এ শ্লোকটা শুনলেই বলবে—'বুঝলেম', কিন্তু *ভারতী* কাগজের মলাটের নীচে থেকে টেনে বার করে আজকালের একখানা ছবি সবার সামনে যদি ধরে দিই, সাড়ে-পনেরো আনার চেয়ে বেশি লোক বলবে, 'বুঝলেম না মশায়!' এই শেষের ঘটনা ঘটতে পারে, হয় যে ছবিটা লিখেছে সেই আর্টিস্টের ছবির ভাষায় বিশেষ জ্ঞান না থাকায়, অথবা যে ছবি দেখেছে চিত্রের ভাষার দৃষ্টিটা তার যদি মোটেই না থাকে। ভারতীর বন্দনাটা যে ভাষায় লেখা সেই ভাষাটা আমাদের সুপরিচিত আর *ভারতীর* ছবিখানা যে ভাষায় রচা সে ভাষাটা একেবারেই আমাদের অপরিচিত; সেইজন্য চিত্র-পরিচয় পড়েও ওটা বুঝলেম না এমনটা হতে বাধা কোন্‌খানে? চীনেম্যানের কানের কাছে খুব চেঁচিয়ে সরস্বতীর স্তোত্র পাঠ করলেও সে বুঝবে না, কিন্তু ছবির ভাষার বেলায় সে অনেকখানি বুঝবে, কেননা ছবির ভাষা অনেকটা সর্বজনীন ভাষা। 'আব্‌র' কথাটা ফরাসিকে বললে সে গাছ বুঝবে, আবার 'আব্‌র' শব্দ হিন্দুস্থানীর কাছে মেঘরূপে দেখা দেবে, ইংরেজ সে শব্দটার কোনোরূপ অর্থ আবিষ্কার করতে পারবে না, কিন্তু আঁকার ভাষায় 'আব্‌র' হয় গাছ নয় অভ্র স্বরূপ হয়ে দেখা দেয়; কথিত ভাষার মতো কৃত্রিম উপায়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া রূপ নিয়ে নয়। সুতরাং ছবির ভাষার মধ্যে বলতেই হয়, অপরিচয়ের প্রাচীর এত কম উঁচু যে, সবাই এমনকি ছেলেতেও সেটা উল্লঙ্ঘন সহজেই করতে পারে, কিন্তু ঐ একটু চেষ্টা যার নেই তার কাছে ঐ একহাত প্রাচীর দেখায় একশো হাত দুর্গপ্রাকার—ছবি ঠেকে সমস্যা। কবির ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন করে ইঙ্গিত করতে-করতে, আবার এই কথিত ভাষা যেটা আসলে কানের বিষয় এখন সেটা ছাপার অক্ষরের মূর্তিতে চোখ দিয়েই যাচ্ছে সোজা মনের মধ্যে; 'নবঘনশ্যাম' এই কথাটা— ছাপা দেখলেই রূপ ও রঙ দুটোর উদ্রেক করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে!

নাটক যখন পড়া হয় কিংবা গ্রামোফোনের মধ্য দিয়ে শুনি তখন কান শোনে আর

মন সঙ্গে-সঙ্গেই নটনটীদের অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি মায় দৃশ্যপটগুলো পর্যন্ত চোখের কোনো সাহায্য না নিয়েই কল্পনায় দেখে চলে, ছবির বেলায় এর বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—চোখ দেখলে রূপের ছাপগুলো, মন শুনে চলল কানের শোনার অপেক্ষা না রেখে ছবি যা বলছে তা; বায়স্কোপের ধরা ছবি, চোখে দেখি শুধু তার চলা ফেরা, ছবি কিন্তু যা বললে সেটা মন শুনে নেয়।

কবির মাতৃভাষা যদি বাংলা হয় তবে বাংলা খুব ভালো করে না শিখলে ইংরেজ সেটি বোঝে না; তেমনি ছবির ভাষা অভিনয়ের ভাষা এসবেও দ্রষ্টার চোখ দোরস্ত না হলে মুশ্‌কিল। মুখের কথা একটা-না-একটা রূপ ধরে আসে, কাগ্‌ বগ্‌ বললেই কালো সাদা দুটো পাখি সঙ্গে-সঙ্গে এসে হাজির! শব্দেব সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে— রূপকথা, অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা-বলা নিয়ে চলন্তি ভাষা! কবিতার ছবির অভিনয়ের ভাষার মতো সুর আর রূপ দিয়ে বাক্যসমূহকে যথোপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মতো সাজিয়ে-গুজিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে ছেড়ে দিলে তবেই যাত্রা শুরু করে দিলে বাক্যগুলো, চলল ছন্দ ধরে যথা—

> 'করিবর-রাজহংস গতি-গামিনী
> চললিহুঁ সঙ্গেত— গেহা
> অনল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জরী
> জিনি অপরূপ সুন্দর দেহা॥'

কিন্তু বাক্যগুলোকে ভাষার সূত্রে নটনটী সূত্রধার এদের মতো বাঁধা হল না, তখন কেবলি বাক্যসকল শব্দ করলে— ও, এ, হে, হৈ, ঐ কিংবা খানিক নেচে চলল পুতুলের মতো কিন্তু কোনো দৃশ্য দেখালে না বা কিছু কথাও বললে না, কোলাহল চলাচল হল খানিক, বলাবলি হল না, যেমন—

> 'হল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মতি
> হয় শান্ত কি ক্ষান্ত কৃতান্ত গতি
> করি গঞ্জিত গুঞ্জিত ভৃঙ্গ সবে
> ত্যজি মৃত্যু কি চিত্ত কি নিত্য রবে?'

শ্লোকটা কি যেন বলতে চাইলে কিন্তু খাপছাড়াভাবে, এ যেন কেউ তুরকি আরবি পড়ে ফরাসি মিশালে! কিন্তু কথাকে কবি কথা বলালেন ভাষা দিয়ে, চালিয়ে দিলেন ছন্দ দিয়ে, কথাগুলো তবে সজাগ সজীব অভিনেতার মতো নেচে গেয়ে বাঁশি বাজিয়ে চলল পরিষ্কার।

> 'চলিগো, চলিগো, যাইগো চলে
> পথের প্রদীপ জ্বলে গো

গগনতলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি
রঙিন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।'

ছবির বেলাতেও এমনি, সুর সার কথাবার্তা এসবের সূত্রে রূপকে না বেঁধে, আঁকা রূপগুলো অমনি যদি ছেড়ে দেওয়া যায় পটের উপরে, তবে তারা একটা-একটা বিশেষ্যের মতো নিজের নিজের রূপের তালিকা দ্রষ্টার চোখের সামনে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, বলে না চলে না—পিদুম, ফুল, ফুলদানি, বাবু, রাজা, পণ্ডিত, সাহেব কিংবা অমুক-অমুক-অমুক এর বেশি নয়; কিন্তু প্রদীপ আঁকলেম, তার কাছে ফেলে দিলেম পোড়া সলতে, ঢেলে দিলেম তেলটা পটের উপর—ছবি কথা কয়ে উঠল,—'নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্।'

ছবিকে ইঙ্গিতের ভাষা দিয়ে বলানো গেল, চলানো গেল। নাট্যকলা প্রধানত ইঙ্গিতেরই ভাষা বটে কিন্তু তার সঙ্গেও কথিত ভাষার সংকেত অনেকখানি না জুড়লে নাটকাভিনয় করা চলে না—এই 'লেকচার' লিখছি সামনে এতটুকু 'টোটো' ছেলেটা বোবা নটের মতো নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে চলল, ভেবেই পাইনে তার অর্থ! হঠাৎ অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে শিশু নট বাক্য আর সুর জুড়ে দিলে অং অং ভুস্ ভুস্, বোঁ বন্ বন্ সোঁ শন্ শন্, হিং টিং ছট্ ফট্ আয় চট্ পট্, লাগ লাগ ভোজবাজি, চোর বেটাদের কারসাজি, ঠিক দুপুরে রোদ্দুরে তাল পুকুরে উত্তুরে, কার আজ্ঞে? না, কথিত ভাষার আজ্ঞে পেয়ে বোবা ইঙ্গিত জাদু-মন্ত্র কথা কয়ে ফেললে, যেন ঘুড়ি উড়িয়ে চলল ঘুরে ফিরে।

ছবির ভাষা, কথার ভাষা, অভিনয়ের ভাষা ও সংগীতের ভাষা এই রকম নানা ভাষা এ-পর্যন্ত মানুষ কাজে খাটিয়ে আসছে। এর মধ্যে সংগীত শুধু যা বলতে চায়, কিংবা যখন কাঁদতে চায় বা হাসাতে চায়, কাকুতি-মিনতি জানাতে চায় তখন ছবির ভাষা ও কথার ভাষাকে অবলম্বন না করেও নিজের স্বতন্ত্র ভাষায় মীড় মূর্ছনা ইত্যাদি দিয়ে সুব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে। রঙের ভাষারও এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আছে—আকাশের রূপ নেই কিন্তু রঙের আভাস দিয়ে সে কথা বলে। কিন্তু আর-সব ভাষা কথিত চিত্রিত অভিনীত সমস্তই এ ওর আশ্রয় অপেক্ষা করে। সুর আর রূপ, বলা ও দেখা, এরা সব কেমন মিলে জুলে কাজ করে দু-একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। মধুর বাক্যগুলো কানের জিনিস হলেও মাধবীলতার মতো চোখের দেখা সহকারকে আশ্রয় না করে পারে না। দৃশ্য বা ছবিকে আশ্রয় না করে কিছু বলা-কওয়া একেবারেই চলে না তা নয়,
যেমন—

'কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর।
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক-সংসারে
এতদিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে।'

এখানে মনোভাব বাচন হল, কোনো রূপ কোনো ভঙ্গি ছবি বা অভিনয়ের সাহায্য না নিয়েও। বাচনের বেলায় বাক্য স্বাধীন কিন্তু বর্ণনের বেলায় একেবারে পরাধীন, যেমন—

'একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন।'

নব যৌবন আর বৃন্দাবনের বসন্ত শোভার ছবি বাক্যগুলোর মধ্যে-মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকাচ্ছে!

'আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল।'

বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল কালো যমুনা তার ধারে কদমতলা, তার ছায়ায় সহচরী সহিত রাধিকা—

'আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্ধন।'

রাধিকার রত্ন অলংকারের ঝিকমিকি থেকে দূরের কালো পাহাড়ের ছবি দিয়ে Landscapeটা সম্পূর্ণ হল, ছবি মিলে গেল কথার সঙ্গে, কান চোখ দুয়ের রাস্তা একত্র হয়ে সোজা চলল মনোরাজ্যে। এর পর আর ছবি নেই বর্ণনা নেই শুধু কথা দিয়ে বাচন—

'এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী
এমন ব্যথিত নাহি শুনএ কাহিনী।'

এ বারে কথিত ভাষার ছবির সাক্ষার্দ্দশন—

'জলদ বরণ কানু, দলিত অন জঞ্জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়—
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল
নিমিষে নিমিখ নাহি রয়।
সই দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে!'

একেবারে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছবি-দেখা কথার ভাষা দিয়ে! এইবার অঙ্গভঙ্গি আর চলার সঙ্গে কথার যোগাযোগ পরিষ্কার দেখাব—

'চলিতে না পারে রসের ভরে
আলস নয়ানে অলস ঝরে
ঘন ঘন সে যে বাহিরে যায়
আন ছলে কত কথা বুঝায়।'

চোখের সামনে চলাফেরা শুরু করে দিলে কথার ভাষা অভিনয় করে নানা ভঙ্গিতে।

চিত্রিত ভাষা কথিত ভাষা অভিনীত ভাষা, এসব যদি এ ওর কাছে লেনা দেনা করে

চলল তবে কথিত ভাষার ব্যাকরণ অলংকারের সূত্র আইন কানুন ইত্যাদির সঙ্গে আর-দুটো ভাষার ব্যাকরণাদির মিল থাকতে বাধ্য। কথার ব্যাকরণে যাকে বলে 'ধাতু', ছবির ব্যাকরণে তার নাম 'কাঠামো' (form)। ধারণ করে রাখে বলেই তাকে বলি ধাতু। ধাতু ও প্রত্যয় একত্র না হলে কথিত ভাষায় শব্দরূপ পাই না, ছবির ভাষাতেও ঠিক ঐ নিয়ম—মাথা হাত পা ইত্যাদি রেখে দিয়ে একটা কাঠামো বা ফর্মা বাঁধা গেল। কিন্তু সেটা বানর না নর এ প্রত্যয় বা বিশ্বাস কিসে হবে যদি না ছবিতে নর বানরের বিশেষ প্রত্যয় দিই! শুধু এই নয়, বিভক্তি যিনি ভাগ করেন ভঙ্গি দেন, তাঁর চিহ্ন ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে কাঠামোয় জুড়ে দেওয়া চাই। বর্ণে-বর্ণে রূপে-রূপে নানা বস্তুর সঙ্গে নানা বস্তুতে সন্ধি সমাস করার সূত্র আছে, ছবির ব্যাকরণে, বচন ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় এমনকি মুগ্ধবোধের সবখানি অলংকারশাস্ত্রের সবখানির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া চলে ছবির ব্যাকরণ আর অলংকারের ধারাগুলো। কথিত ভাষার বেলায় 'ভৃ' ধাতু গক্ প্রত্যয় করে যেমন 'ভৃঙ্গ', ছবির ভাষায় কালো ফোঁটার উপরে দুটো রেফ যোগ করলেই হয় 'দ্বিরেফ ভৃঙ্গ' আবার ভৃঙ্গের কালো ফোঁটায় রেফ না দিয়ে শুশু প্রত্যয় দিলে হয় 'ভৃঙ্গার' যেমন 'ভৃ' ধাতুতে 'গিক' প্রত্যয় জুড়লে হয় 'ভৃঙ্গি'।

ছবি লেখার উৎসাহ নেই কিন্তু ছবির ব্যাকরণ লেখার আস্থা আছে এমন ছাত্র যদি পাই তো চিত্রকরে আর বৈয়াকরণে মিলে এইভাবে আমরা ছবি-দেওয়া একটা ব্যাকরণ রচনা করতে পারি, কিন্তু এ কাজে নামতে আমার সাহস নেই কেননা ব্যাকরণ বলে জিনিসটা আমার সঙ্গে কি কথিত ভাষা কি চিত্রিত ভাষা দুয়ের দিক দিয়েই চিরকাল ঝগড়া করে বসে আছে। সংকীর্তিত ভাষা যেমন, তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা, ব্যাকরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে এইটে যদি সাব্যস্ত হল তবে এও ঠিক হল যে, ছবি দেখা শুধু চোখ নিয়ে চলে না ভাষাজ্ঞানও থাকা চাই দ্রষ্টার, ছবি-স্রষ্টার পক্ষেও ঐ একই কথা। 'রসগোল্লা খেতে মিষ্টি, টাপুর টুপুর পড়ে বৃষ্টি', এটা বুঝতে পারে না পাঠশালায় না গিয়েও এমন ছেলে কমই আছে, কিন্তু শিশুবোধের পাঠ থেকে ভাষাজ্ঞান বেশ একটু না এগোলে—

> 'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
> হৃদয়-কমল-বন মাঝে!'

এটা বোঝা সম্ভব হয় না চট করে বালকের। শুধু অক্ষর কিংবা কথা অথবা পদ কিংবা ছত্রের পর ছত্র লিখতে পারলে অথবা চিনে-চিনে পড়তে পারলেই সুন্দর ভাষায় গল্প কবিতা ইত্যাদির লেখক বা পাঠক হয়ে ওঠা যায় একথা কেউ বলে না, ছবি অভিনয় নর্তন গান ইত্যাদির বেলায় তবে সে কথা খাটবে কেন! যেমন চিঠি লিখতে পারে অনেকে তেমনি ছবিও লিখতে পারে একটু শিখলে প্রায় সবাই, কিন্তু লেখার মতো লেখার ভাষা, আঁকার মতো আঁকার ভাষার উপর দখল কজনে পায়? কাজেই বলি যে-ভাষাই হোক তাতে স্রষ্টাও যেমন অল্প তেমনি দ্রষ্টাও কচিৎ মেলে। ভাষাজ্ঞানের অভাববশত ফুলকে দেখারূপে আঁকা এক ফুলের ভাষা শুনে নিজের ভাষায় ফুলকে বর্ণনা করায় তফাত আছে কে না বলবে!

বাংলা দেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা, কিন্তু সেই অপ্রচলিত ভাষা চলিত বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ভাষা হয়ে প্রচলিত যেমনি হল, অমনি বাংলার পণ্ডিতসমাজে খুব চলন হল সেই ভাষার, সবাই লিখলে কইলে বুঝলে বুঝালে সেই মিশ্র ভাষায়, চলিত বাংলায় খাঁটি বাংলায় লেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়ল, ফল হল—এককালের চলতি ভাষা সহজ কথা সমস্তই দুর্বোধ্য হয়ে পড়ল, এমনকি কথার অক্ষর মূর্তিটা চোখে স্পষ্ট দেখলেও কথাটার ভাব অর্থ ইত্যাদি বোঝা শক্ত হয়ে পড়ল। বাংলা অথচ অপ্রচলিত কথাগুলোর বেলায় যদি এটা খাটে তবে ছবির ভাষার বেলায় সেটা খাটবে না কেন? ছবির মূর্তির অপ্রচলনের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ভাষা বোঝাও দুঃসাধ্য হয়ে যে পড়ে তার প্রমাণ দেশের ইতিহাসে ধরা থাকে, আর সেইগুলোব নাম হয় অন্ধযুগ, এই অন্ধতার মধ্য দিয়ে আমাদের মতো পৃথিবীর অনেকেই চলেছে সময়-সময়। চোখে দেখা মাত্রই সবখানি বোঝা না গেল সে ছবি ছবিই নয় একথা না হয় শিল্পীর উপরে জবরদস্তিতে চালানো গেল, কিন্তু আমাদের নিজ বাংলার মুখের কথা আমরা অনেক সময়ে নিজেরাই বুঝিনে বোঝাতেও পারিনে ভাষাতে পণ্ডিতেরা না বুঝিয়ে দিলে, তবে কি বলব বাংলা ভাষা বলে বস্তুটা বস্তুই নয়?— 'ছীয়াল', 'ছ্মিনী', 'ছোলঙ্গ' এই তিনটেই বাংলা কথা, কিন্তু বুঝলে কিছু? ফরিদপুরের ছেলে 'ছোলঙ্গ' বলতেই বোঝে, বহরমপুরের লোক বোঝে না, বাংলা শব্দকোষ না আয়ত্ত হলে ওয়েবস্টারের জ্ঞান নিয়েও বুঝতে পারে না 'ছোলঙ্গ' হচ্ছে বাতাবি লেবু, লারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর। 'ছিয়াল', 'ছীমনী' এ দুটোও বাংলা কিন্তু বাংলার সাধু ভাষা বলে কৃত্রিম ভাষা নিয়ে যাঁরা ঘরকন্না করছেন তাঁরা এর একটাকে শৃগালের অপভ্রংশ আর-একটাকে ইংরেজি চিম্‌নি কথার বাংলা বলেই ধরবেন কিন্তু এ দুটোই তা নয়— ছীয়াল নামে শ্রীল বা শ্রীমান ও শ্রীমতী, আর ছ্মিনী মানে পাথর-কাটা 'ছেনী' শৃগালও নয় চিমনিও নয়। দুশো বছর আগে যে ভাষা চলিত ভাষা ছিল, পট ও পাটার ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন বাংলা পুথির ভাষাও অপ্রচলিত হয়ে গেছে; সুতরাং যে শ্লোক্‌টা এবারে বলব তা বাংলা হলেও আমাদের কাছে চীনে ভাষারই মতো দুর্বোধ্য—

'যাত বাত হাত ঘর জোছি অয়লাহু
না ভেতল চোলে আরে সবে অকলাহু।'

পরিচিত বাংলায় আন্দাজে-আন্দাজে এর যতটা ধরা গেল তার তর্জমা করলেম, তবে অনেকটা বোধগম্য হল ভাবার্থটা—

ঘাট বাট ঘব করিনু সন্ধান
চোবে না পাইয়া মোরা হইনু হয়রান।

দুই-তিন শত বছবের আগেকার বাঙালি যে চলিত ভাষায় কথা কইত তাই দিয়েই উপরের কবিতাটা লেখা, আজকের আমরা সে ভাষা দখল করিনি অথবা ভুলে গেছি, কবিতা দুর্বোধ্য হল সেইজন্য, ভাষার দোষেও নয় কবির দোষেও নয়।

কথিত ভাষার হিসেব পণ্ডিতেরা এইরূপ দিয়েছেন—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, মিশ্র অথবা সংস্কৃত্র ভাষা আর বিভাষা। আর্টের ভাষাতেও এই ভাগ, যথা— শাস্ত্রীয় শিল্প (Academic art), লোকশিল্প (Folk art), পরশিল্প (Foreign art), মিশ্র শিল্প

(Adapted art) লোকশিল্পের ভাষা হল—পটপাটা গহনাগাটি ঘটিবাটি কাপড়চোপড় এমনি যেসব art শাস্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে না মিললেও মন হরণ করে। শাস্ত্র ব্যাকরণ ইত্যাদি 'পণ্ডিতানাং মতম্' যে art-এর সঙ্গে যোগ দেয়নি কিন্তু 'যত্র লগ্নং হি হৃৎ' হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে, শুক্রাচার্যের মতে তাই হল লোকশিল্পের ভাষার রূপ। আর যা 'পণ্ডিতানাং মতম্' যেমন দেবমূর্তি-রচনা শিল্পশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত অথবা রাজা বা পণ্ডিতগণের অভিমত শিল্প সেই হল শিল্পের সংস্কৃত ভাষা—কোথাও লোকশিল্পের চলিত ভাষাকে মেজে ঘষে সেটা প্রস্তুত, কোথাও প্রাচীন লুপ্ত ভাষাকে চলিতের সঙ্গে মিলিয়ে নব কলেবর দিয়েও সাধু ভাষারূপে সেটা প্রস্তুত করা হয়। পরশিল্প হল যেমন গান্ধারের শিল্প, একালের অয়েল পেন্টিং। মিশ্র শিল্প চীনের বৌদ্ধ শিল্প, জাপানের নারা মন্দিরের শিল্প, এশিয়ার ছাঁচে-ঢালা এখনকার ইউরোপীয় শিল্প, গ্রিসের ছাঁচে-ঢালা স্থানবিশেষের বৌদ্ধশিল্প এবং এখনকার বাংলার নব চিত্রকলা পদ্ধতি! সুতরাং সব ছেড়ে দিয়ে বাংলার নব চিত্রকলাকেই ধরে দেখা যাক—ছবিগুলো সমস্যা হয়ে উঠলে তো বড় বিপদ! ছবির ছবিত্ব চুলোয় গেল, সেগুলো হয়ে উঠল ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব এবং বর-ঠকানো কূট প্রশ্ন! নব চিত্রকলার এ ঘটনা যে ঘটেনি তা অস্বীকার করবার যো নেই যখন সবাই বলছে, কিন্তু ছবিটা যে সমস্যার মতো ঠেকে সেটা ছবির বা ছবি-লিখিয়ের দোষে অথবা ছবি-দেখিয়ের দোষে সেটা তো বিচার করা চাই! 'বায়বা যাহি দর্শতে মে সোমা অরং কৃতাঃ, তেষাং পাহি শ্রুধী হব্‌ম্!'[১] সব অন্ধকার ছবির সমস্যার চেয়ে ঘোরতর সমস্যা আমাদের মতো অজ্ঞানের কাছে, কিন্তু বেদের পণ্ডিতের কাছে এটা একেবারেই সমস্যা নয়! ছবি যেমন তেমনি রাজাও রাষ্ট্রনীতি যুদ্ধবিগ্রহ সৈন্যসামন্ত ধুমধাম হাঁকডাক দ্বারপাল দুর্গ ইত্যাদির দুর্গমতা নিয়ে একটা মস্ত সমস্যার মতো ঠেকেন প্রজার কাছে, কিন্তু উপযুক্ত মানুষ বলে রাজার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে—সেখানে রাজা হন রাজামহাশয়—দুর্গম সমস্যা নয়, তেমনি ছবি মূর্তির সত্তা হল সুন্দর ছবি বা সুন্দর মূর্তি বা শুধু ছবি শুধু মূর্তিতে। রাজাকে উপযুক্ত মানুষের সত্তার দিক দিয়ে দেখার পক্ষেও যেমন দুর্গদ্বার ইত্যাদির বাধা আছে এবং কারও কারও কাছে নেইও বটে, ছবি মূর্তির সত্তার বোধের বেলাতেও ঠিক একই কথা। ছবিকে মূর্তিকে শুধু ছবি মূর্তির দিক দিয়ে বুঝতে পারলে আর-সব দিক সহজ হয়ে যায় কিন্তু এ কাজটাও যে সবাই সহজে দখল করতে পারে— হঠাৎ ছবি মূর্তি দেখেই তাদের সত্তার দিক দিয়ে তাদের ধরা চট করে যে হয়—তা নয়, সেই ঘুরে-ফিরে আসে পরিচয়ের কথা।

সুরের ভাষা যে না বোঝে সংগীত তার কাছে প্রকাণ্ড প্রহেলিকা, দুর্বোধ শব্দ মাত্র! সুতরাং এটা ঠিক যে মানুষ কথা কয়েই বলুক অথবা সুর গেয়ে বা ছবি রচে কিংবা হাতপায়ের ইশারা দিয়েই বলুক সেটা বুঝতে হলে যে বোঝাতে চলেছে তারও তেমন ভাষা ইত্যাদির জটিলতা ভেদ করা চাই।

কথায় যেমন ছবি ইত্যাদিতেও তেমনি যখন কিছু বাচন করা হল তখন সবাই সেটা

১. *ঋগ্বেদসংহিতা*, ১ম মণ্ডল, ২য় সূক্ত, ১ম ঋক

সহজে বুঝবে, না হলে বাচন ব্যর্থ হল। 'হুঁকো নিয়ে এস', এটা ব্যাকরণ আড়ম্বর অলংকার ইত্যাদি না দিয়ে বললেম, তবে হুকোবরদার বুঝলে পরিষ্কার, দরজার দিকে আঙুল হেলিয়ে বললেম, 'যাও', বেরিয়ে গেল হুকোবরদার, একটা মটর-কারের ছবি এঁকে দোকানের দরজার উপর ঝুলিয়ে দিলে সবাই বুঝলে এখানে মটর-কার পাওয়া যায় কিন্তু বর্ণনের বেলায় ভাষা ছন্দ ব্যাকরণ অলংকার ইত্যাদির অবগুণ্ঠন আর আবরণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া গেল কথা ছবি সুর সার সমস্ত, কেমন করে সে বোঝে ভাষার গতিবিধির সঙ্গে যার মোটেই পরিচয় হয়নি!

দেবমাতা অদিতি তিনি স্বর্গেই থাকেন সুতরাং দেবভাষাতেই তাঁর অধিকার হল। একদিন তিনি শুনলেন জল সব চলেছে কি যেন বলতে-বলতে! দেবমাতা বামনদেবকে শুধালেন, 'ঋষি! অ-ল-লা এইরূপ শব্দ করিতে করিতে জলবতী নদীগণ আনন্দ-ধ্বনি করতঃ গমন করিতেছে, তুমি উহাদের জিজ্ঞাসা কর, উহারা কি বলিতেছে?' অদিতির মতো, ঋষিরও যদি জলের ভাষাজ্ঞান জলের মতো না হত, তবে তিনিও শুধু অ-ল-লাই শুনতেন, কিন্তু ঋষি আপনার প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা নিয়ে বিশ্বের ভাষা বুঝে নিয়েছিলেন, জল কি বলে মেঘ কি বলে নদী সমুদ্র কি বলে, সমস্তই তিনি অবগত ছিলেন, কাজেই মেঘ থেকে ঝরে-পড়া জলের সেদিনের কথাটি দেবভাষাতে তর্জমা করে অদিতিকে জানানো তাঁর সুসাধ্য হল, যথা— 'জলবতী নদীগণ ইহাই বলিতেছে, মেঘসকলকে ভেদ করে জলসমূহের এমন শক্তি কোথায়? ইন্দ্র মেঘকে বিনাশ করতঃ জলসমূহ মুক্ত করেন, মেঘের আবরণ ইন্দ্রই ভেদ করেন।'

অ-র-ণ্য এই কটা অক্ষর জুড়ে দিলেই মূর্তিমান অরণ্যটা আমাদের চোখ দিয়ে সাঁ করে গিয়ে আজকাল প্রবেশ করে মনে, কিন্তু ভাষা যখন অক্ষরমূর্তি ধরেনি, শব্দমূর্তি দৃশ্যমূর্তিতে চলেছে তখন দেখি শুধু অরণ্য এইটে বাচন মাত্র করে দিয়েই ঋষির ভাষা স্তব্ধ হচ্ছে না, কিন্তু ছন্দে সুরে, অরণ্যের ভাষা শব্দ আর নানা রহস্য ধরে-ধরে তবে অরণ্যের সত্তা আবিষ্কার করতে-করতে চলেছে ঋষির ভাষা জিজ্ঞাসা আর বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে—"অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ বা প্রেব নশ্যসি। কথা গ্রামং না পৃচ্ছসি নত্বা ভীরিব বিন্দতী॥ বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ। আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে॥ উতগাব ইবাদন্ত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে। উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি॥ গামংগৈষ আহ্বয়তি দার্বংগৈষ অপাবধীৎ। বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে॥ ন বা অরণ্যানির্হংত্যন্যশ্চেন্নাভি গচ্ছতি। স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধায় যথাকামং নি পদ্যতে॥ আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্। প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানি-মশংসিষম্॥"[২]

'হে অরণ্যানি! হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে লুপ্ত হও (কত দূরেই তুমি চলিয়াছ)! অরণ্যানি, তুমি গ্রামের বার্তাই লও না, তোমার ভয় নাই এমনি ভাবে একাকী আছ।

'জন্তুরা বৃষের ধ্বনিতে কি যেন বলিতেছে, উত্তর সাধক পক্ষীবা চিচ্চিক স্বরে যেন

২ অরণ্যানী সূক্ত, *ঋগ্বেদসংহিতা*, ১০ম মণ্ডল, ১৪৬ সূক্ত, ১-৬ ঋক

তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে। এ যেন বীণার ঘাটে ঘাটে ঝনৎকার দিয়া কাহারা অরণ্যানীর মহিমা কীর্তন করিতেছে। বোধ হয় অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী সকল বিচরণ করিতেছ, কোথাও অট্টালিকার মতো কি দৃশ্যমান, ছায়ালোকে মণ্ডিত সায়ংকালের অরণ্য যেন কত শত শকট ওখান হইতে বাহির করিয়া দিতেছে। কে ও! গাভী সকলকে ফিরিয়া ডাকিতেছে, ও কে! কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে, অরণ্যের মধ্যে যে লোক বাস করে সেই লোক বোধ করে সন্ধ্যাকালে যেন কোথায় কে চিৎকার করিয়া উঠিল! বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারও প্রাণবধ করে না, অন্যান্য শ্বাপদ জন্তু না আসিলে ওখানে কোনো আশঙ্কা নাই। নানা স্বাদু ফল আহার করিয়া অরণ্যে সুখে দিন যাপন করা যায়, মৃগনাভি গন্ধে সুরভিত অরণ্য সেখানে কৃষিগণ নাই, অথচ বিনা কর্ষণেই প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হয়। মৃগগণের জননীস্বরূপা এমন যে অরণ্যানী তাঁহাকে এইরূপে আমি বর্ণন করিলাম।'

এখন উপরের এই অরণ্যবর্ণনার একটা তর্জমা বাংলায় না করে ছবির ভাষায় করলে অনেকের পক্ষে বোঝা সহজ হত সবাই বলবে। ভালো কথা— বর্ণনাটা ছবিতে ধরতে আর্ট স্কুলের পরীক্ষার দিনে কাঁচা আধ-পাকা পাকা সব আর্টিস্টদের হাতে দেওয়া গেল, ফল কি হল দেখ। কচি আর্টিস্ট যে ছবি দিয়ে শুধু বাচন করতেই জানে সে অরণ্যানী এইটুকু মাত্র একটা বনের দৃশ্যে বাচন মাত্র করে হাত গুটিয়ে বসল— আর তো বাচন করবার কিছু পায় না। পক্ষীর চিক-চিক বৃষের রব বীণার ঝনৎকার, এসব তো ছবিতে ধরা যায় না, বাকি সমস্তটা মরীচিকার মতো এই দেখতে এই নেই। এদের স্থিরতা দিয়ে ছবিতে ধরলে সমস্তটা মাটি। কিন্তু আধপাকা আর্টিস্ট little learning বা স্বল্প শিক্ষা যাকে ভীষণ সমস্ত পরীক্ষায় ভুলিয়ে নিয়ে চলে, সে 'অরণ্য' কথাটি মাত্র ছবিতে বাচন করে খুশি হল না; সে নির্বাচন করতে বসে গেল— যেন যা হচ্ছে, যেন যা দেখা যাচ্ছে এমনি নব ছায়ারূপ মায় কস্তুরীগন্ধী সোনার মৃগটাকে পর্যন্ত রঙ রেখার ফাঁদে ধরতে চলল মহা উৎসাহে। প্রজাপতিকে যেমন ছেলেরা কুঁড়োজালিতে ধরে সেইভাবে সব ধরলে ছবিতে চিত্রভাষায় নীতি-পরিপক্ক আর্টিস্ট, কিন্তু দেখা গেল ধরা মাত্র সব চিত্র পুত্তলিকার মতো কাঠ হয়ে রইল, ঋষির গতিশীল বর্ণনা দুর্গতিগ্রস্ত হয়ে গিলটির ফ্রেমের ফাঁস গলায় দিয়ে অপঘাত মৃত্যু লাভ করলে। তারপর এল পাকা শিল্পীর পালা। সে ঋগ্বেদের সূক্তটা হাতে পেয়েই তার সমস্ত রসটা মন দিয়ে পান করে ফেললে, তারপর ছবির সাদা কাগজে মোটা-মোটা করে লিখলে— ছবি মানে Book illustration নয়, একমাত্র stage craft এই বর্ণনার illustration চিত্র শব্দ আলো ছায়া এবং নানা গতিবিধি ইত্যাদি দিয়ে ফুটিয়ে দিতে পারে নিখুঁতভাবে, আমি stage manager নই, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করবেন। কথাগুলো অরণ্যের সত্তাকে একদিক দিয়ে বোঝালে, ছবির ভাষা অন্য দিক দিয়ে তাকে বোঝাবে এই জানি, illustration চান, না ছবি চান সেটা জানলে এই পরীক্ষায় অগ্রসর হব ইতি—

পুঃ— ঋষিরা এক জায়গায় বলেছেন 'অন্যের রচনার সাহায্যে তোমরা স্তুতি করিও না', সুতরাং আমার নিজের মনোমতো রচনা দিয়ে আমি ঘরে গিয়ে অরণ্যের স্তুতি ছবি দিয়ে লিখে পাঠাব মনে করেছি; বিদায়—।

যে ছেলেটা সবচেয়ে জ্যেঠা, পরীক্ষক যদি পাকা হন তো জ্যেঠা হিসেবে তাকেই দেবেন ফুল মার্ক, আর কাঁচার পক্ষে ignorance bliss তাকে দেবেন পাস্ মার্ক, আর মাঝামাঝি ছেলেটিকে দেবেন শূন্য, এটা নিশ্চয়ই বলতে পারি। ছবি কথা ইঙ্গিত সুর সার ইত্যাদি যদিও এরা ভাষা—কিন্তু ব্যক্ত করার উপায় ও ক্ষেত্রে এদের সবারই একটু-একটু বিভিন্ন, এরা মেলেও বটে, না মেলেও বটে, এরা একই ভাষা-পরিবারভুক্ত কিন্তু একই নয়—'Language is a system of signs, of Ideas and of relation between Ideas. These signs may be spoken sounds as in ordinary speech or purely visual (নাট্য-চিত্র) or as the Egyptian Hieroglyphs (অক্ষর মূর্তি বা নিরূপিত বাক্য) or as construction of movements as in the finger language used by deaf mutes (ইঙ্গিত)'—(F. RYLAND).

মানুষের ভাষা সব প্রথম শব্দকে ধরে আরম্ভ হল কি বিচিত্র রূপকে ধরে তা বলা শক্ত, তবে স্বভাবের নিয়মে দেখি জন্মাবধি শিশু শব্দ শোনা, শব্দ করা, আলো ছায়া এবং নানা পদার্থের রূপ রঙ ইত্যাদি দুটোই একসঙ্গে ধরে বুঝতে এবং বোঝাতে চলেছে! ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং যে চোখের তারা ফিরিয়েছে বা যে হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে, তারি থেকে কথিত চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষায় একই দিনে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না।

পুরাকালেরও প্রাক্কালে মানুষ যেসব শব্দ করে এ ওকে ডাকত, সে তাকে আদর করে কিছু শোনাত কি জানাত, যে বাক্য তারা বলত তার সুর সার ইঙ্গিত আভাস কোন্ কালের আকাশে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু সেইসব দিনের মানুষের চিত্রিত যে বাক্যসকল তা এখনও যে গুহায় তারা থাকত তার দেওয়ালে বিচিত্র বর্ণ আর মূর্তি নিয়ে বর্তমান আছে; ইউরোপে এশিয়ার নানা স্থানে কত কি যে ছবি তার ঠিকানা নাই—গোরু মহিষ শৃগাল হস্তী অশ্ব মৃগযূথ দলে-দলে জলের মাছ যুদ্ধবিগ্রহ অস্ত্র-শস্ত্র কত কি! চিত্রের ভাষা দিয়ে তারা কি বোঝাতে চেয়েছিল তা এখনও ধরতে পাচ্ছি—দিনের খবর রাতের খবর জলের খবর বনের পশুর এমনকি হরিণের চোখটা কেমন তার খবরটা পর্যন্ত! সেইসব ইতিহাসের বাইরে ও-যুগের মানুষ এবং সাধক পুরুষেরা নিজেদের তপস্যালব্ধ চিত্রভাষার সাহায্যে মনোভাবগুলো লিখে গেছে, সুতরাং ছবিকেও খুব আদিকালে ভাষা হিসেবেই মানুষ যে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। শব্দের দ্বারায় বাক্যের দ্বারায় যেমন, আঁকা ও উৎকীর্ণ রূপের দ্বারাও তেমনি, পরিচিত সব জিনিসকে চিহ্নিত নিরূপিত নির্বাচিত করে চলেছে মানুষ—এই হল গোড়ার কথা। যারা জীবন্ত কিংবা যারা গতিশীল কেবল তাদেরই আদি যুগের মানুষেরা চিত্রের ভাষায় ধরতে চেয়েছে গাছ পাথর আকাশ যারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শব্দ করে না, চলে না, বলেও না, আলোতে অরণ্যানীর মতো হঠাৎ দেখা দেয় আবার অন্ধকারে হঠাৎ মিলিয়ে যায়, ছবির ভাষায় তাদের ধরা তখন সম্ভব বোধ করেনি মানুষ, হয়তো বা কথিত ভাষাতেও এসব বর্ণন করেনি তখনকার মানুষ, কেন যে তা এক প্রকাণ্ড রহস্য! ধরতে গেলে, বিদ্যুৎগতিতে দৌড়েছে যে হরিণ কি মাছ তাদের ছবিতে ধরার চেয়ে, পাথর গাছ কি ফুল যারা স্থির রয়েছে চিরকাল ধরে, আঁকা দিয়ে

তাদেরই ধরা সহজ ছিল, কিন্তু তা হয়নি। গাছপালা পাহাড় পর্বত, এরা বাদ পড়ে গেল, আর যাদের শব্দ অঙ্গভঙ্গি এইসব আছে—এককথায় যাদের ভাষা আছে—পুরাতন মানুষের ছবির ভাষা আগে গিয়ে মিলল তাদেরই সঙ্গে! এ যেন মানুষের সঙ্গে চারিদিকের যারা এসে কথা কইল তাদেরই পরিচয় আগে লিখতে বসল মানুষ; জলকে মানুষ জিজ্ঞসা করলে—জল, তুমি কেমন করে চল? জল স্রোতের রেখা ও গতিভঙ্গি দিয়ে এঁকে ইঙ্গিত করে শব্দ করে যেন জানিয়ে দিলে—এমনি করে ঢেউ খেলিয়ে এঁকে-বেঁকে চলি। হরিণ তুমি কেমন করে দৌড়ে যাও? হরিণ সেটা স্পষ্ট দেখিয়ে গেল। কিন্তু গাছকে পাথরকে শুধিয়ে মানুষ পরিষ্কার সাড়া পেলে না। গাছ, তুমি নড় কেন? এর উত্তর গাছ মর্মরধ্বনি করে দিলে—এই এমনিই নড়ি থেকে-থেকে, জানিনে কেন! গাছের কথাই বোঝা গেল না, ছবিতেও তার রূপ ধরলে না মানুষ। পাহাড়, দাঁড়িয়ে কেন? আকাশ দিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ফিরে এল, কেন! ছবির ভাষায় এদের কথা লেখা হলই না, শুধু এদের বোঝাতে মানুষ গাছ বলতে গোটাকতক দাঁড়ি কসি, পাহাড় বলতে একটা ত্রিকোণচিহ্ন দিয়ে গেল কখনও কখনও কতকটা চীনে অক্ষরের মতো,—রূপাভাষ, কিন্তু পুরো রূপচিত্র নয়। ব্রতধারী মানুষ কামনা ব্যক্ত করবার সময় পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে কথা ছবি সুর নাট্য ইত্যাদি মিশ্রিত ভাষা প্রয়োগ করে চলেছে তার রীতি আমাদের এখনও ধরে থাকতে হয়েছে— শুধু এককালের অস্ফুট শিশুভাষা স্ফুটতর হয়ে উঠেছে, পুরাকালের ব্রতধারীর ভাষার সঙ্গে এখনকার ভাষার।

যে মানুষ ছবি কথা কিংবা কিছু দিয়েই এককালে জননী পৃথিবীকে ধারণার মধ্যে আনতে পারেনি, স্ফুট ভাষার সাহায্যে সেই মানুষ আস্তে-আস্তে একদিন পৃথিবীকে নিরূপিত করলে— আলপনার পদ্মপত্রের উপর একটি বুদ্বুদের আকারে; স্তোত্রের উদাত্ত অনুদাত্ত সুরে ধরা পড়ল বসুন্ধরা—'হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্রদ্বারায় তোমার স্তব করেন।' জীবন্ত হরিণ যে দ্রুত চলেছে তাকে ব্যক্ত করতে হল যেমন গমনশীল রেখা, তেমনি গমনশীল বাক্য ও সুর বর্ণনা করে চলল আকাশে ভ্রাম্যমাণা পৃথিবীকে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ, অকার থেকে ক্ষ ইত্যাদি শব্দ এই মিলিয়ে হল কথিত ভাষা, আর আকার থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রাকার ও তার বিন্দুটি পর্যন্ত নানা রেখা বর্ণ ও চিহ্ন মিলিয়ে হল চিত্র-বিচিত্র ছবির ভাষা, এবং হাত-পায়ের নানা সংকেত ও ভঙ্গি নিয়ে হল অঙ্কের পর অঙ্ক ধরে গতিশীল নাটকের চলতি ভাষা। এই হল ভাষার আদি ত্রিমূর্তি এর পার্শ্বদেবতা হল দুটি—'বাচন' ও 'বর্ণন', এই মূর্তি নিয়ে ভাষা এগোলেন মানুষের কাছে। ঋষি বলেছেন—'হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নামমাত্র বাচন করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের শিক্ষার প্রথম সোপান—নামরূপ হল গোড়ার পাঠ।' এর পরে এল বন্দনা থেকে আরম্ভ করে বর্ণনা পর্যন্ত, আবৃত্তি থেকে শুরু করে বিবৃতি পর্যন্ত—'বালকদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল তাহা বাগ্দেবীর করুণায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল।'—ভাষা, বোধোদয় বস্তু-পরিচয় ইত্যাদি ছাড়িয়ে অনেকখানি এগোল। তারপর এল ভাষার মহিমা সৌন্দর্য ইত্যাদি—'যেমন চালনির দ্বারায় শক্তুকে পরিষ্কার করা হয় সেইভাবে বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিকৃত ভাষা

প্রস্তুত করিয়াছেন। (সেই ভাষাকে প্রাপ্ত হইলে পর) যাহাদিগের চক্ষু আছে কর্ণ আছে এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন...সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার লাভ করেন,... ঋষিদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী স্থাপিত আছেন...বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন...ঋষিদিগের অন্তঃকরণের মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন, সেই ভাষা আহরণপূর্বক নানাস্থানে বিস্তার করিলেন, সপ্ত ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে...।' বিশ্বরাজ্যের প্রকট রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সমস্তই পাচ্ছিল মানুষ ভাষাকে পাবার আগে থেকে, কিন্তু মনের মধ্যে তবুও মানুষের একটা বেদনা জাগছিল— মনের কথাকে খুলে বলবার বেদনা, মানসকে সুন্দররূপে প্রকট করার বাসনা, সুপরিকৃত ভাষাকে পাবার জন্যে বেদনা মনে জাগছিল। মানুষের সবচেয়ে যে প্রাচীন ভাষা তাই-দিয়ে-রচা বেদ এই বেদনের সুরে ছত্রে-ছত্রে পদে-পদে ভরা দেখি; 'আমার কর্ণ, আমার হৃদয় আমার চক্ষুর্নিহিত জ্যোতি সমস্তই তোমাকে নিরূপণ করিতে অবগত হইতে ধাবিত হইতেছে... দূরস্থবিষয়ক চিন্তাব্যাপৃত আমার হৃদয় ধাবিত হইতেছে... আমি এই বৈশ্বানর স্বরূপকে কিরূপে বর্ণন করি কিরূপই বা হৃদয়ে ধারণ করি!' কিংবা যেমন—'কিরূপ সুন্দর স্তুতি ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিবে।' হৃদয়ের বেদনার অন্ত নেই, দেখতে চেয়ে শুনতে চেয়ে প্রাণ ব্যথিত হচ্ছে ধাবিত হচ্ছে। অতি মহৎ জিজ্ঞাসার উত্তর পাচ্ছে মানুষ অতি বৃহৎ পরম সুন্দর, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরের মতো মহাসুন্দর ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।— 'যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন, সেই বিশ্বদেবতা সকলের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তমরূপে রচনা করি!' মনের নিবেদন সুন্দর করে উত্তম করে জানাবার জন্য বেদনা আর প্রার্থনা। কোনো রকমে খবরটা বাৎলে দিয়ে খুশি হচ্ছে না মানুষেব মন; সুন্দর উপায়সকল উত্তম-উত্তম সুর সার কথা গাথা ইঙ্গিতাদি খুঁজছে মানুষ এবং তারি জন্যে সাধ্য-সাধনা চলেছে—'হে বৃহস্পতি। আমাদিগের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতাদোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়।' ছবি দিয়ে যে কিছু রচনা করতে চায় সেও এই প্রার্থনাই করে— রঙ রেখা ভাব লাবণ্য অভিপ্রায়, সমস্তই যেন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হয়ে ফোটে। ধবিত্রীকে বর্ণন করতে ঋষি গতিশীল স্তোত্র আর ভাষা চাইলেন। ভাষার পথে গতি পৌঁছয় কোথা থেকে? মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাষাও বদলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি—বাংলার পক্ষে সংস্কৃতমূলক সাধু ভাষা হল অচল ভাষা, কেননা সে শব্দকোষ ব্যাকরণ ইত্যাদির মধ্যে একেবারে বাঁধা, মনের চেয়ে পুঁথির সঙ্গে তার যোগ বেশি! বাঙালির মন বাংলায় জুড়ে আছে, সুতরাং চলিত বাংলা চলেছে ও চলবে চিরকাল বাঙালির মনের গতির সঙ্গে নানা দিক থেকে নানা জিনিসে যুক্ত হতে-হতে, ঠিক জলের ধারা যেমন চলে দেশ-বিদেশের মধ্যে দিয়ে। ছবির দিক দিয়েও এই বাংলার একটা চলতি ভাষা সৃষ্ট হয়ে ওঠা চাই, না হলে কোন্ কালের অজন্তার ছবির ভাষায় কি মোগলের ভাষায় অথবা খালি বিদেশের ভাষায় আটকে থাকা চলবে না। ঋষিরা ভাষাকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন—'হে ইন্দ্র, হে অগ্নি! মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইল।'

বৃষ্টির জল ঝরনা দিয়ে নদী হয়ে বহমান হল, তবেই সে কাজের হল, আর জল আঁট হয়ে হিমালয়ের চুড়োয় বসে রইল—গললও না চললও না, গলালেও না চালালেও না, জলের থাকা-না-থাকা সমান হল। বাঁধা বস্তুর বা sytleএর মধ্যে এক-এক সময়ে একটা-একটা ভাষা ধরা পড়ে যায়। কথিত ভাষা চিত্রিত বা ইঙ্গিত করার ভাষা সবারই এই গতিক! যেমনি style বেঁধে গেল অমনি সেটা জনে-জনে কালে-কালে একই ভাবে বর্তমান রয়ে গেল— নদী যেন বাঁধা পড়ল নিজের টেনে-আনা বালির বাঁধে! নতুন কবি নতুন আর্টিস্ট এঁরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন style উল্‌টে পাল্‌টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে। এ যদি না হত তবে বেদের ভাষাই এখনও বলতেন, অজন্তার বা মোগলের ছবি এখনও লিখতেন এবং যাত্রা করেই বসে থাকতেন সবাই। ভাষাসকল গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াত অথচ দেখে মনে হত ভাষা যেন কতই চলেছে!

শিক্ষার বিরোধ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব পথে চলে আসছিল। সেটা ভালো কি মন্দ, এ বিষয়ে কারও কোনো উদ্বেগ ছিল না। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা আমিও পড়ব। এর থেকে তিনি যখন দু-পয়সা করে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চেয়ারে বসতে পেরেছেন, হ্যান্ডশেক করতে পেরেছেন, তখন আমিই বা কেন না পারব? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি। হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল। কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষাবিধানটাই বনিয়াদ সমেত এমনি টলমল করতে লাগল যে, একদল বললেন পড়ে যাব। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন না, ভয় নেই—পড়বে না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জরিত করে দিলেন। তার হেতু ছিল। মানুষের শক্তি যত কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরে গাল তাঁরা ঢের দিলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভয় তাঁদের মনের মধ্যেই রয়ে গেল, দৈবাৎ বাতাসে যদি আবার কোনোদিন জোর ধরে তো এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে অতিকায়টা হুমড়ি খেয়ে পড়তে মুহূর্ত বিলম্ব করবে না।

এমনি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এ তো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,— যা তারও বহু পূজ্য,— সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা Anglo-Indian কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে তাদের প্যাঁচালো উপদেশের আর বিরাম নেই। আর কিছু না হোক দেশের হিতাকাঙ্ক্ষায় এদের যখন বুক ফাটতে থাকে তখনি ভয় হয় ভেতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছে। বিশেষ করে বাঙালি পরিচালিত একখানা Anglo-Indian কাগজ। এর মুখের তো আর কামাই নেই। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কবির কথাগুলো বিকৃত, বিধ্বস্ত করে অবিশ্রাম বলছে—আমরা বলে বলে গলা ভেঙে ফেলছি, এখন রবিবাবু এসে রক্ষে করে দিলেন। যথা—

'And if there were any among educated Bengalees, who were

wavering and vacillating, knowing not what to do,— to exclude the West or to stick to the East— Rabindranath's recent Calcutta lectures have gone a great way towards making up their minds. They have given up their sitting-on-the-fence posture. They have jumped off on the Western side.'

অর্থাৎ আমরা দেশের শিক্ষিত সমাজ বেড়ার ডগায় বসেছিলাম, পশ্চিম-প্রত্যাগত কবির ইঙ্গিতে 'জয়রাম' বলে পশ্চিম দিকেই লাফিয়ে পড়লাম! বাঁচা গেল। শিক্ষিত সমাজের এতদিনে একটা কিনারা হল! কিন্তু শিক্ষিতের দল যা নিয়ে এতবড় রৈরৈ করেন, যাঁদের অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ অনুভব করেন না,— তাঁদের যুক্তিতর্কে এর কি মূল্য দাঁড়ায় একবার সেটাও ওজন করা ভালো। কিন্তু মোটের উপর পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কবি কি বলেছেন?

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হয়েছে সুতরাং সেই জয়ের কৌশলটা তাদের কাছে আমাদের শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা, লড়াইয়ের পরে, পশ্চিম শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কৈ?' অতএব তাদের সেটা বলে দেওয়া আবশ্যক। এও ভালো কথা। আমি যতদূর জানি অসহযোগপন্থীর কেউ এ বিষয়ে কোনো আপত্তি করে না। তৃতীয় দফায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' অতএব 'মা গৃধঃ'। চমৎকার কথা—কারও কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এ যে একটা তত্ত্ব নয়, সমস্ত দুনিয়ায় এও কেউ লোকসমাজে অস্বীকার করে না, অথচ মানুষের এমন পোড়া স্বভাব যে, সে সরল ও সহজ সত্য কিছুতেই সোজা করে বলে মিটিয়ে নেবে না আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজন মতো, তার মধ্যে অসংখ্য sub-clause, অগণিত qualification-এর আমদানি করে তাকে এমনি ভারাক্রান্ত করে তুলবে যে, তত্ত্বকথা আপনি হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াবে। তখন অসংকোচে তাকে সত্য বলে চিনে নেওয়াটাই কঠিন। শুধু এই জন্যই উপস্থিত factগুলোই সংসারে সত্যের মুখোশ পরে, মানুষের কর্ম ও চিন্তার ধারার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে, অপরিমেয় অনর্থের সূচনা করে দেয়।

কবি প্রথমেই বলেছেন :

'এ কথা মানতেই হবে যে, আজকার দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল।....অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোনো একটা সত্যের জোরে।'

আজকের দিনে এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীরভাণ্ডেই সে মুখ জুবড়ে আছে,—তার পেট ভরে দুই কস বেয়ে দুধের ধারা নেমেছে—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা fact; আজকের দিনে একে কিছুতেই 'না' বলবার পথ নেই,— আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই বলেই কি এই কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার

পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে? এবং এই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে। লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা fact, কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত তো আজকের দিনে নীচে, জলের উপর এবং ঊর্ধ্বে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে যে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিংবা মাথায় একটা বাড়ি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে ভোজ লাগালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন্ সত্য অধিকারে বলতে পারব না, কিংবা এ দুটো মহাবিদ্যে শেখার জন্যে তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না। তা ছাড়া গাঁটকাটা কিছুতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙালেও শিখিয়ে দেবে না কি করে তার মাথায় উলটে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, তো সে অন্য কোথাও—অন্তত তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে। হয়তো মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই, এ কথা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রিস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করেছিল। আফগানেরাও বড় কম করেনি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি। দুর্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্যোধনের পাত্র ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়েনি, কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে এসে সারা জীবন কেবল পাশাখেলা শিখেই কাটাতে হত। সুতরাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই? আফগান যখন হিন্দুস্থান জয় করেছিল, সে কি তার নিজের গুণে? হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিজেতা আফগানের কাছে শেখবার কিছুই ছিল না। আবার এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নয় যখন বিজেতাই পরাজিতের কাছে কি বিদ্যা, কি ধর্ম, কি সভ্যতা, কি ভদ্রতা সমস্তই শিক্ষা করে আর একদিন মানুষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে বলেছে, সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না? কে বলেছে, তার দ্বার পশ্চিমমুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নশাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমি বিদ্যে শেখবার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করছে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভান করার ওপর, শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর। এতকাল এই তামাশায় যোগ দিয়ে পাগলের মতো সবাই নেচে বেড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ জন-কয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায়

তারা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে এই ফাঁকিটাকে কেবল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে— এই তো দেখি আসলে মতভেদের কারণ।

এই বস্তুটাকেই একটু বিশদ করে দেখবার চেষ্টা করা যাক। পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময়, এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে ততই আনন্দে দম্ভে এদের বুক ভরে উঠেছে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছুদিন অগ্রসর হলে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটিমাত্র মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশি মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে দেখতে না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শেখাতে পারে, কিংবা শেখাবার সুযোগ দিতে পারে, অতি বড় কবি-কল্পনাতেও এ আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠতে পারে, মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয়নি? হয়েছে বৈ কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-product-এর মতো, বলা যেতে পারে। হোক by-product কিন্তু সে যখন মানবের হিতার্থে, তখন সেই বিদ্যাগুলো আয়ত্ত করেও তো আমরা মানুষ হতে পারি। হয়তো পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহংকার অভ্রভেদী। আমাদের এবং আমাদের মতো আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে তখনই ঘরে বাইরে এই কৈফিয়ত দেয় যে, এগুলো দেখতে শুনতে মানুষের মতো হলেও ঠিক মানুষ নয়। অন্তত সাবালক মানুষ নয়, ছেলেমানুষ। বেলজিয়াম যখন রবারের জন্য নিগ্রোদের দেশে গিয়ে নিগ্রোদেরই হাত কেটে দিত তখনও সেই অজুহাতই তারা দিয়েছিল যে, এরা আমাদের হুকুম মানতে চায় না। এরা অসভ্য। অতএব আমরা গায়ে পড়ে এদের সভ্য করবার, মানুষ করবার ভার যখন নিয়েছি, তখন মানুষ এদের করতেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্য এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক। তথাস্তু বলা ছাড়া ওর যে আর কি জবাব আছে আমি জানি না। আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেও ইংরাজ ঠিক এই জবাবটাই দিয়ে আসছে যে, এরা অর্ধসভ্য—ছেলেমানুষ। এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মতো বেশি খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদেরই ভালোর জন্যে। আবার টাকাকড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলে তাই সে-সমস্ত দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। এমনি সব ভালো করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করছেন—কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এদের মানুষ করতে এসেছি—কারণ মানুষ করার sacred duty যে আমাদেরই ওপরে। কিন্তু আঃ— গেলাম! by law established হয়ে ইন্ডিয়ানগুলোকে মানুষ করতে করতেই হয়রান হয়ে মোলাম।

ভগবান জানেন কবে এরা আবার by law disestablished হবে! কবে আমরা

মানুষ হয়ে এদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পারব। দেড়-শো বছর ধরে তালিম দেওয়া চলছে, কিন্তু মানুষ আর হলাম না। কবে যে হতে পারব সেও ওরাই জানে আর জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু ঐ দেড়-শো বছরেও যদি ওই মোহ আমাদের ঘুচে না থাকে, যে এদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সত্যিই একদিন মানুষ হয়ে উঠব, সত্যি সত্যিই আমাদের মানুষ করে নিজেদের মৃত্যুবাণ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলে দিতে এরা ব্যাকুল, তা হলে আমি বলি আমাদের কোনো কালে মানুষ না হওয়াই উচিত। ভগবান যেন কোনো দিন এই দুর্ভাগাদের পরে প্রসন্ন না হন!

বস্তুত, এ কথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই, আর কারও নয়—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম মতো জেলে দিতে ডেপুটি, সব্‌ডেপুটি, ধরে আনতে থানায় ছোট-বড় পিয়াদা, ইস্কুলে ভুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাস্টার, কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, অফিসে খাতা লিখতে জীর্ণ-শীর্ণ কেরানি—তার শিক্ষাবিধান এর বেশি দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে, সে যে পারে না কি আমি তাই শুধু ভাবি। অথচ কবি বলেছেন বাঁচবার বিদ্যা, কিংবা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল শুক্রাচার্যের হাতে, আজ তার বাড়ি পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হতে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়াতেই হবে, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়', অমৃত-লোকের লোক হয়েও কচ-কে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। হয়েছিল সত্য, কিন্তু বিদ্যা তো কচ সহজে আদায় করতে পারেনি, গুরুদেবের ভোজ্য পদার্থ পর্যন্ত হতে হয়েছিল! কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে—আমাদের দুরদৃষ্টে যদি গুরুদেবের ভোজনপর্ব পর্যন্ত হয়েই নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়, তামাশার বাকি আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদের নিজেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানব-জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদৃষ্ট, যে বস্তু তার দৃষ্টির বাহিরে, এবং যার ওপর তার কোনো হাত নেই। তেমনি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা তার সাধ্যের অতীত, যা তার দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে এ কথা উড়িয়ে দেবেন না। দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও অনেকটা দায়ী, যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু কবি এ কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে উপমাচ্ছলে একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা এই :

'মনে কর এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে। অন্য ছেলেটি ভালোমানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কল-কারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্ধ্বস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারল। গাড়ি চালাবার শখ্ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁশই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী, ছেলেও সেই রথের রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালোমানুষ ছেলেটি দেখলে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্চে, তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে 'মরণং ধ্রুবম্',— তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বললে 'আমার আর কিছুতে দরকার নেই।'

এই গল্পের সার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারিনি। ছেলে-দুটি কে তা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম্য দেখে যে বাপ প্রসন্ন হন, তিনি যে কিরূপ বাপ তা বোঝা যায় না! তবে এ কথা বেশ বোঝা যায়, এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে—তা তিনি যত বড় রথেরই রথী হোন, তার 'মরণং ধ্রুবম্'।

অতঃপর কবি এই দুটি ছেলের জীবন-বৃত্তান্তও দিয়েছেন। মোটর-হাঁকানো ছেলেটি তো ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের ক্লাসে প্রোমোশন পেলে, কিন্তু যে ছেলেটির 'মরণং ধ্রুবম্' সে তার ম্যাজিক ও তন্ত্র-মন্ত্র নিয়েই পড়ে রইল। এই তন্ত্র-মন্ত্রের পরে কঠোর কটাক্ষ কবি পূর্বেও করেছেন। তাঁর 'অচলায়তনে' এ নিয়ে হাসি-তামাশা অনেক হয়ে গেছে, যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা এর মীমাংসা করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ববস্তুর পেছনে যে কোনো-একটা অজ্ঞেয় শক্তি আছে, মানব ইতিহাসে এ একটা প্রাচীন তথ্য। এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও কূলকিনারা তার তেমনি অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞেয় শক্তিকে প্রসন্ন করে কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ চিরদিন করে আসছে,— আজও তার উপায় বার হয়নি, অথচ আজও তার অবসান নেই। এই উপায় আবিষ্কারের পথে কি করে যে প্রার্থনা একদিন ম্যাজিকে অর্থাৎ মন্ত্র-তন্ত্রে এবং ম্যাজিক আর একদিন প্রার্থনায় চেহারা বদলে দাঁড়ায় এ তর্ক তুলে পুঁথি বাড়াতে আমার সাধ নেই। ঈশ্বরের ধারণার অভিব্যক্তির ইতিহাসের এই অংশটা বিজ্ঞানের পরিণতির প্রশ্নে আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

সে যাই হোক, এই মোটর-হাঁকানো ছেলেটির উন্নতির হেতুবাদ এবং সেই পায়ের-

দিকে-তাকানো ভালো ছেলেটির দুঃখের বিবরণ কবি এইখানে একবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যথা :

'পূর্বদেশে আমরা যে সময় রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকচি, দৈন্য হলে গ্রহ-শান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্চি শীতলা দেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেচি, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুনেচি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য? ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায় কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই। ইউরোপের কোনো কোণে-কানাচে যাদুমন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।'

কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে বলার আর কিছু নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন কি, সেঁকো বিষ খেতেও কারও আপত্তি করা কর্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য? ভল্‌টেয়ার বেশি দিনের লোক নন, তাঁর মতো পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন সে দেশে বড় সুলভ ছিল না, অতএব এ কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তখনকার দিনে অজ্ঞান ও বর্বরতায় কি এ দেশটা এতখানিই নীচের ধাপে নেবে গিয়েছিল যে ঠিক এমনি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিল না যে বলে, 'বাপু, ভূতের ওঝা না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ি যাও, মারতে চাও তো অন্য পথ অবলম্বন কর, কেবল ঘরে বসে নিরালায় মারণ-মন্ত্র জপ করলেই কার্য সিদ্ধ হবে না।!' ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিংবা যে হাতি পাঁকে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্ব্বিবাদে হজম করতে পারিনে। *গোরা* বলে বাংলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন তো দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—'নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মতো পাপ সংসারে অল্পই আছে।'

কবি বলেছেন, যাদু-মন্ত্রের পরিণতিই হচ্ছে বিজ্ঞানে। কোনো একটা বস্তু কত দিক থেকে যে পরিণত হয়ে ওঠে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে ইউরোপ তার যাদুবিদ্যার নালা এক লাফে ডিঙিয়ে গেল, আর আমরা দেশসুদ্ধ লোক মিলে ঘাড়-মোড় ভেঙে সেই পাঁকেই চিরকাল পুঁতে রইলাম। বাইরের দিকে বিশ্ববস্তু যে একটা প্রকাণ্ড কল, এর অখণ্ড, অব্যাহত নিয়মের শৃঙ্খল যে যাদুবিদ্যায় ভাঙে না, সংসারে যা-কিছু ঘটে তারই একটা হেতু আছে, এবং সেই হেতু কঠোর আইন-কানুনে বাঁধা, অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী বিশ্ব-জগতে কার্য-কারণের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুর্ভাগ্য পূর্বদেশে কারও ছিল না? এবং এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা কি পশ্চিম হতে আমদানি না করতে পারলে আমাদের ভাগ্যে মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের বেশি আর

কিছুই মিলতে পারে না? পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ-সংস্থান, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলের প্রতি যদি শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে, তো মনে হয়, লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভালো। বস্তুত, এই তো নাস্তিকতা। আমি পূর্বেই বলেছি, যে-শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে—অন্তত, তাদের মানুষের ধারণা যা—তা তারা আমাদের দেয়নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গেও যে আমরা কি হয়ে আছি, মাত্র সেইটুকুই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়েছি কেবল এই শিক্ষা— যাতে নিজেদের সর্ববিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা কিছু সমস্তের পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনতিও আজ আমাদের এত গভীর। সেটা তো জানবার পথ নেই, তাই শুধু তাদের বাহিরের সাজসজ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রতি যেমন ঘৃণা, অন্য দিকে তাদের প্রতিও ভক্তির আবেগ একেবারে শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। তাই, একদিন আমাদের দেশের একদল লোক নির্বিচারে ঠিক করেছিলেন, ঠিক ওদের মতো হতে না পারলে আর আমাদের মুক্তি নেই! ওদের জাতিভেদ নেই—অতএব সেটা ঘোচানো চাই, ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—অতএব সেটা না হলেই নয়, তাদের খাওয়া-দাওয়ার বাচ-বিচার নেই—সুতরাং ওটা না তুললেই আর রক্ষা নেই, তাদের মন্দির নেই—অতএব আমাদের গির্জার ব্যবস্থা চাই, তারা ভাড়া করে ধর্ম-প্রচারক রাখে সুতরাং আমাদেরও ওটা অত্যাবশ্যক—এমনি কত কি! কেবল গায়ের চামড়াটা বদলাবার ফন্দি তাঁরা খুঁজে পাননি, নইলে আজ তাঁদের চেনাও যেত না! অথচ, আমি এর দোষ-গুণের বিচার করছি নে, আমি সরলচিত্তে বলছি, কোনো দল বা ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করবার আমার লেশমাত্র অভিরুচি নেই, আমি কেবল এর mentalityটাই আপনাদের গোচর করবার প্রয়াস করছি। এই যে বিদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি নিদারুণ বিরাগ, এ শুধু সম্ভবপর হয়েছিল তাদের অন্দরের পথটা চিরদিন বন্ধ ছিল বলে। তাই এদের সংসর্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি পেয়ে বসেছিল যে, এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাঁদের মুহূর্ত বিলম্ব ঘটেনি যে, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কেবল সেইটুকুর হুবহু নকল করলেই, তাঁরাও অমনি মানুষ হয়ে ওদের অন্তরে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে সরাসরি বসে যেতে পারবেন। সংসারে যা-কিছু অজ্ঞাত, গোপন, যার ভিতরে প্রবেশের পথ নেই, তার প্রতি বাইরের লোকের লোভের অবধি থাকে না। তাই এ কথা তাঁদের স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নিতে কোথাও কিছুমাত্র বাধেনি যে, মানুষ হবার সত্যকার সজীব মন্ত্রটি কেবল ওদের এই নিগূঢ় মর্মস্থানটিতেই চাপা দেওয়া আছে, কোনো মতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করবার দ্বিতীয় পন্থা নেই। এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মায়।

এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ চলেছে,—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ, অত বড় বড় বাড়ি কি হবে? কি হবে টানা পাখায়? কাজ কি আমার টেবিল চেয়ারে—দূর করে দাও মোটা মাইনের বিলিতি প্রফেসার—তার খরচ জোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হয়ে গেল—এমনি আরও কত শত। এর কোনোটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোন্‌খানে? এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? একি কেবল গোটা-কতক সাজগোজ বদলালেই হবে? টেবিল-চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেকট্রিক ফ্যানের পরিবর্তে তালপাখা এনে, কিংবা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা মাইনের দিশি অধ্যাপক আমদানি করে কিংবা বড়জোর বিদেশি ভাষার মিডিয়মের স্থানে স্বদেশি ভাষায় লেক্‌চারের আইন করলেই দুঃখ দূর হবে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মতো, ভিক্ষুকের মতো কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে—তাতে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনো দিন মনুষ্যত্ব দেবে না।

আমার এ-সব কথার কথা নয়—উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশি লেক্‌চার নয়—সত্য সত্যই যা আমি সত্য বলে বুঝেছি তাই কেবল আপনাদের কাছে বলছি। মানুষের একপ্রকার শিক্ষা আছে, যা কেবল নিছক ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার খাতিরে মানুষ অর্জন করতে চায়। যে mentality থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ ইংরিজি ভাষাটা সাহেবের গলায় বলাটাকেই চরম উন্নতি জ্ঞান করে, এবং এই mentality-রই এক ধাপ নীচের লোকগুলো জাহাজে এবং রেলগাড়িতে সাহেবি পোশাক ছাড়া কিছুতেই বেড়াতে চায় না। এবং এই জিনিসটা এত ইতর, এত ক্ষুদ্র যে, এ কেন হয়, এর কি উদ্দেশ্য এ বিষয় আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই জানি এই ছদ্মবেশের হীনতা, এই আপনার কাছ থেকে আপনাকে লুকোবার পাপ, এবং গভীর লাঞ্ছনা আপনারা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এ কথা কেন যে উত্থাপিত করলাম তাও বুঝতে আপনাদের বাকি থাকবে না।

এইখানে জাপানের কথা স্মরণ করে কেউ কেউ বলতে পারেন, এই যদি সত্য, তবে জাপান আজ এমন হল কিসের জোরে? তার চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার ইতিহাসটা একবার ভেবে দেখ! ভেবে আমি দেখেছি। পশ্চিমের শুক্রাচার্যের শিষ্যত্বের জোরেই যদি সে আজ বড় হয়ে থাকে, তবে বড়ত্বটাও মেপে দেখেছি আমরা শুক্রাচার্যেরই মাপকাঠি দিয়ে। কিন্তু মানবত্ব বিকাশের সেই কি শেষ মানদণ্ড? জাতীয় জীবনে এই দুশো পাঁচশো বছরের ঘটনাই কি তার চরম ইতিহাস?

আমি জাপানের ইতিহাস জানিনে। তার কি ছিল এবং কি হয়েছে এ বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, কিন্তু এই তার পার্থিব উন্নতির মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার পদতলে যদি তার আত্মসমর্পণের সূচনাই করে থাকে, তো তারস্বরে অনন্দধ্বনি করবার বোধ হয় বেশি

কারণ নেই। এবং এমনি দুর্দিন যদি কখনো ভারতের ঘটে—সে তার বিগত জীবনের সমস্ত tradition বিস্মৃত হয়ে ঠিক অতখানি উন্নত হয়েই ওঠে, এক কালো চামড়া ছাড়া পশ্চিমের সঙ্গে তার কোনো প্রভেদই না থাকে, তো ভারতের ভাগ্য-বিধাতা উপরে বসে সেদিন হাসবেন কি নিজে চুল ছিঁড়বেন বলা কঠিন।

কোনো বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না—হবার জো-ই নেই। তাদের যে বিদ্যাটার প্রতি আমাদের এত লোভ, তা তাদের মাথায় হাত বুলিয়েই শিখে নিই, বা পায়ে তেল মাখিয়েই অর্জন করি—এর ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী যদি না সে দেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে, এর মূল যদি না জাতির অতীতের মর্মস্থল বিদীর্ণ করে এসে থাকে। এই ফুল সমেত বৃক্ষশাখা, তা সে বর্ণে ও গন্ধে যত দামিই হোক, একদিন শুখোবেই শুখোবে, কোনো কৌশলই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেছে যে, ঠকিয়ে-মজিয়েই হোক বা কেড়ে-বিকড়েই হোক, নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে। তার অতিরিক্ত যা সে শুধুই ভার, নিছক আবর্জনা। পরের দেখে আমরাও যেন এই ঐশ্বর্যের প্রতি লুব্ধ হয়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি তো সে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেছে, ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুরছে, ঐ যে শহরের আলোর মালার আদি অন্ত নেই, ঐ যে শত সহস্র বিদেশি সভ্যতার তোড়জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেছি, ওর কোনোটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মতো আবার যদি কোনো দিন ওর আমদানির মূল শুকিয়ে যায় তো ভোজবাজির মতো ওদের অস্তিত্ব এ দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হবে না। ও-সকল আমরা সৃষ্টি করিনি করতেও জানিনে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা। আজ ও-সকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ, ওর কোনোটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠেনি। এই যে দেখাদেখি প্রয়োজন, এ যদি আমরা গড়তেও না পারি, ছাড়তেও না পারি তা হলে দুষ্ট-ক্ষুধার মতো ও কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িতই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম ওদের সৃষ্টি করেছে নিজের গরজ থেকে, তাদের সভ্যতায় ও-সকল চাই-ই চাই। ঐ যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-কামান-বন্দুক-গ্যাসের নল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ, ও-সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই কোনোটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের নিত্য নব আবির্ভাব দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হয়ে উঠছে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি, নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানির সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি কিন্তু বাণিজ্যজাহাজই বল, আর মোটরগাড়িই বল, যতক্ষণ না সে নিজেদের প্রয়োজনে, নিজের দেশে, নিজের জিনিসের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে, ততক্ষণ যেমন করে এবং যত টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ

করে আনি, সে আমাদের সত্যকারের ঐশ্বর্য নয়। তাই ম্যানচেস্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গ্লাসগো লিনেন এবং মসলিন, স্কট্‌ল্যান্ডের পশমী শীতবস্ত্র—তা সে আমাদের যত শীতই নিবারণ করুক এবং দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুক, কোনোটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জনা।

কিন্তু আমি একটু সরে গেছি। আমি বলেছিলাম যে, মানুষ কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনও সত্যকারের সম্পদও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষে বড়জোর সেইটুকুই তৈরি করতে পারে, কিন্তু তার বেশি সে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা দেখা যায় না—এমন কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস—আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মস্থ হতে দেয় না, অতীতের গৌরব-কাহিনী মুছে দিয়ে আত্মসম্মানে অবিশ্রাম আঘাত করে, কানের কাছে কেবলি শোনাতে থাকে আমাদের পিতা-পিতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্র-তন্ত্র, দৈবজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্যকারণের সম্বন্ধজ্ঞান বা বিশ্বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না—তাই আমাদের এ দুর্দশা, তা হলে সে শিক্ষায় যত মজাই থাক, তার সঙ্গে অবাধ কোলাকুলি একটু দেখে শুনে করাই ভালো।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ মারবার শতকোটি মন্ত্র-তন্ত্র, পরের দেশে তার মুখের গ্রাস অপহরণ করবার ততোধিক কল-কারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে—কিন্তু ঠিক ঐ সকল আমাদের দেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কিনা আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন, এই-সকল মহৎ কার্য করেছে তারা নিশ্চয়ই কোনো একটি সত্যের জোরে। অতএব ওটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যেটা তাদের সত্য। এবং পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু তো বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে, সুতরাং শয়তানির যোগেই ওদের মরণ।

হতেও পারে। কিন্তু যে লোক শুধু মারণ-উচ্চাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপতে শুরু করেছে, তার কোন্‌টা সত্য আর কোনটা শয়তানি নির্ণয় করা কঠিন। কবি আমাদের মুখে একটা কথা গুঁজে দিয়ে বলেছেন :

'ঐ কথাটাই তো আমরা বার বার বলছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এতবড় হাঁ করেচে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে; এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষমতো পরিহার করা চাই।'

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে তো খুব বেশি অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics, Chemistry হিন্দু কি ম্লেচ্ছ এ কথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে culture জিনিসটারও জাত নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। এবং ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মতো পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে, তো সে কেবল এই জন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয়। আর এই যদি ঠিক হয় যে, তারা কেবল

অবিদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে, তা হলে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে, প্রবন্ধের মধ্যে শ্লোক তুলে তুলে হতেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কিভাবে সমন্বয় হতে পারে আমি জানিনে। যাদের গেলবার মতো বড় হাঁ আছে তারা গিলবেই— মনু বা উপনিষদের দোহাই মানবে না। অন্তত এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমের এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলছে, এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়ি বেশ তাজা আছে তাতে আশ্চর্য হবার আছে কি? এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ বাধিয়েছিল তাদের দুপক্ষই চমৎকার সুস্থ দেহে ও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে। এবং ফের যদি আবশ্যক হয় তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হবে।

সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুল-চিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে থাকে, 'ভারতের বাণী কৈ?' তাহলে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করছে! এবং এই জন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঃ' মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে— এ ভরসা কবির থাকলেও আমার নেই। কারণ বাঘের কানে 'বিষ্ণু-মন্ত্র' ফুঁকলে বৈষ্ণব হয় কি না আমি ভেবে পাইনে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্ছে standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই কিন্তু ওদের সমাজ-নীতির যেমন interpretationই দেওয়া যাক তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়ার। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে, এ সত্য সে অস্বীকাব করবে না। এ ধনী হওয়ায় অর্থ তো কেবল সংগ্রহ করাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোনো মানেই থাকে না। সুতরাং কোনো একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় তো অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না। তবু এই একটা কথা নিত্য নিয়ত মনে রাখলে দুরূহ সমস্যার আপনি মীমাংসা হয়ে যায়। এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আজ আমার কথায়, আমাদের ঋষিবাক্যে সে কি তার সমস্ত civilisation-এর কেন্দ্র নাড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহু যুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্যন্ত সে কখনও তার গায়ে লাগতে দেয়নি। আপনাকে এমনি সতর্ক, এমনি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে রেখেছে যে কোনোদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায়নি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশের রাজার মাথার কোহিনূর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্যন্ত, যেখানে যা-কিছু আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ-দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে, কিন্তু

আজ খামকা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্যবস্তুর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পদার্থের inquiry করে থাকে তো আনন্দ করব কি হুঁশিয়ার হব—চিন্তার কথা।

ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,—এই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালোই হোক তারা নেবে না, কারণ তাতে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না—কথাটা শুনতে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভালো। বাকিটুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জনা। তাদের মতো পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি তো মারণমন্ত্র যত সত্যই হোক তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভালো।

আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ করব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হল না—কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না বলেও থাকতে পারলাম না যে, বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ-দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোনো একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমনও হতে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উলটো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশে না, এ দুটো পদার্থও একেবারে উলটো, তবু তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য থাকা ভালো।

☐ ১৩২৮ সালে 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে' পঠিত

লেখক-পরিচিতি

রামমোহন রায়

জন্ম ১০ মে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে, হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে। পিতা রামকান্ত। মাতা তারিণী দেবী। এঁদের পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের দরবারে 'আমিন' ছিলেন; সেই সূত্রে 'রায়' উপাধি লাভ। বাংলা এবং ইংরেজি ছাড়াও আরবি, ফারসি, উর্দু, হিব্রু, ফরাসি, গ্রিক ও লাতিন ভাষাতেও রামমোহন ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান, রাজনীতি, চিন্তাধারার সমন্বয়সাধক 'ভারত-পথিক' রামমোহন আধুনিক ভারতে প্রথম বিশ্ব-পথিক। শিক্ষা-সংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারকরূপেও তিনি কীর্তিমান। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টাতেই সম্ভব হয় সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ। 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন বাংলা-গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধরচনার অন্যতম পথিকৃত।

মৃত্যু ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : আরবি ও ফারসি ভাষায় *তুহ্‌ফাৎ-উল-মুবাহ্‌হিদ্দীন*; বাংলা ও সংস্কৃতে *বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, ঈশোপনিষৎ, গোস্বামীর সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, ব্রহ্মোপাসনা, সহমরণ বিষয়, গৌড়ীয় ব্যাকরণ* প্রভৃতি।

পত্রিকা-সম্পাদনা : ইংরেজি-বাংলায় দ্বিভাষিক—*ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ব্রাহ্মণ সেবধি,* বাংলায় *সম্বাদ কৌমুদি,* ফারসি ভাষায় *মিরাৎ-উল-আখ্‌বার*।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

জন্ম ৯ মার্চ ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে, চব্বিশ পরগনায় কাচড়াপাড়ায়। পিতা, হরিনারায়ণ গুপ্ত। মাতা শ্রীমতী দেবী। দশ বছর বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে মাতুলালয়ে আশ্রয় পান। ছেলেবেলায় লেখাপড়ার সুযোগ পাননি, তবে মুখে ছড়া কাটতে পারতেন। পরে কবির দলে, হাফ-আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধতেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জানুয়ারি বন্ধু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় *সংবাদ প্রভাকর* সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। গদ্য এবং পদ্য রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। *সংবাদ প্রভাকর* ছাড়া তিনি *সংবাদ রত্নাবলী*, *পাষণ্ড পীড়ন* এবং *সংবাদ সাধুরঞ্জন* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবিকে 'খাঁটি বাঙালি' কবি বলে চিহ্নিত করেছেন। ইংরেজি-শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যাদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা কখনও

প্রাচীন যুগের শেষ কবি বলে অভিহিত করি। তবে সাময়িক প্রসঙ্গ ও ঐহিক বিষয় অবলম্বনে কৌতুক-পরিহাসময় খণ্ড কবিতা রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ 'দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরে শিক্ষানবিশ ছিলেন।' প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান সংগ্রহ এবং ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে নিধুবাবু-রাম বসু প্রভৃতির জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যাদর্শের প্রকাশ ঘটেছে। মৃত্যু ২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *কালীকীর্তন*, *কবিবর ঁভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত*. *প্রবোধ প্রভাকর*, *হিত প্রভাকর*, *মহাকবি ঁঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কবিতাবলী সারসংগ্রহ*।

প্যারীচাঁদ মিত্র

জন্ম ২২ জুলাই ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায়। পিতা রামনারায়ণ মিত্র। প্যারীচাঁদ হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করেন। ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবনের সূচনা হয় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিতে 'সাব-লাইব্রেরিয়ান' হিসেবে। পরে তিনি লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। জ্ঞানানুশীলনে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বীটন সোসাইটি, বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-পরিচালনায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। প্যারীচাঁদকে ঠিক বিদ্রোহী ইয়ংবেঙ্গল বলা না গেলেও তিনি *জ্ঞানান্বেষণ* ও *বেঙ্গল স্পেকটেটর* পত্রিকা পরিচালনা ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে যৌথভাবে *মাসিক পত্রিকা* সম্পাদনা করেন, এবং সেই পত্রিকার জন্যই লেখেন *আলালের ঘরের দুলাল*। বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও চর্চার নিদর্শন আছে ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থাদিতে— যথা, কৃষিবিদ্যা, প্রেততত্ত্ব, থিওজফি। তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানেরও তিনি মালিক ছিলেন। তবে প্যারীচাঁদের বাংলা রচনাবলী ভাবুক, শিল্পী এবং কর্মী পরিচয়ের মিলনে মূল্যবান বিবেচিত হয়।
মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৮৮৩ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *আলালের ঘরের দুলাল*, *মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়*, *রামারঞ্জিকা*, *কৃষিপাঠ*, *যৎকিঞ্চিৎ*, *অভেদী*, *আধ্যাত্মিকা*, *এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা*, *বামাতোষিণী*।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১৫ মে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে। পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ। মাতা দিগম্বরী দেবী। শিক্ষা, প্রথমে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে, পরে, হিন্দু

কলেজে। ছাব্বিশ বছর বয়সে ২০ জন বন্ধুসহ তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। বিষয়কর্মে ইনি যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনি ধর্মপ্রবর্তনায় তাঁর নিষ্ঠা ছিল। ১৮৬৭ খ্রি. ব্রাহ্মণগণ তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৬ খ্রি. বীরভূমের ভুবনডাঙার একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড কিনে সেখানে যে আশ্রম নির্মাণ করেন তা-ই আজকের শান্তিনিকেতন।

মৃত্যু ১৯ জানুয়ারি ১৯০৫ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, উপহার, আত্মজীবনী* প্রভৃতি।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

জন্ম ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে, চব্বিশ পরগনার চাংড়িপোতা গ্রামে। পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। গ্রামের পাঠশালায় কিছুকাল অধ্যয়ন করে দ্বারকানাথ স্বগ্রামে জনৈক আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতশিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮৪৫ খ্রি. সংস্কৃত কলেজেব শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতার পর সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ও পরে অধ্যাপক এবং কিছুদিন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের সহকারীরূপে কাজ করেন। তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা। মার্জিত রুচি, প্রাঞ্জল ভাষা ও নির্ভীক সমালোচনার জন্য পত্রিকাটি বিশিষ্ট ছিল। ইনি নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

মৃত্যু ২৩ অগাস্ট ১৮৮৬ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *নীতিসার, পাঠামৃত, ছাত্রবোধ, ভূষণসার ব্যাকরণ* প্রভৃতি ছাত্রপাঠ্য পুস্তক এবং *প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সুখ, বিশ্বেশ্বর বিলাপ পদ্য* প্রভৃতি কাব্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত

জন্ম ১৫ জুলাই ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে, নবদ্বীপের কাছে চুপী গ্রামে। পিতা পীতাম্বর। মাতা দয়াময়ী দেবী। গ্রামের পাঠশালা থেকে ১০ বছর বয়সে কলকাতায় গিয়ে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে শিক্ষালাভ করেন। এখানে দু'বছর পড়ার পরেই পিতৃবিয়োগের ফলে পড়া ছেড়ে তাঁকে অর্থোপার্জনে উদ্যোগী হতে হলেও আজীবন তিনি পড়াশুনা করে গেছেন। কালক্রমে বিবিধ বিষয়ে এবং ফরাসি ও জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশীয় ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা পরিচালিত পাঠশালায় উনিশ বছর বয়সে অক্ষয়কুমার মাসিক ৮ টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে নর্মাল স্কুলে প্রধানশিক্ষকতা করেন। উদারনীতিক ও সংস্কারমুক্ত অক্ষয়কুমার উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ যুগের অন্যতম পথিকৃত।

মৃত্যু ২৮ মে ১৮৮৬ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *চারুপাঠ* (১-৩), *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, পদার্থবিদ্যা, ধর্মনীতি, বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* (১-২), *প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার* প্রভৃতি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে, মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা ভগবতী দেবী। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র ন'বছর বয়সে পিতার সঙ্গে পদব্রজে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। একাদিক্রমে বারো বছর কাব্য, ব্যাকরণ, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি পাঠ করে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হিন্দু ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। ১৮৪১ খ্রি. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেডপণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৪৬ খ্রি. সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক, ১৮৫০-এ উক্ত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এক বছর পরে উক্ত কলেজের নবসৃষ্ট অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সর্ববিভাগের সংস্কারসাধনে ব্রতী ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রি. 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠার পর ১৮৬৪ খ্রি. এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে আসে। এই স্কুলই প্রথমে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন' এবং পরে ১৮৭২ খ্রি. কলেজে রূপান্তরিত হয়, যা আজ 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ, শাস্ত্রবিদ, সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর শিক্ষকতা এবং শিক্ষাবিষয়ক কার্যাদিতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বিধবাবিবাহের প্রবর্তনা। কবি মধুসূদন তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন : The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother. রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'

মৃত্যু ২৯ জুলাই ১৮৯১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বেতালপঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, কথামালা, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, চরিতাবলী, সীতার বনবাস, আখ্যানমঞ্জরী, ভ্রান্তিবিলাস, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগরচরিত* প্রভৃতি।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

জন্ম ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে, চব্বিশ পরগনার শুঁড়া গ্রামে। পিতা জনমেজয়। গোবিন্দচন্দ্র বসাকের ফ্রি স্কুলে শিক্ষালাভের পর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু

কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে বিবাদের ফলে কলেজ ত্যাগ করেন। এরপর আইন ও ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। ক্রমে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি, উর্দু, গ্রিক, লাতিন, ফরাসি, জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। ১৮৪৬ খ্রি. এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। কখনও সহ-সভাপতি, কখনও সম্পাদক এবং সবশেষে প্রথম ভারতীয় সভাপতিরূপে (১৮৮৫) তিনি আমৃত্যু এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রি. 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার অন্যতম পুরোধা, পুরাতত্ত্ববিৎ, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক রাজেন্দ্রলালকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল' উপাধি প্রদান করে (১৮৭৬)।

মৃত্যু ২৬ জুলাই ১৮৯১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *প্রাকৃত ভূগোল, শিল্পিক দর্শন, শিবাজীব চরিত্র, মেবারের রাজেতিবৃত্ত, পত্রকৌমুদী, অশৌচ ব্যবস্থা, মানচিত্র* প্রভৃতি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার হরীতকীবাগানে। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। মাতা ব্রহ্মময়ী দেবী। প্রথমে সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করে পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে মাসিক বৃত্তি পেতেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু ও গৌরদাস বসাক। ১৮৪৫ খ্রি. হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে কিছুদিন হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে ও স্ব-প্রতিষ্ঠিত চন্দননগর সেমিনারিতে শিক্ষকতা করেন। তিন বছর পর কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে সরকারি শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। ১৮৬৪ খ্রি. Additional Inspector of Schools পদ প্রাপ্ত হন। পরে বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং শেষে হান্টার কমিশনের সদস্য হিসাবে (এডুকেশন কমিশন) ১৮৮৩ খ্রি. অবসর নেন। চাকুরির সঙ্গে সমান্তরালভাবে গ্রন্থরচনা ও সাময়িকপত্র-পরিচালনা করতেন। 'শিক্ষাদর্পণ' ভূদেব পরিচালিত শিক্ষাবিষয়ক প্রথম সাময়িকপত্র। পরে 'এডুকেশন গেজেট' ও 'বার্তাবহ' সাপ্তাহিক পত্রিকার দায়িত্ব নেন। ভ্রমণের নেশা ছিল। তাঁর দানশীলতা বিখ্যাত।

মৃত্যু ১৫ মে ১৮৯৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব, পুরাবৃত্তসার, বাঙলার ইতিহাস, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস* প্রভৃতি।

রাজনারায়ণ বসু

জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে, চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে। পিতা নন্দকিশোর। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে কলেজ ছেড়ে

উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদকরূপে তত্ত্ববোধিনী সভায় কাজ করেন ১৮৪৬-৪৯ খ্রি.। পরে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষক ও মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধানশিক্ষকরূপে ১৮৬৮ খ্রি. অবসরগ্রহণ। অন্যত্র পদোন্নতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রিয় কর্মকেন্দ্র মেদিনীপুর ত্যাগ করেন নি। সেখানে শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষার জন্য একটি রাত্রিকালীন বিদ্যালয় ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মমতে ব্রাহ্ম ছিলেন। 'ঋষি' আখ্যায় অভিহিত বঙ্গ সংস্কৃতির একজন প্রধান পুরোধা রাজনারায়ণ এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষকতাও করেছিলেন।

মৃত্যু ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *আত্মচরিত, সেকাল আর একাল, প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত, সায়েন্স অফ রিলিজিয়ন, রিলিজিয়ন অফ লাভ* প্রভৃতি।

কেশবচন্দ্র সেন

জন্ম ১৯ নভেম্বর ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায়। পিতা প্যারীমোহন। মাতা সারদাসুন্দরী দেবী। শিক্ষা হিন্দু কলেজে ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে। হিন্দু কলেজে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৫৭ খ্রি. ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং অচিরেই দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা বিলোপের চেষ্টায় অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহী হন এবং অব্রাহ্মণ, কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিসহ সমাজের আচার্যপদে নিয়োজিত করেন। অসাধারণ বাগ্মিতা ও স্বদেশপ্রীতির জন্য দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। কন্যা সুনীতির বিবাহ উপলক্ষে (১৮৭৮) নিজসৃষ্ট 'উপবীতত্যাগ' প্রথা এবং মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়ঃসীমা লঙ্ঘনের ঘটনায়, এই বিবাহে ব্রাহ্মপদ্ধতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে করে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ একদল নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্ম আন্দোলন করেন এবং 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি পৃথক সমাজ স্থাপিত হয়; বাকি জীবন কেশবচন্দ্র ধ্যান, যোগ ইত্যাদিতে কাটান এবং নববিধান' বা 'সমন্বয় ধর্ম' নামে নতুন নতুন সাধন প্রবর্তন করেন।

মৃত্যু ৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *দুইটি প্রার্থনা, বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য, ভক্তি, ধর্মসাধন, জীবনবেদ* প্রভৃতি। এছাড়াও আছে শতাধিক ইংরেজি গ্রন্থ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ২৬ জুন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে, নৈহাটির (উত্তর চব্বিশ পরগনা) কাঁঠালপাড়া গ্রামে। পিতা যাদবচন্দ্র। মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী। প্রাথমিক শিক্ষা পিতার কর্মস্থান মেদিনীপুরে। পরে হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৬ খ্রি. আইন পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে

ভর্তি হন। পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখান থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খ্রি. বি. এ. পরীক্ষা চালু হলে ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দু'জন—যদুনাথ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র—দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রি. সরকার তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করায়, আইন পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। পরে ১৮৬৯ খ্রি. আইন পাশ করেন। একাদিক্রমে ৩৩ বছর সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৮৯১ সালে অবসর নেন। সাহিত্যস্রষ্টা ঔপন্যাসিক, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা এবং বাঙলার 'নবজাগরণ যুগের' অন্যতম অগ্রণী পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ-রচনা এবং সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও নতুন আলোক আনয়ন করেন।

মৃত্যু ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, কৃষ্ণচরিত, সাম্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, ধর্মতত্ত্ব* প্রভৃতি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর সিংহ-বাড়িতে। পিতা নন্দলাল সিংহ। অল্প বয়সে পিতাকে হারিয়ে কালীপ্রসন্ন অভিভাবক হিসেবে পেয়েছিলেন ছোট-আদালতের বিচারক হরচন্দ্র ঘোষকে। হিন্দু কলেজে কালীপ্রসন্ন কয়েকবছর পড়েছেন। বাড়িতে তাঁকে ইংরেজি পড়াতেন উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক, সংস্কৃত পড়াতেন একজন পণ্ডিত। নিতান্ত বালকবয়সে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপন করেন। এই সভায় তিনি প্রবন্ধ পড়তেন, ডেভিড হেয়ারের বাৎসরিক স্মৃতিসভাতেও নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। ১৮৫৬ সালে সিংহ-বাড়িতে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে বেণীসংহার, বিক্রমোর্বশী নাটক-অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন। *বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা* এবং *বিবিধার্থ সংগ্রহ* পত্রিকা সম্পাদনায় কালীপ্রসন্নের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা হুতোম প্যাঁচার নকশার রচিয়তা কে তা নিয়ে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হলেও, নকশাগুলি কালীপ্রসন্নের রচনা মনে করার অনেক কারণ আছে। পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি অষ্টাদশ খণ্ড মহাভারত অনুবাদ করে তা বিনামূল্য বিতরণ করেন। মাইকেল মধুসূদনের সংবর্ধনা, নীলদর্পণ-মামলায় জেমস লঙের হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান, বিধবাবিবাহ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ ও অর্থসাহায্য, অবৈতনিক বিদ্যালয় ও সাধারণ পাঠাগার স্থাপন, দুঃস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য, দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নানা কাজে 'তিনি যেমন তাঁহার Purse-এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।' (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য)

মৃত্যু ২৪ জুলাই ১৮৭০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বাবু নাটক, বিক্রমোর্বশী নাটক, সাবিত্রী-সত্যবান নাটক, মালতীমাধব নাটক, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পুরাণ সংগ্রহ : মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত।*

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

জন্ম ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীর অন্তর্গত মালির বাগান নামক স্থানে। পিতা রামজয় তর্কালঙ্কার। আট বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং কৃতী ছাত্র হিসাবে বার বার বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রি. প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্তন হলে কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ঐ বছরই বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এক বছর পর কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে পশ্চিমে অজ্ঞাতবাস করতে থাকেন। এই ঘটনায় তাঁর দাদা সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন, 'আমার ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য গত ৫ই বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬/১৭ বৎসর। কিন্তু খর্বাকৃতির জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ। সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন, প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাহার নিকট যথোচিত বাধিত উপকৃত হইব। শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক (সংবাদ প্রভাকর) ২০শে এপ্রিল, ১৮৫৭, ৮ই বৈশাখ, ১২৬৫।' ১৮৬০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিদ্যালয়সমূহের উপ-পরিদর্শক এবং ১৮৬২ খ্রি. প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খ্রি. বি. এল. পাশ করে অধ্যাপনা ছেড়ে ওকালতি করেন। ১৮৮৪ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৮৯১ খ্রি. রিপন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে ১৯০৩ খ্রি. অবসর-গ্রহণ করেন। কঁৎ-এর পজিটিভিজম দর্শনে বিশ্বাসী, বহুভাষাবিদ্, সংস্কৃত পণ্ডিত, স্মার্ত, আইনজ্ঞ সাহিত্যসেবী, ব্যবহারবিদ্, অধ্যাপক ও দৃঢ়চেতা এই মনীষী উনিশ শতকের এক বিচিত্র প্রতিভা।

মৃত্যু ১৩ অগাস্ট ১৯৩২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা-ভ্রমণ, বিচিত্রবীর্য্য, পৌল ভর্জ্জিনী, সুহৃৎ-স্মৃতি, ললিতবাবু, সেকালের কথা, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনবৃত্তান্ত, Positivism কাহাকে বলে?* প্রভৃতি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১১ মার্চ ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মাতা সারদা দেবী। বাল্যশিক্ষা প্রধানত স্বগৃহে। পরে সেন্ট পল্‌স স্কুল ও হিন্দু কলেজে

ভর্তি হলেও পাঠ শেষ করেননি। একাধারে কবি, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং বাংলায় কবিতাকারে শর্টহ্যান্ড ও আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবক আত্মভোলা দ্বিজেন্দ্রনাথের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন কাব্যচর্চা, জ্ঞানসাধনা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। তিনিই প্রথম 'মেঘদূত' বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য কাব্যগ্রন্থ। 'তত্ত্ববোধিনী', 'ভারতী', 'সাধনা' নবপর্যায়ে 'বঙ্গ দর্শন', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' প্রভৃতি সমকালীন সাময়িকপত্রে তাঁর বহু রচনা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তিনিই 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'রও সম্পাদনা করেন।

মৃত্যু ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *মেঘদূত, তত্ত্ববিদ্যা (১-৪), আর্য্যামি ও সাহেবিআনা, সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা, হারামণি অন্বেষণ, রেখাক্ষর বর্ণমালা, আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত* প্রভৃতি।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

জন্ম ২৩ জুলাই ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে, ঢাকা, বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে। পিতা শিবনাথ। কালীপ্রসন্ন বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে ফারসিভাষায় 'বন্দে নামাবয়াৎ' এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের অধিকাংশ স্থান কণ্ঠস্থ করে আবৃত্তি করতে পারতেন। দশ বছর বয়সে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজি শেখেন। এর পর কলকাতায় ইংরেজি-সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, থিওলজি প্রভৃতি এবং শেষে পাণিনি পড়তে শুরু করেন। বাইশ বছর বয়সে ঢাকা ছোট আদালতে পেশকার পদে নিযুক্ত হন। এখানে এগারো বছর কাজ করার পর ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার হন। ১৮৭৪ খ্রি. 'বান্ধব' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। বাগ্মিতার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ইংরেজি ও বাংলায় বক্তৃতা দিতে হত।

মৃত্যু ২৯ অক্টোবর ১৯১০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব, প্রভাত-চিন্তা, নিভৃতচিন্তা, নিশীথ-চিন্তা* প্রভৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ১ জুন ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মাতা সারদা দেবী। গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত ও ইংরেজি শেখেন। ১৮৫৭ খ্রি. হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬২ খ্রি. লন্ডন যান এবং ১৮৬৪ খ্রি. আই. সি. এস. হয়ে স্বদেশে ফেরেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। চাকরি করতে সস্ত্রীক বোম্বাই যান। ১৮৬৫ খ্রি. আমেদাবাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট

কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৭ খ্রি. অবসর নিয়ে কলকাতায় ফেরেন। দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে কলকাতার বেলগাছিয়ায় 'হিন্দুমেলা'র প্রর্বতন করেন ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন। 'মিলে সব ভারতসন্তান' গানটি তাঁর রচনা। সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন।

মৃত্যু ৯ জানুয়ারি ১৯২৩ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *স্ত্রী-স্বাধীনতা, ভারতবর্ষীয় ইংরাজ, সুশীলা ও বীরসিংহ* (নাটক), *বোম্বাই চিত্র* প্রভৃতি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জন্ম ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে। পিতা নীলকমল। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন গিরিশচন্দ্রের প্রথম জীবনে প্রথাগত শিক্ষার প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকলেও উত্তরকালে বন্ধু ব্রজবিহারী সোমের প্রভাবে প্রচুর পড়াশুনা করেন। অ্যাটকিন্‌সন্ টিল্‌কন্ কোম্পানির 'বুক-কিপার' হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ। নাট্যজগতে প্রবেশ করেন মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের গীতিকার হিসাবে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে 'নিমচাঁদ' চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে গিরিশচন্দ্র বাগবাজারে যে শখের যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন, এই দুটি নাটকই তারা প্রযোজনা করেছিল। বাগবাজার দল ১৮৭১ খ্রি. 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করে অভিনয় আরম্ভ করে। কিন্তু টিকিট বিক্রি নিয়ে মতান্তর হওয়ায় দলের সংস্রব ত্যাগ করেন। এর পর ১৮৮০ খ্রি. পার্কার কোম্পানির ১৫০ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে ১০০ টাকা বেতনে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার হন। এই মঞ্চেই অভিনীত হয় তাঁর রচিত প্রথম মৌলিক নাটক 'আগমনী' (১৮৮৭)। পরবর্তী জীবনে স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গালয় পরিচালনার পর পুনরায় ১৯০৮ খ্রি. মিনার্ভার নাট্যাধ্যক্ষরূপে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। সেকালে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ক্ষমতা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল।

মৃত্যু ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *দক্ষযজ্ঞ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, জনা, পাণ্ডবগৌরব, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, কালাপাহাড়, ম্যাকবেথ* (অনুবাদ) এবং *মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, মেঘনাদবধকাব্য, পলাশীর যুদ্ধ*-এর নাট্যরূপ প্রভৃতি।

চন্দ্রনাথ বসু

জন্ম ৩১ অগাস্ট ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে, হুগলি জেলার কৈকালা গ্রামে। পিতা সীতানাথ। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে চন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে কিছুদিন জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিতে পড়বার পর ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হন। এখান থেকে প্রবেশিকা

পরীক্ষায় পাশ করে অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. এবং বি. এ. পাশ করেন। ১৮৬৬ খ্রি. ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. এবং পরের বছর বি. এল. পাশ করেন। কর্মজীবনে বহুবার পেশা পরিবর্তন করেছেন। সমসাময়িক শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। উনিশ শতকের অন্যতম জাতীয়চেতনাসঞ্চারক চন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হত 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'নবজীবন', 'নব্যভারত', 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায়।

মৃত্যু জুন ১৯১০ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, পশুপতি সংবাদ, বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, সাবিত্রী-তত্ত্ব, ফুল ও ফল, বেতালে বহু রহস্য, হিন্দুত্ব* প্রভৃতি।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ৩১ অক্টোবর ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে, নদীয়া জেলার গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামে। পিতা আনন্দচন্দ্র। রাজকৃষ্ণ প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজে এবং পরে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. এবং বি. এল. পাশ করেন। শিক্ষা-শেষে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কটক ল' কলেজ, বহরমপুর কলেজ প্রভৃতি বহু কলেজে অধ্যাপনা করে অবশেষে বাঙলা গভর্নমেন্টের বাংলা অনুবাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ফারসি, উর্দু, ওড়িয়া, সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি, লাতিন ও পালি ভাষা জানতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন।

মৃত্যু ১০ অক্টোবর ১৮৮৬ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *যৌবনোদ্যান, মিত্রবিলাপ, কাব্যকলাপ, রাজবালা, প্রথম শিক্ষা বীজগণিত, প্রথম শিক্ষা, বাঙ্গালার ইতিহাস, কবিতামালা, নানা প্রবন্ধ* প্রভৃতি।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

জন্ম ১২ জুলাই ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে, নদীয়া জেলার শিমহাট গ্রামে। পিতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগেন্দ্রনাথ কলকাতায় থেকে শিক্ষালাভ করে এম. এ. পাশ করেন। ক্যাথিড্র্যাল মিশন কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতা করে ১৮৮০ খ্রি. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। পরে স্বাস্থ্যের কারণে ঐ কাজ ত্যাগ করেন। পাশ্চাত্য ইতিহাস ও দর্শনে গভীর জ্ঞান ছিল। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের সবিশেষ সহায় ছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যা মহালক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। 'আর্যদর্শন' মাসিক-পত্র প্রচার করে এক সময় যোগেন্দ্রনাথ যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুমেলার নাম পরিবর্তন করে 'ভারতমেলা' করার প্রস্তাব করেন।

মৃত্যু ১২ জুন ১৯০৪ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *আত্মোৎসর্গ, হৃদয়োচ্ছ্বাস, প্রাণোচ্ছ্বাস, কীর্তিমন্দির, সমালোচনামালা, জ্ঞানসোপান, চিন্তাতরঙ্গিনী* এবং *গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, ওয়ালেস, জন স্টুয়ার্ট মিল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার* প্রভৃতির জীবনী।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

জন্ম ১১ ডিসেম্বর ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে, হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়। পিতা গঙ্গাচরণ। অক্ষয়চন্দ্র কিছুকাল বহরমপুরে ওকালতি করেন। সরল ভাষায় রাজনীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি চুঁচুড়া থেকে 'সাধারণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'নবজীবন' নামে মাসিক পত্রিকারও তিনি স্বত্বাধিকারী সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিত লিখতেন। সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহকারী সভাপতি ছিলেন। রায়তের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন।

মৃত্যু ২ অক্টোবর ১৯১৭ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *গোচারণের মাঠ, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, সমাজ আলোচনা, শিক্ষানবিশের পদ্য, হাতে হাতে ফল, পিতা পুত্র, সনাতনী, মোতিকুমারী, রূপক ও রহস্য, মহাপূজা* প্রভৃতি।

মীর মশাররফ হোসেন

জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে, কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায়। পিতা পীর মোয়াজ্জেম হোসেন। উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসাবে যশস্বী। যে-সব প্রগতিশীল লেখক সাহিত্যকে কৃষক-সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। 'বিষাদ-সিন্ধু' তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর 'জমিদার দর্পণ' নাটকের অবলম্বন ১৮৭২-৭৩ খ্রি. পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের কৃষক-বিদ্রোহ। ফরিদপুর নবাব এস্টেটে এবং দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের চাকরি করলেও দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছেন — দেশ-দেশান্তরের খবরাখবর যা তাঁর প্রত্যক্ষগোচর হত — তিনি সেগুলি সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। তাঁর সাহিত্যগুরু ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু ১৯১২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *রত্নবতী, গোরাই-ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু, বসন্তকুমারী, এর উপায় কি? গো-জীবন, বেহুলা গীতাভিনয়, উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজী মিঁয়ার বস্তানী, মদিনার গৌরব, বিবিকুলসুম* প্রভৃতি।

শিবনাথ শাস্ত্রী

জন্ম ৩১ জানুয়ারি ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে, চব্বিশ পরগনার চিংড়িপোতায় মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগনার মজিলপুর গ্রাম। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য। মাতা গোলকমণি দেবী। বাল্যশিক্ষা মায়ের কাছে। মজিলপুরের আদর্শ বাংলা বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ন'বছর বয়সে কলকাতায় এসে ভর্তি হন সংস্কৃতকলেজে। ১৮৬৬ খ্রি. এনট্রান্স, ১৮৬৮ খ্রি. এল. এ. (এফ. এ.), ১৮৭১ খ্রি. বি. এ. এবং ১৮৭২ খ্রি. সংস্কৃত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করে 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। ছাত্রাবস্থায় সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে একদিকে যেমন তাঁর পাঠ্যজীবন বাধাপ্রাপ্ত হয় অন্যদিকে পিতার বিরাগভাজন হন। তিনি অবশ্য মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের অশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। একসময় দ্বারকানাথের বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটি শিবনাথ দেখতেন। ১৮৭৪ খ্রি. তিনি ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলে হেডমাস্টার পদে যোগ দেন। ১৮৭৬ খ্রি. হেয়ার স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে আসেন কিন্তু সরকারি চাকুরির প্রতি বিরাগবশত এবং ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য দু'বছর বাদে পদত্যাগ করেন। গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও হিন্দুদের মধ্যে সেকালে প্রচলিত কুসংস্কার ও অর্থহীন আচার-আচরণের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মায়। বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং বাল্যবিবাহের বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেন। শিবনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন ১৮৬৯ খ্রি.। তখন তাঁদের নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। নারী-মুক্তি আন্দোলনেও তিনি কেশবচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। পরে, মহিলাদের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। শিবনাথ প্রমুখেরা কেশবচন্দ্রকে অগ্রাহ্য করে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় বা বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বীয় কন্যা হেমলতাকে ভর্তি করে দেন। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন তরুণকে নিয়ে একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করেন ১৮৭৭ খ্রি.। তাঁর লেখা 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' আজও গবেষকদের কাছে অতি মূল্যবান আকরগ্রন্থ।

মৃত্যু ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *নির্বাসিতের বিলাপ, পুষ্পমালা, এই কি ব্রাহ্মবিবাহ, মেজবৌ, গৃহধর্ম্ম, জাতিভেদ, রামমোহন রায়, হিমাদ্রিকুসুম, পুষ্পাঞ্জলি, ছায়াময়ী পরিণয়, যুগান্তর, নয়নতারা, ধর্মজীবন (১-৩), বিধবার ছেলে, প্রবন্ধাবলী* প্রভৃতি।

রমেশচন্দ্র দত্ত

জন্ম ১৩ অগাস্ট ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায় মামার বাড়িতে— বর্তমান বেথুন রো'র কাছে, কৃষ্ণ সিংহের গলিতে। পৈতৃক বাসভূমি কলকাতার রামবাগান অঞ্চলে। পিতা ঈশানচন্দ্র। মাতা থাকমণি দেবী। ১৮৬৪ খ্রি. কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৬৬ খ্রি. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করে, আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্য

বিলাত যান। সেখানে সিভিল সার্ভিস ও ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফেরেন। কলকাতায় ফিরে আসার পরই তিনি সরকারি কাজে যোগ দেন। ১৮৮৩ খ্রি. রমেশচন্দ্র প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৩ থেকে '৯৭ খ্রি. পর্যন্ত ভারতে অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন। এই চাকরি ছেড়ে তিনি বিলাত যান। সেখানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা এবং ভারতের ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। স্বদেশে ফিরে বরোদা'র রাজা গায়কোয়াড়ের অনুরোধে রাজস্ব সচিব হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ছ'বছর পরে চাকরি ছেড়ে বাংলায় ফিরে বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে সাহিত্যকর্মে লিপ্ত হন। ১৮৯৮ খ্রি. রমেশচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯০৫ খ্রি. ভারতে শিল্প-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৯ খ্রি. ১ জুন, তিনি পুনরায় বরোদার দেওয়ান পদে কার্যভার গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও রমেশচন্দ্র তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্যকে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করেছেন। তিনিই সমগ্র 'ঋগ্বেদ'-এর প্রথম বঙ্গানুবাদক ও প্রকাশক।

মৃত্যু ৩০ নভেম্বর, ১৯০৯ খ্রি. বরোদায় কর্মরত অবস্থায়।

রচিত গ্রন্থ : *বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, সংসার, সমাজ* প্রভৃতি। এছাড়া অনেকগুলি ইংরেজি গ্রন্থ।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৪ মে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে, মামার বাড়ি পাণ্ডুগ্রামে। পৈতৃকনিবাস বর্ধমানের গঙ্গাটিকুরি। পিতা বামাচরণ। ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে ১৮৬৯ খ্রি. বি. এ. পাশ করে বীরভূমের হেতমপুর ও বর্ধমানের ওকড়সা স্কুলে হেডমাস্টারের কাজ করেন। ১৮৭১ খ্রি. বি. এল. পাশ করে পূর্ণিয়ায়, দিনাজপুরে, কলকাতা হাইকোর্টে, সবশেষে আমৃত্যু বর্ধমানে ওকালতি করে গেছেন। মাঝে কিছুদিন মুন্সেফের কাজও করেন। বাংলা সাহিত্যের 'পাঁচু ঠাকুর' ইন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিস্ময়কর। সরস হাস্য-পরিহাসে ও রঙ্গরসিকতায় সেকালে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। শ্লেষব্যঙ্গপূর্ণ 'পঞ্চানন্দ' মাসিকপত্র তাঁর প্রমাণ। বিলাতি আচারের অন্ধ অনুকরণ, প্রগতি ও সংস্কৃতির নামে ইংরেজসেবার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন 'পঞ্চানন্দ'। বঙ্কিমের ভাষায় বাঙলার জীবন ও সাহিত্যাকাশে তিনি 'হেলির ধুমকেতু'। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পাঁচ খণ্ডের 'ভারত উদ্ধার' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কাব্য।

মৃত্যু ২৩ মার্চ, ১৯১১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *উৎকৃষ্ট কাব্যম্, কল্পতরু, ক্ষুদিরাম* প্রভৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৪ মে, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মাতা সারদা দেবী। বাল্যশিক্ষা স্বগৃহে। পরে সেন্ট পল্‌স, মন্টেগু অ্যাকাডেমি ও হিন্দু স্কুলে

পড়াশুনা করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. পড়ার সময়ে জোড়াসাঁকো থিয়েটার সংগঠনের চেষ্টায় কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৬৭ খ্রি. অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল আমেদাবাদ গিয়ে সেতারবাদন, অঙ্কনবিদ্যা এবং ফরাসি ও মারাঠী ভাষা শিক্ষা করেন। কলকাতায় ফিরে এসে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে ১৮৬৯-৮৮ খ্রি. কাজ করেন। চৈত্র বা হিন্দুমেলার যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন ১৮৭৪-৭৫ খ্রি.। ইতিমধ্যে তাঁর রচিত জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়ায় তাঁর নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হয়। বিচিত্রকর্মা পুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশি দেশলাই তৈরি, দেশি কাপড়-বোনা, দেশি স্টিমার সার্ভিস চালু করা এবং নীলচাষ ও পাটের ব্যবসা করার চেষ্টায় বহু আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেছেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী-মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ইতিহাস, দর্শন, ভ্রমণ-কাহিনী এবং বহু গল্প ও উপন্যাস ফরাসি সাহিত্যভাণ্ডার থেকে আহরণ করে বাংলায় অনুবাদ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকও বাংলায় অনুবাদ করেন।

মৃত্যু ৪ মার্চ ১৯২৫ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *কিঞ্চিৎ জলযোগ, সরোজিনী, এমন কর্ম আর করব না, অশ্রুমতী নাটক, হঠাৎ নবাব, হিতে বিপরীত, স্বরলিপি, গীতিমালা, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, বিক্রমোর্ব্বশী, বেণীসংহার নাটক, দায়ে পড়ে দার-গ্রহ, জুলিয়াস সীজার, মিলিতোনা প্রভৃতি।*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

জন্ম ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে, নৈহাটি চব্বিশ পরগনায়। পিতা রামকমল ভট্টাচার্য। রামকমলের পঞ্চম পুত্রের নাম শরৎনাথ ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে শরৎনাথই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নামে খ্যাত। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ লিখেছেন, 'আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দীর হাইস্কুলেই হয়। ...তখন আমার বয়স ন'বছর—স্কুলে আসিয়া Admission Register দেখিলাম। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য, সেই নামেই আমায় ভরতি হইতে হইয়াছিল।' শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তিনি ১৮৭১ খ্রি. এন্ট্রান্স ১৮৭৩ খ্রি. এফ. এ. এবং ১৮৭৬ খ্রি. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। সংস্কৃত কলেজে এম. এ. পড়বেন বলে কলকাতায় এলেন কিন্তু অর্থাভাবে সে উদ্দেশ্য বিফল হবার উপক্রম হলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। ১৮৭৭ খ্রি. এম. এ. পাশ করে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। কর্মজীবনে বোহেমিয়ান চরিত্রের প্রকাশ লক্ষণীয়। প্রথমে ছিলেন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক, ১৮৭৮ খ্রি. কয়েকদিনের জন্য লখনউ যান লখনউ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ নিয়ে। এরপর কলকাতা সংস্কৃত কলেজ, সরকারি অনুবাদকের সহকারী পদ, বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ব্যুরো অফ ইনফরমেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়— বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি ১৯০৭ খ্রি. নেপালে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ-নিদর্শন

'চর্যচর্যাবিনিশ্চয়', সরোহবজ্র রচিত 'দোহাকোষ', কাহ্নপাদ রচিত 'দোহাকোষ' ও সংস্কৃতে রচিত ডাকার্ণব-এর প্রাচীন পুথি আবিষ্কার।

মৃত্যু ১৭ নভেম্বর ১৯৩১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *ভারত মহিলা, বাল্মীকির জয়, সচিত্র রামায়ণ, মেঘদূত ব্যাখ্যা, কাঞ্চনমালা, বেনের মেয়ে, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধ ধর্ম* প্রভৃতি। ইংরেজিতেও তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ আছে।

প্রিয়নাথ সেন

জন্ম ১০ নভেম্বর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। পিতা মহেন্দ্রনাথ। সাহিত্যক্ষেত্রে 'সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি এবং ইতালীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গদ্যরচনার বিষয়বস্তু— রবীন্দ্রনাথের কাব্যব্যাখ্যান বা সাহিত্যদ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন। তিনি কবিতাও লিখতেন। মোপাসাঁ ও রাস্কিন সম্বন্ধেও তাঁর রচনা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহোদরসুলভ প্রীতি ছিল।

মৃত্যু ২৫ অক্টোবর ১৯১৬ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি*।

স্বর্ণকুমারী দেবী

জন্ম ২৮ অগাস্ট ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে পিতৃগৃহে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা। বিবাহের পর স্বামীর নিকট ইংবেজি ভাষা শিক্ষা করেন। ঠাকুরবাড়ির সমৃদ্ধ শিক্ষিত অভিজাত সংস্কৃতিমনস্ক পরিবেশে লালিত স্বর্ণময়ীকে দেশজোড়া সাধারণ মেয়ের মতো অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা-সংস্কারবদ্ধতা-প্রথাসর্বস্বতার অদ্ভুত আঁধারে বাস করতে হয় নি। মাত্র কুড়ি বছর বয়স থেকে শুরু করে ছিয়াত্তর বছরের জীবন-পরিধির মধ্যে রচনা করেছেন সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস, ছোটোগল্প, বিজ্ঞান-সমাজ-ভ্রমণ-ব্যক্তি বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা, কৌতুকনাট্য, গান। ১২৯১ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। নিরুপায় বিধবা বালিকাদের শিক্ষাদানে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে কলকাতায় 'সখি সমিতি' গড়ে তোলেন।

মৃত্যু ৩ জুলাই ১৯৩২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *দীপ নির্ব্বাণ, ছিন্ন-মুকুল, মালতী, মিবাবরাজ, হুগলীর ইমামবাড়ী, স্নেহলতা, বিদ্রোহ, ফুলের মালা, কাহাকে?, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলনরাত্রি, নবকাহিনী ও অন্যান্য গল্প, মালতী ও গল্পগুচ্ছ, বসন্ত-উৎসব, বিবাহ-উৎসব, দেব-কৌতুক, কনে-বদল, পৃথিবী, কবিতা ও গান* প্রভৃতি।

বিপিনচন্দ্র পাল

জন্ম ৭ নভেম্বর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামে। পিতা রামচন্দ্র। বিদ্যাশিক্ষা প্রথমে একজন মৌলবীর কাছে পরে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। ১৮৭৪ খ্রি. প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে দু'বছর এবং কলকাতার চার্চ মিশনারি সোসাইটিতে এক বছর পড়ে গণিতের জন্য আই. এ. পাশ করতে না পারলেও পরিচিত মহলে তাঁর ইংরেজি-জ্ঞানের খ্যাতি ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রেরণায় ১৮৭৭ খ্রি. ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ত্যাজ্যপুত্র হন। কটক, শ্রীহট্ট, কলকাতা, বাঙ্গালোরে শিক্ষকতা করেন। ১৮৯৮ খ্রি. বৃত্তি পেয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়ার জন্য বিলাত যান। ভারতে ফিরে ১৯০১ খ্রি. 'নিউ ইন্ডিয়া' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হয়ে সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তাঁর বাগ্মিতা সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল। রাজনৈতিক জীবনে তিনি লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলকের অনুগামী এবং চরমপন্থী 'লাল-বাল-পাল'-এর অন্যতম। ১৯২১ খ্রি. গান্ধীজি প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে নিন্দিত হন ও সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী বিপিনচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন।

মৃত্যু ২০ মে ১৯৩২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *শোভনা, ভারত সীমান্তে রুস, ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সুবোধিনী, ভক্তিসাধন, জেলের খাতা, চরিতকথা, সত্য ও মিথ্যা, প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ, নবযুগের বাঙ্গালা, রাষ্ট্রনীতি* প্রভৃতি।

জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, ময়মনসিংহে। আদি নিবাস ঢাকার রাড়িখাল অঞ্চলে। পিতা ভগবানচন্দ্র। পিতার কর্মক্ষেত্র ফরিদপুরে বাল্য-শিক্ষা। পরে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ও কলেজে শিক্ষালাভ করে ইংলন্ড যান। সেখানে ১৮৮৪ খ্রি. কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. পাশ করেন। দেশে ফিরে ১৮৮৫ খ্রি. প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। এ সময়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক নেশা ছিল ফোটোগ্রাফি ও শব্দগ্রহণ। ৩৫ বছর বয়সে 'বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গ' সম্বন্ধে গবেষণায় মনোনিবেশ করে এ বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন। তাঁর এই গবেষণা ইউরোপের বেতার-গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এসসি. উপাধি প্রদান করেন। বিজ্ঞান সাধনার পাশাপাশি মাতৃভাষার প্রতিও তাঁর বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাঁর বাংলা রচনা 'অব্যক্ত'র মধ্যে তাঁর সৌন্দর্য-পূজারী শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৫ খ্রি. অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নিয়ে 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু সেখানে গবেষণা করেন।

মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭ খ্রি., গিরিডিতে।

রচিত গ্রন্থ : *Plant Responses as a Means of Physiological Investigations, Physiology of the Ascent of Sap, Physiology of Photosynthesis, Nervous Mechanism of plants* প্রভৃতি।

যোগেশচন্দ্র রায়

জন্ম ২০ অক্টোবর ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে পিতার কর্মস্থল বাঁকুড়ায়। পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার আরামবাগের ৪ মাইল দক্ষিণে দিগড়া গ্রামে। ১৮৮৩ খ্রি. বছরের একমাত্র ছাত্র হিসাবে বটানিতে ২য় বিভাগে এম.এ. পাশ করে কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের লেকচারার হন। একটানা ৩০ বছর অধ্যাপনার পর ১৯১৯ খ্রি. অবসর নেন। আজীবন তিনি বাংলা ভাষা, জ্যোতির্বিদ্যা ও কলা-চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। পুরীর পণ্ডিতসভা তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডক্টরেট, রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী পদক প্রভৃতি সম্মানে ভূষিত ছিলেন। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন।

মৃত্যু ৩০ জুলাই ১৯৫৬ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, রত্নপরীক্ষা, বাঙ্গালা ভাষা, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, শিক্ষা-প্রকল্প, পূজাপার্বণ, কোন্ পথে, বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, কি লিখি* প্রভৃতি।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জন্ম ২৭ অক্টোবর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে, ফরিদপুর জেলার খানাকুল গ্রামে। কবি ও নৃতত্ত্ববিদ। ইনি তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া ভাষাও জানতেন। সম্বলপুরে আইন ব্যবসায় করতেন। দেশীর রাজ্য সোনপুরের রাজার আইন-উপেষ্টা ছিলেন দীর্ঘ ৪০ বছর। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হন। শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারান। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পালি ভাষা থেকে 'থেরীগাথা' এবং সংস্কৃত থেকে 'গীতগোবিন্দ' বাংলায় অনুবাদ করেন।

মৃত্যু ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *কবিতা, যুগপূজা, ফুলশর, যজ্ঞভস্ম, পঞ্চকমালা, কথানিবন্ধ, Elements of Social Anthropology, Aborigines of Central India, Orissa in the making* প্রভৃতি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

জন্ম ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে, হুগলি জেলার খন্যান-এ। পিতা দেবীচরণ। হুগলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতা জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। কিন্তু দেশ-সেবার জন্য কলেজ ত্যাগ করেন। কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিন্ধুদেশে যান। সেখানে কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক পাদরির সঙ্গে মিলিত হয়ে খ্রিস্টধর্মের অনুরাগী হন। এর পরে খুল্লতাত রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রথমে প্রটেস্ট্যান্ট ও পরে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন। এই সময় তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষায় পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্যাগ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করেন। সিন্ধুদেশে থাকার সময় কয়েকজন সিন্ধুযুবককে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। সেখানে তিনি 'কঙ্কর্ড ক্লাব' নামে একটি সমিতি স্থাপন ও 'কঙ্কর্ড' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশ করেন। এর পর কিছুদিন করাচিতে 'ফিনিক্স' ও 'হার্মান' পত্রিকার সম্পাদন ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তায় কলকাতায় 'টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' নামে একটি মাসিক-পত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। ১৯০১ খ্রি. স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করে ১৯০২-০৩ খ্রি. বেদান্ত প্রচারার্থ বিলাত যান এবং অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯০১ খ্রি. রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপনকালে তাঁর সক্রিয় সাহায্য পান। ১৯০৫ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে ইনি 'সন্ধ্যা' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সরকারি আদেশে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বন্ধ করা হয় এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি মুদ্রাকরসহ ধৃত হন। মামলা চলাকালে গুরুতর পীড়িত হন।

মৃত্যু ২৭ অক্টোবর ১৯০৭ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি, ব্রহ্মামৃত, সমাজতত্ত্ব, আমার ভারত উদ্ধার, পালপার্বণ* প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মাতা সারদা দেবী। বিদ্যাশিক্ষার জন্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেও শিক্ষা শেষ করেন নি। স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা না হলেও বিভিন্ন গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নানামুখী জ্ঞানার্জনের কোনো ত্রুটি ঘটে নি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তাঁকে বিলাত পাঠানো হয় কিন্তু দেড় বছর পরে পিতার আদেশে দেশে ফিরে আসেন। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সংগীত' ও 'রুদ্রচণ্ড' রচনা করেন। জ্ঞানাঙ্কুর

পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' এবং প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে জয়মাল্য লাভ করেন। পরবর্তীকালে, গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গকৌতুক, দিন-লিপি, ভ্রমণকাহিনী, শিক্ষা, রাজনীতি ও দেশপ্রেম বিষয়ক প্রবন্ধ, শব্দ-ছন্দ-ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্য-কবিতা, রূপকনাট্য, প্রহসন এবং সর্বোপরি সংগীত রচনায় তাঁর দান অজস্র ও অপূর্ব। Song Offerings কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ খ্রি. নোবেল পুরস্কার পান। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁর অসামান্য কীর্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জাপান, ইতালি, ইংলন্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ভ্রমণ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরকার-প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্যপ্রযোজক এবং স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের একক চেষ্টায় বাংলাভাষা সকল দিকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

মৃত্যু ৭ অগাস্ট ১৯৪১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *কড়ি ও কোমল, মানসী, বাল্মীকি প্রতিভা, সোনার তরী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, চোখের বালি, আত্মশক্তি, গোরা, প্রাচীন সাহিত্য, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, খেয়া, রাজা, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, গীতাঞ্জলি, ডাকঘর, বলাকা, স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষাতত্ত্ব, পূরবী, মুক্তধারা, চার অধ্যায়, গল্পগুচ্ছ, শান্তিনিকেতন, মহুয়া, চিরকুমার সভা, জীবনস্মৃতি, শেষ সপ্তক, পুনশ্চ, শ্যামলী, বিশ্বপরিচয়, জন্মদিনে* প্রভৃতি।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

জন্ম ১৫ জুলাই ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে, মাতুলালয় চাণক (ব্যারাকপুর) চব্বিশ পরগনায়। পিতা শশিভূষণ বসু। বাল্যকালে পিতার কাছে লাহোরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রের সভ্যা এবং মাতৃভাষার বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় তাঁর স্বাক্ষরবিহীন বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর একমাত্র রচনা 'শুভবিবাহ।'

মৃত্যু ১১ এপ্রিল ১৯২০ খ্রি.।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম ১৯ জুলাই ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র। হুগলি কলেজ থেকে বি. এ. এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. পাশ করে সরকারি বৃত্তি

নিয়ে কৃষিবিদ্যা শিখতে বিলাত যান। এখানে পাশ্চাত্য সংগীত শেখেন ও Lyrics of Ind নামে ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। নানা ধরনের চাকুরি করেছেন— সেটেলমেন্ট অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আবগারী বিভাগের প্রথম পরিদর্শক, ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার বিভাগে সহকারী ডিরেক্টর। স্বাধীনচেতা হওয়ায় চাকুরিজীবন সুখের হয়নি। অল্প বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করে ১৯০৩ খ্রি. পর্যন্ত কবিতাই লেখেন। এর মধ্যে প্রহসন কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কবিতাও আছে। শেষ দশ বছর প্রধানত নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিলাতে থাকাকালে সেখানকার প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় এবং রঙ্গালয়ের কলাকৌশল সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা এই সময় কাজে লাগে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক— সবরকম নাটক রচনাতেই দক্ষ ছিলেন। তাঁর হাসির গান এক সময় বাঙালিদের নির্মল আনন্দ দিয়েছে। সংগীত রচনায় দেশীয় ও পাশ্চাত্য সুর ব্যবহার করেছেন।

মৃত্যু ১৭ মে ১৯১৩ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *কল্কি অবতার, আর্যগাথা, আষাঢ়ে, হাসির গান, ত্র্যহস্পর্শ, বিরহ, পাষাণী, তারাবাই, রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, সাজাহান, মেবার পতন, পুনর্জন্ম, চন্দ্রগুপ্ত, পরপারে* প্রভৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ

জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে. কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে পৈতৃক বাড়িতে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। শৈশবের নাম বীরেশ্বর বা বিলে। স্কুলে ভর্তির সময় নাম রাখা হয় নরেন্দ্রনাথ। ১৮৭৯ খ্রি. মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে ১৮৮১ খ্রি. এফ. এ., ১৮৮৩ খ্রি. বি. এ.। ১৮৮৪-৮৬ খ্রি. মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) আইন বিভাগের ছাত্র। এই সময় পিতার মৃত্যুতে সাংসারিক অনটনে পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। সাংসারিক প্রয়োজনে মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কলেজে পড়বার সময় রামমোহন রায়ের বেদান্তদর্শন বিষয়ে গ্রন্থ পড়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। ১৮৮১ খ্রি. সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৬ অগাস্ট ১৮৮৬ খ্রি. রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর গুরুভ্রাতাদের নিয়ে বরাহনগরে মঠ-স্থাপন করে সন্ন্যাস-নাম গ্রহণ করেন 'বিবেকানন্দ'। পরের পাঁচ বছর পরিব্রাজকরূপে আসমুদ্রহিমাচল ভারত-ভ্রমণ করেন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য ৩১ মে ১৮৯৩ খ্রি. আমেরিকা যাত্রা করেন। ওই ধর্মমহাসভায় তাঁর ভাষণ সে দেশের ধর্মপ্রচারক মহলে আলোড়ন তোলে। ১৮৮৬ খ্রি. পর্যন্ত বোস্টন, ডেট্রয়েট, নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, ব্রুকলিন প্রভৃতি নগরে বক্তৃতা দেন। তাঁর বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় ইংলন্ড ও আমেরিকার বহু নরনারী তাঁর বক্তব্যে ও ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মিস্ মার্গারেট

নোবল (নিবেদিতা) অন্যতম। ১৮৯৭ খ্রি. ভারতে প্রত্যাবর্তন ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৮ খ্রি. বেলুড় মঠ স্থাপন ও ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সূচনা। ১৮৯৯ খ্রি. মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন, বাংলায় 'উদ্বোধন' ও ইংরেজিতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ খ্রি. দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রা। বাংলা সাহিত্যে সফল কথ্যভাষার অন্যতম প্রচারক বিবেকানন্দ।

মৃত্যু ৪ জুলাই ১৯০২ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *পরিব্রাজক, ভাববার কথা, বর্তমান ভারত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বীরবাণী, Karmayoga, Rajayoga, Jnanayoga, Bhaktiyoga* প্রভৃতি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জন্ম ২০ অগাস্ট ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে, মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দি গ্রামে। পিতা গোবিন্দসুন্দর। ছ'বছর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্তি হন। পরে কান্দি ইংরেজি স্কুল থেকে ১৮৮১ খ্রি. বৃত্তিসহ এনট্রান্স পাশ করেন। এই সময় তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতৃব্যের সঙ্গে কলকাতায় এসে ১৮৮৬ খ্রি. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি. এ., ১৮৮৭ খ্রি. এম. এ. পাশ করেন। ১৮৮৮ খ্রি. পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরের দু'বছর প্রেসিডেন্সি কলেজ লেবরেটরিতে বিনা বেতনে বিদ্যাচর্চা করেন। ১৮৯২ খ্রি. রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ও শেষে অধ্যক্ষ হন। 'নবজীবন' পত্রিকায় 'মহাশক্তি' নামে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। পরে 'সাধনা', 'ভারতী' পত্রিকাতেও লিখতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে পরিষদের উন্নতিসাধন করেন।

মৃত্যু ৬ জুন ১৯১৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *প্রকৃতি, পুণ্ডরীককুলকীর্তি পঞ্জিকা, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা, মায়াপুরী, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কর্মকথা, চরিতকথা, বিচিত্রপ্রসঙ্গ, শব্দ কথা, বিচিত্র জগৎ, নানা কথা, যজ্ঞকথা* প্রভৃতি।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ২০ ডিসেম্বর ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে, পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে। পৈতৃক নিবাস ২৪ পরগনার অন্তর্গত হালিশহর। পিতা বেণীমাধব। পাটনা কলেজ থেকে ১৮৮৭ খ্রি. সংস্কৃতে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। কাশীর সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। হিন্দি, উর্দু, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এঁর জীবনের প্রথমাংশ সরকারি চাকুরি ও অধ্যাপনার কাজে অতিবাহিত হয়। পরে সংবাদপত্র সম্পাদনা শুরু করেন। 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী' ও 'হিতবাদী' পত্রিকা বহুদিন ইনি যোগ্যতার

সঙ্গে সম্পাদনা করেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদনায়। কার্টুন প্রকাশের জন্য এই পত্রিকাটি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গালয়' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন।

মৃত্যু ১৫ নভেম্বর, ১৯২৩ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *আইন-ই-আকবরী, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উমা, রূপ-লহরী, সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস, বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়, সাধের বউ, দরিয়া* প্রভৃতি।

সখারাম গণেশ দেউস্কর

জন্ম ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। পিতা সদাশিব গণেশ দেউস্কর। ('মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্তর্গত রত্নাগিরি জেলায় শিবাজীর মালবণ নামক দুর্গের নিকট দেউস নামে একটি গ্রাম আছে। এই দেউস দেউস্কর বংশের আদি নিবাস।') সখারাম বৈদ্যনাথের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৯১ খ্রি. প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে ওই স্কুলেই ১৫ টাকা বেতনে সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই ইনি বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। প্রথমে 'প্রতিভা' নামক মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখতেন। ক্রমে বাংলার সংবাদপত্রে ও সাময়িক সাহিত্যে প্রধান লেখকদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। দেওঘরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট অত্যাচারী হার্ড-এর বিরুদ্ধে বহু তথ্য হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশ করলে ম্যাজিস্ট্রেটের কোপানলে পড়ে ১৮৯৭ খ্রি. শিক্ষকতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। দেওঘরের নিভৃত নিবাস ছেড়ে কলকাতায় এসে সখারাম সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ তাঁকে ওই পত্রিকার প্রুফ-রিডার নিযুক্ত করেন। ১৯০৭ খ্রি. জাপান থেকে দেশে ফেরার পথে কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হলে সখারাম 'হিতবাদী'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'হিতবাদী'র সম্পাদকের পদ ত্যাগ করার পর সখারাম ন্যাশনাল কাউন্সিলের (জাতীয় শিক্ষা পরিষদের) বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯১০ খ্রি. তাঁর 'দেশের কথা' গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্তৃপক্ষীয়দের শঙ্কিত ভাব দেখে তিনি এই কাজও ছাড়তে বাধ্য হন। এর পর আবার কিছুদিন 'হিতবাদী'র সম্পাদক হয়েছিলেন। এই সময় তাঁর একমাত্র পুত্র ও পত্নীর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে রোগে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তিনি কলকাতা ছেড়ে পৈতৃক ভিটা মহারাষ্ট্রের করোঁগ্রামে চলে যান।

মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৯১২ খ্রি. দেওঘরে।

রচিত গ্রন্থ : *দেশের কথা, তিলকের মকদ্দমা, বাজীরাও, এটা কোন যুগ, ঝান্সির রাজকুমার, মহামতি রাণাডে, আনন্দীবাই* প্রভৃতি। এ ছাড়া মারাঠি ভাষাতেও তাঁর বই আছে।

চিত্তরঞ্জন দাশ

জন্ম ৫ নভেম্বর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায়। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার তেলরবাগ গ্রামে। পিতা ভুবনমোহন। বাল্যশিক্ষা ভবানীপুর লন্ডন মিশনারি স্কুলে। ১৮৯০ খ্রি. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যান। কিন্তু উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ভারতসম্বন্ধে বিলাতে একটি তীব্র বক্তৃতা দেওয়ায় শিক্ষানবিশদের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়। অতঃপর ১৮৯৩ খ্রি. ব্যারিস্টারি পাশ করে স্বদেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বারীন ঘোষ, অরবিন্দ প্রমুখের পক্ষ সমর্থনে ব্যারিস্টার ও দেশপ্রেমিকরূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। গান্ধীজির আহ্বানে বহু সহস্র টাকার মাসিক আয় ত্যাগ করে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই অসামান্য ত্যাগের ফলে সারা দেশ অনুপ্রাণিত হয় এবং বাঙলার মানুষ তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২১ খ্রি. আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরের বছর কারামুক্ত হয়ে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারি নীতির বিরোধিতা করার জন্য আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে মত দেন। তাঁর এ নীতি কংগ্রেস গ্রহণ না করায় তিনি কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ করে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা চালান। রাজনীতির মধ্যে থেকেও তিনি রীতিমতো সাহিত্যচর্চা করতেন। তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা, 'নারায়ণ' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে পৈতৃক বসতবাটি জনসাধারণকে দান করেন। এখন সেখানে তাঁর নামাঙ্কিত 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠিত।

মৃত্যু ১৬ জুন ১৯২৫ খ্রি. দার্জিলিঙে।

রচিত গ্রন্থ : *মালঞ্চ, সাগরসঙ্গীত, মালা, অশোকগুচ্ছ, অন্তর্যামী* প্রভৃতি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৬ নভেম্বর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। পিতা বীরেন্দ্রনাথ। মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী। বলেন্দ্রনাথ প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। পরে হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথের জীবনে সাহিত্য-সাধনা ছাড়া, দুটি বৃহত্তর কর্মসাধনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ কুষ্টিয়াতে একটি ফার্ম খোলেন। অর্থ ও উৎসাহ দিয়ে রবীন্দ্রনাথও এই ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এ-ছাড়া পঞ্জাবের আর্যসমাজ ও কলকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের মিলনে বলেন্দ্রনাথ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা আর্যসমাজীদের কাছেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। নিতান্ত অল্প বয়সেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার উন্মেষ হয়। প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় তাঁর প্রথম লেখা, গদ্যরচনা 'একরাত্রি' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর লেখা

ছাপা হয়। ঠাকুর-পরিবারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রিকার বাইরে তিনি লেখেন নি। সংস্কৃত-সাহিত্য সমালোচনার পাশাপাশি প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের কবি ও কাব্য সম্পর্কেও বলেন্দ্রনাথের রচনার পরিধি কম নয়। তিনি ললিতকলার সমালোচনাতেও সূক্ষ্ম রসবোধ ও নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক প্রবন্ধগুলি তাঁর পরিণত চিন্তার ফসল। এছাড়া বর্ণনামূলক ও ব্যক্তিগত নিবন্ধ এবং কবিতাও রচনা করেছেন।

মৃত্যু ২০ অগাস্ট ১৮৯৯ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *চিত্র ও কাব্য, মাধবিকা, শ্রাবণী, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী* প্রভৃতি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৭ অগাস্ট ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। পিতা গুণেন্দ্রনাথ। মাতা সৌদামিনী দেবী। বাল্যশিক্ষা ঠাকুরবাড়ির প্রথানুসারে গৃহশিক্ষকের কাছে। সংস্কৃত কলেজেও কিছুকাল পড়েছিলেন। ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে দখল ছিল। ইটালিয়ান গিলার্ডি ও ইংরেজ পামার-এর কাছে প্যাস্টেল, জল রং, তেল রং ও পোর্ট্রেট অঙ্কন শেখেন। কিন্তু পাশ্চাত্যরীতির চিত্রাঙ্কনবিদ্যা তাঁকে পরিতৃপ্ত করেনি। শুরু হয় ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-রীতি পুনরুদ্ধারের সাধনা। কলকাতাস্থ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাভেল উৎসাহ দিলেন। তাঁরই অনুরোধে আর্ট কলেজের উপাধ্যক্ষ হলেন। জাপানি শিল্পীর কাছে জাপানি অঙ্কন-রীতি শিক্ষা করেন। অচিরে ভারতীয় শিল্পের নবজন্মদাতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯২১ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতীর আচার্য-পদ গ্রহণ করেন ১৯৪২ খ্রি.। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় লেখক-রূপে। ছোটো ও বড়োদের উপযোগী বহু কাহিনী ও প্রবন্ধ রচনা করেন। বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলী ও রসসঞ্চারে এইসব রচনা বহুবিচিত্র ও অনন্য। শ্রুতি-লেখিকার সাহায্যে বর্ণিত তাঁর দুটি অনবদ্য গ্রন্থ 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে।'

মৃত্যু ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা, রাজকাহিনী, শকুন্তলা, নালক, ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী* প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে, হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। পিতা মতিলাল। মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। পাঁচ বছর বয়সে দেবানন্দপুরে প্যারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্তি হন। এর পর দেবানন্দপুরেই সিদ্ধেশ্বর মাস্টারের স্কুলে এক বছর পড়ার পর তিনি পরিবারের সঙ্গে ডিহিরিতে চলে যান। সেখানে দু'তিন বছর তিনি কোনো স্কুলে ভর্তি হননি। প্রায় দশ বছর বয়সে মাতুলালয়ে ভাগলপুরে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হন। আরো দু বছর ভাগলপুরে পড়ার পর পিতার সঙ্গে দেবানন্দপুরে ফিরে আসেন এবং হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন। আর্থিক অসচ্ছলতায় মাঝে মাঝে তাঁকে পড়াশুনা বন্ধ রাখতে হয়। অবশেষে ভাগলপুরের বিখ্যাত বিদ্যালয় তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে আঠারো বছর বয়সে শরৎচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষণে ১৯০৩ খ্রি. ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন। রেঙ্গুনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে চাকুরি করতেন। ১২/১৩ বছর প্রবাসে থাকা-কালে আত্মীয়-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে সাহিত্যরচনার সূত্রপাত। প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' নামে গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কার পায়। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি'। গল্প উপন্যাস ছাড়া রাজনীতি বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়।

মৃত্যু ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ খ্রি.।

রচিত গ্রন্থ : *শ্রীকান্ত* (১-৪), *দেবদাস, চন্দ্রনাথ, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, চরিত্রহীন, পল্লীসমাজ, বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, পরিণীতা, মেজদিদি, পথের দাবি, গৃহদাহ, দেনা-পাওনা* প্রভৃতি।